বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রভাব

পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

গবেষক

মোঃ আলী করিম

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, **"বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রভাব"** (Impact of Rohingya Refugees on Socio-economic aspects of Bangladesh) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশ বিশেষ ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে জমা দেওয়া হয় নাই।

আমি আরও অঙ্গিকার করছি যে, আমার দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোনো ধরনের Plagiarism (অন্যের লেখা আমার নিজের বলে চালানো) নেই।

গবেষক

(মোঃ আলী করিম)
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন: ০৩/২০১৩-২০১৪
পূন:রেজিস্ট্রেশন: ০৩/২০১৩-২০১৪ (২০১৯-২০)
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস
ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ আলী করিম (রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ০৩/২০১৩-২০১৪, পূন) এর **"বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রভাব"** (Impact of Rohingya Refugees on Socio-economic aspects of Bangladesh) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচনা করেছেন। আমার জানা মতে এ অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোথাও ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য জমা দেওয়া হয় নাই। এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম।

এ গবেষণাটি তাৎপর্যপূর্ণ, তথ্যবহুল ও তত্ত্বের আলোকে রচিত মৌলিক গবেষণাকর্ম। গবেষক ২০১৩-২০১৪ সেশনে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে দীর্ঘ প্রায় এক দশক ধরে নির্ধারিত বিষয়ে অনুসন্ধান ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। ২০১৭ সালে নতুন করে বিপুল সংখ্যক (প্রায় ১০ লাখ) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনের ফলে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর বিভিন্ন বিষয়ে (জীবনমান, মানসিক চাপ, আর্থ-সামাজিক, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি) প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ গবেষণায় গবেষক আর্থ-সামাজিক বিষয়ে সুক্ষাতিসুক্ষ্ম তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। এ আগমনের পরিধি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপান প্রক্রিয়ায় চাপের বিষয়টি তুলে ধরার জন্য গবেষককে পরিস্থিতি বুঝতে বাস্তবতা ও তত্ত্বগত বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান করতে হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এ দীর্ঘ সময়ব্যাপী গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্টতা গবেষকের জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করছি।

(অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস)

তত্ত্বাবধায়ক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান প্রভু আল্লাহ’র নিকট শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে **“বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রভাব”** শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করার তাওফীক দান করেছেন। হৃদয়ের গভীর থেকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, লেখক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস-এর প্রতি; যিনি শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনার ফলে এ পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

শরণার্থী ক্যাম্পে গবেষণাকর্ম পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, কক্সবাজারের তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিসি (ডেপুটি কমিশনার) এবং কক্সবাজারে অবস্থিত শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনের কমিশনারগণ, অতিরিক্ত কমিশনারগণ বিশেষ করে জনাব মোহাম্মদ সামছু-দ্দৌজা’র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়া শরণার্থী ক্যাম্পের দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের অগ্রজ মোঃ ওবায়দুল্লাহ, আমার বিভাগের অগ্রজ মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান ও সহপাঠী মোঃ জালাল উদ্দিন, মহেশখালী উপজেলার তৎকালীন নির্বাহি অফিসার মোঃ আবুল কালাম এবং উক্ত কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ধন্যবাদ জানাই। তাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতাসহ বিভিন্ন এনজিও প্রতিবেদন, আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের বিবরণী, বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত শরণার্থী চুক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ সরবরাহ করে আমাকে এ গবেষণা সম্পন্ন করতে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহিব উল্লাহ সিদ্দিকী, অধ্যাপক ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অধ্যাপক ড. রাহমান নাসির উদ্দিন, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. খোন্দকার লুৎফুল এলাহি প্রমুখ। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছাইদুল হক, অধ্যাপক ড. নাহিদ ফেরদৌসী, জনাব শহীদ আহমেদ চৌধুরী, অধ্যাপক ও ডীন ডা. মোহাম্মদ নোমান সরকার, অধ্যাপক ড. মোঃ মঈনুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহ্ আলম সরকার, অধ্যাপক ড. সাদিয়া আফরোজ সুলতানা, অধ্যাপক ড. সাবিনা ইয়াসমিন, অধ্যাপক ড. মো. চেঙ্গীশ খান, অধ্যাপক ড. মহাঃ আমিরুল ইসলাম, আমিরুল ইসলাম (গণিত), ড. মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, ড. রাফসান মাহমুদ, ড. মোঃ মোতাহারুল ইসলাম, ড. ইকবাল হুসাইন, মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম (গণিত), অধ্যাপক ড. মোঃ রকিবুর রহমান, ড. মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, এমএস কাজী শারমিন পামেলা, জনাব মোঃ মাঈনউদ্দিন ও মোঃ ওমর ফারুক ভূঁইয়া প্রমুখ। এছাড়া আরও ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যায়ের কর্তৃপক্ষ ও সকল সুহৃদ সহকর্মী যাঁদের প্রেরণা আমাকে পথ চলতে উৎসাহ যুগিয়েছে; তাদের পরামর্শ এ গবেষণা পরিচালনার পথকে মসৃণ করেছে।

এ মিশ্র পদ্ধতির গবেষণায় যে সকল জ্ঞানতাপস ও গবেষকগণ আমাকে অনেক কিছু হাতে কলমে শিখিয়েছেন, স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনাও দিয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম পরামর্শক ও

হিতাকাঙ্ক্ষী শিক্ষক, শরণার্থী বিষয়ক গবেষক, রেমিটেন্স বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন গবেষণাকর্মের রিভিউয়ার অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার, ড. একেএম সাইফুল্লাহ, গবেষক ড. মো: আশরাফুজ্জামান খান, ডা. মোঃ আবু সায়েম (পিএইচ.ডি) ও অধ্যাপক ড. মো: সাহাবুল হক এর অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং আমার শিক্ষক, পরামর্শক ও হিতাকাঙ্ক্ষী বিশেষ করে ইতিহস গবেষক ও অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান (ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, অধ্যাপক ড. মো. আতাউর রহমান মিয়াজী, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. মো. মোশাররফ হোসাইন ভুঁইয়া, অধ্যাপক ও ডীন ড. আবদুল বাছির, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম আজাদ, সহপাঠী ও অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল্লাহ ও অধ্যাপক ড. এটিএম সামছুজ্জোহা এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যারা গবেষণাকালীন সময় আমার অনেক দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে এ গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করতে নিঃস্বার্থ সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কক্সবাজারের কৃতি সন্তান, সাংবাদিক ও লেখক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম ও এ্যাডভোকেট এসএ নাঈম (সুপ্রিম কোর্ট) এর প্রতি। মাগুরা জেলার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং পরবর্তিতে শিক্ষকতা জীবনে গুরুজনের দোয়া ও পরিতৃপ্তির ভালবাসায় সিক্ত ছিলাম। এজন্য সকল স্তরের শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞ যাঁদের জ্ঞান ও আদর্শের আলোয় আমি এ পর্যন্ত আসার সুযোগ পেয়েছি।

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় দেশী-বিদেশী বিভিন্ন লেখকের রচনা ও বইপত্র এবং গবেষণাকর্মের সহযোগিতা গ্রহণ করেছি। যথাস্থানে ‘পাদটিকা’ ও উদ্ধৃতিতে তাঁদের নাম, গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরী, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার শাহবাগ, জাতীয় গ্রন্থাগার আগারগাঁও, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, রেফিউজি এ্যান্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস্ রিসার্স ইউনিট (রামরু) লাইব্রেরী, কাকরাইল, ঢাকা, ‘ঐতিহ্য’ গ্রন্থাগার রাজশাহী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা, IBS লাইব্রেরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী ছাড়াও বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে যেসব প্রতিষ্ঠান, সুধীজন, শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী আমাকে সহযোগিতা করেছেন এবং দোয়া করেছেন তাদের সকলের প্রতি অকৃত্রিম ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাছাড়াও এ গবেষণা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক পিএইচ.ডি ক্যাটাগরিতে গবেষণা বৃত্তি মঞ্জুরি প্রদান ও এককালীন আর্থিক অনুদানের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

হৃদয়ের গহীন থেকে উৎসারিত সকল শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার মরহুম পিতা, আমার প্রথম শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম রশিদ এর প্রতি। অর্জিত জ্ঞান বিতরণ, মানুষের জন্য ত্যাগ স্বীকার, সহায়তা প্রদানে আগ্রহ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষকে সম্মান করার ব্যাকুলতা ছিল যাঁর চরিত্রের ভূষণ। আমার

প্রাণপ্রিয় মা রাবেয়া খাতুন-এর প্রতি প্রকাশ করছি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। কাক ডাকা ভোর থেকে রাত অবধি সংসারের সকল কাজ একাই সামলে আমাদের শিক্ষার পথ সুগম করতে তিনি ছিলেন সদাব্যস্ত।

গবেষণাকর্মের জন্য অনেক সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে লাইব্রেরিতে অবস্থান ও মাঠকর্ম পরিচালনায় দীর্ঘসময় কক্সবাজার অবস্থান করায় পুত্র আফরাজ জাঈম ও কন্যা আলফিয়া ফারওয়াহ্ আমার স্নেহ ও সান্নিধ্য হতে বঞ্চিত হয়েছে। কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসায় সিক্ত আমার সহধর্মিণী মেহনাজ মুস্তারী তালুকদার (তিন্নি) এর প্রতি। গবেষণা চলাকালীন সময় সে সংসারের গুরুদায়িত্ব বিশেষ করে সন্তানদের পরিপূর্ণ দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে এ গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করতে সহযোগিতা করেছে। আমার ব্যস্ততা তাদের প্রাপ্য সুবিধা ও নৈকট্য থেকে বঞ্চিত করেছে। সকল কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে তারা আমাকে সাহস, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তাই আমি সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক কল্যাণ ও সুস্থতা কামনা করছি।

মোঃ আলী করিম
জুলাই, ২০২২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সারসংক্ষেপ

১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শরণার্থী পুনর্বাসনকল্পে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সকে (Hiram Cox) প্রথমে তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) ও পরে তত্ত্বাবধায়কের ক্ষমতাসহ কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। এ সময় থেকেই কক্সবাজার অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিগণ ভূমি রাজস্ব আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পতিত জমি ও বনভূমি বরাদ্দ করা হয়। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে এ অঞ্চলের মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বনভূমির জায়গা বন্দবস্ত (লিজ) নিয়ে যুগের পর যুগ বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছে। এ স্থানীয় জনগোষ্ঠী ক্ষেত-খামার, চাষাবাদ, মৎস আহরোণ ও বনজসম্পদ কাজে লাগিয়ে জীবন নির্বাহ করে থাকে। দুই শত বছরের বেশি সময় ধরে রাখাইন (আরাকান) অঞ্চল থেকে রাখাইন ও আরাকানীজ মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে আসা-যাওয়া অব্যাহত রয়েছে। তবে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সত্তরের দশকে নির্যাতিত হয়ে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে কয়েক লাখ সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে আগমন করে। এরপর চার দশক ধরে একইভাবে শরণার্থী হয়ে আগত কয়েক লাখ রোহিঙ্গা চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ করে কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছে। বাংলাদেশে অবস্থিত কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় সর্বশেষ ৩৩টি রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে প্রায় ১১ লাখ শরণার্থীর বসবাস রয়েছে (অল্পকিছু নোয়াখালি জেলার ভাসান চরে রয়েছে)। এ সকল শরণার্থী ক্যাম্পে তারা নূন্যতম মৌলিক অধিকার নিয়ে কোনো রকম জীবন ধারণ করে বেঁচে আছে। এ গবেষণায় ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের পাশাপাশি মিশ্র পদ্ধতিতে পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা এলাকা হিসেবে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলাকে নিধারণ করা হয়েছে।

মিয়ানমার থেকে উচ্ছেদ হওয়া এ বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর অধিকার নিশ্চিত করা বাংলাদেশের একার পক্ষে সম্ভব নয়। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের মানবিক আশ্রয় প্রদানের পর উখিয়া ও টেকনাফ অঞ্চলের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ে। তাই গবেষণায় দেখা যায়, এ সকল শরণার্থী ক্যাম্পের আশপাশে শত শত বছর ধরে বসবাস করা স্থানীয় জনগোষ্ঠী যাদের পেশা ছিল মূলত কৃষি ও মৎসজীবি এবং বনের ওপর নির্ভরশীল। রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় তাদের চাষের জমি কমেছে, শ্রমিকের শ্রমের মূল্য হারিয়েছে, স্থানীয় পণ্য উৎপাদন কমে গেছে, অন্য স্থান থেকে আসা পণ্য দ্রব্যের মূল্য কয়েক গুণ বেড়ে গেছে, দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা কমে গেছে। নদী-নালা, খাল-বিলের পানি দূষিত হওয়ায় মিঠা পানির মাছের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। বন-জঙ্গল ধ্বংস হওয়ায় অস্বাভাবিক ভাবে গাছ-পালা কমে গেছে, অধিকাংশ স্থানীয়দের আয়-রোজগার কমে গেছে, জ্বালানী ও বনজ সামগ্রির সংকট দেখা দিয়েছে। রাস্তা-ঘাটে মানুষের চলাচল, সকাল থেকে বাজার-ঘাটে প্রচুর মানুষের ভীড় স্থানীয় গ্রামীণ পরিবেশ প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে। শরণার্থীদের বাসস্থানের আশপাশে মানুষের কোলাহল, নারী-পুরুষের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি ও ময়লা-দুর্গন্ধে স্থানীয় পরিবেশ বিষিয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন অতিষ্ঠ পরিবেশে বসবাস করা যেন দায় হয়ে পড়েছে। স্কুল কলেজে চাকুরি করা শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কমে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় সামান্য কিছু মানুষ লাভবান হয়েছে। স্বল্প শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত অল্প কিছু মানুষ

দেশি-বিদেশি এনজিওতে সামান্য কিছু চাকুরি পেয়েছে। অনেকে জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর ভাড়া দিয়ে মোটা অংকের অর্থ আয় করেছে। সংখ্যায় সামান্য স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, ঠিকাদার শ্রেণি, কিছু বড় ব্যবসায়ী হঠাৎ ধনী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

এ অবস্থায় বাংলাদেশে অবস্থানরত বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে শিবিরের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা বেশ কঠিন। এতে স্থানীয়দের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা ব্যাহত হওয়ায় শ্রমজীবী মানুষ কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে এবং নিম্ন আয়ের মানুষ দরিদ্র্য থেকে চরম দারিদ্র্যসীমায় ব্যাপকভাবে নেমে আসার আশঙ্কায় রয়েছে। স্থানীয় প্রান্তিক কৃষক শ্রেণি ও শ্রমজীবী মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাদের কৃষি আয়ের উৎসও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। রোহিঙ্গাদের উপস্থিতির কারণে গবাদিপশুর চারণভূমি সংঙ্কুচিত ও স্থানীয় শ্রমবাজার ভারসাম্য হারিয়েছে। অধিকাংশ স্থানীয় মানুষের এনজিও বা উন্নয়ন সংস্থায় ছোট-খাটো চাকরি করার মতো শিক্ষাগত যোগ্যতাও নেই। একদিকে তাদের আয় কমে গেছে আবার অন্যদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যও সংঙ্গত কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়েছে। বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ এবং অবৈধ গোপন বিবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমাজ জীবনে নানা ধরনের জটিল সমস্যা তৈরি হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ক্যাম্প কেন্দ্রিক মাদক ব্যবসা। একশ্রেণির স্থানীয় অসাদু ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ এর সাথে জড়িয়ে পড়েছে। শরণার্থীদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে মাদক বহনের কাজে অনেক ক্ষেত্রে শরণার্থী নারী, শিশু ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের ব্যবহার করা হচ্ছে। নেশার অর্থ যোগাড় করতে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনাচার বেড়েছে। এর মধ্যে অন্যতম চুরি, ডাকাতি, ছিন্তায়, খুন-খারাবি ও বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষের মানসিক ও পারিবারিক অবস্থা নাজুক হয়েছে। স্থানীয়দের বহু বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা তাদের পারিবারিক বন্ধনকে ক্ষয়িষ্ণু করছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমাজ জীবনে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধির ফলে সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে জটিল সমীকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরূপ অবস্থায় স্থানীয়রা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ চিন্তিত। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা পর্যন্ত শরণার্থী ইস্যুতে চাপের মধ্যে রয়েছে।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে; তা স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বের মাধ্যমে তাদের জীবনে বহুমাত্রিক প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে একটি ধারণা দেওয়া; যার মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নীতি ও কৌশল গ্রহণে সহায়ক হয়। এ বিষয়ে গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও কিছু সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে। যাতে মূলত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে স্থানীয় পর্যায়ে থেকে নিজেরাই সক্ষম হতে পারে। এ জন্য স্থানীয়দের স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকার মধ্য দিয়ে তারা সেখানে জীবনকে স্বাভাবিক রাখতে সচেষ্ট হবেন এমন কিছু সিদ্ধান্ত বা কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

মোঃ আলী করিম

জুলাই, ২০২২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সূচিপত্র

ঘোষণাপত্র -- i

প্রত্যয়নপত্র --- ii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার --- iii-v

এ্যাবস্ট্রাক্ট ---vi-vii

সূচিপত্র --viii-xv

চিত্রের তালিকা -- xvi-xvii

মানচিত্রের তালিকা --- xviii

সারণী--- xix- xx

শব্দ সংক্ষেপ -- xxi-xxiii

প্রথম অধ্যায়:

ভূমিকা --- পৃষ্ঠা (০১-২৭)

১.১ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনে স্থানীয়দের জীবন-যাত্রায় বিড়ম্বনা

১.১.১ বিশ্বব্যাপী শরণার্থী পরিস্থিতি

১.১.২ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী

১.১.৩ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর

১.১.৪ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির প্রেক্ষিত

১.১.৫ গবেষণার লক্ষ্য

১.১.৬ তত্ত্বগত আলোচনা

১.১.৭ গবেষণা পদ্ধতি

১.২ গবেষণার পটভূমি

১.৩ গবেষণার সমস্যা

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা

১.৬ গবেষণার তাৎপর্য

১.৭ অধ্যায় বিন্যাস

দ্বিতীয় অধ্যায়:

গবেষণা পদ্ধতি -- পৃষ্ঠা (২৮-৬০)

২. ভূমিকা:

২.১ গবেষণার প্রশ্ন

২.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

২.৩ গবেষণার নকশা

২.৩.১ তথ্য সংগ্রহের ধাপ

২.৩.২ প্রথম ধাপ
২.৩.৩ দ্বিতীয় ধাপ
২.৪ তথ্যের উৎসসমূহ:
২.৪.১ প্রাথমিক উৎস
২.৪.২ দ্বৈতীয়িক বা মাধ্যমিক উৎস
২.৫ গবেষণার নির্ধারিত এলাকা
২.৫.১ কক্সবাজার জেলা:
২.৫.১.১ উখিয়া উপজেলা
২.৫.১.১.১ রাজাপালং ইউনিয়ন
২.৫.১.১.১.১ কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প
২.৫.১.১.১.২ কুতুপালং মেকশিফ্ট ক্যাম্প
২.৫.১.১.২ পালংখালি ইউনিয়ন
২.৫.১.২ টেকনাফ উপজেলা
২.৫.১.২.১ হ্নীলা ইউনিয়ন
২.৫.১.২.১.১ নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্প
২.৫.১.২.১.২ লেদা মেকশিফ্ট ক্যাম্প
২.৬ গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি
২.৬.১ ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতির ব্যবহার
২.৬.২ দলিল-পত্র বিশ্লেষণ
২.৬.৩ পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতি
২.৭ তথ্য সংগ্রহের উপকরণসমূহঃ
২.৭.১ পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ
২.৭.২ প্রশ্নমালা জরিপ
২.৭.৩ গুণগত তথ্য সংগ্রহ
২.৭.৩.১ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক
২.৭.৩.২ যন্ত্রপাতির ব্যবহার
২.৭.৪.১ পর্যবেক্ষণ
২.৭.৪.২ নিবিড় সাক্ষাৎকার
২.৭.৪.৩ প্রধান তথ্য সরবরাহকারী বা কেআইআই
২.৭.৪.৪ দল ভিত্তিক অলোচনা
২.৮ গবেষণার নমুনা সংখ্যা নির্ণয়
২.৮.১ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী জনসংখ্যার পরিধি
২.৯ তথ্য সংগ্রহে অংশগ্রহণকারীদের বৈশিষ্ট্য
২.৯.১ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার পরিধি
২.১০ গুণগত তথ্য সংগ্রহে নমুনায়ন
২.১০.১ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী
২.১০.২ স্থানীয় জনগোষ্ঠী
২.১১ তথ্য বাছাই প্রক্রিয়া
২.১২ তথ্য বিন্যাস
২.১২.১ তথ্য বিশ্লেষণ কৌশল

২.১২.২ তথ্যের ত্রিভুজীকরণ পদ্ধতি
২.১৩ গবেষণার সীমাবদ্ধতা
২.১৪ গবেষণার নৈতিক অনুমোদন
২.১৪.১ তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ
২.১৫ গবেষণার অনুমোদন
২.১৬ গবেষণার তথ্য সংগ্রহের অনুমোদন
২.১৭ তথ্য সংরক্ষণের প্রক্রিয়া
২.১৮ উপসংহার

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

সংশ্লিষ্ট গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা---------------------------------পৃষ্ঠা (৬১-১১৬)

৩.১ ভূমিকা
৩.১.১ পর্যায়ক্রমিক গবেষণা পর্যালোচনা
৩.১.২ বিশ্বব্যাপী শরণার্থী ইতিহাস
৩.১.৩ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত শরণার্থী

৩.২ বিভিন্ন অঞ্চলে শরণার্থীদের অবস্থান
৩.২.১ আফ্রিকায় শরণার্থী অবস্থাঃ
৩.২.২ ইউরোপে শরণার্থী অবস্থাঃ
৩.২.৩ আরব বিশ্বে ফিলিস্তিন শরণার্থী
৩.২.৪ এশিয়ায় শরণার্থী অবস্থান
৩.২.৫ বাংলাদেশে বিহারী শরণার্থী
৩.২.৬ থাইল্যাণ্ডে বার্মিজ শরণার্থী
৩.২.৭ নেপালে ভুটানি লোটাস্যাম্পস শরণার্থী
৩.২.৮ শ্রীলংকা থেকে ভারতে আগত তামিল শরণার্থী
৩.২.৯ মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থী

৩.৩ শরণার্থী উপস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রায় প্রভাবঃ গবেষণা সূত্রপাত

৩.৪ শরণার্থী শিবিরের উপস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রভাবসমূহ

৩.৪.১ অর্থনৈতিক প্রভাবসমূহঃ
৩.৪.১.১ বাজার অর্থনীতিতে প্রভাবঃ
৩.৪.১.২ স্থানীয় বাজারে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি
৩.৪.১.৩ স্থানীয় শ্রম ও মজুরির উপর প্রভাব
৩.৪.১.৪ খাবার চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধিঃ
৩.৪.১.৫ কৃষি ব্যবস্থা
৩.৪.১.৬ ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ

৩.৪.২ সামাজিক প্রভাবসমূহঃ

৩.৪.২.১ স্থানীয় সম্প্রদায় এবং শরণার্থী জনসংখ্যার মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত
৩.৪.২.২ সামাজিক পরিষেবা
৩.৪.২.৩ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম
৩.৪.৩ পরিবেশগত বিষয়সমূহ
৩.৪.৩.১ প্রাকৃতিক পরিবেশ
৩.৪.৩.২ বন এবং জ্বালানী কাঠ
৩.৫ বার্মা: উপনিবেশ পূর্ব, উপনিবেশিক ও উপনিবেশ উত্তর আমলের পর্যালোচনা
৩.৬ বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রভাব
৩.৬.১ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মজুরীতে প্রভাব:
৩.৬.২ কাঠ ও জ্বালানীতে বন উজাড়
৩.৬.৩ পণ্যমূল্য বৃদ্ধি
৩.৬.৪ রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশীদের মধ্যে আত্মীয়তার মিশ্র বন্ধন
৩.৬.৫ পরিবেশগত বিপর্যয়
৩.৬.৫.১ বনের ওপর নির্ভরতা
৩.৬.৫.২ মাদক
৩.৭ উপসংহার

চতুর্থ অধ্যায়:
ধারণামূলক কাঠামো ও স্থিতিস্থাপকতার তাত্ত্বিক আলোচনা------------ পৃষ্ঠা (১১৭-১৪৬)
পর্ব-১
৪.১ ভূমিকা
৪.২ গবেষণার ধারণামূলক কাঠামো (Conceptual Framework)
৪.৩ রোহিঙ্গা শরণার্থী
৪.৪ স্থানীয় জনগোষ্ঠী
৪.৪.১ স্থানীয়দের আর্থ-সামাজিক অবস্থা
৪.৫ শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক মিথস্ক্রিয়া
৪.৫.১ অর্থনৈতিক বিষয়
৪.৫.২ সামাজিক বিষয়
৪.৫.২.১ স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং শরণার্থী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব
৪.৫.৩ পরিবেশগত বিষয়
৪.৬ উপসংহার
পর্ব-২
৪.২.১ ভূমিকা
৪.২.২ গবেষণায় তাত্ত্বিক কাঠামোর গুরুত্ব

৪.২.৩ উপযুক্ত তাত্ত্বিক কাঠামো নির্বাচন
৪.২.৪ তত্ত্ব ও গবেষণার পারস্পরিক সম্পর্ক
৪.২.৫ গবেষণায় তত্ত্বগত কাঠামো (Theoretical framework)
৪.২.৬ তাত্ত্বিক আলোচনা: শরণার্থী-স্থানীয় সম্প্রদায় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানো
৪.২.৭ স্থিতিস্থাপকতার ধারণা
৪.২.৮ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের স্থিতিস্থাপকতা
৪.২.৯ স্থিতিস্থাপকতার সাথে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক (ডিসিপ্লিন) পর্যালোচনা
৪.২.৯.১ সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা
৪.২.১০ স্থিতিস্থাপকতার (Resilience) তত্ত্ব গ্রহণের যৌক্তিকতা
৪.২.১১ স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্বগত ব্যবহার
৪.৩ উপসংহার

পঞ্চম অধ্যায়:

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পরিচয় ---------------------------- পৃষ্ঠা (১৪৭-২২৬)
৫.১ ভূমিকা
৫.১.১ আরাকান ও আরাকানী জনগোষ্ঠীর পরিচয়
৫.১.১.১ আরাকানের ভৌগোলিক পরিচয়
৫.১.১.২ আরাকান নামের উৎস
৫.১.১.৩ আরাকানে মুসলিম সম্প্রদায় ও আরব মুসলিমদের আগমন
৫.১.১.৪ ব্যবসা-বাণিজ্যে আরব মুসলিমগণ
৫.১.১.৫ আরাকানে রাখাইনদের আগমন
৫.১.১.৬ ১৭৮৫ সালে স্বাধীন আরাকান রাজ্যের পতন
৫.১.১.৭ ব্রিটিশদের আরাকান দখল ও মুসলিম সংগঠন
৫.১.১.৮ বার্মা প্রদেশ গঠন ও জাপানী শাসন
৫.১.১.৯ ব্রিটিশ নীতি ও মুসলিমদের সমস্যার সূত্রপাত
৫.১.১.১০ প্যানলং সম্মেলন ও আরাকানীজ মুসলিম
৫.১.২ রোহিঙ্গা শব্দের উৎপত্তি, নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও জীবনধারা
৫.১.২.১ বার্মায় রোহিঙ্গা ও জাতীয় পরিচয়
৫.১.২.২ বার্মার মুসলিম জাতি গঠন
৫.১.২.৩ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিকাশ
৫.১.২.৩.১ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও ঐতিহাসিক উপাদান
৫.১.২.৩.২ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বর্ণ সংঙ্কর ধারা
৫.১.২.৩.৩ রাখাইন-রোহিঙ্গা সম্পর্ক

৫.১.২.৩.৪ পরিচয় সংকটে রোহিঙ্গা মুসলমান
৫.১.২.৩.৫ পরিচয় বিতর্ক: 'রোহিঙ্গা' বনাম 'বাঙালি'
৫.১.২.৩.৬ ভাষা বিতর্ক: প্রসঙ্গ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী
৫.১.২.৩.৭ স্বাধীনতা উত্তর বার্মায় আরাকান (রাখাইন)
৫.১.২.৩.৮ স্বাধীনতা উত্তর বার্মায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী
৫.১.২.৩.৯ সামরিক শাসনামলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী (১৯৬২-২০১১)
৫.১.২.৩.১০'নাগরিকত্ব আইন' এর খড়গ ১৯৮২
৫.১.৩ মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং জাতিগত নির্মূলের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী
৫.১.৩.১ রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও জাতিগত সংঘাত
৫.১.৩.২ আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা গণহত্যা
৫.১.৩.৩ নারী নির্যতন ও গণধর্ষণ
৫.১.৩.৪ গণধর্ষণে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততা
৫.১.৪ বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ থেকে উগ্র বৌদ্ধ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ
৫.১.৪.১ বর্মী জাতীয়তাবাদ
৫.১.৪.২ বর্মী জাতীয়তাবাদ ও সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরোধ
৫.১.৪.২.১ ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ: বৌদ্ধ ভিক্ষু আন্দোলন
৫.১.৪.২.২ জাতীয় পরিচয়ের রাজনীতিকিকরণ
৫.১.৪.৩ বৌদ্ধ ভিক্ষু আন্দোলন: উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী প্রচারণা
৫.১.৪.৪ বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষার স্ববিরোধীতা: গণহত্যায় প্ররোচনা
৫.১.৫ উপসংহার

ষষ্ঠ অধ্যায়:

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমন ও অবস্থান-------------------পৃষ্ঠা (২২৭-২৮০)
৬.১ ভূমিকা
৬.১.১ আশ্রয়ের সন্ধানে বাংলাদেশে 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী
৬.১.২ শরণার্থী জনগোষ্ঠী সীমান্ত এলাকার বাস্তবতা
৬.১.৩ রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে অবস্থান (উখিয়া-টেকনাফ)
৬.২ বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনের ঘটনাপঞ্জি
৬.২.১ বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আগমন ১৯৭৮
৬.২.২ বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমন ১৯৯১-৯২
৬.২.৩ বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমন ২০১২
৬.২.৪ বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমন ২০১৬-১৭
৬.৩ বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের শিবিরে জীবন-যাপন (উখিয়া ও টেকনাফ)
৬.৩.১ কুতুপালং ও নয়াপাড়া অবস্থিত নিবন্ধিত শরণার্থী শিবির

৬.৩.২ কুতুপালং মেকশীফ্‌ট ও লেদা মেকশীফ্‌ট শিবির বা ক্যাম্প
৬.৩.৩ নতুন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিবিরে অবস্থান ও ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা ২০১৭
৬.৩.৩.১ কুতুপালং নিবন্ধিত ও নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্পের প্রশাসনিক ব্যবস্থা
৬.৩.৩.২ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কার্যক্রম
৬.৩.৩.৩ শরণার্থী ক্যাম্পে বিভিন্ন এনজিও কার্যক্রম
৬.৩.৩.৪ পরিচিতি (আইডি) নথি ও পারিবারিক বই বা ফ্যামিলি বুক
৬.৩.৩.৫ নন ফুড আইটেম (এনএফআই) বিতরণ
৬.৩.৩.৬ শরণার্থী পরিচিতি (আইডি) কার্ড ও মেডিকেল ডেটা শীট
৬.৩.৩.৭ ইউএনএইচসিআর-এর নিবন্ধন আপডেট ও নিবন্ধন যাচাই পদ্ধতি
৬.৩.৩.৮ শরণার্থী শিবিরের শিক্ষা কার্যক্রম
৬.৪ উপসংহার

সপ্তম অধ্যায়:

গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ--------------------------------------- পৃষ্ঠা (২৮১-৩২৩)

ক. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ক্যাম্প জীবন

৭.১ শরণার্থী শিবিরে (ক্যাম্প) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা
৭.২ উত্তরদাতাদের জনমিতিক বিশ্লেষণ
৭.৩ শিবিরের শিক্ষা কার্যক্রম
৭.৪ রোহিঙ্গাদের নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশে আগমন
৭.৫ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শিবিরে বসবাস
৭.৬ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পেশা ও জীবন-ধারণ
৭.৭ রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আত্মীয়তার সম্পর্ক
৭.৮ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সামাজিক সমস্যা
৭.৯ শরণার্থী শিবিরের পরিবেশগত বিষয়

খ. উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব (উখিয়া ও টেকনাফ)

৭.২ ভূমিকা
৭.২.১ উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জনমিতিক পরিসংখ্যান:
৭.২.২ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বসবাস
৭.২.৩ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পেশা ও আয়
৭.২.৪ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপনে প্রভাব
৭.২.৫ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে রোহিঙ্গাদের সামাজিক সম্পর্ক
৭.২.৬ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ
৭.২.৭ স্থানীয় পরিবেশগত বিষয়ক
৭.৩ উপসংহার

অষ্টম অধ্যায়:

গবেষণার ফলাফল আলোচনা --পৃষ্ঠা (৩২৪-৩৩৩)

৮.১ ভূমিকা

৮.২ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমন

৮.৩ আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

৮.৪ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ক্যাম্প জীবন-যাপন

৮.৫ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা

৮.৬ স্থানীয় সমাজে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর গ্রহণ ও বর্জন

৮.৭ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা

৮.৮ বাংলাদেশের নীতিগত অবস্থান

৮.৯ উপসংহার

নবম অধ্যায়:

উপসংহার ও সুপারিশমালা---পৃষ্ঠা (৩৩৪-৩৩৬)

তথ্যসূত্র/গ্রন্থপঞ্জি---পৃষ্ঠা (৩৩৭-৩৭৯)

জরিপ প্রশ্নমালা (রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী) -----------------------------------পৃষ্ঠা (৩৮০-৩৮৬)

জরিপ প্রশ্নমালা (স্থানীয় জনগোষ্ঠী) ------------------------------------পৃষ্ঠা(৩৮৭-৩৯২)

পরিশিষ্ট --পৃষ্ঠা (৩৯৩-৪০৬)

পরিশিষ্ট ১: -- (৩৯৩)

পরিশিষ্ট ২: -- (৩৯৪)

পরিশিষ্ট ৩: -- (৩৯৫)

পরিশিষ্ট ৪: -- (৪০০)

পরিশিষ্ট ৫: --- (৪০১-৪০২)

পরিশিষ্ট ৬: --- (৪০২)

পরিশিষ্ট ৭: --- (৪০৩)

পরিশিষ্ট ৮: --- (৪০৩)

পরিশিষ্ট ৯: --- (৪০৪)

পরিশিষ্ট ১০:--- (৪০৪)

পরিশিষ্ট ১১:---(৪০৫)

পরিশিষ্ট ১২:--- (৪০৬)

চিত্রের তালিকা

চিত্র-২.১০ঃ গবেষণা তথ্য সংগ্রহের ক্যাম্প ও গ্রামসমূহ
চিত্র-৩.১ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা
চিত্র-৩.২ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি
চিত্র-৪.১ঃ ধারণাগত কাঠামোর চিত্র
চিত্র-৪.৩ঃ ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা
চিত্র-৫.২ঃ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে রাখাইন সন্ত্রাসীদের আগুনে ভস্মীভুত হওয়ার চিত্র
চিত্র-৫.৩ঃ গণহত্যার সংজ্ঞায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ
চিত্র-৫.৪ঃ ১৯৪৮ সালের স্বাধীনতা লাভের পর নিপীড়নের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী
চিত্র-৫.৫ঃ ঘরবাড়িসহ অসংখ্য নোঙ্গর করা বজরা আর নৌকার শহর ও অন্যান্য স্থাপনা
চিত্র-৫.৬ঃ মিয়ানমারের সহিংসতার নেপথ্যে চরমপন্থি বৌদ্ধভিক্ষুরা
চিত্র-৫.৭ঃ ২০১৩ সালের টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ
চিত্র-৬.২ঃ রাখাইনে বৌদ্ধ সম্প্রদায় কর্তৃক রোহিঙ্গা মুসলিমদের বাড়িঘরে আগুণ লাগায়
চিত্র-৬.৩ঃ পারিবারিক নথির নিবন্ধীকরণ ফর্ম
চিত্র-৬.৪ঃ রোহিঙ্গাদের বর্ণ ও মুসলিম পরিচিতি কার্ড
চিত্র-৬.৫ঃ মিয়ানমারের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট ইস্যুকৃত রোহিঙ্গাদের পারিবারিক তালিকা
চিত্র-৭.২.১ঃ উত্তরদাতা রোহিঙ্গাদের আরাকানের আগত এলাকাসমূহ
চিত্র-৭.৫.১ঃ আরাকান থেকে এসে প্রথম বসবাস
চিত্র-৭.৫.২ঃ আরাকান থেকে আগত রোহিঙ্গাদের বাসস্থানের ধরণ
চিত্র-৭.৫.৩ঃ আগত রোহিঙ্গাদের সৌচাগারের অবস্থা
চিত্র-৭.৬.১ঃ আরাকান থেকে আগত রোহিঙ্গাদের পেশার ধরণ
চিত্র-৭.৬.২ঃ আরাকান থেকে আগত রোহিঙ্গাদের আয়
চিত্র-৭.৬.৩ঃ আগত রোহিঙ্গাদের জীবিকা নির্বাহের উৎসসমূহ
চিত্র-৭.৬.৪ঃ আগত রোহিঙ্গাদের উপার্জনকারী পারিবারিক সদস্য সংখ্যা
চিত্র-৭.৬.৫ঃ রোহিঙ্গাদের কক্সবাজারের বাইরে কাজ করার অভিজ্ঞতা
চিত্র-৭.৬.৬ঃ রোহিঙ্গাদের বিদেশ থেকে অর্থের যোগান আসে
চিত্র-৭.৭.১ঃ আরাকানের থেকে আগত রোহিঙ্গাদের বৈবাহিক স্থান
চিত্র-৭.৮.১ঃ কি ধরণের সামাজিক সমস্যার আছে
চিত্র-৭.৯.১ঃ পরিবারের অন্য সদস্যগণ বনে কাঠ কাটতে যায়
চিত্র-৭.৯.৩ঃ প্রথমে এসে আপনার পরিবারের রান্নার জ্বালানী ব্যবহৃত হয়
চিত্র-৭.২.২.১ঃ উত্তরদাতাদের ইউনিয়ন ভিত্তিক শতকরা হার
চিত্র-৭.২.২.২ঃ স্থানীয় উত্তরদাতাগণের আবাসস্থলের ধরণ

চিত্র-৭.২.২.৩ঃ স্থানীয় উত্তরদাতাগণ এখানে কতদিন যাবত বসবাস করছেন
চিত্র-৭.২.২.৪ঃ স্থানীয় উত্তরদাতাগণ যে যে ক্যাম্পের নিকট বসবাস করছেন
চিত্র-৭.২.২.৫ঃ উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা
চিত্র-৭.২.৩.১ঃ স্থানীয় উত্তরদাতাদের মাসিক আয়
চিত্র-৭.২.৩.২: স্থানীয় উত্তরদাতাদের পরিবারের মাসিক আয়
চিত্র-৭.২.৪.১ঃ স্থানীয় উত্তরদাতাদের উপার্জনকারী সদস্যদের সংখ্যা
চিত্র-৭.২.৪.২ঃ স্থানীয় উত্তরদাতাদের এ ক্ষতি পুষিয়েছে
চিত্র-৭.২.৫.১ঃ উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে রোহিঙ্গাদের সম্পর্ক
চিত্র-৭.২.৫.২ঃ কি কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মজুরি কমেছে
চিত্র-৭.২.৫.৩ঃ স্থানীয় বাজরে শ্রমের মজুরি বৃদ্ধির কারণ
চিত্র-৭.২.৫.৪ঃ সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে
চিত্র-৭.২.৫.৫ঃ এ প্রভাব বেশি হওয়ার কারণ কি কি
চিত্র-৭.২.৫.৬ঃ কৃষিতে কি কি ধরণের প্রভাব পড়েছে
চিত্র-৭.২.৫.৭ঃ কৃষিতে প্রভাব কাটিয়ে উঠেছে
চিত্র-৭.২.৫.৮ঃ কৃষিতে প্রধান ঝুঁকি হয়
চিত্র-৭.২.৬.১ঃ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণে বিরূপ প্রভাব
চিত্র-৭.২.৬.২ঃ বন কি কি উপকার আসে
চিত্র-৭.২.৬.৩ঃ বনে আগের মতো সুবিধা না পাওয়ার কারণ
চিত্র-৭.২.৬.৪ঃ বন ধ্বংসে কারা দায়ী বলে মনে হয়
চিত্র-৭.২.৬.৫ঃ বন ধ্বংসে কি কি সমস্যা হয়েছে
চিত্র-৭.২.৬.৬ঃ রান্নার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার
চিত্র-৭.২.৬.৭ঃ জ্বালানী সংকটে পরিবারর ওপর কি কি প্রভাব তৈরি করেছে
চিত্র-৭.২.৭.১ঃ লিকার্ড স্কেলের মাধ্যমে বিভিন্ন মতামত জানতে চাওয়া হয়
চিত্র-৭.২.৭.২ঃ লিকার্ড স্কেলের মাধ্যমে বিভিন্ন মতামত জানতে চাওয়া হয়

মানচিত্রের তালিকা

মানচিত্র-২.১ঃ গবেষণার নির্ধারিত এলাকা
মানচিত্র-২.২ঃ কক্সবাজার জেলার মানচিত্র
মানচিত্র-২.৩ঃ উখিয়া উপজেলা মানচিত্র
মানচিত্র-২.৪ঃ রাজাপালং ইউনিয়নের স্থানীয়দের অবস্থান
মানচিত্র-২.৫ঃ কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প এর অবস্থান
মানচিত্র-২.৬ঃ পালংখালি ইউনিয়নের স্থানীয়দের অবস্থান
মানচিত্র-২.৭ঃ টেকনাফ উপজেলা মানচিত্র
মানচিত্র-২.৮ঃ হ্নীলা ইউনিয়নের স্থানীয়দের অবস্থান
মানচিত্র-২.৯ঃ নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্পের মানচিত্র
মানচিত্র-৪.২: উখিয়া এবং টেকনাফের শরণার্থী শিবিরগুলোর অবস্থান
মানচিত্র নং-৫.১ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকানের মানচিত্র
মানচিত্র নং-৬.১ঃ মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দেশে আগমন

সারণীর তালিকা

সারণী-১ঃ আশ্রয়দানকারী দেশসমূহে শরণার্থীদের সংখ্যা
সারণী-২ঃ নিজ দেশসমূহ থেকে উচ্ছেদের শিকার নাগরিকদের সংখ্যা
সারণী-২.২ঃ রোহিঙ্গা উত্তরদাতা জনগোষ্ঠী (পরিমাণগত)
সারণী-২.৩ঃ স্থানীয় উত্তরদাতা জনগোষ্ঠী (পরিমাণগত)
সারণী-২.৪ঃ রোহিঙ্গা উত্তরদাতা জনগোষ্ঠী (গুণগত)
সারণী-২.৫ঃ স্থানীয় উত্তরদাতা জনগোষ্ঠী (গুণগত)
সারণী-২.৬ঃ উভয় জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতাদের সাথে দলীয় আলোচনা
সারণী-৩.১ঃ শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশিদের ভারতে রাজ্যভিত্তিক আশ্রয়
সারণী-৫.১ঃ নৃতাত্ত্বিক গ্রুপ ও আরাকানের জনগোষ্ঠী (১৮৭১-১৯১১)
সারণী-৬.১ঃ বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী জুলাই, ১৯৭৮
সারণী-৬.২ঃ ১৯৯০ এর নির্বাচনে বিজয়ী রোহিঙ্গা প্রার্থীদেরা নাম ও নির্বাচনী এলাকা
সারণী-৬.৩ঃ ১৯৯১-১৯৯২ সালে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ক্যাম্প ভিত্তিক হিসাব
সারণী-৬.৪ঃ রাখাইন কর্তৃক রোহিঙ্গা নির্যাতনের খতিয়ান চিত্র
সারণী-৬.৫ঃ ২০১৭ সালে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য উখিয়া ও টেকনাফের উদ্যোগ
সারণী-৭.২.১ঃ গবেষণার উত্তরদাতাদের বয়স ও শিক্ষার চিত্র
সারণী-৭.৩.১ঃ গবেষণায় উত্তরদাতাদের সন্তানের শিক্ষার অংশগ্রহণ
সারণী-৭.৫.১ঃ আরাকান থেকে আগত রোহিঙ্গাদের সৌচাগার পর্যাপ্ত
সারণী-৭.৫.৩ঃ স্থানীয় বাজরে শ্রমের মজুরি বৃদ্ধির কারণ
সারণী-৭.৬.১ঃ রোহিঙ্গা হিসেবে আপনি মজুরী কম পান
সারণী-৭.৬.২ঃ আরাকান থেকে আগত রোহিঙ্গাদের মজুরী কম দেবার কারণ
সারণী-৭.৭.১ঃ আরাকান থেকে আগত উত্তরদাতা রোহিঙ্গাদের বৈবাহিক অবস্থা
সারণী-৭.৮.১ঃ আরাকানে রোহিঙ্গাদের সমস্যা ছিল
সারণী-৭.৮.২ঃ বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গাদের সামাজিক সমস্যা
সারণী-৭.৯.১ঃ রান্নার জ্বালানী সংগ্রহে বনের কাঠের ব্যবহৃত হয়
সারণী-৭.৯.১ঃ রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে নাগরিক সুবিধা লাভের প্রচেষ্টা
সারণী-৭.২.১ঃ গবেষণায় উত্তরদাতা পুরুষ-নারীর অংশগ্রহণ
সারণী-৭.২.২ঃ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতাদের বয়স ও শিক্ষা
সারণী-৭.২.৩ঃ স্থানীয় উত্তরদাতাদের পেশা
সারণী-৭.২.৪ঃ শরণার্থী আগমনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপনে প্রভাব
সারণী-৭.২.৫ঃ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে গড়ে ওঠা সম্পর্ক
সারণী-৭.২.৬ঃ একে অপরের বাড়িতে আসা-যাওয়া করে

সারণী-৭.২.৭ঃ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক
সারণী-৭.২.৮ঃ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত
সারণী-৭.২.৯ঃ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কারণে শ্রমবাজারে শ্রমের মজুরি হ্রাস-বৃদ্ধি
সারণী-৭.২.১০ঃ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রায় প্রভাব
সারণী-৭.২.১১ঃ জীবন-যাত্রায় প্রভাব ইতিবাচক-নেতিবাচক
সারণী-৭.২.১২ঃ আপনি বা আপনার পরিবার কৃষি কাজের সাথে জড়িত
সারণী-৭.২.১৩ঃ শরণার্থী আগমনে কৃষিতে প্রভাব পড়েছে
সারণী-৭.২.১৪ঃ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষা গ্রহণে সমস্যা
সারণী-৭.২.১৫ঃ বনে আগের মতো সুবিধা পাওয়া যায়
সারণী-৭.২.১৬ঃ জ্বালানী সংগ্রহে বর্তমান সমস্যা
সারণী-৭.২.১৭ঃ উখিয়া ও টেকনাফে শ্রেণিভিত্তিক বনভূমির পরিমাণ-২০১৫
সারণী-৭.২.১৮ঃ উখিয়া ও টেকনাফে শ্রেণিভিত্তিক বনভূমির পরিমাণ-২০১৫
সারণী-৭.২.১৯ঃ উখিয়া ও টেকনাফে শ্রেণিভিত্তিক বনভূমি ধ্বংস হওয়া পরিমাণ-২০২০
সারণী-৭.২.২০ঃ উখিয়া রেঞ্জ ও টেকনাফ রেঞ্জ এর অধীনে বনভূমির পরিমাণ-২০১৫
সারণী-৭.২.২১ঃ রোহিঙ্গাদের জন্য নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনা
সারণী-৭.২.২২ঃ রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য জ্বালানী
সারণী-৭.২.২৩ঃ মাদক উদ্ধারের কয়েক বছরের খতিয়ান

সংকেত পরিচয় ও শব্দ সংক্ষেপ

(সা.)	: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(রা.)	: রাদিয়াল্লাহু আনহু
(আ.)	: আলাইহিস সালাম
(র.)	: রাহমাতুল্লাহি আলায়হি
হি.	: হিজরি
খ্রি.	: খ্রিষ্টাব্দ
ব.	: বঙ্গাব্দ
তা. বি	: তারিখ বিহীন
ইফাবা	: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বা এ	: বাংলা একাডেমী
ঢা বি	: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢা বি লা	: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী
পৃ.	: পৃষ্ঠা
দ্র.	: দ্রষ্টব্য
সম্পা.	: সম্পাদিত
অনূ.	: অনূদিত
সং	: সংস্করণ
মৃ.	: মৃত
প্র.	: প্রকাশিত/প্রকাশকাল
প্রাগুক্ত	: পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
বামার	: বার্মীজ
রাখাইন	: প্রদেশ
রাখাইন	: জনগোষ্ঠী
AA	: Arakan Army
AFPEL	: Anti-Fascist people’s Freedom League

AHS : Arakan historical Society
AIO : Arakan Independence Organization
AMO : Arakanese Muslim Organization
ANC : Arakan National Congress
ANLP : Arakan National Liberation Party
ANUO : Arakan National United Organization
APLP : Arakan Peopl's Liberation Party
ARIF : Arakan Rohingya Islamic Front
ARNO : Arakan Rohingya National Organization
BIA : Burma Independence Army
BNA : Burma Nationalist Army
BPC : Bengal Public Consultations
BSPP : Burma Socialist Program Party
BSR : Bangladesh Secretariat Records
BTF : Burma Territorial Force
CDR : Chittagong District Records
CPB : Communist Party of Burma
ed. : Edition
GOB : Government of Bangladesh
Ibid : Ibiden
ICJ : International Court of Justice
ICTR : International Criminal Tribunal for Rwanda
ICTY : International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
IDP : Internally Displaced Persons
ILO : International Labor Organization
JASB : Journal of the Asiatic Society of Bengal
JBRS : Journal of the Burma Research Society
MOU : Memorandum of Understanding
MSF : Médecins Sans Frontières (Doctors Without Borders)
MSKC : Muhammad Siddiq Khan Collection
NAB : National Archives of Bangladesh

NaSaKa : Nay-Sat Kut-kwey ye (Myanmar border security force)
NATO : North Atlantic Treaty Organization
NGO : Non-Government Organization
NLD : National League for Democracy
NRC : National Registration Card
OIC : Organization of Islamic Conference
P. : Page
PP. : Pages
RIF : Rohingya Independence Force
RLF : Rohingya Liberation Front
RPF : Rohingya Patriotic Front.
RRRC : Refugee Relief and Repatriation Commission
RSO : Rohingya Solidarity Organization.
RZPR : Rangpur Zila Perished Records.
SEA : South-East Asia
SLORC : State Law and Order Restoration Council
U.N. : United Nations
UNDP : United Nations Development Program
UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees
Vol : Volume
WFP : World Food Program

প্রথম অধ্যায়:

ভূমিকা

১.১ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমন ও স্থানীয়দের জীবন-যাত্রায় বিড়ম্বনা

বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের কক্সবাজার জেলাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত অবস্থিত এবং প্রতিবছর অসংখ্য দেশি-বিদেশি পর্যটক বেড়াতে আসে। এ এলাকার অধিকাংশ মানুষের জীবন যাপন পরিচালিত হয় কৃষি ও মৎস্য চাষের মধ্য দিয়ে। মিয়ানমারের (ভূতপূর্ব বার্মা) সাথে বাংলাদেশের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ২৭১ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা রয়েছে। মিয়ানমারের রাখাইন (ভূতপূর্ব স্বাধীন আরাকান) অঞ্চল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ হিসেবে পরিচিত। উভয় দেশের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও ধর্মীয় মিল থাকায় আসা-যাওয়া করাও উভয়ের জন্য সহজ। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভের পর মিয়ানমার সরকার, সেনাবাহিনী, রাখাইন জনগোষ্ঠী এবং বৌদ্ধ মিলিশিয়াদের দ্বারা হত্যা, নির্যাতন ও উচ্ছেদের শিকার হয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী চার দশক ধরে বাংলাদেশে আসছে। ফলে এ এলাকার মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কোনো না কোনোভাবে ব্যাহত হয়েছে। যদিও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমন ও বসবাস ১৯৭৮ সাল থেকে হয়ে আসছে কিন্তু সর্বশেষ ২০১৬ ও ২০১৭ সালে অল্পসময়ের ব্যাধানে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে। এতে এ এলাকার স্থানীয় মানুষের জীবন-যাপন বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৭৮৫ সালে স্বাধীন আরাকান রাজ্য বার্মার দখলে চলে আসলে আরাকান রাজ্যের রাখাইন (মূলত বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী) ও রোহিঙ্গা উভয় জনগোষ্ঠী বর্মীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে আরাকান ত্যাগ করে বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা নিকটবর্তী এলাকায় (বর্তমান বাংলাদেশের) সীমান্ত অঞ্চল বান্দরবান ও কক্সবাজার অঞ্চলে এবং পটুয়াখালী জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত ব্যাপক সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশে চলে এসেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে জীবন-যাত্রার জন্য শুধু মৌলিক সাহায়তা ও ভরণ-পোষণ প্রদান করা হয়েছে। সত্যিকার অর্থে রোহিঙ্গাদের সহায়তায় মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন ও নাগরিক অধিকারের জন্য তেমন কোনো জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান করায় আন্তর্জাতিক মহল থেকে সাধুবাদ পেলেও এ সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক বিশ্ব তেমন একটা কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এতে রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি নিঃসন্দেহে গবেষণা এলাকার স্থানীয় মানুষ এক চরম দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে পড়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহল কর্তৃক রোহিঙ্গাদের জীবন ধারণে মৌলিক চাহিদা সহায়তা করার পরও তাদের জন্য যথেষ্ঠ নয় বিধায় তারা স্থানীয় বাজারে আয় বৃদ্ধির জন্য প্রবেশ করে। এতে করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় চাপ বাড়ছে। সর্বশেষ ২০১৭ সালে আগত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর চাপ অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয়দের সংকট বহুমাত্রিক

পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে। রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠী মূলত মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের অধিবাসী। তারা রাখাইন প্রদেশের একটি সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্যাতন শুরু হয়। এর ফলে জীবন বাঁচানোর তাগিদে তারা সত্তর এর দশকে প্রথম বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এরপর বিচ্ছিন্নভাবে একই প্রক্রিয়ায় কয়েক ধাপে রোহিঙ্গারা এ দেশে আসতেই থাকে। সম্প্রতি ২০১৭ সালে বৌদ্ধ উগ্রবাদী রাখাইন জনগোষ্ঠী কর্তৃক রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় অনুরূপ ঘটনায় বিপুল সংখ্যায় বাংলাদেশে আগমন ঘটে। মানবিক কারণে এই নির্যাতিত জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশ আশ্রয় প্রদান করেছে। যে-কোনো সমাজে হঠাৎ করে কোনো অতিরিক্ত জনগোষ্ঠীর আগমন স্থানীয় পর্যায়ে জন-জীবনে সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। এ বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির কারণে কক্সবাজার জেলায় উখিয়া-টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে জন-জীবনের ওপর এর প্রভাব পড়তে পারে বলে প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা হলেও স্থানীয় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন-জীবনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনের প্রভাব নিয়ে গবেষণা খুব বেশি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে, বিশ্বব্যাপী শরণার্থী উপস্থিতিতে স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গবেষণা হল-Chamber (1986), Mogire (2011), Harrell-Bond (1986), Jacobsen (2002), Whitaker (2008) এবং Porter et al., (2008) প্রভৃতি। শরণার্থী উপস্থিতিতে স্থানীয়দের ওপর বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলতে পারে বিধায় এ সকল গবেষকগণ স্থানীয়দের ওপর প্রভাব বিষয়ে বিশ্লেষণে অবদান রেখেছেন।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা আগমন, বিশেষত ২০১৭ সালে তাদের ব্যাপক আগমনের ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রভাব বিষয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণা হয়েছে। এ সকল গবেষণায় ব্যাপক সংখ্যক রোহিঙ্গা উপস্থিতির বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত হয়নি। সে সময় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিতে ব্যাপকতাও লক্ষ করা যায়নি। এ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গবেষণা হল-Ahmed, Imtiaz (2010); Farhana Rahman, Sonia (2014); Bhattacharya, R (2017); Uddin, N. (Ed). (2012) & Dadush, U. and Niebuhr, M: (2016) প্রমুখ। এ সকল গবেষকগণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমন ও পরবর্তী উদ্ভূত সমস্যাসমূহের কারণ ও সামান্য কিছু সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ সম্পর্কিত গবেষণার অন্যতম গবেষক ইমতিয়াজ আহম্মেদ এর ২০১০ সালের গবেষণাগ্রন্থটি মূলত বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থী, তাঁদের পরিচয়, নিরাপত্তা সমস্যা, এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির ভূমিকা, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব ও তাঁদের প্রতি করণীয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে (Ahmed, 2010)। ২০১২ সালে গবেষক নাসির উদ্দিন এর গবেষণায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সীমিত পরিসরে উপস্থিতিতে বাংলাদেশে দুর্দশা ও সমস্যার আইনগত বিষয়ে, শরণার্থীদের আশ্রয়দান ও নিপীড়ন বিষয়ে বর্তমান অবস্থার ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বসবাসের কারণে বাংলাদেশের বনভূমির ওপর

শরণার্থী প্রভাব বিষয়ে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে (Uddin, (Ed). 2012)। ২০১৪ সালে গবেষক ফারহানা রহমান এর গবেষণায় রোহিঙ্গা ইস্যু, অবৈধ অস্ত্র, মাদক, মানুষ ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী, আগামী দিনের অর্থনৈতিক শক্তি মিয়ানমার ও ট্রানজিট ইস্যু সম্পর্কে সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে (Rahman, 2014)।

সাধারণত শরণার্থী উপস্থিতির ফলে স্থানীয় সমাজ ও সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ও পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণ হতে পারে। এটি এশিয়ার সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় বাস্তবতায় এক রকম আবার ইউরোপের সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় বাস্তবতায় অন্য রকম হতে পারে (Maystadt and Verwimp, 2009ঃ p. 1-2)। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শরণার্থী উপস্থিতিতে হঠাৎ করে অতিরিক্ত মানুষ আগমনের ফলে সেই সমাজে অনেক ধরনের সমস্যা তৈরির ফলে স্থানীয়দের কর্মসংস্থানে অতিরিক্ত চাপ বা অতিরিক্ত চাহিদা তৈরি হতে পারে (Khatun, 2017)। যেহেতু বাংলাদেশের কক্সবাজার অঞ্চলে একই ভাবে হঠাৎ করে অধিক সংখ্যক রোহিঙ্গাদের আগমন ঘটেছে সেহেতু এখানেও এরূপ কর্মসংস্থানের সমস্যা আছে কিনা তা এ গবেষণার মাধ্যমে খুঁজে বের করার চেষ্টা থাকবে। আবার কোথাও কোথাও শরণার্থী উপস্থিতিতে হঠাৎ করে অতিরিক্ত মানুষ আগমনের ফলে সেই সমাজে স্বল্প সম্পদের মালিকানা এবং স্থানীয় চাকরির বাজারের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত হয় (Uddin and Ahamed, 2008)। কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা দরিদ্র প্রবণ এলাকা। এ এলাকায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যক মানুষ বসতি স্থাপন করায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনে নানামুখি চাপ সৃষ্টি করছে। শরণার্থী উপস্থিতিতে যে-কোনো এলাকার কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদায় আরও চাপ সৃষ্টি করে (Uddin and Ahamed, 2008)। ফলে ক্রমবর্ধমান রোহিঙ্গ জনগোষ্ঠীর কারণে স্থানীয় সমাজে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ও বাসস্থানসহ মৌলিক চাহিদা পূরণে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া একই কারণে অবকাঠামো যেমন: পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পয়োনিষ্কাশন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপরও প্রভাব পড়ছে। এ ক্ষেত্রে শরণার্থীদের দীর্ঘমেয়াদী আশ্রয় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাব এমন কি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সংঘর্ষের মতো পরিস্থিতিতে ফেলতে পারে। বিশেষ করে শরণার্থী অধ্যুষিত এলাকায় তাদের উপস্থিতি স্থানীয়দের জন্য বিভিন্ন উদ্বেগের কারণ হতে পারে (Philips, 2003, p. 1)। তাই গবেষণা এলাকায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ে যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতির তৈরি হতে পারে।

এছাড়া কোনো এলাকায় শরণার্থী আগমনে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করতে পারে। শরণার্থী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবেশগত সংঘাতের ওপর মার্টিন (২০০৫) বিষয় বিবেচনা করে ধারণাগত কাজটিতে ইঙ্গিত করেছেন; যাতে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগও রয়েছে। এটি নিরাপত্তাহীনতা, অভাব, জাতিগত পার্থক্য এবং অসমতার তাৎপর্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। যাতে তৈরি করতে পারে অনুৎপাদনশীলতার পরিস্থিতি। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে,

জনবসতি তৈরির পরে সম্পদের চাহিদা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, যা বনের কৃষি জমির রূপান্তর ত্বরান্বিত, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ জল আহরণ, মাছ ধরা এবং শিকারে পরিচালিত করতে পারে। এ কারণে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী উপস্থিতি এলাকায় স্থানীয় সম্পদের ওপর স্থায়ী চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এটি সাধারণ সম্পত্তির অতিরিক্ত শোষণের দিকে পরিচালিত করে। যেমন কাঠ, পাহাড়ি গাছপালা, নদী ও সমুদ্র সম্পদ, জীবাশ্ম-জ্বালানি প্রভৃতি। একজন শরণার্থীকে ক্রমবর্ধমান বোঝা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে খারাপ পরিস্থিতি তৈরি করে সে এলাকায় সম্পর্ক স্থাপন এবং ক্যাম্পের বাইরে বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়ায় বন ও অন্যান্য সম্পদের অবক্ষয়কে আরও গতিশীল করে। প্রকৃতপক্ষে, শরণার্থীরা জ্বালানি এবং নির্মাণ সামগ্রীর জন্য জ্বালানী-কাঠ পেতে বনের ওপর নির্ভরশীল হয়। এভাবে বনজ সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায়; যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জনজীবন ও ভবিষ্যত হুমকির মুখে পড়ে (Martin, 2005)। ইউএনএইচসিআর পরিচালিত একটি গবেষণায়ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী, শরণার্থী উপস্থিতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার অনুরূপ তথ্য উঠে এসেছে (UNHCR, 2004)। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা অবস্থান করছে সেখানে দরিদ্র স্থানীয়রা খাদ্য, কাজ, মজুরি, পরিষেবা এবং সাধারণ সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। এতে করে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এক নতুন ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। এ পরিবর্তিত পরিস্থিতি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনকে দীর্ঘমেয়াদী সংকটে পতিত করবে কিনা এ বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সুতরাং এ গবেষণার একটি অন্যতম লক্ষ্য হল রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উপস্থিতির ফলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের ওপর আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

১.১.১ বিশ্বব্যাপী শরণার্থী

শরণার্থী সমস্যার বেশিরভাগই মূলত জাতিগত এবং সাম্প্রদায়গত সংঘাতের ফলাফল; যা আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের কারণে উদ্দীপিত হয়ে থাকে। তৃতীয় বিশ্বের অনেক সংঘাতের অন্তর্নিহিত গতিশীলতা হচ্ছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতা (যেমন ইথিওপিয়া, সোমালিয়া এবং সুদান) (Loescher, 1992, p. 31)। শরণার্থীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মূল দেশ থেকে তাদের আশ্রয়দানকারী দেশে সম্পদ স্থানান্তর করতে অক্ষম হয়। তারা আশ্রয়দানকারী দেশ এবং বিশেষ করে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য একটি সমস্যা বা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য আশ্রয়দানকারী দেশসমূহের প্রতিক্রিয়া সময়ের সাথে সাথে শরণার্থী গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। কিছু সরকার শরণার্থীদের প্রবেশে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে বা তাদের সাথে কঠোর আচরণ করে। তাদের চলাচল সীমিত করে এবং এমনকি তাদের নিরাপত্তাও বিপন্ন করে (Jacobsen, 1996)। বৃহৎ সংখ্যক শরণার্থী আশ্রদানকারী অধিকাংশ দেশ উন্নয়নশীল এবং দরিদ্র। বিশ্ব জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ শরণার্থী উপস্থিতি আশ্রয়দানকারী দেশগুলোর স্থানীয়দের সাথে ইউএনএইচসিআরকেও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আশ্রয়দানকারী স্থানীয় সরকার প্রায়শই প্রত্যন্ত অঞ্চলে শরণার্থী-স্থানীয় সম্প্রদায়সমূহকে উপেক্ষা করে। উন্নয়নশীল দেশসমূহ

দীর্ঘ সময়ের জন্য শরণার্থীদের আতিথেয়তা করলে তাদের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত পরিণতি সমস্যা ভোগ করতে হয় (UNHCR Standing Committee, 1997)। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত বিষয়টি বিশ্বব্যাপী নতুন কোনো ঘটনা নয়। এরই ধাবাহিকতায় এক দেশের জনগোষ্ঠী অপর দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিভিন্ন কারণে বিশ্বব্যাপী শরণার্থীরা অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এ আশ্রয় গ্রহণ কোথাও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় ও যুদ্ধের কারণে হয়ে থাকে। এসকল কারণ ছাড়াও কোথাও কোথাও একাধিক কারণেও মানুষ শরণার্থী হিসেবে অন্যদেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। অনুমান করা হয় যে, বিশ্বব্যাপী শরণার্থী সংখ্যা প্রায় ৭ মিলিয়ন মানুষ। এরমধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের জনগোষ্ঠী মোট শরণার্থী সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি। শরণার্থীদের আশ্রয়প্রদানকারী দেশ হিসেবে তুরস্ক, পাকিস্তান, উগান্ডা, লেবানন, ইরান, জার্মানি, বাংলাদেশ ও সুদান উল্লেখযোগ্য অবস্থানে রয়েছে (UNHCR 2018, p. 2-3)। ২০২১ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী ৬৮ মিলিয়ন মানুষ ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে এ সকল শরণার্থীরা এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। UNHCR এর তথ্য মতে, মাত্র পাঁচটি দেশ থেকে উদ্ভূত সমস্ত শরণার্থীর দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি এবং মাত্র পাঁচটি দেশ থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক শরণার্থী এসেছে (২০২১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শরণার্থীদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল (https://www.unhcr.org/refugee-statistics/2020)[১]

সারণী-১.১ঃ আশ্রয়দানকারী দেশসমূহে শরণার্থীদের সংখ্যা

ক্রমিক নং	আশ্রয়দানকারী দেশ	শরণার্থী সংখ্যা	মহাদেশ
১.	তুরস্ক	৩.৭ মিলিয়ন	এশিয়া
২.	কলম্বিয়া	১.৭ মিলিয়ন	দ: আমেরিকা
৩.	উগান্ডা	১.৫ মিলিয়ন	আফ্রিকা
৪.	পাকিস্তান	১.৪ মিলিয়ন	এশিয়া
৫.	জার্মানি	১.২ মিলিয়ন	ইউরোপ

ওপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে তুরস্কে সর্বোচ্চ সংখ্যক শরণার্থীর আগমন ঘটেছে ৩.৭ মিলিয়ন; যার অধিকাংশ সিরিয়ান। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে কলম্বিয়ায় শরণার্থী আগমন ঘটেছে ১.৭ মিলিয়ন; যার অধিকাংশ ভেনিজুয়েলা থেকে আগত। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে উগান্ডায় শরণার্থী আগমন ঘটেছে ১.৫ মিলিয়ন; যার অধিকাংশ দক্ষিণ সুদান থেকে আগত। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে পাকিস্তানে শরণার্থী আগমন ঘটেছে ১.৪ মিলিয়ন; যার অধিকাংশ আফগানিস্থান থেকে আগত। এরপর এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে জার্মানিতে শরণার্থী আগমন ঘটেছে ১.২ মিলিয়ন; যার অধিকাংশ তুর্কী থেকে আগত।

১. https://www.unhcr.org/refugee-statistics/2020 (Accessed 22 Dec, 2020)

সারণী-১.২ঃ নিজ দেশসমূহ থেকে উচ্ছেদের শিকার নাগরিকদের সংখ্যা

ক্রমিক নং	নিজ দেশ	শরণার্থী সংখ্যা	মহাদেশ
১.	সিরিয়ান আরব	৬.৮ মিলিয়ন	এশিয়া
২.	ভেনিজুয়েলা	৪.১ মিলিয়ন	দ: আমেরিকা
৩.	আফগানিস্তান	২.৬ মিলিয়ন	এশিয়া
৪.	দক্ষিণ সুদান	২.২ মিলিয়ন	আফ্রিকা
৫.	মিয়ানমার	১.১ মিলিয়ন	এশিয়া

ওপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে, সিরিয়া থেকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সর্বোচ্চ সংখ্যক শরণার্থীর উচ্ছেদের শিকার হয়েছে ৬.৭ মিলিয়ন; যার অধিকাংশ তুরস্কে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ভেনিজুয়েলা থেকে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে শরণার্থী আগমন ঘটেছে ৪.১ মিলিয়ন; যার অধিকাংশ কলম্বিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আফগানিস্তান থেকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে শরণার্থী আগমন ঘটেছে ২.৬ মিলিয়ন; যার অধিকাংশ পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ সুদান থেকে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে শরণার্থীর আগমন ঘটেছে ২.২ মিলিয়ন; যার অধিকাংশ উগান্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এছাড়া মিয়ানমার থেকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে শরণার্থীর আগমন ঘটেছে ১.১ মিলিয়ন; যারা মূলতঃ বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

১.১.২ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী

মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশ ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী নাফ নদীর ওপারে অবস্থিত। যা এক সময় স্বাধীন আরাকান নামে পরিচিত ছিল। এ আরাকান ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৭৮৫ সালে আরাকান বার্মার দখলে চলে যায়। নবম শতাব্দী থেকে বার্মার আরাকানে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। বার্মায় মুসলিমদের ইতিহাস তিনটি ভাগে পাওয়া যায়; তা হলো প্রাক-উপনিবেশিক, উপনিবেশিক এবং উপনিবেশ-উত্তর আমল (Milton et al., 2017, p. 942)। ১৯৪৭ সালের 'প্যানলং জাতীয় সম্মেলনে' রোহিঙ্গাদের কোন প্রতিনিধিকে 'জাতিসত্তা ও জনগোষ্ঠির' প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ না জানানোর কারণে রোহিঙ্গাদের এতোকালের 'আরাকানীজ মুসলিম' পরিচিতির পরিবর্তে স্বতন্ত্র ও নতুন পরিচয় বিনির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এজন্য আব্দুল গফ্ফার ১৯৫১ সালে আরাকানের মুসলিম অধিবাসীদের প্রথম লিখিতভাবে 'রোহিঙ্গা' নামের পরিচয় যুক্ত করেন। ঐতিহাসিক চার্নি মনে করেন, রাখাইন ও মুসলিম উভয়ই আরাকানের অভিবাসী এবং নিঃসন্দেহে তারা বামারদের (বর্মী) আগে এসেছে (Charney, 2005)। তবে বিশ শতাকের পঞ্চাশের দশকে শুরুতে আব্দুল গফ্ফার প্রথম 'রোহিঙ্গা' নামে সম্বোধন করেন। ১৯৬২ সালে বার্মার সামরিক জান্তা ক্ষমতা গ্রহণের পর রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর ব্যাপক নির্যাতন শুরু করলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মাধ্যমে 'রোহিঙ্গা' শব্দটি বিশ্বের দরবারে পরিচিতি পায়

(উদ্দিন, রাহমান নাসির, ২০১৮)। আরাকানে রোহিঙ্গা বসতির ইতিহাস সম্পর্কে যে সকল গবেষণা অথবা প্রকাশিত বই পুস্তকে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে তারমধ্যে অন্যতম; হেইন তাঁর The Re-Ethnicisation of Politics in Myanmar and the Making of the Rohingya Ethnicity Paradox গ্রন্থে যুক্তি দিয়েছেন, আরাকান ছিল প্রথমে ভারতের বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অঞ্চল (Hein, 2018, p. 366)। তবে, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা বসতি সম্পর্কে কিছু ভিন্নমতও রয়েছে। আরাকানের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ, ইরাবতী, পেগু এবং টেনাসেরিম নদীর বদ্বীপগুলো সে সময়ের মুসলিম নাবিকদের কাছে পরিচিত ছিল; যারা পূর্বে সমুদ্র বন্দরগুলোর সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করত। নবম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কাল ধরে মুসলিম বণিকদের সাথে বার্মার অব্যাহত যোগাযোগ নিশ্চয়ই কিছু আলামত রেখে গিয়েছিল। এ যোগাযোগের ফলে বর্মী শব্দভাণ্ডারে কিছু আরবি ও ফার্সি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। বিশেষ করে এগুলো ছিল নৌ-চালনাবিদ্যা ও বাণিজ্যিক ব্যাপার সম্পর্কিত। এ সব শব্দের অন্তর্গত কতিপয় শব্দের সমার্থক কোনো শব্দ বর্মী ভাষায় দুর্লভ ছিল (Shin, 1961)। যেহেতু বর্মীরা সমুদ্র বিচরণকারী ছিল না; তাই এটা ধারণা করা যুক্তি সংগত যে, এ অঞ্চলের নাবিকেরা ছিল আরব এবং পারস্য দেশীয়। মুসলিম বাণিজ্য কলোনিগুলো নবম শতাব্দী নাগাদ পেগুতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আরবদের বাণিজ্য তরীগুলো প্রায়ই এখানে ভিড়ত (Khan, 1936)। বার্মায় মুসলিমদের প্রাথমিক পর্যায়ের কলোনিগুলো ছিল এ ধরনের ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তবে তাদের সবাই কিন্তু স্বেচ্ছায় আসেনি। ধারণা করা হয়, জাহাজ ডুবির কারণে এদের মধ্যে কতিপয় লোক বাধ্য হয়েই তীরবর্তী এলাকায় আশ্রয়ের সন্ধান করার জন্য বসতি স্থাপন করে এখানে থেকে যায় (Smart, 1917)। আরব, পারস্য দেশীয় এবং ভারতীয় মুসলিম বণিকদের বংশধরগণ "বার্মান মুসলিম" সম্প্রদায়ের আদি নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং বর্মী রাজাদের আমলে এরা পাথি বা কালা নামে পরিচিত ছিল (Henry and Burnell, 1903)। এই 'কালা' অর্থ বিদেশি। হিন্দুদেরও 'কালা' বা বিদেশি বলা হতো। এভাবে বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হতে থাকলে বার্মায় মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। কিছুটা মিশ্রবিবাহের ফলশ্রুতিতে এদের সন্তান-সন্ততিদের ক্রমশঃ বৃদ্ধি এবং কিছুটা মুসলিম বণিক এবং অভিযাত্রীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার কারণে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, ধর্মান্তকরণের ফলে ইসলাম বার্মায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ এবং মিশ্র বিবাহ সঞ্জাত সন্তান-সন্ততি (Khan, 1936)। আবদুল হক চৌধুরীর মতে, ভাষাগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মিয়ানমারে স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী হিসেবে পৃথক অবস্থান রয়েছে (চৌধুরী, ১৯৯৪)।

দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রোহিঙ্গাদের চেহারায় বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট এবং তাঁরা আলাদা সংস্কৃতি ও মিশ্র ভাষার উৎপত্তি করেছে। অন্যান্য সকল জাতিসত্ত্বার মতো রোহিঙ্গারাও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে এবং সম্মিলনে ভাষা, সামাজিক আচার-আচরণ, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে একটি শংকর কিন্তু স্বতন্ত্র জাতি হয়ে উঠেছে (উদ্দিন, ২০১৮)। Moshe

Yegar নামের একজন ইসরাইলি গবেষক ও লেখক আরাকানে মুসলিমদের হাজার বছরের ইতিহাস ও অবস্থানকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এসকল মুসলিমকে রোহিঙ্গা বলে ডাকা হতো কিনা সেটি স্পষ্ট করেন নি (Yegar, 1972)। ফ্রান্সিস বুকাননও বার্মায় রোহিঙ্গাদের অস্তিত্বের কথা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (Buchanan, 1799)। গবেষক আজিম ইব্রাহিম এর *The Rohingyas: Inside myanmar's Hidden Genocide* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, জার্মান ভাষাবিদ এবং ধর্মতাত্ত্বিক 'Johann Severin Vater' তাঁর ১৮১৫ সালে তৈরি করা একটি নৃগোষ্ঠীর তালিকায় আরাকানে বসবাসকারী রোইঙ্গা (*Ruinga*) বলে একটি জনগোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করেন; যাঁরা একটি স্বতন্ত্র ভাষায় কথা বলতেন (Ibrahim, 2016)।

এছাড়াও এ সম্পর্কিত বিষয়ে দুইজন লেখকের দু'টি গ্রন্থ থেকে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে জানা যায়। HboChey নামের একজন লেখক ১৯৩৯ সালে "*Old Biography of the Bamar Muslims,*" বা 'বামার মুসলিমদের পুরাতন জীবন-কাহিনী সম্পর্কে লিখেছিলেন (HboChey, 1939)। সম্ভবত ১৯৩০-এর দশকে Mya কর্তৃক "*Summary of the History of the Bamar Muslims,*" বা 'বামার মুসলিমদের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার', লিখিত হয়েছে (Mya (1), 1939)। মায়া ব্যাখ্যা করেছেন যে, বামার মুসলিমরা বার্মীজ হিসেবে চিহ্নিত এবং তাদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বর্মী বৌদ্ধরাও বাস করেছে এবং বার্মীজ রাজাদের ধারাবাহিক প্রজন্ম বামান মুসলিমদের অধিকার প্রদান করেছে; যা বার্মীজদের দেওয়া সমান সম্মান দিয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা। ওপরোক্ত উভয় লেখকই বার্মীজ রাজবংশের মতো অন্যান্য উৎস থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন। বার্মার অ-বার্মীজের ইতিহাস এবং বিবরণে (বেশির ভাগ ইউরোপীয়ান দ্বারা), মুসলিম এবং বিভিন্ন বার্মীজ রাজবংশের মধ্যে যোগাযোগ প্রদর্শন করা হয়েছে (Mya (1), 1939, p. 84)।[২] কীভাবে মুসলিমরা বার্মীজ সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল তা এখানে দেখানো হয়েছে। মায়া এবং এইচবো চে দুজনেই বোঝাতে চেয়েছেন মুসলিম ও বার্মার রাজাদের মধ্যে সম্পর্ক কেবল বানোয়াট গল্প নয়। এছাড়া আয়াকো বলেছেন, ১৯৩০-এর দশকে, রোহিঙ্গাদের বামার মুসলিম বলা হতো এবং নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে বর্ণনা করত; যাঁরা মিয়ানমারের ঐতিহ্য ও রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। তখন তাদেরকে মিয়ানমারের আদিবাসী নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হতো এবং অমুসলিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের ভালো সম্পর্ক ছিল (Ayako, 2014, pp. 1-2)।

১৯৩০ এর দশকে থাকিন পার্টির নেতৃবৃন্দ আরাকানের মগ নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক গড়ে মুসলমান-মগদের মাঝে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাধীনতা উত্তর আরাকানকে বর্মীভুক্ত রাখার

---

২. The book obtained by the author is a reprinted version, with a forward written by Mya's daughter. In the forward, she describes the period from 1929 until 1936 as such: "The Summary on the History of Bamar Muslims was written and distributed for free." It is not clear in which year it was reprinted.

পরিকল্পনা করে। তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঐতিহাসিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে সাংস্কৃতিকভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মগদের মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে (চৌধুরী, ১৯৯৪, পৃ. ১৪৬-১৪৭)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিদের কাছে পরাস্ত হয়ে ব্রিটিশরা আরাকানে তাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে 'ভাগ কর শাসন কর নীতি' গ্রহণ করে আরাকানীজ মুসলিমদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। বার্মা হতে ক্ষমতাচ্যুত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে আরাকানের মুসলিমদেরকে সম্প্রদায়গত মর্যাদা দানের প্রতিশ্রুতিও প্রদান করে; যা প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক বাসস্থানের ইঙ্গিত বহন করে (Yegar, 1972, p. 25)। ১৯৪২ সালে BIA (Burma Independent Army) এর কিছু সদস্য জাপানি সেনাবাহিনীর সাথে আরাকানে এলে স্থানীয় মগ'রা আরাকানীজ মুসলমানদের ওপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়; যা '৪২ এর ম্যাসাকার হিসেবে পরিচিত (চৌধুরী, ১৯৯৪, পৃ. ১৪৭)। ব্রিটিশদের প্রতিশ্রুতিতে আশান্বিত হয়ে মুসলিমরা ব্রিটিশদের সমর্থন করে এবং গোপনে বিভিন্ন তৎপরতা অব্যাহত রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বার্মা ফ্রন্টের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর 'ভি ফোর্স' (V Force) এর অন্যতম কমাণ্ডার মেজর এ্যান্থনী আরিউইন (Anthony Irwin) রচিত '*Burmese Outpost*' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, জাপানি বাহিনীর নিকট থেকে আরাকান পুনর্দখলের জন্য ব্রিটিশদের সার্বিক সহযোগিতায় আরাকানীজ মুসলিম নেতা আব্দুস সালামের নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র গ্রুপ গঠিত হয় এবং বৌদ্ধ মগ ও জাপানিদের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানতে শুরু করায় ব্রিটিশদের আরাকান পুনর্দখলকে ত্বরান্বিত করে (Irwin, 1946)। মূলতঃ এখান থেকে বার্মায় বৌদ্ধ বামান ও আরাকানীজ মুসলিমদের মধ্যে স্থায়ী বিভক্তির রূপ প্রকাশ পায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আরাকানীজ মুসলিমরা ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধ করে জাপানিদের তাড়িয়ে দিলেও ব্রিটিশরা প্রচার করে-"Burma for the Budhist Burmans এবং Muslim are Foreign Immigants or kalas". (ইসলাম, ১৯৯৮)।

আরাকানীজ মুসলিমদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের বিরুদ্ধে মগ জনগোষ্ঠী স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এ প্রচারণা চলতে থাকলে পরবর্তীতে বর্মী সরকার পরিকল্পিতভাবে এ উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। তাছাড়া স্বাধিকার আন্দোলনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আরাকানীজ মুসলিমদের স্বতন্ত্র কোন নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে না পারায় অপপ্রচার সত্যায়নের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ফলে আরাকানীজ মুসলিমদের আরাকানের বৈধ নাগরিক হয়েও বার্মার সংবিধানে নৃতাত্ত্বিক বা বুনিয়াদী জাতি হিসেবে তালিকাভুক্তির দাবী আদায়ে ব্যর্থ হয় (হাবিবউল্লাহ, এন.এম., ২০০২)। মুসলিম নের্তৃবৃন্দ বর্মী সরকারের কাছে '৪২ এর গণহত্যার ওপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে বিতাড়িত আরাকানীজ মুসলিমদের স্বীয় বসতবাড়িতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানালে সরকার এ সকল দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং সরকারী চাকরী হতে আরাকানীজ মুসলিমদের অপসারণ করে তদস্থলে মগদের নিয়োগ করা শুরু করে (হাবিবউল্লাহ, এন.এম., ২০০২)। ১৯৬০ এর দশক থেকে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছিল। মিয়ানমারে ১৩৫টি জাতিগোষ্ঠী রয়েছে

এবং রোহিঙ্গারা তাদের মধ্যে একটি। কিন্তু সমস্যা হল রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার রাষ্ট্র ১৯৮২ সাল থেকে নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে না। ১৯৮২ সালে মিয়ানমার সরকার একটি জাতীয়তা আইন পাস করে যা মিয়ানমারের নাগরিকত্ব আইন নামে পরিচিত। এই আইন অনুসারে রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের ১৮২৩ সালের আগে তাদের পূর্বপুরুষদের রাজ্যে বসবাসের প্রমাণ থাকতে হবে এবং রাজ্যের একটি জাতীয় ভাষায় সাবলীলতা থাকতে হবে (Lwin, 2012)। নাগরিকত্ব আইন ১৯৮২ অনুযায়ী মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব থেকে বাদ দিয়ে তাদের রাষ্ট্রহীন করে (Ahmed, 2010; Parnini, 2012, p. 284)। এ নাগরিকত্ব বাতিল করার মধ্যদিয়ে রোহিঙ্গাদের চূড়ান্তভাবে মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে অস্বীকার করা হয়েছে। এর ফলে মিয়ানমার আইনগতভাবে রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রহীন নাগরিকে পরিণত করেছে এবং তাদের ওপর নির্যাতন চালানো সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মিয়ানমারের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ আচরণ শুরু করে। পাশাপাশি বৌদ্ধভিক্ষু, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী এবং বৌদ্ধ মিলিশিয়াদের বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হওয়ায় তারা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়; যাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু (UNHCR, 2018, p. 7-9)। ধর্ম ও বর্ণ রক্ষায় নিয়োজিত বৌদ্ধ পুরোহিতদের সংগঠন ‘মা বা থা’ প্রচার করে বৌদ্ধধর্ম সত্য ও শান্তির পক্ষে। কিন্তু তারাই বার্মায় বসবাসরত মুসলিম নিধনে অগ্রণী; নিজ জাতি, বর্ণ ও ধর্ম সুরক্ষার্থে মুসলিম নিধনকে তারা যৌক্তিক মনে করে (Wade, 2017)। বিবিসির দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রতিনিধি জোনাথনের মতে, “এখন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তাদের মাতৃভূমি এবং গ্রামে ফিরে যেতে পারে না। কারণ মিয়ানমার সরকার তাদের বাড়িঘর ও গ্রাম ধ্বংস করে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ব্যারাক তৈরি করেছে। মিয়ানমার সরকার বাংলাদেশের সীমান্তে ল্যান্ডমাইন পুঁতে রেখেছে। তাই সবসময় অনেকে নীরবেও সীমান্ত অতিক্রম করতে পারে না। (Jonathan, 2019)। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (2013a) অনুমান করে যে হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে গ্রেপ্তার, নির্যাতন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়; যা গণনা করা যায়নি (HRW, 2013a)।

প্রায়শই সেনাবাহিনীর সমর্থনে বৌদ্ধ কর্মীদের দ্বারা বিরোধী মুসলিম নির্যাতন যেমন: মার্চ ২০১৩ সালে একটি ইসলামিক বোর্ডিং স্কুল পুড়িয়ে ফেলার ফলে দাঙ্গায় ছাত্র ও শিক্ষকদের হত্যা এবং অসংখ্য মৃত্যু ঘটে (ICG, 2013)। অনুরূপ এ ঘটনাগুলো নিপীড়ন এবং আক্রমণের একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে যা বর্তমান পর্যন্ত সেখানে অব্যাহত রয়েছে (Akhter & Kusakabe, 2014, p. 228)। এরপর থেকে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে। ইউএনএইচসিআর এর তথ্য অনুসারে রোহিঙ্গারা নির্যাতিত হয়ে মৌলিক অধিকার বঞ্চিত এবং মিয়ানমারের নাগরিকত্ব হারিয়ে ক্ষমতাহীন ও রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে (UNHCR, 2003)। ২০১৪ সালের আদমশুমারিতে রোহিঙ্গারা নিজেদেরকে “বাঙালি” হিসেবে পরিচয় দিতে বাধ্য হয়েছিল (Washaly, 2019)। সামরিক থেকে গণতান্ত্রিক সরকারে রূপান্তরের

সময় নভেম্বর, ২০১৫ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর নতুন করে মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা নিপীড়ন ও বৈষম্য সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। রোহিঙ্গারা আশা করেছিল যে তাদের মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে এবং তারা আর সহিংসতা ও বৈষম্যের শিকার হবে না। সেই আশা অবাস্তব বলে প্রমাণিত হয়েছে। মিয়ানমারের রাখাইন ও বাংলাদেশের কক্সবাজার অঞ্চলে বিভিন্ন সময় উভয় জনগোষ্ঠীর আসা-যাওয়ার ঘটনা দীর্ঘদিন থেকে বিদ্যমান। বাংলাদেশ ও মিয়ানমার দু'টি দেশ পাশাপাশি হওয়ায় সামাজিক যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক বিনিময়, ভৌগোলিক নৈকট্য, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলনের সাদৃশ্য রয়েছে (Abrar and Sikder, 2014)। তাছাড়া তাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব ও চলাফেরার স্বাধীনতা বঞ্চিত করে ক্ষমতাহীন এবং রাষ্ট্রহীন করে তোলা হয়েছে (UNHCR, 2003)। কথিত আছে ২৫ আগস্ট, ২০১৭ সালে ARSA একটি মিয়ানমার পুলিশ চেক পোস্টে হামলা চালায় এবং এতে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রতিরোধ গোষ্ঠী গঠন করা হয় (Martin & Vaughn, 2017)। এই ঘটনাটি রোহিঙ্গা এবং মুসলিম বিরোধী প্রচারকে সমর্থন করতে এবং বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদকে ইন্ধন দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে (Walton & Hayward, 2014)। ১৯৭৮ সাল থেকে চার দশকব্যাপী এ আগমনধারা অব্যাহত থাকায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায়, বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় এবং কক্সবাজারের বিবিন্ন উপজেলায় ছড়িয়ে পড়ে। সর্বশেষ ২০১৭ সালের আগস্ট মাসের দাঙ্গা এবং মুসলিম বিরোধী অভিযানের ঘটনায় ৬০০,০০০ এর বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছিল (Martin, & Vaughn 2017, p. 1)।

১.১.৩ স্থানীয় জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ মুসলিম দেশ হিসাবে পরিচিত। দেশটি ১৪৮,৪৬০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের। এটি ভারত, মিয়ানমার এবং বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টিত। জনসংখ্যার ৯৮% বাঙালি জাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং ৮৯.১% মুসলিম বলে দাবি করে (CIA, 2018)। জাতিসংঘের মতে, বাংলাদেশ ৪৭টি স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) এর মধ্যে একটি এবং এটি "অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত আঘাতের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়" (UN, 2018)। এদেশ দুর্বল অবকাঠামো, বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় প্রবণ হিসেবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলা কক্সবাজার এর সর্ব দক্ষিণে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা অবস্থিত। এ অঞ্চলে বাঙালি মুসলিম ছাড়াও নৃতাত্ত্বিক বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এ উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার পূর্ব সীমান্তে ছোট্ট নাফ নদী বয়ে চলেছে; যা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে। উখিয়া ও টেকনাফ এর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মূল পেশা কৃষি ও মৎস চাষ। এ এলাকার বন-জঙ্গল তাদের জীবীকা নির্বাহের উৎস হিসেবে স্থানীয়দের জীবনে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করত। এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে স্থানীয়দের জন-জীবন সম্পৃক্ত থাকায় তা ছিল তাদের উপার্জনের অন্যতম উৎস। এছাড়া লবণ, পান ও ধান চাষেও সমৃদ্ধির পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের জন্য এ অঞ্চল বেশ প্রসিদ্ধ। বিশেষ করে এ অঞ্চলে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত এর

অবস্থান হওয়ায় মানুষের নিকট এটি আকর্ষণীয় পর্যটন এলাকা হিসেবে পরিচিত। তাই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রা, সন্তানের লেখা-পড়া, কাজকর্ম, পরিবেশ পরিস্থিতি, চলাফেরা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমাজ-সামাজিকতা স্বাভাবিক নিয়মেই চলছিল।

দীর্ঘ চার দশক ব্যাপী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমণ অব্যাহত থাকলেও ২০১৭ সালের পর তাদের ব্যাপক আগমনের ফলে স্থানীয়দের জীবন-যাপনের স্বাভাবিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলছে। যদিও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আইনে শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদানে বাধ্য নয়; তবুও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সরকার শরণার্থীদের মর্যাদা দিয়েছে (Nur, 2012)। বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী দীর্ঘকালব্যাপী এ এলাকার শরণার্থী শিবিরে বসবাস করায় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারায় তারা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে স্থানীয় সম্পদ, শ্রমবাজার ও স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তারা জড়িত হচ্ছে। তাই এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে বন-জঙ্গল, পাহাড়, ফসলের জমি-জমা নষ্ঠ, নদী-নালা ও খাল-বিল এর মাছ ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়ায় স্থানীয়দের আয়ের উৎস ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাই এদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং জনসংখ্যার ওপর চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই চাপের বোঝা বহন করা বর্তমানে ঐ অঞ্চলের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে।

১.১.৪ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জোরপূর্বক বাস্তচ্যুতির প্রেক্ষিত

১৯৪৮ সালে বার্মার স্বাধীনতা লাভের পূর্বে অং সান এবং অন্যান্য জাতীয় নেতাদের দ্বারা ইউনিয়ন এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তখন 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' ধারণাকে প্রচার করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করে বার্মার ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল (Ahmed, 2010, p. 15)। যদিও উ নু এর নেতৃত্বাধীন সরকার (১৯৪৮-১৯৫২, ৬০-৬২) রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দেয় (Jilani, 1999)। সরকার এবং সামরিক বাহিনী রোহিঙ্গাদেরকে বার্মার মূল স্রোতের বাইরে একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করে। এতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ন্যায় তাদের 'জাতিগোষ্ঠী' হিসেবে স্বীকার করা হয়নি, ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করেও তারা সকল ধরণের নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় (Murshid, 2017)। ১৯৬২ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়কালে মিয়ানমারের সামরিক সরকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় (Akhter & Kusakabe 2014, p. 227)। নাগরিকত্ব আইন পাসের মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গা মুসলিমরা রাষ্ট্রের অবৈধ বাঙালী ও বিদেশী হয়ে যায়। বার্মা সরকার রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ১৯৭৮ সালে অপারেশন নাগা মিন এবং অপারেশন থায়া শুরু করে (Akins, 2014)। ১৯৭৮ সালে 'কিং ড্রাগন অপারেশন' (অপারেশন নাগামিন) এর ফলে ৩০০,০০০ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এছাড়াও সামরিক কর্মীদের দ্বারা ভয় দেখানো, ধর্ষণ এবং হত্যার কৌশলগত প্রচারণাও চালানো হয়েছে (Constantine, 2012)। বৌদ্ধ বর্মীদের থেকে রোহিঙ্গাদের ধর্ম এবং জাতিগতভাবে একটি আলাদা অবস্থান রয়েছে। এটি শুধুমাত্র থেরভাদ বৌদ্ধদের কারণে; যারা রোহিঙ্গা মুসলিমকে মিয়ানমারের নাগরিক বলে অস্বীকার

করে। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ থেরাভাদা বৌদ্ধরা আবেদন করে যে, রোহিঙ্গা মুসলিম সংখ্যালঘুরা ‘অবৈধ বাঙালি’। প্রথমে মিয়ানমার রাখাইন রাজ্যের জনগণকে রোহিঙ্গা শব্দ ব্যবহারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। অথচ ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতেও মধ্যদিয়ে “রোহিঙ্গা” পরিচয় স্বীকৃত ছিল। মিয়ানমারের নাগরিকদের এনআরসি নামে পরিচিত একটি জাতীয় নিবন্ধন কার্ড ছিল। ১৯৭০ সালে নে উইন দ্বারা মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে NRC কেড়ে নেয় এবং রাজ্যে রোহিঙ্গাদের যাতায়াত বন্ধ করতে পুলিশ চেকপোস্ট স্থাপন করে। সম্প্রতি এ কারণে সরকার তাদের রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি এবং সঙ্গত কারণেই তাদের কোনো নাগরিক অধিকারও স্বীকার করে না (Wade, 2017)। তাদের সম্পত্তি বা জমির কোনো অধিকার ছিল না এবং কয়েক দশক ধরে তাদের দ্বারা বসতি স্থাপন করা এলাকা থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। ১৯৮৮ সালে রাজ্য আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার কাউন্সিল (এসএলওআরসি) রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে একটি সামরিক ক্যাম্প নির্মাণের জন্য তাদের জমি দখল করে এবং কোনো ক্ষতিপূরণ না দিয়ে বরং রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গাদের গৃহহীন করে তোলে। এ পর্যায়ে বার্মার অপরিচিত ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মিয়ানমার সরকার ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা গত কয়েক দশক ধরে রাখাইন অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে আসছে। মিয়ানমারের শাসক গোষ্ঠীর অনিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ডের বৃদ্ধি এবং অতি-জাতীয়তাবাদী মৌলবাদী বৌদ্ধদের উত্থানের কারণ রোহিঙ্গা সংকটের ভয়াবহতা বাড়িয়ে দিয়েছে (Martin & Vaughn, 2017; Gibbens, 2017)।

মূলত বর্তমান সংকট শুধু একটি ধর্মীয় প্রেক্ষাপট নয়; এতে অর্থনৈতিক সমস্যার ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক মাত্রাও রয়েছে (Walton & Hayward, 2014)। সন্ন্যাসীরা যেভাবে বৌদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েছে তার একটি উদাহরণ মিয়ানমার তাদের এজেন্ডাকে এগিয়ে নিতে সংখ্যাসূচক ধর্মীয় ‘প্রতীক ৯৬৯’ ব্যবহার করছে। যা মুসলিম বিরোধী আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বৌদ্ধ বিশ্বাসে সংখ্যাসূচক প্রতীকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ‘৯৬৯ প্রতীক’ ত্রিরত্ন (বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ) তাদের ধর্মের অনুসারীদের বৌদ্ধধর্মের চর্চার মৌলিক চেতনা। এতে শান্তি, গুণ, নৈতিকতা, সমতা এবং আলোকিতকরণ ছিল (UNHCR, 2012)। ২০১২ সাল থেকে ‘৯৬৯’ চিহ্নটি জঙ্গী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অপব্যবহার ঘৃণা ও বৈষম্যকে উৎসাহিত করেছে। যা পরিণত হয়েছে বৌদ্ধপন্থী উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে। বৌদ্ধ ধর্মোপদেশগুলোতে প্রভাবশালী আখ্যান সাধারণভাবে মুসলিমদের বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের ভয় ও ঘৃণার ন্যায্যতা প্রমাণ করে (Marshall, 2013)। ‘৯৬৯ আন্দোলন’ ঘৃণাত্মক বক্তব্য ব্যবহার করেছে; যা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনেক মানুষেকে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। নবগঠিত গণতন্ত্রে ধর্মীয় বহুত্ববাদ, সমতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠার আশাকে ক্ষুণ্ণ করেছে (Palatino, 2013)। বৌদ্ধ চরমপন্থীরা ঐতিহাসিক যুক্তি ব্যবহার করে যে, রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অভিবাসী ও এখানে ‘বিদেশি’ থাকার কোনো অধিকার নেই। এই দাবিটি মিয়ানমার

সরকারের অন্তর্নিহিত সমর্থন দ্বারা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আন্তর্জাতিক মানবিকতার আহ্বানকে কর্ণপাত করেনি। সকল সম্প্রদায়ের জাতিগত অধিকারকে স্বীকৃতি না দেয়া এবং এর জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদান না করায় রোহিঙ্গারা বৈষম্যের শিকার হয়েছে (Brooten, 2015)।

তদুপরি, ৯৬৯ আন্দোলনের প্রবক্তারা মিয়ানমারের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তারা বলে যে, বৌদ্ধরা এই অঞ্চলের ইসলামিক সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো দ্বারা বেষ্টিত এবং হুমকির সম্মুখীন; যেমন বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মুসলিম চরমপন্থীদের ভয় মিয়ানমারের বার্মীজ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থানীয় উদ্বেগ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। বৌদ্ধ মৌলবাদীরা দাবি করে যে রোহিঙ্গারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য হুমকি স্বরূপ। মিয়ানমারের সমাজ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রোহিঙ্গাদের সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচনা করে (Galache, 2017)। অথচ হাস্যকরভাবে বৌদ্ধ ধর্মের অনুশাসন এবং শিক্ষা নির্দেশ করে যে ভিক্ষু এবং এর অনুসারীরা হবে সদাচারী, আচরণে নৈতিক এবং অন্যদের ক্ষতি করবে না। মানবাধিকার সংস্থা এবং জাতিসংঘের মতে, 'জাতিগত নির্মূল' হিসেবে বর্ণিত সহিংসতার প্রচারের ফলে হাজার হাজার রোহিঙ্গা জনগণ নির্যাতিত এবং বাস্তুচ্যুত হয় (DeHart, 2013; HRW, 2013b; Uddin, 2015)। আশিন উইরাথু ৯৬৯ আন্দোলন সাফল্যের পর এবং তার সমর্থকরা জাতীয় পরিচয় রক্ষার ধারণাকে সমর্থন করে। জাতীয় পরিচয় রক্ষার জন্য উইরাথু এবং তার দল আন্তঃধর্মীয় বিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্য জাতীয় পরিষদে একটি আবেদন করে। তারা আরও যুক্তি দেয় যে আন্তঃধর্মীয় পিতামাতার সন্তানরা ইসলামকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করতে পারে এবং বিশ্বের জন্য বিপদ হতে পারে এবং বুদ্ধের ওপর দাগ পড়তে পারে (Kyaw, 2013)। সুতরাং জাতীয় পরিচয় রক্ষার জন্য উইরাথু বৌদ্ধ চাপ ব্যবহার করে এবং এ আইনটি পাস করার চেষ্টা করে। যদি পুরুষ তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং তার স্ত্রীকে কোনো অযুহাত দেখায়, তাহলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে এবং তাকে ১০ বছরের জন্য জেলে যেতে হবে (UNO, 2013)। তবে, জাতীয় পরিষদ এই ধারণাকে আইন হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছে। রাজনীতিবিদরা যুক্তি দেন যে, আমরা মিয়ানমারের জনগণকে এক দেশে একত্রিত করার চেষ্টা করছি। অন্যদিকে মানবাধিকার সংস্থা, নারী অধিকার সংগঠনগুলো এ ধারণা প্রত্যাখ্যান করে। থেরভাদ বৌদ্ধরা ১০৫৭ সাল থেকে এই অঞ্চলে বসবাস করছিল এবং এখানে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৌদ্ধ বার্মীজরা উপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির জন্য ব্রিটিশদের সাথে লড়াই করেছিল। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম বার্মার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অংশ হয়ে ওঠে। বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাস মুসলিম বিশ্বাসের সাথে বিরোধী ছিল এবং মুসলিমরা তাদের নবীকে যে স্থান দিয়েছিল বুদ্ধকে একই স্থান দিতে রাজি হয়নি। সুতরাং এই সমস্যাটি জাতি গঠনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উভয় ধর্মের নেতারা সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব চান কিন্তু তারা প্রতিটি ধর্মের প্রতি ধর্মীয় সহনশীলতার কথা ভুলে যান

(Juergensmeyer, 2010)। বৌদ্ধরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং তারা গণতান্ত্রিকভাবে সরকার গঠন করেছিল। কিন্তু সরকারের নেতা ও মন্ত্রী ছিলেন বৌদ্ধপন্থী এবং তারা রোহিঙ্গাদের মোকাবেলা করে ইসলামকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। বার্মার অধীনে উ নু জনগণের শাসন "সমাজতন্ত্রের প্রতি বার্মীজ বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি" এর সমর্থন করেছিল। এই ধারণা বৌদ্ধ ধর্মীয় চরমপন্থায় শাসকগোষ্ঠীর সাথে যোগ দেয়। সেই সময় উ নু বৌদ্ধধর্মকে প্রশাসনিক ধর্মে রূপদানের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কার্যত এই পদ্ধতিটি ব্যর্থ হয়েছে; কারণ প্রশাসনিক সংস্থা শুধু বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের ওপর অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থিক বিনিয়োগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এতে আরাকানের মতো ধর্মীয় সংখ্যালঘু রাজ্যে কোনো অবকাঠামো বা আর্থিক বিনিয়োগ হয়নি (Akins, 2014)। প্রায় এক মিলিয়ন রোহিঙ্গা মিয়ানমারের নিকটবর্তী বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা কক্সবাজারে চলে আসে (Dussich, 2018, p. 11-12)। মিয়ানমার সরকার কীভাবে সহিংসতা পরিচালনা করেছে তা নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগ ও সমালোচনা ছিল। সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ বার্মনরা এই সংঘর্ষকে কীভাবে দেখেছিল? প্রথমত, জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতা এবং ১৯৯১ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া অং সান সু চি বা দেশের মানবাধিকার গোষ্ঠী এবং গণতন্ত্রপন্থী কর্মীরা এই সহিংসতার নিন্দা করেননি। অং সান সু চি'র কাছ থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা অনেক বেশি ছিল। কারণ তিনি গণতন্ত্র আন্দোলন এবং মানবাধিকারের একজন আইকন হিসাবে অনেকের কাছে প্রশংসিত হয়েছেন। সু চি সবচেয়ে বড় বিরোধী রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারপার্সন ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি সফরের সময় সু চিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি কেন রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর চালানো সহিংসতার নিন্দা করেননি। তার প্রতিক্রিয়া ছিল যে, আপনি অবশ্যই ভুলে যাবেন না যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের উভয় দিকেই মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে। এটি একটি সম্প্রদায় বা অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করার বিষয় নয়। আমি সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিন্দা জানাই (Ingber, 2012)।

সাধারণভাবে মিয়ানমারের জনগণ এবং বিশেষ করে রাখাইনরা, যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তারা দৃশ্যত রোহিঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করে না। তারা বরং কখনও কখনও একটি অবমাননাকর শব্দ 'কালা'র ব্যবহার করে। নে উইন সরকারের আমলে সাধারণ মানুষের মধ্যে "জাতীয়তাবাদী জেনোফোবিয়া" বৃদ্ধি পায়। বামান জনসাধারণ রোহিঙ্গা মুসলিমদের বহিরাগত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য বিপদ হিসেবে বিবেচনা করে। উইরাথুর শিক্ষা এবং ঘৃণার বক্তৃতা বার্মীজ সমাজে স্থান পায় এবং ৯৬৯ আন্দোলন জাতীয় পরিচয় রক্ষার মতো আন্দোলন গড়ে ওঠে। ২০১২ সালের অক্টোবরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাইকমিশনের সামনে রাষ্ট্রপতি থিননিউন ঘোষণা করেন যে, রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের অধীনস্থ নয় এবং তাদের নিজেদের জন্য একটি নতুন বিকল্প রাজ্যের প্রয়োজন। এসব আন্দোলন রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং তারা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নৃশংস হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ রোহিঙ্গারা বিশ্বের সবচেয়ে নিপীড়িত

সংখ্যালঘুতে পরিণত হয় (Zarni, 2013)। ২৫ আগস্ট, ২০১৭ সালে সামরিক বাহিনী হামলার তাৎক্ষণিক জবাব দেয়; যাকে তারা ‘ক্লিয়ারেন্স অপারেশন’ বলে অভিহিত করেছে। এর ফলে বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া, মানুষ হত্যা করা হয়েছে। সহিংসতার সময় রাখাইন রাজ্যে প্রচারপত্র ছড়ানো হয়; যা স্থানীয় বৌদ্ধদের মধ্যে ভীতি ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। পুস্তিকাগুলো পরামর্শ দিয়েছে যে বৈশ্বিক ইসলামিক পরিকল্পনা অমুসলিম দেশগুলোতে বিভিন্ন রূপে প্রবেশ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো-বহুবিবাহের অনুশীলন, মসজিদ নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এবং রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য একটি জাতিগত সংখ্যালঘু মর্যাদা চাওয়া। যদিও এটি প্রমাণিত হয়নি কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে, ২০১৫ সালে সাধারণ আসন্ন নির্বাচনের আগে ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার প্রয়াসে প্যামপ্লেটগুলো সরকারের কৌশল হতে পারে (McDonald, 2012)। ভিক্ষুরা (জাফরান রঙের পোশাক পরা) একটি প্রধান বৌদ্ধ দেশে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি সামরিক বাহিনীর দ্বারা অত্যন্ত সম্মানিত। সেপ্টেম্বর মান্দালায়াতে শুরু হওয়া দু’দিনের জনগণের বিক্ষোভে কয়েকশত বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ হাজার হাজার মানুষ রোহিঙ্গাদের তৃতীয় কোনো দেশে পুনর্বাসনের প্রেসিডেন্ট থেইন সেইনের প্রস্তাবের সমর্থনে অংশ নিয়েছিল। সন্ন্যাসীরা রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবকে সমর্থন করে তাদের মাতৃভূমিকে বাঁচাতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানায়। তারা অভিযোগ করেছে যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে জাতিসংঘ রোহিঙ্গাদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় অকারণে হস্তক্ষেপ করছে (Irrawaddy and Associated Press, 2012)। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নির্যাতন ও এক পর্যায়ে ‘জাতিগত নির্মূল’ এর শিকার হয়ে বাস্তুচ্যুত হতে থাকে। আশিন উইরাথুর নের্তৃত্বে ৯৬৯ আন্দোলন এ বাস্তুচ্যুতিকে আরো নিশ্চিত করেছে।

১.১.৫ গবেষণার লক্ষ্য

সাম্প্রতিক কালে শরণার্থী ইস্যুটি সারা বিশ্বের একটি গুরুতপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। পৃথিবীব্যাপী এখন মানুষ বাড়ছে, সমস্যাও বাড়ছে এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার কারণে শরণার্থী জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে স্বাগতিক দেশের রাজনীতিতে শরণার্থী নীতি খুব বড় প্রভাব ফেলতে পারে। যে সকল দেশ ইতিমধ্যেই ১৯৫১ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত শরণার্থী কনভেনশন এবং ১৯৬৭ প্রোটোকল স্বাক্ষর করেছে, তারা তাদের দেশে শরণার্থীদের প্রবেশ কমাতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিচ্ছে। আজ অবধি বাংলাদেশ ১৯৫১ সালের কনভেনশন বা ১৯৬৭ প্রটোকলে স্বাক্ষর করেনি। এমনকি বাংলাদেশের সংবিধানেও শরণার্থী সংক্রান্ত কোনো বিধান নেই। তাই রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরও বাংলাদেশে কোন সরকারী আইনি মর্যাদা নেই। যেহেতু তারা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে এসেছে তাই জাতিসংঘ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে “শরণার্থী” হিসাবে উল্লেখ করেছে। মূলত বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) তাদেরকে “জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক” হিসেবে উল্লেখ করেছে (UNHCR, 2018, p. 7)। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সরকার এই সমস্যার সূত্রপাত হতেই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কোনো আইনি মর্যাদার বিষয়ে অনুমতি না দেওয়ার নীতি স্পষ্ট করেছে। এতদসত্ত্বেও বর্তমান সরকার ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের গ্রহণ করার

জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন এবং প্রশংসা পেয়েছে। এই রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে মানবিক প্রতিক্রিয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছে UNHCR এবং IOM-সংস্থার সহায়তা। এ অবস্থায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের ভূমিকাও শুরু থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক ছিল। শরণার্থী আগমনের কারণে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবন অনিবার্যভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ইউএনএইচসিআর রিপোর্ট করেছে যে, স্থানীয় সম্প্রদায়ের বাজারে প্রবেশ, শ্রম প্রতিযোগিতা, বন উজাড় এবং মুদ্রাস্ফীতিসহ নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে (UNHCR, 2018, pp. 7-9)। UNHCR কর্তৃক সূচিত যৌথ পরিকল্পনায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের সহায়তার বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে (UNHCR, 2018)। বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাতাদের প্রতি জোরালোভাবে পরামর্শও দিচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অসুবিধা কমাতে সহায়তা করে যাচ্ছে। কিন্তু স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক বিষয়ে এ সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ তথ্য অপর্যাপ্ত। এ গবেষণার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তথ্যের ঘাটতি কিছুটা হরেও পূরণ হবে বলে আশা করা যায়। স্থানীয় পর্যায়ে হঠাৎ করে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির ফলে বাংলাদেশ সরকার ও দাতা সংস্থাসমূহ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এর ব্যবস্থা করায় স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় পর্যাপ্ততা প্রভাব পড়ছে। এ পরিস্থিতিতে এখানে বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি তথা তাদের জীবনে যে অতিরিক্ত চাপ পড়ছে; তা গবেষণা এলাকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীই বেশি অনুভব করে থাকে। এতে ঐ অঞ্চলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, কর্মসংস্থান ও কৃষি জমির সমস্যা, বনজ সম্পদ ধ্বংসের মুখে। যদি এ সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে এ পরিস্থিতিতে সংকট কিরূপ হতে পারে; তা এ গবেষণার মাধ্যমে উঠে এসেছে। এছাড়াও এ সমস্যাসমূহ কিরূপ, কত ধরণের এবং এ সমস্যার গভীরতা কী পরিমাণ হয়েছে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে; যা এ গবেষণার লক্ষ্য।

১.১.৬ তত্ত্বগত আলোচনা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শরণার্থী উপস্থিতি নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। এক্ষেত্রে শরণার্থী ও স্থানীয়দের সম্পর্ক তাত্ত্বিকভাবে অনেক গুরুত্ব পেয়েছে। সাম্প্রতিক কালে শরণার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে সম্পর্ক তাত্ত্বিকভাবে বুঝতে গিয়ে অনেকেই তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শরণার্থী ও উন্নয়ন তত্ত্ব Kuhlman, (1990); আশ্রিত দেশে শরণার্থীরা বোঝা নয় বরং উপকারি তত্ত্ব Whitaker, B.E., (2002); ওয়ার্ল্ড সিস্টেম বা বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্ব Fazito D. and McCarty C., (2009) সমালোচনামূলক তত্ত্ব Betts, A. (2009) সামাজিক পরিবর্তন তত্ত্ব Sheldon, Eleanor B. and Moore, Wilbert E. (eds), (1968) ও সুরক্ষাকরণ তত্ত্ব McGahan, K. (2009) প্রমূখ। তবে এ গবেষণার মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতির কারণে কক্সবাজারের দু'টি উপজেলা উখিয়া ও টেকনাফের স্থানীয় মানুষের জীবনে প্রভাব বোঝার ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বটি ব্যবহার করা হয়েছে। মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন সে বিপদকে

মোকাবেলা করার সামর্থ্য বা শক্তি অর্জন করাই স্থিতিস্থাপকতা। কাজেই এ এলাকায় যখন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আগমন ঘটে; তখন নতুন একটি দেশের বৈরী পরিবেশে বিপুল পরিমাণ শরণার্থী আসায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়েছে। তা স্থানীয়দের জীবনে কী ধরনের ব্যাঘাত ঘটেছে এবং তা ঘটলে কোন ধরণের ব্যাঘাত ঘটেছে। এ ধরণের ব্যাঘাত কিভাবে তারা মোকাবেলা করে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। তাদের যে একটি স্থিতিস্থাপকতা বা শক্তি অথবা সামর্থ্য ছিল সেটি শক্তিশালী হয়েছে নাকি নষ্ঠ হয়েছে এটি বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে।

১.১.৭ গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণার সময়কাল ছিল দীর্ঘ এক দশকব্যাপী। এ জন্য রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে এবং কক্সবাজারের উখিয়ায় ও টেকনাফের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে পরিমাণগত (জরিপ সাক্ষাৎকার) এবং গুণগত পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ এবং অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাব বিস্তার ত্বরান্বিত করার জন্য রোহিঙ্গারা গুরুত্বপূর্ণ চলক হিসেবে কাজ করেছে। এ সকল সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সংকলিত, শ্রেণিবদ্ধ এবং পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ, সারণী এবং পরিসংখ্যানে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গবেষণার প্রাথমিক পদ্ধতি ছিল অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ। গুণগত পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে তথ্য সংগ্রহ যেমন অংশগ্রহণকারীদের পর্যবেক্ষণ এবং নিবিড় সাক্ষাৎকার এবং দলীয় আলোচনা পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত উপায় বলে মনে হয়। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী উভয়ের সাথে দীর্ঘ সময় অতিবাহত করার সুযোগ হয়েছে। গবেষণায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নিয়োগকৃত গবেষণা সহকারীর সহায়তায় তথ্য সংগ্ৃীত হয়েছে।

১.২ গবেষণার পটভূমি

মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে (পূর্বের আরাকান) বসবাসরত জনগোষ্ঠীর এদেশে আগমন নতুন নয়। ব্রিটিশ উপনিবেশিক যুগের পূর্বেও এই আরাকান অঞ্চলে কোনো ধরণের সমস্যা হলে সেখানকার জনগোষ্ঠীর মানুষ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে উখিয়া ও টেকনাফ এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সীমান্তবর্তী ও সহজেই প্রবেশের সুযোগ থাকায় অনেক আগে থেকে এ অঞ্চলের মানুষের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল। এছাড়া আত্মীয়তা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চিকিৎসার জন্য রাখাইন প্রদেশের বৌদ্ধ ও মুসলিম ধর্মের মানুষ প্রায়ই উখিয়া ও টেকনাফ অঞ্চলে আসা-যাওয়া ছিল। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের ১৭১ কিলোমিটার সীমান্ত অনেকটাই উন্মুক্ত এবং ছোট্ট নাফ নদী দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় পারাপারও সহজ। শুধু ধর্মীয় কারণে নয়; এই সহজ পারাপার হওয়ার কারণে তারা এদেশে বারবার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অনেক সময় উন্নত দেশে আশ্রয় গ্রহণের আশায় প্রথমে বাংলাদেশের ন্যায় সীমান্তবর্তী একটি নিরাপদ জীবন-যাপন বেছে নিতে অবস্থান শুরু করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা মিয়ানমার ছেড়ে যাবার পর ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। জাতি ও ধর্মীয় বিভাজন হয়েছে; এতে জাতিতে জাতিতে বিশ্বাসের ফাটল ধরেছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় প্রভাব শুধু তৎকালীন সমাজেই নয় বরং রাজদরবারেও বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। উপনিবেশ পূর্ব ও ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমলে এ অঞ্চলে রোহিঙ্গাদের অবস্থান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরা তাদের লেখনিতে স্পষ্ট করেছেন। উল্লেখ্য যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এ অঞ্চলে দীর্ঘদিন (যুগ যুগ ধরে) বসবাস করলেও এখানে বসবাসরত রাখাইন এবং বর্মান জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বাস্তবতায় পার্থক্য ছিল। এতে করে অনেক দিন থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এ অঞ্চলে একটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ধারা নিয়ে ঐতিহাসিকভাবে টিকে ছিল (Karim, 2000; Yegar, 1972)। ১৭৫৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশ উপনিবেশের অংশ হলেও পরবর্তীতে এ (ভারতীয়) উপমহাদেশকে নিরাপদ রাখতে একসময় বার্মাও ব্রিটিশ উপনিবেশভুক্ত হয়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের নিকট পরাজিত হয়ে বার্মা হতে ব্রিটিশরা অল্প কিছুদিনের জন্য 'পশ্চাদপসারণ' করে। পরবর্তীতে রোহিঙ্গা মুসলিমদের সহায়তায় ব্রিটিশরা আবার বার্মা পুনরুদ্ধ করলে জাপানিজরা বার্মা ত্যাগ করে। ১৯৪৮ সালে বার্মার স্বাধীনতা লাভের সময় থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত বেসামরিক প্রশাসক হিসেবে মূলত দেশটি শাসন করে সাবেক সেনাপ্রধান উ নু'র সরকার।

১৯৬২ সালের রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক স্বৈরশাসক নে উইনের শাসনামলে আরাকানের পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে যায়। পরবর্তীতে ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা কারণে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের গতিশীলতা বারবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মিয়ানমারের সামরিক জান্তা কর্তৃক মুসলিম সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকারের ব্যাপক লঙ্ঘন থেকে এ সমস্যা উদ্ভূত হয়। ১৯৯০ সালে গোটা বিশ্বে যে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান লক্ষ্য করা যায়, মিয়ানমারে তার ঢেউ লাগলেও সামরিক স্বৈরাচার তা প্রতিহত করে। তবে তারা কথিত বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বাহ্যিক গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে। ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অং সান সু চি'র দল-ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্র্যাসি-এনএলডি জয়লাভ করে। কিন্তু তখনও সেনাবাহিনী ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকার করে কাউন্সিলের নামে দেশ শাসন করে। ২০১১ সালের শাসন সংস্কারের ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে সু চি'র দল আবারও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে সীমিতভাবে সু চি দেশ পরিচালনার চেষ্টা করলেও মূল ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতেই থেকে যায়। সেনাবাহিনীর সাথে একরকম আপস করেই দেশ চালাতে হয়। সর্বশেষ এ অবস্থায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে নিজস্ব জনপ্রতিনিধি পায়নি এবং সেই সাথে সকল প্রকার রাজনৈতিক আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। একটি উদার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অনুপস্থিতির ফলে মিয়ানমারের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের চাপে এবং সেনাবাহিনীর অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের ফলে রোহিঙ্গা

জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত রেখে দীর্ঘদিন সে দেশের মূলধারা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত থাকায় সামরিক শাসনের যাতাকলে পিষ্ঠ হয়ে অনেক বছর হলো তারা ন্যূনতম নাগরিক অধিকার, শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধাসহ স্বাধীনভাবে চলাচলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছে। এছাড়া আরো কিছু ঐতিহাসিক কারণেও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দেশান্তর হওয়ার ইতিহাস রয়েছে।

মূলত মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে নির্যাতনের শিকার হয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশে এসেছে। কখনও শরণার্থী মর্যাদা আবার কখনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে চার দশক ধরে অবস্থান করছে। ২০১২ সালের জুন মাসে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হয়েছে অসংখ্য রোহিঙ্গা এবং শরণার্থী হয়েছে প্রায় ১ লাখ। ২০১২ সালে আরাকানে রোহিঙ্গা মুলমানদের ওপর সরকারী বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় উগ্র বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী দ্বারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এ সময় ১ লক্ষ ৩০ হাজার রোহিঙ্গা স্থানচ্যুত ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে হাজারের বেশি মানুষ আরাকান ত্যাগ করে বাংলাদেশে আসতে বাধ্য হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এই পরিস্থিতি বর্ণনা করতে ‘জাতিগত নিধনযজ্ঞ’ বলে অভিহিত করেছে (HRW, 2013)। জাতিসংঘ রোহিঙ্গাদেরকে বিশ্বের অত্যন্ত নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের অন্যতম হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। আরাকান রাজ্যের রামরি শহরে ২৮ মে, ২০১২ সালে তিনজন রোহিঙ্গা মুসলিম কর্তৃক একজন বৌদ্ধ নারীকে ধর্ষণের পর হত্যার গুজবে কোনো প্রকার সত্যতা যাচাই-বাছাই ছাড়াই রাখাইন প্রদেশব্যাপী রোহিঙ্গারা ‘রাখাইন বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী’র দ্বারা আক্রান্ত হয়। রাখাইন রাজ্যের সমুদ্র উপকূলীয় টংগোপ নামক স্থানে ৩ জুন, ২০১২ সালে সেনাবাহিনী এবং পুলিশের উপস্থিতিতে ‘রাখাইন বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী’ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ১০ জন রোহিঙ্গা হত্যার শিকার হন (HRW, 2012, p. 1)।

পূর্বে বাংলাদেশে বসবাসকৃত নিবন্ধিত প্রায় ৩২,০০০ হাজার রোহিঙ্গা নিয়ে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় দু’টি শরণার্থী শিবির গড়ে ওঠে। ফলে এবার আরও একদফায় রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে ও বিভিন্নভাবে বাধার সম্মুখিন হয়। ‘বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক’ যারা রোহিঙ্গা পরিচয়ে ঐতিহ্যগতভাবে দীর্ঘদিন থেকে মিয়ানমারে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। ২০১২ সালের আগস্ট মাসে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লে (পুরো রোহিঙ্গা গ্রামে আগুন ধরানো হয়) হাজার-হাজার মানুষ তাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এতে অসংখ্য রোহিঙ্গা নারী ও শিশু পুনরায় বাংলাদেশে অবস্থান গ্রহণ করে (unrefugees.org)।[৩] ২০১৬ সালে অনিবন্ধিত প্রায় ৫ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার সাথে এবারও কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গা নতুন করে যোগ হয়েছে। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী গুজব ছড়ায় যে সর্বশেষ রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের আক্রমণে দেশটির ৯ জন সীমান্তরক্ষী প্রহরী নিহত হয়েছে। মিয়ানমারে সেনাবাহিনী ওই হত্যার

৩. https://www.unrefugees.org/emergencies/rohingya/ (Accessed 24 Dec, 2020)

জের ধরে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে দেশটির রাখাইন রাজ্যের মংডু শহরে। যে বা যারা অপরাধ করেছে তার বা তাদের নির্দিষ্ট না করে ব্যবস্থা না নিয়ে তারা ঢালাওভাবে জাতিগত আক্রমণ চালায় (*হিন্দুস্তান টাইমস*, ২০১৬)। আইওএম'র এক জরিপে ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে প্রায় ৮৭ হাজার নতুন রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে বলে তথ্য উঠে এসেছে। জরিপের বিষয়ে '*Bangladesh needs and population monitoring: An Documented Myanmar nationals in Teknaf and Ukhia, Cox's Bazar*' শীর্ষক একটি রিপোর্টও প্রকাশ করে আইওএম। আইওএম'র মতে, নতুন রোহিঙ্গাদের সংখ্যা এতদিন ছিল ৭৬ হাজার। কয়েক মাসে নতুন করে ১১ হাজার রোহিঙ্গা ঢুকেছে জানিয়ে বলা হয়, এখন সেই সংখ্যা ৮৭ হাজারে পৌঁছেছে (*দৈনিক মানবজমিন*, ২০১৭)। সম্প্রতি একটি তদন্ত কমিশন গঠনের পর অং সাং সুচি দাবি করছেন, রাখাইন অঞ্চলে কোনো গণহত্যা বা ধর্মীয় নিপীড়নের ঘটনা ঘটেনি। মিয়ানমার সরকার রাখাইন অঞ্চলে সাংবাদিকদের যেতে দেয়নি এবং নির্যাতন ও ধর্ষণের খবর মিথ্যা বলছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রোহিঙ্গা গ্রামবাসীদের ওপর মিয়ানমার পুলিশের অকথ্য নির্যাতনের ভিডিও ফুটেজ ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পর মিয়ানমার সরকার বলে যে এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মিয়ানমার থেকে জীবন বাঁচাতে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ ও শিশুকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করা হয়েছে, অনেকে মিয়ানমার ফিরতে না পারার কারণে অথৈ সাগরে ভেসেছে। রোহিঙ্গাদের কোনো কোনো নৌকা পানিতেই ডুবিয়ে দিয়েছে মিয়ানমারের নাসাকা বাহিনী বা নৌবাহিনীর সদস্যরা।

এ অবস্থায় মিয়ানমার সীমান্তে সতর্ক পাহারায় থেকেছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি ও কোস্টগার্ড। এতে রোহিঙ্গা মুসলমানদের স্মরণকালের এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। তারপরও রোহিঙ্গারা প্রাণ বাঁচাতে বিজিবির চোখ ফাঁকি দিয়ে নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে ঢুকছে। মানবিক কারণে ১৯৭৮, ১৯৯১-১৯৯২, ২০১২ ও ২০১৬-২০১৭ সালে কয়েক ধাপে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে। বাংলাদেশ যদিও ২০১২ সালে আগত রোহিঙ্গাদের এদেশে আশ্রয় দিতে চায়নি। তবে বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদানের সিদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন ও প্রশংসা পেয়েছে। ইউএনএইচসিআর এবং আইওএম এর সহায়তায় বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে মানবিক নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আশ্রয়দানকারী সম্প্রদায়ের ভূমিকাও প্রথম থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সহায়ক ছিল। তাই শরণার্থী আগমনে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনে প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। ইউএনএইচসিআর বলেছে, বাংলাদেশের স্থানীয় সম্প্রদায়ের বাজারে রোহিঙ্গাদের প্রবেশ, শ্রম প্রতিযোগিতা, বন উজাড় এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ইউএনএইচসিআর ২০১৮-এর যৌথ পরিকল্পনায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে। বাংলাদেশ সরকার দাতাদের সাহায্য

পরিকল্পনায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যও জোরালো পরামর্শ দিচ্ছে এবং সরকারীভাবে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করছে (UNHCR. 2018b)।

১.৩ গবেষণার সমস্যা

বাংলাদেশের বর্তমান "আর্থ-সামাজিক" বাস্তবতায় রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে শরণার্থী হিসেবে বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশে এসেছে এবং আসছে। ২০১৭ সালে এতো অল্প সময়ের মধ্যে মিয়ানমার থেকে সীমান্তবর্তী বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যায় আগমন উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। যেহেতু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর এই আগমন প্রথম বারের মতো নয়। তাই তাদের বাংলাদেশে পালিয়ে আসায় দেশটিকে উচ্চ পরিমাণে চাপ মোকাবিলা করতে হচ্ছে; যা বর্তমানে উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহায়তা সত্ত্বেও আশ্রয়, বস্ত্র, খাদ্য, পানি ও স্যানিটেশন, যানবাহন, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক কিছু অপ্রতুল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সরকারী সহযোগিতাও অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ সহয়তা করে আসছে; কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর জন্য এ সহায়তা যথেষ্ট নয়। সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সহায়তার পরও উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বসবাস করায় ক্যাম্পগুলোর আশেপাশে বিভিন্ন সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতিদিনের জীবন-যাপন প্রক্রিয়া এবং এই বাড়তি জনসংখ্যা স্থানীয় জনগণের সাথে মিশে বিভিন্ন পর্যায়ে অতিরিক্ত যে চাপ সৃষ্টি করছে তা আজ বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে একটি সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনসাধারণ আজ বিভিন্ন ধরণের ও নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। স্থানীয়দের জীবন-জীবিকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, বন-জঙ্গল ধ্বংসের ফলে বনের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের জীবন-জীবিকা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে, শ্রমজীবী মানুষ তাদের স্থানীয় শ্রম বাজারে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে ও কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, বাংলাদেশে রোহিঙ্গারা প্রত্যাশার চেয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য অবস্থান করছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের ন্যায় একটি জনবহুল দেশে রোহিঙ্গাদের বাড়তি চাপের ফলে সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করছে এবং এতে করে স্থানীয়দের স্বাভাবিক জীবন যাপন ব্যাহত করছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ও সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রভাবসমূহ নিরূপণ করা প্রয়োজন।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণাটি রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতিতে সীমান্তবর্তী উখিয়া ও টেকনাফ এলাকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত সমস্যার প্রভাব বুঝতে পরিচালিত হয়েছে। এছাড়াও নিম্নে এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives) উল্লেখ করা হলো-

ক) মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কি কি;

খ) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশের ক্যাম্পে জীবন-ধারণ প্রক্রিয়ার অনুসঙ্গ বুঝতে চেষ্টা করা;

গ) রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন অনুসন্ধান;

ঘ) রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক মিথস্ক্রিয়া অনুসন্ধান।

১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা

সুসংগঠিত জ্ঞানের আবিষ্কার ও বিকাশের লক্ষ্যেই গবেষণার যৌক্তিকতা (Rationale of the Study) পরিচালনা করা হয়। যদিও সাধারণভাবে শরণার্থী এবং বিশেষ করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ওপর অসংখ্য বই এবং নিবন্ধ রয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং শরণার্থী উভয়েরই ব্যাপকতা বাংলাদেশে আগমন এবং শরণার্থী উপস্থিতিতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব এই গবেষণায় আলোকপাত করা হয়েছে। এটি লক্ষণীয় যে, যদিও শরণার্থী বিষগুলো দীর্ঘদিন ধরে অধ্যয়ন করা হয়েছে, তবে এখানে আরো জোর দেওয়া হয়েছে স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক বিষয়ের ওপর প্রভাব বোঝা। এই অধ্যয়নের লক্ষ্য রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিষয়ে বিদ্যমান জ্ঞানের সংস্থায় অবদান রাখা। এছাড়াও এ পরিস্থিতিতে সমস্যাগুলির জন্য সুপারিশ এবং পরামর্শগুলি সম্পূর্ণ হলে এই বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান সরকারী সংস্থাগুলোর পাশাপাশি জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (UNHCR) এবং এনজিওসমূহের মতো অন্যান্য সংস্থাগুলিকে আরও যোগ করবে যা একটি উপযুক্ত কাজের হাতিয়ার গঠন করতে পারে। এ গবেষণা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আয়তনের তুলনায় বিপুল জনসংখ্যার উপস্থিতির ফলে এ অঞ্চলে বহুবিধ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এ গবেষণা এলাকা শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া এবং সমুদ্র উপকূলীয় দারিদ্র প্রবণ সীমান্ত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। যে কোনো সমাজে রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো তার নাগরিকদের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। অতপর রাষ্ট্র অন্যত্র নজর দিতে পারে। সঙ্গত কারণেই গবেষণা এলাকায় রাষ্ট্র তার নাগরিকদের চাহিদা পুরণ করে আগত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সুবিধা পূরণ করতে অন্যান্য পদক্ষেপ নিতে পারে। কিন্তু এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ ও তাদের চাহিদা মিটিয়ে স্থানীয় মানুষের মৌলিক চাহিদার প্রতি যথপোযুক্ত নজর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এ এলাকার মানুষের জন-জীবনে যথেষ্ট আর্থ-সামাজিক চাপ অনুভূত হচ্ছে, সন্তানদের শিক্ষা ব্যহত হচ্ছে এবং পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হচ্ছে। এর ফলে এ অঞ্চলের স্থানীয় অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হলে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় রোধ করা কঠিন হতে পারে। এ জন্য এর

মাত্রাটি কিরূপ তা জানা জরুরী হয়ে পড়েছে। এ বিপর্যয়ের কারণগুলো গবেষণার দ্বারা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে এ বিপর্যয়ের পেছনের বিষয়গুলোর অনুসন্ধান ও এর সমস্যা সমাধানে সুপারিশ করা হবে এ গবেষণায়।

১.৬ গবেষণার তাৎপর্য

দীর্ঘ চার দশক ধরে বিভিন্ন সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ ও বসবাস করে আসছে। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে শুরু করে সর্বশেষ ২০১৭ সালে মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর নির্যাতন ও অত্যাচারের ফলে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। এ পরিস্থিতিতে তাদের বসবাস, চলাচল, জীবন-যাপন, পেশা বাছাই ইত্যাদির ফলে এ বসবাসকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে শরণার্থী উপস্থিতিতে প্রভাব অনুসন্ধান করা হয়েছে। সর্বশেষ আগমনে বাংলাদেশ সরকার মানবিক কারণে তাদের প্রতি উদার নীতি গ্রহণ করেছে। তবে, রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদানে সরকারের আন্তরিকতা থাকলেও ভূমির স্বল্পতা, বন উজাড়, কর্মসংস্থানের অভাব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণ এবং শরণার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে অস্থিরতার ফলে সরকার এবং স্থানীয়দের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনে অস্থিরতার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি (চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাবি, মাদক), কৃষি জমির সংকট, প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস ও জ্বালানী সংকট থেকে উত্তরণের উপায় নির্ধারণ করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাবের ফলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হচ্ছে।

শরণার্থী সংকটের ফলে কক্সবাজারের স্থানীয় জনসংখ্যার ওপর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে তাদের জীবনে ঘুরে দাড়ানো এবং স্থিতিশীলতা অর্জনের পর্যায়গুলোও আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী সীমিত সম্পদ নিয়ে তাদের সাথে ভাগাভাগি করলেও এখন তারা রোহিঙ্গাদের বোঝা হিসেবে মনে করছে। বাংলাদেশকে তার নিজ জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা মেটানো ও নিরাপত্তা বিধান করা জরুরী দায়িত্ব। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বসবাসে বাংলাদেশ ইচ্ছা করলেও তাদের প্রত্যাবাসন করতে পারছে না। কারণ মিয়ানমার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যথাযথ সহযোগিতা না পাওয়ায় এটি সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি তাদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করতে না পারলে এই সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলবে। যদিও অনেকে এ সমস্যার বিষয়টি ধারণা করে বা অনুমান করে সমাধানের কথা বলেন; কিন্তু রোহিঙ্গাদের এখানে দীর্ঘ মেয়াদে অবস্থানের ফলে কি ধরণের সম্ভাব্য সমস্যা হতে পারে এ গবেষণা সেই সমস্যার তথ্য বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করে এর সমাধানে সুচিন্তিত প্রস্তাব করেছে। বিভিন্ন সংস্থা, গবেষক এবং নীতি নির্ধারকগণ শরণার্থীদের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি পর্যাপ্তভাবে বুঝতে না পারলে শরণার্থীদের সম্ভাবনা কাজে লাগানো কঠিন হবে (Betts et al., 2014)। স্থানীয় পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক বিষয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রভাবসমূহ বিশ্লেষণের দ্বারা নতুন জ্ঞান সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। এতে ছাত্র, শিক্ষক,

বিভিন্ন সংস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, রাষ্ট্রের আইন, বিচার ও প্রশাসন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের নীতি নির্ধারনিতে এর জ্ঞান কাজে লাগতে পারে। পরবর্তী কোনো নতুন গবেষক এ গবেষণা থেকে দিক নির্দেশনা লাভ করবেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ, দুর্যোগ ও প্রত্যাবাসন মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাই এ গবেষণার ফলাফল রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারনিতে এবং পরবর্তী গবেষণার নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরিতে সহায়তা করতে পারে।

১.৭ অধ্যায় বিন্যাস

এ গবেষণাকর্মে অধ্যায় বিন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। মোট আটটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। গবেষণার সমস্যা, পদ্ধতির ব্যবহার, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পরিচয়, তাত্ত্বিক আলোচনা, সংশ্লিষ্ট গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা, বাংলাদেশের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শরণার্থী ক্যাম্প জীবন, স্থানীয়দের দৈনন্দিন জীবন-যাপনে আর্থ-সামাজিক প্রভাব এবং উপসংহার ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার পটভূমিতে পটভূমি, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী-জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক, সাম্প্রতিক ঘটনাপঞ্জি, গবেষণার সমস্যা, বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের আগমন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে অবস্থান, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর শরণার্থী উপস্থিতির প্রভাব, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার যৌক্তিকতা, গবেষণার তাৎপর্য, অধ্যায় বিন্যাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণার নকশা, তথ্যের উৎসসমূহ, গবেষণার নির্ধারিত এলাকা, গবেষণা পদ্ধতি, পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের নমুনা নির্ণয়, তথ্য সংগ্রহে উপকরণসমূহ, গুণগত তথ্য সংগ্রহের নমুনা নির্ণয়, গুণগত পদ্ধতির ব্যবহার, তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া, তথ্য বিন্যাস, গবেষণা পরিধি ও সীমাবদ্ধতা গবেষণার নৈতিক অনুমোদন, গবেষণার অভিজ্ঞতা ও গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রভৃতির আলোকপাত রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে, এখানে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপে; পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন দেশে শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবন-যাত্রার ওপর যে আর্থ-সামাজিক প্রভাবসমূহ পরিলক্ষিত হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা রয়েছে। এরমধ্যে পর্যায়ক্রমিক গবেষণা পর্যালোচনা, বিশ্বব্যাপী শরণার্থী ইতিহাস, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত শরণার্থী, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে শরণার্থীদের অবস্থান, শরণার্থী উপস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রায় প্রভাব: গবেষণা সূত্রপাত, শরণার্থী শিবিরের উপস্থিতিতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনে প্রভাবসমূহ, অর্থনৈতিক প্রভাবসমূহ, সামাজিক প্রভাবসমূহ ও পরিবেশগত বিষয়সমূহ প্রভৃতি। দ্বিতীয় ধাপে; উপনিবেশ পূর্ব, উপনিবেশিক ও উপনিবেশ উত্তর আমলের

পর্যালোচনাসহ রোহিঙ্গাদের ওপর যে সকল তথ্যবহুল আলোচনা রয়েছে সে বিষয়ে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনাবলি স্থান পেয়েছে। তৃতীয় ধাপে; বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রভাব বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মজুরীতে প্রভাব, কাঠ ও জ্বালানীর জন্য বন উজাড়, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, পরিবেশগত বিপর্যয়, রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশীদের মধ্যে আত্মীয়তার মিশ্র বন্ধন এবং মাদক ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষণার এ অধ্যায়ে ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য প্রথম পর্বে গবেষণার প্রত্যয় বা বিষয়ের স্পষ্ট ধারণা প্রদান করার মাধ্যমে গবেষণার ধারণাগত কাঠামো তৈরি ও আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে গবেষণার ধারণামূলক কাঠামো রোহিঙ্গা শরণার্থী, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, শরণার্থী এবং স্থানীয়দের আর্থ-সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, অর্থনৈতিক বিষয়, সামাজিক বিষয়, পরিবেশগত বিষয় প্রভৃতি আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় পর্বে গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো গঠন ও আলোকপাত করতে তত্ত্বগত কাঠামোঃ শরণার্থী-স্থানীয় সম্প্রদায়ের দুর্দশা ও স্থিতিস্থাপকতা, গবেষণায় তাত্ত্বিক কাঠামোর গুরুত্ব, উপযুক্ত তাত্ত্বিক কাঠামো নির্বাচন, তত্ত্ব ও গবেষণার পারস্পরিক সম্পর্ক, গবেষণায় তত্ত্বগত কাঠামো, তাত্ত্বিক আলোচনাঃ শরণার্থী-স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়া, স্থিতিস্থাপকতার ধারণা, ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের স্থিতিস্থাপকতা, স্থিতিস্থাপকতার সাথে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা, সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা, স্থিতিস্থাপকতার (Resilience) তত্ত্ব গ্রহণের যৌক্তিকতা, স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্বগত ব্যবহার এর আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে তত্ত্বগত বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী কিভাবে খাপ খাইয়ে চলছে বা নাজুক পরিস্থিতিতে কিভাবে নিজের এবং নিজের পরিবারকে টিকিয়ে রাখতে প্রতিনিয়ত প্রানপণ চেষ্টা করে চলেছে তা সংগৃহীত তথ্য ও তত্ত্বের মাধ্যমে উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পরিচয় শিরোনামে আরাকান ও আরাকানী জনগোষ্ঠীর পরিচয়, রোহিঙ্গা শব্দের উৎপত্তি, নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও জীবনধারা, রূপান্তরিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিকাশ, স্বাধীনতা উত্তর বার্মায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, সামরিক শাসনামলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, আরাকানীজ মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে রোহিঙ্গা মুসলিম, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং জাতিগত নির্মূলের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, জাতিগত সংঘাত, আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা হত্যা, সন্ত্রাস দমনের নামে রাখাইনে গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও গণধর্ষণ, গণধর্ষণে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততা, বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ থেকে উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ, বৌদ্ধ ভিক্ষু আন্দোলনঃ উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারণা, বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষার স্ববিরোধিতা ও গণহত্যায় প্ররোচনা ইত্যাদি বিষয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে চার দশকে বিভিন্ন ধাপে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের আগমন ও অবস্থান বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৭৮, ১৯৯১-৯২, ২০১২ এবং ২০১৬-১৭ সালে

শরণার্থী ক্যাম্পে আগমন ও অবস্থান নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণার আওতায় রোহিঙ্গাদের বসবাসরত দু'টি নিবন্ধিত ক্যাম্পে পুরাতন ও দু'টি মেকশিফ্‌ট ক্যাম্পে অবস্থিত নতুন রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের নির্ধারিত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাদের বসবাস, ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর (নতুন ও পুরাতন) জীবন-যাপন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে আর্থ-সামাজিক প্রভাব বুঝতে তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। এ জন্য প্রথমত (কুতুপালং নিবন্ধিত ক্যাম্প, নয়াপাড়া নিবন্ধিত ক্যাম্প, কুতুপালং মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প ও লেদা মেকশিফ্‌ট ক্যাম্পে) বসবাসরত রোহিঙ্গাদের ক্যাম্প জীবন-যাপন, স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ, শ্রম বাজারে অনুপ্রবেশ ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয়ত এ গবেষণায় গুণগত সাক্ষাৎকারের তথ্যকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বসবাসও কর্মকাণ্ডের আলোকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত বিষয়ে প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করতে মাঠপর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও শরণার্থীদের পারস্পরিক যোগাযোগ-সম্পর্ক, বৈবাহিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সামাজিক সমস্যা, স্থানীয় শ্রম বাজারে অবৈধ উপস্থিতি, শ্রমের মূল্যে প্রভাব, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপন ব্যবস্থায় ক্ষতি, কৃষি জমি হ্রাস, কৃষি উৎপাদন হ্রাস, স্থানীয়দের জন-জীবনে ঝুঁকি, প্রাকৃতিক বন উজাড়ের ফলে জ্বালানী ও পরিবেশের সংকট ইত্যাদি বিষয়ে পরিমাণগত ও গুণগত প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে এ অধ্যায়ে গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা করে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে এ অধ্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফলাফল বিশ্লেষণ করে উপসংহার টানা হয়েছে। এ সংক্রান্ত পরবর্তী গবেষণার সুযোগ সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া কতিপয় সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে যা থেকে একটি দিক নির্দেশনামূলক ও নীতি নির্ধরণী পর্যায়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

১.৮ উপসংহার

এ গবেষণায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিতে উখিয়া-টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শরণার্থী উপস্থিতি বিশ্লেষণ দ্বারা এ গবেষণাকর্মে স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিষয়টি বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সমস্যা এবং বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা যাচ্ছে। তাই এ গবেষণায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন প্রভাবে স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বের বিষয়টি আলোচনার দাবী রাখে। যা একজন পাঠক, গবেষক ও নীতি নির্ধারনী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্থানীয়দের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে ও উত্তরণে সহায়তায় সচেষ্ট হতে পারেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ
গবেষণা পদ্ধতি

২. ভূমিকা

এ মিশ্র গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মূলত শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক প্রভাবকে ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রভাবের ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন-যাপনে যে ধরণের প্রভাব বিস্তার করছে; সেটি বোঝার ওপর বর্তমান গবেষণাটি বাংলাদেশের নির্বাচিত ও নির্দিষ্ট গ্রামসমূহে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর একটি সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ গবেষণার পদ্ধতিটি অণু-সামাজিকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, কারণ এখানে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তে সামাজিক প্রক্রিয়াগুলোতে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে (Maanen, 1979, p. 520; Hitchcock and Hughes, 1995, p.116)। তদানুসারে, এই গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিটি এর প্রভাবকে আরও গভীরে বোঝার লক্ষ নির্দিষ্ট করেছে। এ মিশ্র গবেষণায় মূলত ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্তসহ গুণগত এবং পরিমাণগত তথ্য প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অধ্যায়ে গবেষণা পদ্ধতিসমূহের যৌক্তিকতার রূপরেখা এবং গবেষণার জন্য ব্যবহৃত কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গবেষণা এলাকা নির্ধারণ, পদ্ধতির ব্যবহার, সংগৃহীত তথ্য ও তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গবেষণার বিশ্লেষণকৃত ও প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের ত্রিভুজিকরণ এবং এর যথাযথ বিন্যাস করা হয়েছে।

২.১ গবেষণার প্রশ্ন

এ গবেষণায় অনুসন্ধানের সুবিধার্থে নিম্নের যে প্রশ্নগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে তাই গবেষণা প্রশ্ন (Research Questions)-

ক) বাংলাদেশে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনের ঐতিহাসিক কারণসমূহ কি কি?

খ) বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবন-ধারণ প্রক্রিয়ার অনুসঙ্গ কিরূপ?

গ) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উদ্ভূত সমস্যার ধরন কিরূপ?

ঘ) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার সম্ভাব্য পরিণতি কিরূপ?

২.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণা মূলত একটি জনগোষ্ঠীর জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এবং এর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্থানীয় সমাজে দৃশ্যমান বিভিন্ন ধরণের সমস্যাবলির ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এ গবেষণায় সমস্যার ধরণ, সমস্যার কারণ ও উত্তরণের উপায় এর তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.৩ গবেষণার নকশা

প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা করে গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের জন্য নানা ধরনের পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। এসব পদ্ধতি ও কৌশলের ভিত্তিতেই গবেষণার উপকরণ, নমুনায়ন ও তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া নির্বাচন করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীও পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে। এ গবেষণায় সকল ক্ষেত্রেই পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণার সহায়ক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের স্বীকৃত নিয়ম মেনে চলা হয়েছে। গবেষণাকর্মে যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো (ক) ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি (Historical Method) ও (খ) প্রায়োগিক গবেষণা পদ্ধতি (Empirical Method)। গবেষণাটি ঐতিহাসিক হলেও সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় অনুসৃত প্রায়োগিক পদ্ধতিতে দুই ধরণের-গুণগত (Qualitative) ও পরিমাণগত (Quantitative) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহৃত হয়েছে। মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ত্রিভুজিকরণ করে তথ্যসমূহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করত পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এজন্য এখানে গবেষণার উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং সুপারিশমালা উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

২.৩.১ তথ্য সংগ্রহের ধাপ

এ গবেষণায় দুই পর্বে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ বা (Information Collection) করা হয়েছে। প্রথম ধাপে দু'টি নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প বা শিবিরে এবং দু'টি মেকশিফট ক্যাম্প বা শিবিরে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের জীবন-যাপন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে আসার কারণে দু'টি উপজেলার ৩ (তিন) টি ইউনিয়নের মোট = ৮(আট) টি গ্রামে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর তথ্য অনুসন্ধান করতে উল্লেখিত গ্রামগুলো থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ধাপ দু'টি নিম্নরূপ-

২.৩.২ প্রথম ধাপ

তথ্য সংগ্রহের প্রথম ধাপে এ গবেষণার লক্ষ্য পূরণের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় দু'টি নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প বা শিবিরে এবং দু'টি মেকশিফট ক্যাম্প বা শিবিরে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক এর অনুমতি স্বাপেক্ষে সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রশ্নমালা জরিপ (Survey) কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত ক্যাম্পসমূহে যথাযথ কর্তৃপক্ষের তথা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর সচিব মহোদয়ের নিকট থেকে গবেষণা কর্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমতি গ্রহণ করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রশ্নমালা জরিপ (Survey) কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে রোহিঙ্গা শিবিরে নিবিড় সাক্ষাৎকার ও কেআইআই এর মাধ্যমে করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত ৪টি শরণার্থী ক্যাম্পে উত্তরদাতাদের উপস্থিতিতে ৪টি এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে।

২.৩.৩ দ্বিতীয় ধাপ

তথ্য সংগ্রহের দ্বিতীয় ধাপে এ গবেষণার লক্ষ পূরণের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে চারটি রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প বা শিবিরের পাশে অবস্থিত (উখিয়া ৪টি+টেকনাফ ৪টি=মোট ৮টি) গ্রামে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক এর অনুমতি স্বাপেক্ষে পর্যবেক্ষণ (Objervation) ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে প্রশ্নমালা জরিপ (Survey) কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপের এ পর্যায়েও কেআইআই (Key Informants Interview) (প্রশাসন, পুলিশের বিশেষ শাখা এপিবিএন ও জনপ্রতিনিধি) ও নিবিড় সাক্ষাৎকার (Indepth Interview) গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি)। এছাড়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আলাদাভাবে পুরুষদের সাথে তিনটি ও নারীদের সাথে তিনটি এফজিডি F.G.D. (Focus Group Discussion) (স্থানীয় জনগোষ্ঠী) পরিচালনা করা হয়েছে। এরপরও অধিক জানার জন্য নারী-পুরুষের মিশ্র উপস্থিতিতে সমাজের সচেতন অংশ হিসেবে একটি কলেজ শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সাথে একটি অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৪ তথ্যের উৎসসমূহঃ

২.৪.১ প্রাথমিক উৎস

এ গবেষণা এলাকার (রোহিঙ্গা ও স্থানীয়) উভয় জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে বিভিন্নভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এরমধ্যে পর্যবেক্ষন (Objervation), প্রশ্নমালা জরিপ (Survey), নিবিড় সাক্ষাৎকার (Indepth Interview), কেআইআই (Key Informants Interview) ও দলভিত্তিক আলোচনা F.G.D. (Focus Group Discussion) ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

২.৪.২ দ্বৈতীয়িক বা মাধ্যমিক উৎস

নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত ও অবিকৃত তথ্য, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদন বা রিপোর্ট যেমন-মাধ্যমিক গবেষণা বা পূর্বে প্রকাশিত প্রাথমিক গবেষণা থেকে সংগৃহিত তথ্যাবলীর ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের গবেষণায় বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ যেমন সমসাময়িক গ্রন্থ, দলিলপত্র, বিভিন্ন চুক্তি, সরকারি অধ্যাদেশসমূহ, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র, বই, সরকারি সংস্থার নথি, নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত গবেষণা প্রবন্ধ, বার্ষিক প্রতিবেদন, গবেষণা সংস্থার প্রকাশিত পরিসংখ্যান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত এ সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থাবলি এবং জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও ইন্টারনেট, দৈনিক পত্রিকা, সাময়িকী, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা হতে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৫ গবেষণার নির্ধারিত এলাকা

এ গবেষণাটি মূলত কক্সবাজার জেলার অন্তর্ভুক্ত উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ও পালংখালি ইউনিয়ন এবং টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নে পরিচালিত হয়েছে; যা গবেষণার এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা এ এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী শিবিরে বসবাস করে আসছে এবং সবগুলো রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির ও মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প উক্ত উপজেলা দ্বয়ের মধ্যেই অবস্থিত। ইতোমধ্যে এ এলাকা শরণার্থী শিবিরের ক্যাম্প বা আশ্রয়স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে (Lewis, 2018)। রোহিঙ্গা সঙ্কটের কারণে স্থানীয় এলাকার সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মাধ্যমে ক্ষেত্র বিশেষ প্রচারণাও চলেছে (Panday, 2004: p.100-101; Maystadt and Verwimp P. 2009, P. 1) এ উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের কুতুপালং গ্রাম এবং পালংখালি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বালুখালি, থাইংখালি ও পালংখালি গ্রামসমূহ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের নয়াপাড়া, মুচুনী, জাদিমুরা ও লেদা গ্রামে অধিকাংশ শরণার্থী ক্যাম্প অবস্থিত হওয়ায় এ গ্রামগুলো গবেষণার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখিত দু'টি উপজেলার চারটি রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরে (কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প, কুতুপালং মেকশিফট ক্যাম্প, নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্প ও লেদা মেকশিফট ক্যাম্প) এ গবেষণাকর্ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূলত এ কারণে গবেষণাটির জন্য এ এলাকাটি নির্ধারণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী কিছু গবেষণায়ও দেখা গেছে বিভিন্ন সময়ে আরাকানে নির্যাতিত হয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নাফ নদী পার হয়ে সহজে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা দু'টিতে অবস্থান গ্রহণ করেছে (Abrar and Sikder, 2007; Hassan, 2016)। এর কারণ হচ্ছে উভয় অংশের জনগোষ্ঠী (রাখাইন ও রোহিঙ্গা) আগে থেকেই সামাজিক, সাংস্কৃতি ও ধর্মীয় সম্প্রীতির সাথে এ এলাকায় আসা যাওয়া করে আসছে। যদিও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নির্যাতিত হয়ে বার্মা থেকে (বর্তমান মিয়ানমার) ১৯৭৮, ১৯৯১-৯২, ২০১২ ও সর্বশেষ ২০১৬-২০১৭ সালে এ এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এ গবেষণাটি মূলত কক্সবাজারের উক্ত দু'টি উপজেলাতে পরিচালনা করা হয়েছে।

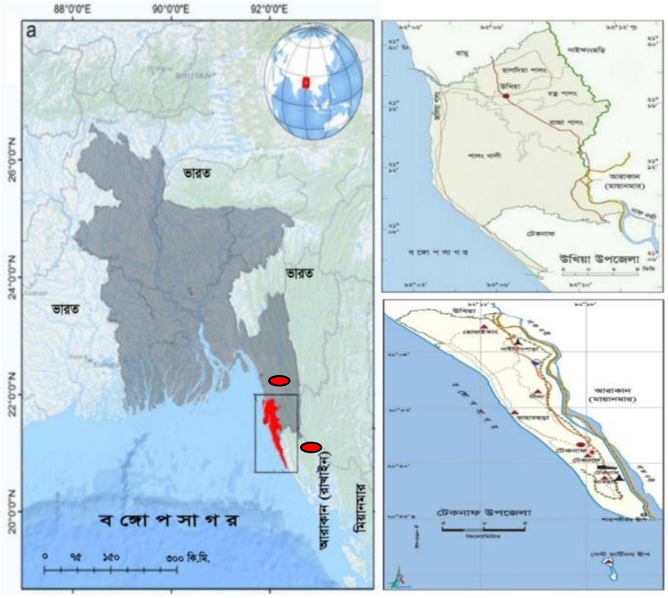

মানচিত্র-২.১ঃ গবেষণার নির্ধারিত এলাকা

২.৫.১ কক্সবাজার জেলা:

কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার মিলিতভাবে মোট আয়তন ৬৫০.৪৮ বর্গকিলোমিটার এবং উখিয়া ও টেকনাফের মোট জনসংখ্যা ৩,৫৫,৭৯৪ জন (bbs, 2011)। কক্সবাজারের উত্তরে চট্টগ্রাম জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে বান্দরবান জেলা, নাফ নদী এবং আরাকান (মিয়ানমার), পশ্চিম অংশে বঙ্গোপসাগর সীমাবদ্ধ। কক্সবাজারের একাংশে পার্বত্য অঞ্চল এবং বাকি অর্ধেকটি উপকূলীয় দ্বীপসমূহ নিয়ে গঠিত। কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলার মধ্যে উখিয়া ও টেকনাফ এ দু'টি উপজেলায় সবকয়টি শরণার্থী শিবির অবস্থিত রয়েছে। কক্সবাজার জেলা থেকে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত উখিয়া উপজেলা এবং আরও দক্ষিণে নাফ নদী ও বঙ্গপোসাগরের মোহনায় টেকনাফ উপজেলা অবস্থিত। নিম্নে কক্সবাজার জেলার মানচিত্র প্রদান করা হলো (https://www.bing.com)[১]-

মানচিত্র-২.২ঃ কক্সবাজার জেলার মানচিত্র

এ গবেষণার এলাকা হিসেবে উক্ত জেলার এ দু'টি উপজেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। বর্তমানে উখিয়া উপজেলায় 'কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প' সংলগ্ন 'কুতুপালং মেকশীফট ক্যাম্প' এবং টেকনাফ উপজেলায় 'নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্প' এর নিকটবর্তী লেদা গ্রামে অবস্থিত 'লেদা মেকশিফ্ট ক্যাম্প' উদ্দেশ্যমূলকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে 'কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প' ও 'নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্প' এ পুরাতন এবং 'কুতুপালং মেকশীফ্ট ক্যাম্প' ও 'লেদা মেকশীফট ক্যাম্প' এ নতুন রোহিঙ্গাদের বসবাস রয়েছে। এ গবেষণায় পুরাতন এবং নতুন সকল শরণার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এ চারটি ক্যাম্প নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

---

১. https://www.bing.com/images/search?view

২.৫.১.১ উখিয়া উপজেলা:

ষষ্ঠদশ শতকে আরাকান যখন একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত ছিল তখন কক্সবাজারের গভর্ণর বা ক্যাপ্টেন ছিল জনৈক উখিয়া রাজা। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রেকর্ডপত্রে 'উখিয়া' শব্দের ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রেকর্ডপত্রে উখিয়া ঘাট শব্দের উদ্ভব দেখানো হয়েছে। 'উখিয়া ঘাট' থেকে ঘাট শব্দ বাদ দিয়ে উখিয়া শব্দের উৎপত্তি (ইসলাম, ২০১০)। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনীর ফ্রান্সিস বুকানন নামের একজন কর্মচারী ১৭৯৮ সালে একটি জরিপ পরিচালনা করেন। তিনি ১৭৯৮ সালে চাঁদপুর থেকে এসে অলোচিত উখিয়াসহ কক্সবাজার, রামু, চকরিয়া, সাতকানিয়া ও চট্টগ্রাম ভ্রমন করেন। এসময় তিনি উখিয়া নাম ব্যবহার করেন (ইসলাম, ২০১০)। কক্সবাজার জেলা শহর থেকে প্রায় ৩০ কি: মি: দূরে উখিয়া উপজেলা অবস্থিত। ১৯২৬ সালে এটি থানা হিসেবে গঠিত হয় এবং ১৯৮৩ সালে এটি উপজেলায় উন্নীত হয়; যার আয়তন ২৬১.৮০ বর্গ কিলোমিটার (বার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৯-২০)।[২] সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে ১৩টি মৌজার অধীন ৫৪টি গ্রামে মোট পরিবার ৩৭,৯৪০ ও জনসংখ্যা ২,০৭,৩৭৯ জন। এর মধ্যে নারী পুরুষ যথাক্রমে (পুরুষ ১,০৪,৫৬৭ ও নারী ১,০২,৮১২) জন বসবাস করে। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৯ শতাংশ। প্রতি বর্গ কিলোমিটার জনসংখ্যার ঘনত্ব ৭৯২ জন (*বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো*, ২০১৬)। এ উপজেলার শিক্ষার হার ৩৬.৩ শতাংশ এবং এর মধ্যে যথাক্রমে (পুরুষ ৩৮.০ ও নারী ৩৪.৫) জন। মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম ১,৮৯,৮২১, হিন্দু ৪,৩৪০, বৌদ্ধ ১৩,০০০, খ্রীষ্টান ৩১ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী রয়েছে ১৮৭ জন। নিম্নে উখিয়া উপজেলার মানচিত্র প্রদান করা হলো (https://www.bing.com)[৪]-

মানচিত্র-২.৩ঃ উখিয়া উপজেলা মানচিত্র

---

২. বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০ (coxsbazar.gov.bd)

৩. https://www.bing.com/images/search?view=political+map+of+ukhia+cox%27s+bazar&simid=6080

৪. https://www.bing.com/images/search?view=political+map+of+ukhia+cox%27s+bazar&simid=6080

এ উপজেলায় পাহাড়, নদ-নদী, রাস্তা, বাস্তুভিটা ও বনাঞ্চল রয়েছে। আবাদী কৃষি জমির পরিমাণ ১২,৮১১ হেক্টর ও কৃষক পরিবারের সংখ্যা ২৭,৪৬১ (coxsbazar.gov.bd)।[৫] এ উপজেলার বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে শরণার্থী সমস্যা অন্যতম একটি সমস্যা। এখানে বন বিভাগের উখিয়া রেঞ্জ ও ইনানী রেঞ্জ নামে দু'টি রেঞ্জ রয়েছে। উখিয়া রেঞ্জে ৮৬৭০.০৭ হেক্টর ও ইনানী রেঞ্জে ৮২০২.৮৪ হেক্টর পরিমাণ বনভূমি রয়েছে (*দক্ষিণ বনবিভাগ অফিস*, কক্সবাজার ২০১৮)। এখানে বিভিন্ন প্রকার কৃষি, ধান, পান ও মাছ চাষ করার জন্য বেশ উপযোগী।

২.৫.১.১.১ রাজাপালং ইউনিয়নঃ

উখিয়া উপজেলার অধীনে অন্তর্ভুক্ত ৫টি ইউনিয়নের মধ্যে রাজাপালং বেশ গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন হিসেবে পরিচিত। এ ইউনিয়নে ১৫টি গ্রাম রয়েছে; যার আয়তন ৯,৭৩৫ একর। সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ ইউনিয়নে ১০,৫৯৬টি পরিবার ও মোট জনসংখ্যা ৫৬,৮৯৫ জনের বসবাস রয়েছে। যার মধ্যে (পুরুষ ২৮,৬৬৩ জন ও নারী ২৮,২৩০) জন। এ ইউনিয়নে শিক্ষার হার ৩৬.৯ শতাংশ এর মধ্যে যথাক্রমে (পুরুষ ৩৮.০ ও নারী ৩৫.৮%)। এখানে মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম ৫০,৮৭৭, হিন্দু ১,৬০৫, খ্রিস্টান ১১, বৌদ্ধ ৪,৩৭৫ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী রয়েছে ২৭ জনের বসবাস রয়েছে। এ ইউনিয়নের কুতুপালং গ্রাম গবেষণাকর্মের জন্য নির্ধারিত গ্রামগুলোর একটি। এখানে বিভিন্ন প্রকার কৃষি, ধান ও মাছ চাষ করার জন্য বেশ উপযোগী। নিম্নে রাজাপালং ইউনিয়নের মানচিত্র প্রদান করা হলো (Reach_bgd_map_ukhia_upozila_raja_palong_union)[৬]-

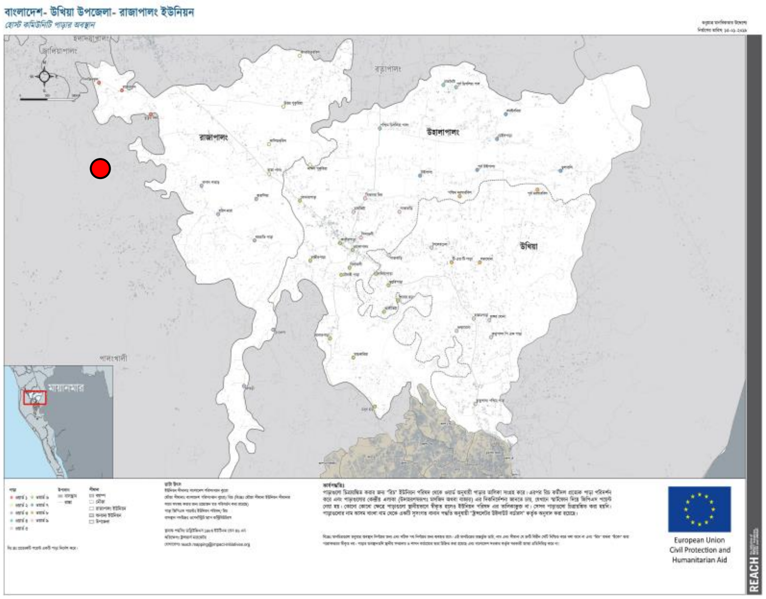

মানচিত্র-২.৪ঃ রাজাপালং ইউনিয়নের স্থানীয়দের অবস্থান

---

৫. coxsbazar.gov.bd

৬. Reach_bgd_map_ukhia_upozila_raja_palong_union_host_community_paras_16jan2019_a0_bg.pdf

২.৫.১.১.১.১ কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প

উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নে অবস্থিত কুতুপালং গ্রামে ‘কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প’ ১৯৯২ সালের ২ ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয়। উখিয়া উপজেলা সদর থেকে দক্ষিণ দিকে ৫ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত এই ক্যাম্প (ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি অফিস, ২০১৮)। উখিয়া-টেকনাফ মহাসড়ক এর পাশে এ ক্যাম্প কেন্দ্রীক গড়ে ওঠা বড় একটি বাজার রয়েছে। নিম্নের মানচিত্রে ‘কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প’ দেখানো হলো (ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি অফিস, ২০২০) -

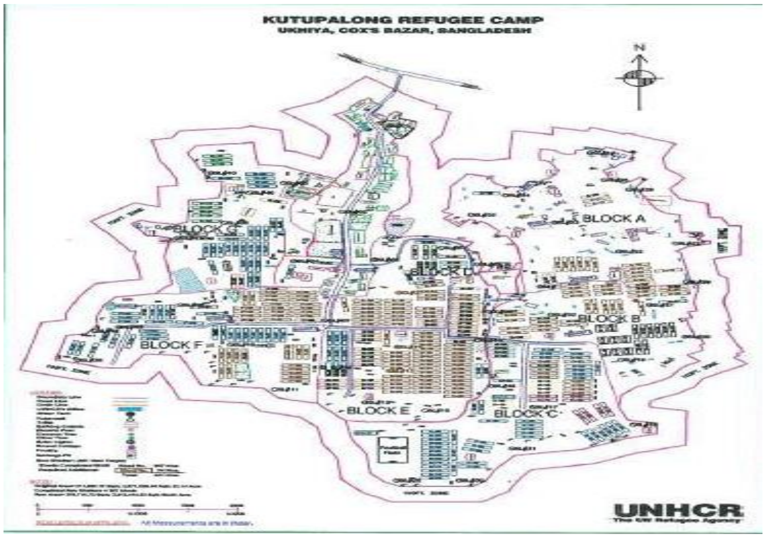

মানচিত্র-২.৫ঃ কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প এর অবস্থান

স্থানীয় অধিবাসী ছাড়াও এ বাজারের অধিকাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাগণ ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্য (ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি অফিস, ২০২০)। এ বাজারে মাছ, সব্জি থেকে শুরু করে পোশাক, ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীসহ নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া যায়। উখিয়া-টেকনাফ মহাসড়ক থেকে ডান পাশে বাজারের মাঝ দিয়ে ২০ গজ পরই ক্যাম্পের মূল প্রবেশ পথ। ক্যাম্পের শুরুতে একটি নিরাপত্তা চৌকি ও ক্যাম্প ইন চার্জ বা (সিআইসি) এর বাসভবন ও অফিস অবস্থিত।

২.৫.১.১.১.২ কুতুপালং মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প

এ কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের পাশেই গড়ে উঠেছে ‘কুতুপালং মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প’। এ ক্যাম্পটি বাংলাদেশ টেলিভিশনের উখিয়া উপ-কেন্দ্র পার হয়ে বালুখালির আগ পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার বিস্তৃত। ‘কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প’ ও ‘কুতুপালং মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প’ উভয় ক্যাম্পের পেছন দিকে কোন সীমানা দেয়াল না থাকায় দক্ষিণ দিকটা অরক্ষিত এবং এদিক দিয়ে শরণার্থীরা অনায়াসে বাহিরে আসা-যাওয়া করতে পারে। উখিয়া-টেকনাফ প্রধান সড়ক দক্ষিণ দিক থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এ ‘কুতুপালং মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প’। সম্প্রতি কাঁটা তারের মাধ্যমে

এ প্রধান সড়ক সংলগ্ন সীমানা প্রাচীরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের কিছু পরিবারের মানুষ এ কাঁটা তারের বেড়ার সীমানার মধ্যে ভৌগোলিক কারণে অবস্থান করছে।

২.৫.১.১.২ পালংখালি ইউনিয়নঃ

উখিয়া উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পালংখালি ইউনিয়ন। ১৭টি গ্রাম নিয়ে গঠিত এ ইউনিয়নে প্রায় ২৮টি নতুন আশ্রয় শিবির অবস্থিত এবং এ ইউনিয়নের আয়তন রয়েছে ৩৩,৪৪২ একর। সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ গ্রামের ৫,৫৮৯টি পরিবার বসবাস করে এবং মোট জনসংখ্যা ছিল ৩২,৮৪৩ জন (পুরুষ ১৬,৫০৮ ও নারী ১৬,৩৩৫)। এখানে সার্বিক শিক্ষার হার ৩৪.৩% এর মধ্যে যথাক্রমে (পুরুষ ৩৪.৯% ও নারী ৩৩.৬%) (*বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো*, ২০১৮)। এখানেও বিভিন্ন প্রকার কৃষি, ধান, পান ও মাছ চাষ করার জন্য বেশ উপযোগী। নতুন রোহিঙ্গা অধ্যুষিত ‘কুতুপালং মেকশিফ্ট ক্যাম্প’ এবং পালংখালি, থাইংখালি ও বালুখালি এ তিনটি গ্রামের স্থানীয় জনগোষ্ঠী এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিম্নে পালংখালি ইউনিয়নের মানচিত্র প্রদান করা হলো- (Reach_bgd_map_ukhia_upozila_palong_khali_union_host)[৭]

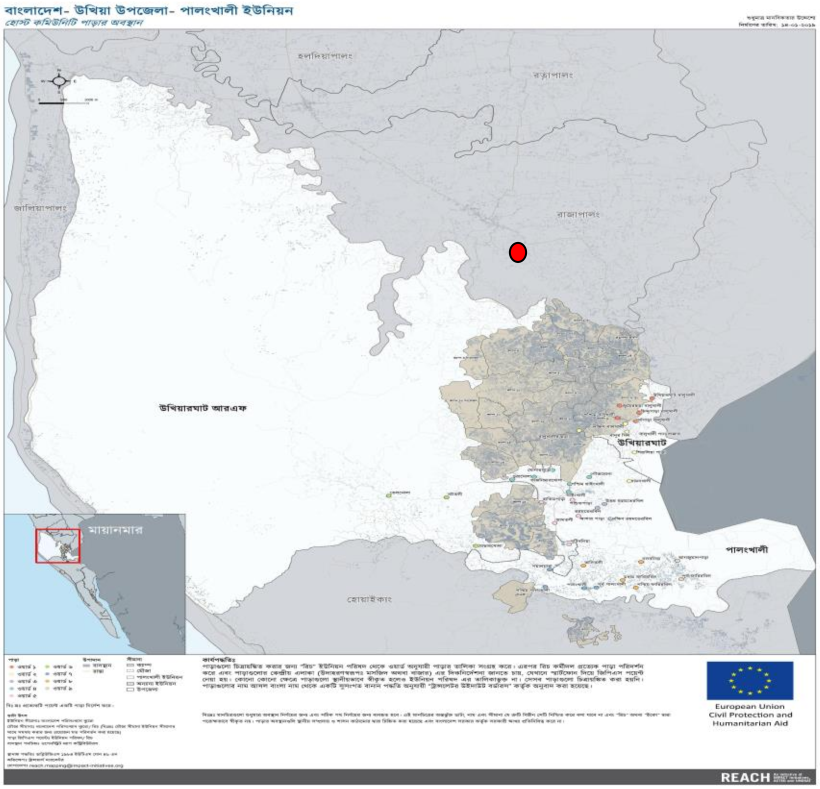

মানচিত্র-২.৬ঃ পালংখালি ইউনিয়নের স্থানীয়দের অবস্থান

৭. Reach_bgd_map_ukhia_upozila_palong_khali_union_host_community_paras_16jan 2019 _a0_bg. page_001.jpg

২.৫.১.২ টেকনাফ উপজেলা

কক্সবাজার জেলার সর্বদক্ষিণে নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত টেকনাফ উপজেলা। কক্সবাজার সদর হতে এ উপজেলার দূরত্ব ৮২ কি: মি: এবং এর আয়তন ৩৮৮.৬৮ কি. মি.। নাফ নদী বার্মা এবং বাংলাদেশকে বিভক্ত করেছে। ১৯৩০ সালে এটি থানা হিসেবে গঠিত হয় এবং ১৯৮৩ সালে এটি উপজেলায় রূপান্তরিত হয়। টেকনাফ উপজেলা সদরে ৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত টেকনাফ পৌরসভা (বার্ষিক পরিকল্পনা: ২০১৯-২০)।[৮] সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ উপজেলার ৪৬,৩২৮টি পরিবারে জনসংখ্যা ২,৬৪,৩৮৯ জন এবং যথাক্রমে (পুরুষ ১,৩৩,১০৬ ও নারী ১,৩১,২৮৩) জন। সার্বিক শিক্ষার হার ৩১.১% এর মধ্যে যথাক্রমে (পুরুষ ৩৪.৪% ও নারী ২৭.৯%) জন। এ জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম ২,৫৮,২৪৫, হিন্দু ২৯৬৭, বৌদ্ধ ৩০৮৯, খ্রিষ্টান ০৯ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী রয়েছে ৭৯ জন। এ উপজেলায় পাহাড়, নদ-নদী, রাস্তা, বাস্তুভিটা ও বনাঞ্চল রয়েছে। এ উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে ১২টি মৌজার অধীন ১৪৬টি গ্রামে মানুষের বসবাস (*বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো*, ২০১৮)। প্রতি বর্গ কিলোমিটার জনসংখ্যার ঘনত্ব ৭৯২ জন। এ উপজেলায় বনবিভাগের তিনটি রেঞ্জ রয়েছে। বনভূমির পরিমান টেকনাফ রেঞ্জে ৬৫৯১.২৫ হেক্টর, হোয়াইক্যাং রেঞ্জে ৫১৯৭.১৭ হেক্টর ও শিলখালী রেঞ্জে ২৯৭৮.৪৮ হেক্টর রয়েছে (*দক্ষিণ বনবিভাগ অফিস*, ২০২০)। পর্যটন এলাকা খ্যাত নৌ-বন্দর, পাহাড় ও নদী-সাগর ঘেরা টেকনাফে লবণ মাঠ এবং বড় বড় মৎস্য খামার রয়েছে। এছাড়া এখানে কৃষি ও মাছ চাষ করার জন্য বেশ উপযোগী (বার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৯-২০)।[৯] নিচে টেকনাফ উপজেলার মানচিত্র প্রদান করা হলো (Teknaf.jpg)[১০]-

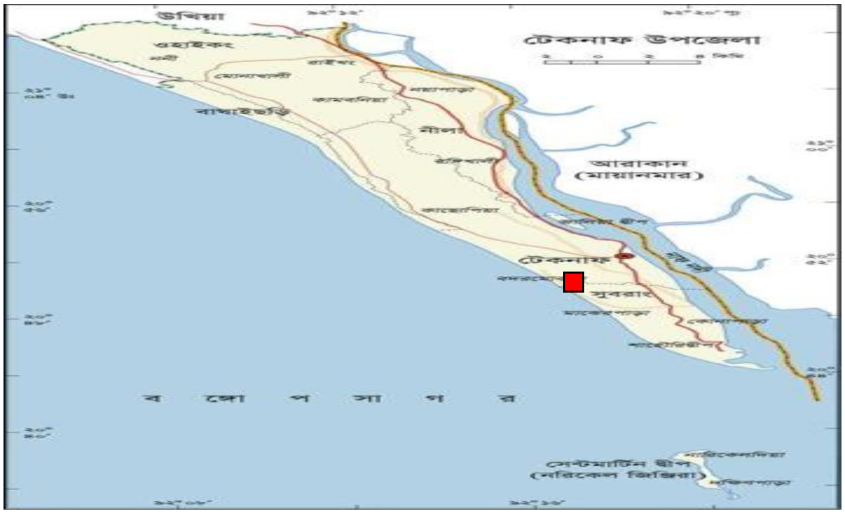

মানচিত্র-২.৭ঃ টেকনাফ উপজেলা মানচিত্র

৮. বার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৯-২০ (coxsbazar.gov.bd)

৯. বার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৯-২০ (coxsbazar.gov.bd)

১০. https://www.bing.com/images/search?view= Teknaf.jpg

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার ৭৫% ও ঝরে পড়ার হার ২৫% এবং প্রাথমিকে শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার ৯০%। এছাড়া আবাদী জমির পরিমান ১১,৪৭৫ (হেক্টর) ও কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১৮,৪৩০টি। মৎস্য চাষির সংখ্যা ৬০৮ জন এবং নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা ৭৮৬২ জন (বার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৯-২০)।[১১] এ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নে নয়াপাড়া গ্রামে 'নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্প' ও লেদা গ্রামে 'লেদা মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প' অবস্থিত।

২.৫.১.২.১ হ্নীলা ইউনিয়নঃ

টেকনাফ উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের মধ্যে হ্নীলা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের আয়তন ১৭,১২৫ একর এবং এ ইউনিয়নে মোট ২৮টি গ্রাম রয়েছে। সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ ইউনিয়নে ৮,২৭১টি পরিবারে মোট জনসংখ্যা ৪৬,৮৯৬ জন। এ ইউনিয়নে পাহাড়, নদ-নদী, রাস্তা, বাস্তভিটা ও বনাঞ্চল রয়েছে। এ ইউনিয়নে ০২টি মৌজার অধীনে ২৬টি গ্রাম রয়েছে (*বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো*, ২০২০)। হ্নীলা ইউনিয়নের শিক্ষার হার ২৮.৫% এবং এর মধ্যে যথাক্রমে (পুরুষ ৩০.৬% ও নারী ২৬.৫%)। হ্নীলা ইউনিয়নের মধ্যে নয়াপাড়া ও মুচুনী গ্রামে 'নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্প' ও লেদা গ্রামে 'লেদা মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প' অবস্থিত। হ্নীলা ইউনিয়নে অবস্থিত ক্যাম্প দু'টি ও এর পার্শ্ববর্তী যথাক্রমে চারটি নয়াপাড়া, মুচুনী, জাদিমুরা ও লেদা গ্রামের স্থানীয় জনগোষ্ঠী নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নের মানচিত্রে হ্নীলা ইউনিয়নের অবস্থান দেখানো হলো (Reach_bgd_map_teknaf_upozila_nhilla_khali_union)[১২]-

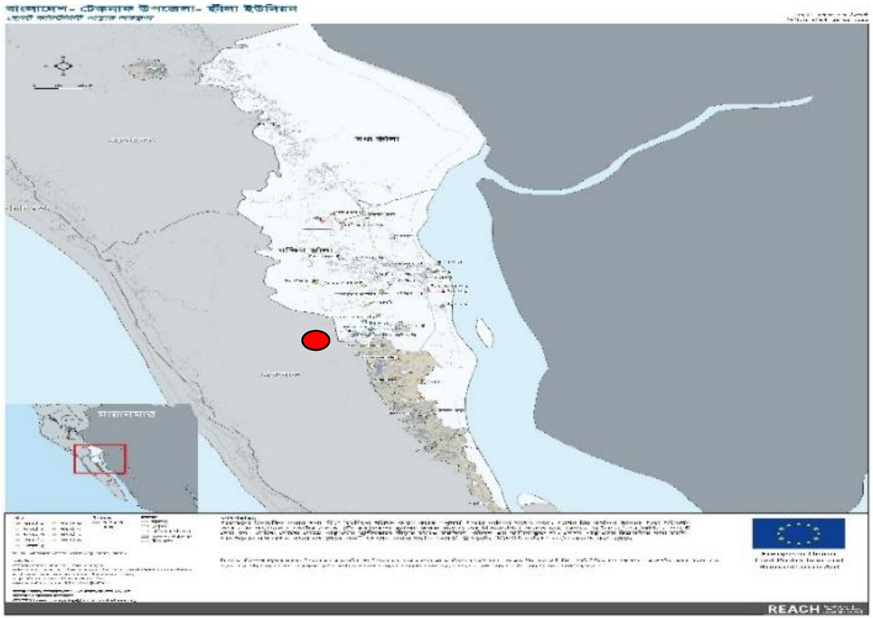

মানচিত্র-২.৮ঃ হ্নীলা ইউনিয়নের স্থানীয়দের অবস্থান

১১. বার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৯-২০, (coxsbazar.gov.bd)

১২. Reach_bgd_map_teknaf_upozila_nhilla_khali_union_host_community_paras_16jan 2019_a0_bg. (1)-page- 001.jpg

২.৫.১.২.১.১ নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্প

টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামে অবস্থিত ‘নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্প’টি চালু হয় ১৯ নভেম্বর, ১৯৯২ সাল। মুচুনী বাসস্ট্যাণ্ড থেকে উখিয়া-টেকনাফ মহাসড়ক থেকে ডান দিকেই ‘নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্পে’র প্রবেশ পথ। এ ক্যাম্পের উত্তরে রয়েছে লেদা গ্রাম, দক্ষিণে নয়াপাড়া, মুচুনী ও জাদিমুরা গ্রাম এবং পূর্বে অল্প কিছু চাষের জমিসহ নাফ নদী অবস্থিত। যদিও এ চাষের জমিতে এখন নতুন রোহিঙ্গাদের অস্থায়ী আশ্রয় শিবির। এর সাথেই একটি ছোট্ট বাজার ও মুচুনী-নয়াপাড়া আদর্শ বিদ্যাপীঠ এবং পশ্চিমে রয়েছে পাহাড়ি বনভূমি। এখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব মূলত ক্যাম্প ইন চার্জ এর তত্ত্বাবধানে পুলিশের (এপিবিএন), আনসার বাহিনী ও অতিরিক্ত ৫০ জন বিজিবি সদস্য রয়েছে। এই শরণার্থী ক্যাম্পে কোন সীমানা প্রাচীর বা দেয়াল নেই (ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি অফিস, নয়াপাড়া, ২০১৮)। তবে ক্যাম্পের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বর্ধিত নতুন ক্যাম্প (শালবন ক্যাম্প নামে পরিচিত) এবং শুধু পশ্চিম এলাকা পাহাড় বেষ্টিত রয়েছে। ‘নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্প’ এর মানচিত্র (ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি অফিস, নয়াপাড়া, ২০১৮) -

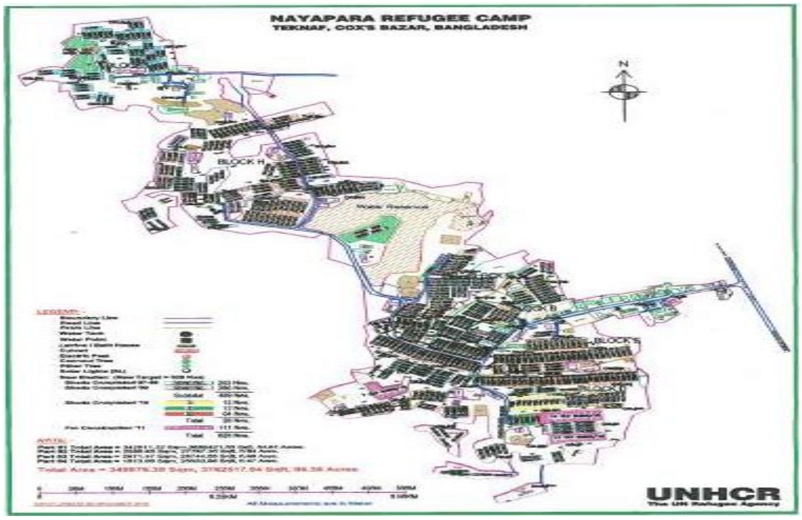

মানচিত্র-২.৯ঃ নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্পের মানচিত্র

২.৫.১.২.১.২ লেদা মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প

নয়াপাড়া রোহিঙ্গা নিবন্ধিত শরণার্থী ক্যাম্প থেকে উত্তর দিকে লেদা গ্রাম অবস্থিত। এ গ্রামের পশ্চিম দিকে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বসবাস। লেদা গ্রামের মধ্যদিয়ে উখিয়া-টেকনাফ এর প্রধান সড়ক চলে গেছে এবং এ সড়কের পশ্চিম পাশে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বসতির পাশেই অবস্থিত এ ‘লেদা মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প’। এ ক্যাম্পে সাধারণত নতুন আগত রোহিঙ্গারা বসবাস করে থাকে। প্রাকৃতিক পাহাড় বেষ্টিত এ ক্যাম্পের পশ্চিম প্রান্তে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনে জ্বালানী সংগ্রহের জন্য রোহিঙ্গারা আসা-যাওয়া করে থাকে।

ওপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে গবেষণার জন্য নির্ধারিত উখিয়া ও টেকনাফ এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা, জনসংখ্যার পরিমাণ, শিক্ষার হার ও দারিদ্র সীমায় খুব বেশি পার্থক্য নেই। পূর্ব আত্মীয়তার সূত্র ধরে যোগাযোগ ব্যবস্থার সাশ্রয়ী সুবিধা থাকায় এবং স্থানীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কয়েক দশক আগে থেকেই আরাকান থেকে এসে এ এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করে আসছে। তাই এ এলাকার আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

২.৬ গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি

মূলত এটি একটি ঐতিহাসিক গবেষণা হিসেবে গবেষণাটির একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। তাই এর ঐতিহাসিক যথার্থতা মূল্যায়ণের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক গবেষণার অংশ হিসেবে প্রভাব পর্যালোচনারও সুযোগ রয়েছে। এ গবেষণার উপকরণ, নমুনায়ন ও তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া নির্বাচন ও বিচার করার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। নিম্নে এ গবেষণার ব্যবহৃত পদ্ধতিগত বিষয়ে আলোকপাত করা হলো-

২.৬.১ ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতির ব্যবহার

ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে-অতীতের কোন বিষয় বা বর্তমানের কোন বিষয়কে ঐতিহাসিক তথ্য, উপাত্ত ও দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা; যা এ গবেষণায় অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের জন্যও গবেষণাটিতে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে; কারণ এটি গবেষণা শুরু করতে এবং গবেষণাটি সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করেছে (Charmaz, 2006)। ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতির ধারণা দিতে গিয়ে ফিলিপ্স বলেন, এটি হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যাতে ঐতিহাসিক তথ্যাদি, প্রামাণ্য দলিল, নথিপত্র, শিল্পবস্তু প্রভৃতি ব্যবহার করে কোন ঘটনার সত্যতা যাচাই করা অথবা অস্পষ্ট বিষয়কে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয় (Phillips, 1971)। এ বিষয়ে ইয়ং বলেন, ঐতিহাসিক পদ্ধতি হচ্ছে কোন অতীতের যুক্তি নির্ভর গবেষণা প্রক্রিয়া যার সাহায্যে বর্তমানকে বুঝতে পারা যায় (Young, 1993)। এখানে নির্দিষ্ট গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতির নির্বাচন করা হয়ে থাকে (Creswell, 2009)। এ গবেষণায় আরাকানের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম জনগোষ্ঠীর হাজার বছরের ইতিহাস ফুটে উঠেছে বিধায় এখানে ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি দ্বারা গবেষণার একটি পর্যায় পর্যন্ত সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণী-২.১ঃ বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমণের ক্রমধারা

আগমণের সময়কাল	আগমণের স্থান
১৯৭৮ সাল	কক্সবাজার
১৯৯১-১৯৯২ সাল	কক্সবাজার ও বান্দরবান এর বিভিন্ন উপজেলা
২০১২ সাল	কক্সবাজার (উখিয়া ও টেকনাফ)
২০১৬-২০১৭ সাল	কক্সবাজার (উখিয়া ও টেকনাফ)

যার ফলে আরাকানে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের পরিচয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নির্যাতিত হয়ে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আগমণ, দীর্ঘদিন শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থান এবং এর ফলে রোহিঙ্গা ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবন-যাপনের মিথষ্ক্রিয়ায় স্থানীয় জন-জীবনে কি ধরণের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তা এই গবেষণার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

২.৬.২ দলিল-পত্র বিশ্লেষণ

প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত উভয় নথিসমূহ মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করার পদ্ধতিগত প্রক্রিয়াই দলিল-পত্র বিশ্লেষণ বা (Documents Analysis) (Bowen, 2009)। অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের কৌশলের ন্যায় নথি বিশ্লেষণ এই গবেষণায় অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করেছে। এ গবেষণায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী দ্বারা গবেষণা এলাকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রায় প্রভাব নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি যেমন বই, অভিসন্দর্ভ, প্রবন্ধ, বুকলেট, রচনাবলী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহের নথি-পত্র পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের মাধ্যমেও নথি সংগ্রহ করে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে গবেষণার সময়ও এ সম্পর্কিত অনেকগুলো নথি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারসহ বেশ কয়েকটি গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নথি বিশ্লেষণের জন্য যথাযথ নথির সন্ধান করতে বিশেষ করে আরআরআরসি (শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন), জাতিসংঘ গ্রন্থাগার এবং রিফিউজি এণ্ড মাইগ্রেটরী রিহেবিলিটেশন ইউনিট (রামরু) থেকে বেশ কিছু মূল্যবান দলিল-পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এ গবেষণা এলাকায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বসবাসের ফলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবন-যাত্রায় প্রভাব সম্পর্কে গভীরভাবে বুঝতে দলিল-পত্র বা ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে।

২.৬.৩ পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতি

গবেষণার তথ্য অনুসন্ধানের জন্য গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুকে দু'ভাবে সংযুক্ত করার প্রতি জোর প্রদান করা হয় (Merriam, 2009; Stake, 2010)। তাই এ মিশ্র গবেষণায় সামাজিক বিজ্ঞানে বহুল ব্যবহৃত প্রায়োগিক গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত দুই ধরণের তথ্যকে বেছে নেওয়া হয়েছে- (ক) পরিমাণগত তথ্য এবং (খ) গুণগত তথ্য। এ গবেষণাটি স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ধরণ অনুধাবনের জন্য গুণগত Quantitative পদ্ধতিতে তথ্য বিশ্লেষণ করা হলেও কিছু বিষয়ে উভয় জনগোষ্ঠীর তথ্য-উপাত্তকে পরিমাণগত Qualitative পদ্ধতিতেও বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

২.৭ তথ্য সংগ্রহের উপকরণসমূহঃ

কোন কোন উপকরণ (Tools) ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষণা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তা গবেষণার বিষয় ও ধরণের ওপর নির্ভর করে। এ গবেষণায় পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক.

আবদ্ধ প্রশ্ন ও খ. খোলা প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহে খোলা প্রশ্নমালা ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই এ গবেষণায় গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরণের তথ্য ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিমাণগত ও গুণগত উভয় তথ্য সংগ্রহে উত্তরদাতার অনুমতি গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে উভয় পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে অলোকপাত করা হলো-

২.৭.১ পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ

পরিমাণগত তথ্য Quantitative Information অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষার তথ্য পেতে এবং সংগৃহীত তথ্যের প্রাথমিক বিশ্লেষণ মূল্যায়ন করার জন্য প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে বাছাইকৃত উত্তরদাতাদের সাথে নির্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে (King, 2000, p. 73)। তবে, সাধারণভাবে জনতত্ত্ব বা সংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ের সাথে মিল রেখে গবেষণা প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য পরিমাণগত তথ্যের অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। তাই এ গবেষণায় নির্দিষ্ট উপাদানসমূহের সংখ্যাসূচক উত্তর পেতে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের বিবেচনা করা হয় (Kuada, 2012)। সুতরাং এ গবেষণায় পরিমাণগত তথ্য পেতে প্রশ্নমালা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা সঙ্গত। নিম্নে প্রশ্নমালা জরিপ সম্পর্কে আলোকাত করা হলো-

২.৭.২ প্রশ্নমালা জরিপ

প্রশ্নমালা বা প্রশ্নপত্র জরিপ (Survey Questionnaire) তথ্য সংগ্রহের একটি কৌশল। সাহিত্য পর্যালোচনা করার পরে সাক্ষাৎকারের জন্য গবেষণার বিষয়কে সামনে রেখে কতগুলো প্রশ্ন তৈরি করা হয়েছে; যাতে এই গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। প্রশ্নমালা তৈরির ক্ষেত্রে তথ্যের সংকেতায়ন বা কোড ব্যবহার করা হয়েছে। যে সকল প্রশ্নের উত্তরে গবেষণার তথ্যসমূহ সংগৃহীত হয়েছে সে প্রশ্নগুলো উত্তরদাতার নিকট সরাসরি উপস্থাপন করে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অনুসন্ধানের সফলতা এবং সংগৃহীত তথ্যের উৎকর্ষ অনেকাংশেই প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ওপর নির্ভর করে। তাই বিস্তৃত ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহে এটি অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে আবদ্ধ প্রশ্নকে প্রথমে ধারণার ওপর নির্ভর করে কিছু প্রশ্ন তৈরি পূর্বক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে পরীক্ষামূলক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এরপর মাঠ পর্যায়ের ধারণাসহ নতুন করে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে তা গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক এর অনুমোদন স্বাপেক্ষে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার উক্ত চারটি শরণার্থী ক্যাম্পে প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তির ব্যবহারিক বিষয়, সময়, স্থান বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে একমত হয়েছেন (Kvale, 1996)। এক্ষেত্রে ভাষা বোঝার সুবিধার্থে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে শরণার্থী উপস্থিতিতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনে প্রভাব বুঝতে একইভাবে স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিকট থেকে দু'টি উপজেলার উক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাম থেকে

বিভিন্ন পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর সাথে দ্বৈচয়নের ভিত্তিতে সমসংখ্যক উত্তরদাতার নিকট থেকে প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৭.৩ গুণগত তথ্য সংগ্রহ

সাধারণত গুণগত তথ্য পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হলে পরিমাণগত তথ্য আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়। গুণগত গবেষণা প্রায়শই মানুষের জীবন ও জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য সহায়ক হয়; এজন্য এ গবেষণায় গুণগত তথ্য ব্যবহার (Using Qualitative Information) করা হয়েছে (Silverman 2001, p. 25)। কারণ গুণগত গবেষণার গভীরতা পেতে বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনে ব্যবহৃত হয় এবং এটি বিভিন্ন সামাজিক জ্ঞান অন্বেষণ ও প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চায়। এ গুণগত কৌশলগুলো গবেষককে ব্যক্তির বোঝাপড়া এবং উপলব্ধিসমূহ ভাগ করে নিতে এবং কীভাবে মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপন করে তা আবিষ্কার করে (Berg, 2001)। এ গবেষণায় গুণগত তথ্য ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দ্বারা স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে তার বর্ণনামূলক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা। গুণগত গবেষণা নিজেকে এই পরিমাণে আলাদা করে তোলে যে, এটি সাধারণত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের সময় পরিমাণের চেয়ে বর্ণনার ওপর জোর দেয় (Bryman, 2008, p. 366)। এটি প্রস্তাবনামূলক (Inductive) পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রচলিত যেখানে তাত্ত্বিক গবেষণার বাইরে অন্যান্য উপায়ে বেশি গবেষণা করা হয়। গুণগত গবেষণায় বিবরণ প্রদান এবং গবেষণার বিষয়াবলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। এ গবেষণায় পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণা এলাকার অর্থনীতি, সামাজিক অবকাঠামো, পরিবেশগত এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রায় সংগঠিত সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

২.৭.৩.১ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার প্রথম দিকে তথ্য সংগ্রহের চেয়ে তাদের সাথে অর্থাৎ স্টেক হোল্ডারদের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরী ছিল। এতে করে পর্যবেক্ষণ কাজটি সহজ হয়েছে। পরবর্তীতে মাঠকর্মের গবেষণা নোটের সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্য বিন্যস্ত করা হয়েছে।

২.৭.৩.২ যন্ত্রপাতির ব্যবহার

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারসমূহ ধারণ করে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনুমোদন স্বাপেক্ষে ডিভাইস বা যন্ত্রপাতির সাহায্য নেয়া হয়েছে।

২.৭.৪.১ পর্যবেক্ষণ

সামাজিক গবেষণার তথ্য সংগ্রহের একটি অন্যতম কৌশল হচ্ছে পর্যবেক্ষণ (Observations)। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করছে হুবহু তা অবলোকন করা যায়। তথ্য সংগ্রহে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়। এ গবেষণায় সামাজিক

ইতিহাসের ঘটনাসমূহের সাথে একটি চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণা কৌশলের মধ্যে পর্যবেক্ষণকে মৌলিক হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Angrosino, 2007)। আবার পর্যবেক্ষণের একটি অন্যতম কার্যকরী উপাদান হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ। এ গবেষণায় সামাজিক অনুসন্ধানে পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি একটি কার্যকরী পদ্ধতি ছিল। গবেষণা এলাকার চারপাশে মানুষের জীবন এবং জীবিকা ভালোভাবে বুঝতে, স্থানীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রামে এবং শরণার্থী ক্যাম্পে গবেষণা চলাকালে পর্যবেক্ষণগুলো ক্রমাগতভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ দ্বারা আধেয় জনগোষ্ঠীর জীবন প্রণালীও সংযুক্ত করা হয়েছে। এ গবেষণায় উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সংগঠিত ঘটনা, আচরণ এবং তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার জন্য পর্যবেক্ষণ তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ জন্য নিরবিচ্ছিন্ন নোট সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় (Glesne & Peshlin, 1992)। তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যায়ক্রমে দীর্ঘদিন শরণার্থী ক্যাম্প ও এর পাশের আবাসিক এলাকায় থাকতে হয়েছে। এছাড়া ক্যাম্প-ইন-চার্জ বা সিআইসি এর কার্যালয় এবং ক্যাম্পের নিকটতম বাজারে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বহু পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছে। সাক্ষাৎকার ছাড়াও শরণার্থী ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দু'টি পক্ষের মধ্যেকার যোগাযোগ, লেনদেন ও অন্যান্য সম্পর্কের ধরণ ও মাত্রা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। গবেষণা এলাকা শরণার্থী ক্যাম্পের বিভিন্ন স্থানে যেমন বাজার, খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মসজিদ, মাঠ, মিয়নমার ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব এবং অন্যান্য এলাকায় গবেষণার জন্য পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণা এলাকা স্থানীয় গ্রামের বিভিন্ন স্থানে যেমন বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাঠ ও অন্যান্য এলাকায় গবেষণার জন্য পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। অন্যান্য স্থান যেমন শরণার্থী শিবির ইন চার্জ অফিস, আরআরআরসি (শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন) অফিস, ইউএনএইচসিআর এর অফিস এবং অন্যান্য সংস্থার সংগৃহীত তথ্য সম্পূরক হিসেবে এবং বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৭.৪.২ নিবিড় সাক্ষাৎকার

স্পর্শকাতর অনেক বিষয়ে উত্তর খুঁজতে নিবিড় সাক্ষাৎকার (Indepth Interview) কৌশলে শক্তি রয়েছে। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে কোনো বিষয় সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি বিশেষ এর মধ্য থেকে নির্বাচিত একজন ব্যক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত আলোচনার সুযোগ দিয়ে এর মাধ্যমে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্পর্শকাতর বিষয়সহ বিভিন্ন সম্পর্কের প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী সংগ্রহের পদ্ধতি ছিল নিবিড় সাক্ষাৎকার (Indepth Interview)। এটি এমন সমস্যাকে প্রকাশ করে যা শুধু সাক্ষাৎকার বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে নাও পাওয়া যেতে পারে। এটি অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণের সুযোগগুলো আরও প্রশস্ত করার সুযোগ করে দেয়; যা আরও আকর্ষণীয় এবং মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করতে পারে (Bryman, 2008, p. 466)। এর দ্বারা তথ্য সরবরাহকারীর মনের ভেতরে প্রবেশের সুযোগ থাকে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার

বিশ্লেষণে বিন্যাস করা হয়েছে। এতে তথ্যদাতার অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা বা জীবনের কিছু দিক অনুসন্ধানের জন্য সহায়ক হয়েছে (Harvey and MacDonald, 1993)। এটি পারস্পরিক আগ্রহের বিনিময় প্রস্তাবে একটি বিষয় সম্পর্কে কথোপকথনের জন্য মতবিনিময় করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি পদ্ধতির পাঠ্যগুলোর যেমন প্যাটনের (Patton, 1990) গুণগত মূল্যায়ন ও গবেষণা পদ্ধতি এবং (McCracken, 1988) এর দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে করা হয়েছে। এখানে উত্তরদাতাদের অভিজ্ঞতা এবং দৈনন্দিন জীবন থেকে বেশি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যার সবই থাকবে বর্ণনামূলক প্রকাশ হিসেবে। এ সময় আবেগ এবং প্রভাব মুক্ত থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে; যেন গবেষণায় ভালো ফলাফল প্রস্তুত করা যায়। গুণগত এ আলোচনার কিছু বিষয় অডিও রেকর্ড করা হয়েছে; যাতে এ গবেষণা প্রশ্নগুলোর নোট গ্রহণের পরে উত্তরসমূহ পেতে সহায়তা করে।

২.৭.৪.৩ প্রধান তথ্য সরবরাহকারী বা কেআইআই

সমাজের এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ তাঁদের দায়িত্ব পালনের জন্যেই অনেক বিষয়ে ধারনা লাভ করেন। ফলে তারা বিভিন্ন বিষয়ে অনেক মূল্যবান মতামত প্রদান করতে পারেন। এ জন্য এই বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে শরণার্থী বসবাসের কারণে গবেষণা এলাকার স্থানীয়দের আর্থ-সামাজিক বিষয়ের ওপর যে প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তার স্বরূপ উন্মোচনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। তাই এ গবেষণায় প্রধান তথ্য সরবরাহকারী বা কেআইআই (KII) (Key Informants Interview) করা হয়েছে তথ্যের সাধারণীকরণের জন্য। এ সকল তথ্যসমূহ দ্বারা একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

২.৭.৪.৪ দলভিত্তিক অলোচনা

F.G.D (Focus Group Discussion) বা দল ভিত্তিক আলোচনা মূলত একটি দলীয় আলোচনা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে কোনো কর্মসূচি সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দ্বৈচয়নের ভিত্তিতে ভিন্নধর্মী ও সমধর্মী সদস্যদের মধ্য হতে বা বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত একটি ক্ষুদ্র দলকে সুনিয়ন্ত্রিত আলোচনার সুযোগ দিয়ে এর মাধ্যমে বিভিন্ন আবেগ ও আত্মনিষ্ঠ দিক বাদ রেখে আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, সন্তুষ্টি, উদ্বেগ এবং জটিল পারস্পরিক সম্পর্কের প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী সংগ্রহের পদ্ধতিই হলো দলভিত্তিক অলোচনা বা এফজিডি (Focus Group Discussion)। ফোকাস দল আলোচনা বলতে সহজ কথায় উপযুক্ত অনুসন্ধান বিষয়ের ওপর একটি ক্ষুদ্র দলভূক্ত (সাধারণত ৮ থেকে ১২ জন) সদস্যকে একজন সঞ্চালকের পরিচালনায় আলোচনায় অংশ গ্রহণের প্রক্রিয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। এতে আলোচনাই হচ্ছে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের মূল বিষয়। এখানে আলোচনা হয়ে থাকে খোলামেলা পরিবেশে। সঙ্গত কারণেই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ কোনো বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য, পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন করা, অন্যের মন্তব্য নিয়ে যৌক্তিক পর্যালোচনা বা যুক্তি খণ্ডন করণ এবং একটি সাধারণ ঐক্যমতে উপনীত হবার চেষ্টা

করা হয়। এ গবেষণায় দল ভিত্তিক অলোচনা বা এফজিডি (F.G.D) পরিচালনা করা হয়েছে তথ্যের সম্মিলিত মতামত গ্রহণের নিমিত্তে। নিম্নে এ গবেষণায় ব্যবহৃত দল ভিত্তিক অলোচনা বা এফজিডি (F.G.D) পরিচালনা বিষয়ে আলোকপাত করা হলো-

২.৮ গবেষণার নমুনা সংখ্যা নির্ণয়

গবেষণার ধরণ অনুযায়ী দুই ধরণের উত্তরদাতার মধ্যে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে-ক. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী খ. স্থানীয় জনগোষ্ঠী। এ ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতা নির্ধারণের জন্য চারটি শিবির বা ক্যাম্পে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ গবেষণার নমুনার সংখ্যা নির্ণয়ে নিম্নের সূত্র প্রয়োগ করা হয়েছে-

$$n = \frac{z^2 \times pq}{d^2 \times RR}$$

যেখানে, p = ০.৪৫, q = ১-p, d = ০.০৫, Z value at ৯৫% CI (Confidence Interval) two-sided test= ১.৯৬, NR (Non-Response) = ৫%

n= (১.৯৬)² (০.৪৫) (১-০.৪৫)

(০.০৫)²×.৯৫=৩৮৪.১৬

Krejcie & Morgan এর মতে, যদি তথ্যবিশ্ব সমগ্রক ১০ লাখ বা তার বেশি হয়; তবে, ৫% আন্তসীমায় নমুনার আকার, n= ৩৮৪ জন হবে (Krejcie & Morgan, 1970)। এখানে অনেকে পরিপূর্ণ তথ্য নাও দিতে পারেন এজন্য ৫% অতিরিক্ত ধরে মোট উত্তরদাতা ছিল ৪০০ জন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্য। তবে, গুচ্ছ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে উখিয়া উপজেলার দু'টি ক্যাম্পে ২০০ জন (কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পে ১০০ জন+ কুতুপালং মেকশিফ্‌ট ক্যাম্পে ১০০=২০০ জন) ও টেকনাফ উপজেলার দু'টি ক্যাম্পে ২০০ জনসহ (নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্পে ১০০ জন+ লেদা মেকশিফট ক্যাম্পে ১০০=২০০ জন) সর্বমোট ৪০০ জন সদস্য রয়েছে। গুচ্ছ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেকটি ক্যাম্পকে একটি করে গুচ্ছ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি গুচ্ছ থেকে সাধারণ দৈবচয়ন Simple Random Sample Technique বা কৌশল অনুসরণ করে আনুপাতিক হারে উত্তরদাতা সদস্যদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া এই গবেষণায় ওপরোক্ত গাণিতিক সূত্র অনুযায়ী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের ন্যায় একইভাবে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য Sample Size সম্পর্কিত Assumption বা অনুমান করা হয়েছে ৩৮৪ জন উত্তরদাতা সদস্যের।

এখানে উক্ত ৫% অতিরিক্ত ধরে মোট উত্তরদাতার সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০০ জন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্য। গবেষণায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বিষয়ের ওপর প্রভাব জানাতে পরিমাণগত নমুনার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নির্ধারিত Sample Size গুচ্ছ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে উখিয়া উপজেলায় রাজাপালং ইউনিয়নে ১টি গ্রাম ও পালংখালি ইউনিয়নে ৩টি গ্রামসহ মোট =০৪ (চার)টি গ্রামে নারী-পুরুষ (নারী ২৫+ পুরুষ ২৫=৫০ জন) যথাক্রমে

৫০×৪=২০০ জন ও হ্নীলা ইউনিয়নে ৪টি গ্রামে (নারী ২৫+ পুরুষ ২৫=৫০ জন) যথাক্রমে ৫০×৪=২০০ জন নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ ছিল। অর্থাৎ সর্বমোট ৪০০ জন প্রধান উত্তরদাতারা এ প্রশ্নমালা জরিপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় সম্প্রদায় এবং শরণার্থী জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যবহৃত নমুনা পদ্ধতিটি এবং দৈবচয়ন নমুনার মধ্যে সংমিশ্রণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণামূলক প্রশ্নসমূহের সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়ার জন্য কৌশলগত নমুনা অর্জনের লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীদের নমুনাসমূহ তৈরি করা হয় (Bryman, 2008, p. 415)।

সারণী-২.২ঃ রোহিঙ্গা উত্তরদাতা জনগোষ্ঠী (পরিমাণগত)

	উখিয়া		টেকনাফ		
লিঙ্গ	কুতুপালং শরণার্থী শিবির	কুতুপালং মেকশিফ্‌ট শিবির	নয়াপাড়া শরণার্থী শিবির	কুতুপালং মেকশিফ্‌ট শিবির	মোট
পুরুষ	৭১	৭১	৭১	৭১	২৮০ জন
নারী	২৯	২৯	২৯	২৯	১২০ জন
সর্বমোট	১০০	১০০	১০০	১০০	৪০০ জন

ওপরের চার্ট বা তালিকায় দু'টি শরণার্থী শিবির ও দু'টি মেকশিফ্‌ট শিবিরে অবস্থানরত পুরাতন ও নতুন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে জরিপ সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ জরিপ সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে উত্তরদাতা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পুরুষ ও নারী সদস্যদের নিকট থেকে আলাদাভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে, এখানে নারী উত্তরদাতার তুলনায় পুরুষ উত্তরদাতার সংখ্যা বেশি ছিল। কারণ মুসলিম প্রভাবাধীন রোহিঙ্গা সমাজে সাক্ষাৎকার প্রদানের ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় পুরুষ সদস্যগণ বেশি আগ্রহী ছিলেন। তারপরও শতকরা ২৯ ভাগ নারী উত্তরদাতা এ গবেষণায় উত্তর প্রদানে অংশগ্রহণ করেন।

সারণী-২.৩ঃ স্থানীয় উত্তরদাতা জনগোষ্ঠী (পরিমাণগত)

	উখিয়া				টেকনাফ			
	রাজাপালং ইউনিয়ন	পালংখালি ইউনিয়ন			হ্নীলা ইউনিয়ন			
গ্রাম	কুতুপালং	থাইংখালি	পালংখালি	বালুখালি	নয়াপাড়া	লেদা	মুচুনী	জাদিমুরা
পুরুষ	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫
নারী	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫
মোট সংখ্যা	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
সর্বমোট-৪০০								

ওপরের চার্ট বা তালিকায় উখিয়া ও টেকনাফ দু'টি উপজেলায় বসবাসরত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে জরিপ সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ জরিপ সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পুরুষ ও নারী সদস্যদের নিকট থেকে

আলাদাভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে স্থানীয় পুরুষ উত্তরদাতা ও নারী উত্তরদাতার অংশগ্রহণ সমসংখ্যক ছিল। শতকরা ৫০% পুরুষ উত্তরদাতা ও ৫০% নারী উত্তরদাতা এ গবেষণায় উত্তর প্রদানে অংশ নিয়েছিল। এ পর্যায়ে গবেষণায় গুণগত তথ্যের ব্যবহার সম্পর্কে নিম্নে অলোকপাত করা হলো-

২.৮.১ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী জনসংখ্যার পরিধি

গবেষণার স্বার্থে কক্সবাজার জেলার অধীনে উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলা দ্বয়কে চার্টের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে। উখিয়া উপজেলার মধ্যে রাজাপালং ও পালংখালি ইউনিয়ন অবস্থিত। একইভাবে টেকনাফ উপজেলার মধ্যে হ্নীলা ইউনিয়ন অবস্থিত। উখিয়া উপজেলায় অবস্থিত শরণার্থী ক্যাম্প 'কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পে' রোহিঙ্গা পরিবারের সংখ্যা ১৮১৩টি ও তাদের পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ১৩,১৭৬ জন এবং টেকনাফ উপজেলায় অবস্থিত একটি শরণার্থী ক্যাম্প 'নয়াপাড়ায় শরণার্থী ক্যাম্পে' রোহিঙ্গা পরিবারের সংখ্যা ৩,৭৬৩টি ও তাদের পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ১৯,৪৪১ জন। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনের তথ্য মতে দু'টি রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে মোট জনগোষ্ঠী ৩২,৬১৭ হাজার জন (শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনের কার্যালয়, ২০১৬)। একইভাবে দু'টি রোহিঙ্গা মেকশীফ্ট ক্যাম্পের মধ্যে উখিয়ায় অবস্থিত 'কুতুপালং মেকশিফট ক্যাম্পে' ৩৬,০০০ হাজার ও টেকনাফ উপজেলায় অবস্থিত 'লেদা মেকশিফ্ট ক্যাম্পে' ২০,০০০ হাজারসহ ৪টি ক্যাম্পে সর্বমোট আনুমানিক ৮৮,০০০ হাজার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অবস্থান ছিল (শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনের কার্যালয়, ২০১৬)। যদিও পরবর্তীতে ২০১৭ সালে আরো বিপুল সংখ্যায় প্রায় ৭ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করলে তাদেরকে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলাদ্বয়ে স্থানান্তর করা হয় (http://rrrc.gov.bd/site/monthly_report)।[১৩] যার মধ্যে এ গবেষণায় আলোচ্য রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য চারটি ক্যাম্পে সর্বমোট ৪০০ জন উত্তরদাতা ছিলেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে নারী-পুরুষের আলাদাভাবে অংশগ্রহণ ছিল।

২.৯ তথ্য সংগ্রহে অংশগ্রহণকারীদের বৈশিষ্ট্য

এ গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের বাছাইয়ের জন্য রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের দু'টি জনগোষ্ঠীর উত্তর প্রদানকারী সদস্যদের দ্বৈচয়নের ভিত্তিতে বাছাই করে আলাদাভাবে ক. পর্যবেক্ষন (Objervation), খ. নিবিড় সাক্ষাৎকার (Indepth Interview), গ. প্রশ্নমালা জরিপ (Survey) ও ঘ. কেআইআই (Key Informants Interview) বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া এ গবেষণায় বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সাথে উল্লেখিত পদ্ধতিতে-ঙ) দল ভিত্তিক আলোচনা F.G.D. (Focus Group Discussion) পরিচালনা করা হয়েছে।

---

১৩. http://rrrc.gov.bd/site/monthly_report/ed54585a-826d-43bf-a988-60841c2f50bf, (Accessed on 12 December, 2018)

ক) পর্যবেক্ষণ-উখিয়া ও টেকনাফ এর গবেষণা এলাকায় রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপন বুঝতে এ গবেষণায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

খ) সাক্ষাৎকার গ্রহণ-রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথমত; উত্তরদাতাদের মধ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিকট থেকে মোট চারটি ক্যাম্প থেকে শরণার্থীদের সাথে জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। শরণার্থী ক্যাম্পের সাধারণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও রোহিঙ্গা মাঝি বা নেতারা এ গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ গবেষণা জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছর ও তদুর্ধ্বো বয়সের মধ্যে ছিল। শরণার্থী ক্যাম্পের এ জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী উত্তরদাতা আলাদাভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত; এ গবেষণা জরিপে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতাদের বয়সও ১৮ থেকে ৬০ বছর ও তদুর্ধ্বো বয়সের মধ্যে ছিল। এ গবেষণা সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন পেশার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী, এনজিও কর্মী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং শ্রমিক শ্রেণি রয়েছে।

গ) নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ-রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিকট থেকে নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এ নিবিড় সাক্ষাৎকারে সাধারণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, রোহিঙ্গা মাঝি বা নেতা রয়েছেন এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শিক্ষক, ডাক্তার, সাংবাদিক, শ্রমিক, শিক্ষার্থী, এনজিওকর্মী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি রয়েছে।

ঘ) কেআইআই এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ-ক্যাম্পের দায়িত্ব প্রাপ্ত দুইজন ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্যাম্প ইন চার্জ, স্থানীয় প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ যেমন জেলা প্রশাসক, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনের কমিশনার, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনের অতিরিক্ত কমিশনার, উখিয়া-টেকনাফ উপজেলার ইউএনও, গবেষণা এলাকার তিনটি ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান, ইউপি মেম্বর (পুরুষ ও মহিলা) জনপ্রতিনিধি, শরণার্থী ক্যাম্পের অফিস সহকারী, রোহিঙ্গা মাঝি (রোহিঙ্গা নেতা) এবং এনজিও কর্মকর্তাগণ রয়েছে।

ঙ) এফজিডি বা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন পরিচালনা-রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্য ও রোহিঙ্গা মাঝি বা নেতা; স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাধারণ ব্যক্তিবর্গ, এনজিও কর্মী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মসজিদের ইমাম, গৃহিনী, শ্রমিক ও কৃষিজীবী শ্রেণির উপস্থিতিতে এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে। এ সকল এফজিডি একজন মধ্যস্থতাকারীর সঞ্চালনায় পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণাটি শরণার্থীদের বসবাসের ফলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবন-যাত্রার ওপর প্রভাব নিরূপণে দ্বৈচয়নের মাধ্যমে বাছাই করা হয়েছে।

২.৯.১ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার পরিধি

ওপরের চার্টে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বলতে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে বুঝানো হয়েছে। দুই উপজেলার তিনটি ইউনিয়ন এবং ৮টি গ্রামে এ গবেষণা কার্যক্রমে Simple Random Sampling Technique কৌশলে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী রাজাপালং ইউনিয়নে মোট স্থানীয় জনসংখ্যার ৫৬,৮৯৫ জন এরমধ্যে নারী-পুরুষ যথাক্রমে পুরুষ ২৮,৬৬৩ ও নারী ২৮,২৩২ জন বসবাস করে (*বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো*, কক্সবাজার জেলা, অক্টোবর, ২০২০)। উখিয়া উপজেলার অধীনে অন্তর্ভুক্ত অপর ইউনিয়ন পালংখালি। সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ ইউনিয়নে ৫,৫৮৯টি পরিবার বসবাস করে এবং মোট স্থানীয় জনসংখ্যা ৩২,৮৪৩ জন। নারী পুরুষ যথাক্রমে পুরুষ ১৬,৫০৮ ও নারী ১৬,৩৩৫ জন বসবাস করে (*বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো*, কক্সবাজার জেলা, মে, ২০২০)। এছাড়া সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নে ৮২৭১টি পরিবারে মোট স্থানীয় জনসংখ্যা ৪৬,৮৯৬ জন যথাক্রমে পুরুষ ২৩,৩৬০ ও নারী ২৩,৫৩৬ জন বসবাস করে (*বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো*, কক্সবাজার জেলা, অক্টোবর, ২০২০)।

২.১০ গুণগত তথ্য সংগ্রহে নমুনায়ন

২.১০.১ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী

এ ক্ষেত্রে আলোচ্য গবেষণায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে গুণগত তথ্য সংগ্রহে নমুনায়ন (Qualitative Sample Size) করে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। দলিল-পত্র, পর্যবেক্ষণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়াও ৪টি ক্যাম্প থেকে ৪×৮=৩২টি নিবিড় সাক্ষাৎকার এবং ৮+৮=১৬ জন বিভিন্ন অফিসিয়াল দায়িত্বশীলগণের সাথে কে.আই.আই. এর মাধ্যমে সর্বমোট (৩২+১৬)=৪৮(আট চল্লিশ) জনের নিকট থেকে গুণগত গবেষণা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এরমধ্যে ৪টি ক্যাম্পের ৮ জন করে সাধারণ রোহিঙ্গা ৪×৮=৩২ জনের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার এবং শরণার্থী ক্যাম্পের ক্যাম্প-ইন-চার্জ (১+১)=২(দুই) জন, অফিস সহকারী (১+১)=২(দুই), মাঝি (রোহিঙ্গা নেতা) (৩+৩)=০৬(ছয়) জন ও (৩+৩)=৬(ছয়) জন এনজিও কর্মকর্তাসহ ১৬ জনের সাথে কে.আই.আই. করা হয়েছে।

সারণী-২.৪ঃ রোহিঙ্গা উত্তরদাতা জনগোষ্ঠী (গুণগত)

উখিয়া		টেকনাফ	
সাক্ষাৎকারের ধরণ	কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প ও কুতুপালং মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প	নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্প ও লেদা মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প	

	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	মোট
নিবিড় সাক্ষাৎকার	১০	০৬	১০	০৬	৩২ জন
(কে.আই.আই.) বা প্রধান তথ্য সরবরাহকারীর সাক্ষৎকার	০৬	০২	০৬	০২	১৬ জন
সর্বমোট পুরুষ ও নারী-					৪৮ জন

বিঃ দ্রষ্টব্যঃ এ গবেষণায় প্রধান তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ক্যাম্প-ইন-চার্জ, রোহিঙ্গা নেতা বা মাঝি ও আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিগণ রয়েছেন।

ওপরের চার্ট বা তালিকায় দু'টি শরণার্থী শিবির ও দু'টি মেকশিফ্‌ট শিবিরে অবস্থানরত পুরাতন ও নতুন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে নিবীড় সাক্ষাৎকার ও কে.আই.আই বা প্রধান তথ্য সরবরাহকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে উত্তরদাতা সদস্য পুরুষ ও নারী উভয় ছিল। যদিও মুসলিম প্রভাবাধীন রোহিঙ্গা সমাজের নারীরা সাক্ষাৎকার প্রদানের ক্ষেত্রে খুব বেশি আগ্রহী ছিল না।

২.১০.২. স্থানীয় সম্প্রদায়

উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের কুতুপালং গ্রাম ও পালংখালি ইউনিয়নের থাইংখালি, পালংখালি ও বালুখালি গ্রামে এবং টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের নয়াপাড়া, মুচুনী, জাদিমুরা ও লেদা গ্রাম থেকে Simple Random Sampling Technique কৌশলে এ গবেষণার গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানেও দলিল-পত্র, পর্যবেক্ষণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়াও দু'টি উপজেলা থেকে ২০×২=৪০টি নিবিড় সাক্ষাৎকার, ১০+১০=২০ জন বিভিন্ন অফিসিয়াল দায়িত্বশীলগণের সাথে কেআইআই এর মাধ্যমে সর্বমোট (৪০+২০)= ৬০ (ষাট) জনের নিকট থেকে গুণগত গবেষণা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এরমধ্যে ৮টি গ্রামের ৫ জন করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ৫×৮=৪০ জনের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার এবং ২(দুই) জন ইউএনও, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা কৃষি, সমাজসেবা ও বন কর্মকর্তা (৩+৩)=৬ (ছয়) জন, এনজিও কর্মকর্তা (৩+৩)=৬(ছয়) এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে চেয়ারম্যান-মেম্বর রয়েছেন (৩+৩)=৬(ছয়) জনসহ মোট ২০ জনের সাথে কে.আই.আই. করা হয়েছে। উখিয়া ও টেকনাফ দু'টি উপজেলায় তিনটি ইউনিয়নের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতা সদস্য পুরুষ-নারী এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

সারণী-২.৫ঃ স্থানীয় উত্তরদাতা জনগোষ্ঠী (গুণগত)

উখিয়া		টেকনাফ	
সাক্ষাৎকারের ধরণ	**কুতুপালং, বালুখালি, থাইংখালি ও পালংখালি গ্রাম**	**নয়াপাড়া, মুচুনী, লেদা ও জাদিমুরা গ্রাম**	

	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	মোট
নিবিড় সাক্ষাৎকার	১৪	০৬	১৪	০৬	৪০ জন
(কে.আই.আই.) বা প্রধান তথ্য সরবরাহকারীর সাক্ষৎকার	০৮	০২	০৮	০২	২০ জন
সর্বমোট পুরুষ ও নারী-					৬০ জন

বিঃ দ্রষ্টব্যঃ এ গবেষণায় প্রধান তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ডিসি, ইউএনও, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বর ও আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধি রয়েছেন।

ওপরের চার্ট বা তালিকায় উখিয়া ও টেকনাফ দু'টি উপজেলায় বসবাসরত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া তালিকায় উখিয়া ও টেকনাফ দু'টি উপজেলায় বসবাসরত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে (কে.আই.আই.) বা প্রধান তথ্য সরবরাহকারীর সাক্ষৎকার গ্রহণের মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে উত্তরদাতা সমসংখ্যক স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পুরুষ ও নারীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও উভয় উপজেলায় যথাক্রমে ২টি পুরুষ (২×২=৪টি) ও ১টি নারী সদস্যদের সাথে (২×১=২টি) এফজিডিসহ মোট ৬টি এবং ১টি নারী-পুরুষ সদস্যদের উপস্থিতিতে নিম্নের সর্বমোট ৭টি এফজিডি পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণী-২.৬ঃ উভয় জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতাদের সাথে দলীয় আলোচনা

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী		স্থানীয় জনগোষ্ঠী	
উখিয়া	টেকনাফ	উখিয়া	টেকনাফ
১.কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প (শিবির) ২.কুতুপালং মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প (শিবির)	১.নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্প (শিবির) কুতুপালং ২. লেদা মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প (শিবির)	১. কুতুপালং গ্রাম ২. বালুখালি গ্রাম ৩. থাইংখালি গ্রাম ও ৪. পালংখালি গ্রাম	১. নয়াপাড়া গ্রাম ২. মুচুনী গ্রাম ৩. লেদা গ্রাম ও ৪. জাদিমুরা গ্রাম
পুরুষ ০২ টি (প্রতিটিতে ৮ জন) ২×৮= ১৬ জন	পুরুষ ০২ টি (প্রতিটিতে ৮ জন) ২×৮= ১৬ জন	পুরুষ ০২ টি ও নারী ০১ টি (প্রতিটিতে ৮ জন) ৩×৮= ২৪ জন	পুরুষ ০২ টি ও নারী ০১ টি (প্রতিটিতে ৮ জন) ৩×৮= ২৪ জন
মোট ১৬ জন	মোট ১৬ জন	মোট ২৪ জন	মোট ২৪ জন
এছাড়াও পুরুষ-নারীর মিশ্র অংশ গ্রহণে ০১ টি এফজিডি বা দলীয় আলোচনা পরিচালনা করা হয়েছে-			পুরুষ-নারী মিশ্র ০১ টি (প্রতিটিতে ৮ জন) ১×৮= ০৮ জন

মোট	০৮ জন
দলীয় আলোচনায় সর্বমোট অংশগ্রহণকারী = ৮৮ জন	

উক্ত দু'টি উপজেলার চারটি ক্যাম্পের প্রত্যেকটি ক্যাম্পে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে ১টি (১×৪=৪টি) এফজিডি (প্রতিটিতে ৮জন করে উত্তরদাতা অংশগ্রহণ করেছেন) পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও উখিয়া ও টেকনাফ দু'টি উপজেলায় তিনটি ইউনিয়নের স্থানীয় পুরুষ উত্তরদাতা ও নারী উত্তরদাতার অংশগ্রহণ করেছিলেন। উখিয়া উপজেলায় যথাক্রমে ২টি পুরুষসহ ১টি নারী মোট ৩টি এফজিডি পরিচালনা এবং টেকনাফ উপজেলায় যথাক্রমে ২টি পুরুষসহ ১টি নারী মোট ৩টি এফজিডি পরিচালনাসহ সর্বমোট ৬টি পরিচালনা করা হয়েছে। তবে শুধু টেকনাফ উপজেলায় ১টি নারী-পুরুষের মিশ্র উপস্থিতিতে এফজিডিসহ সর্বমোট ৭টি এফজিডি (প্রতিটিতে ৮জন করে উত্তরদাতা অংশগ্রহণ করেছেন) পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উখিয়া-টেকনাফ উপজেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সর্বমোট ৫৬ জনের সাথে দলীয় আলোচনা পরিচালনার মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে পরিচালিত গবেষণা এলাকা চার্ট এর মাধ্যমে দেখানো হলো-

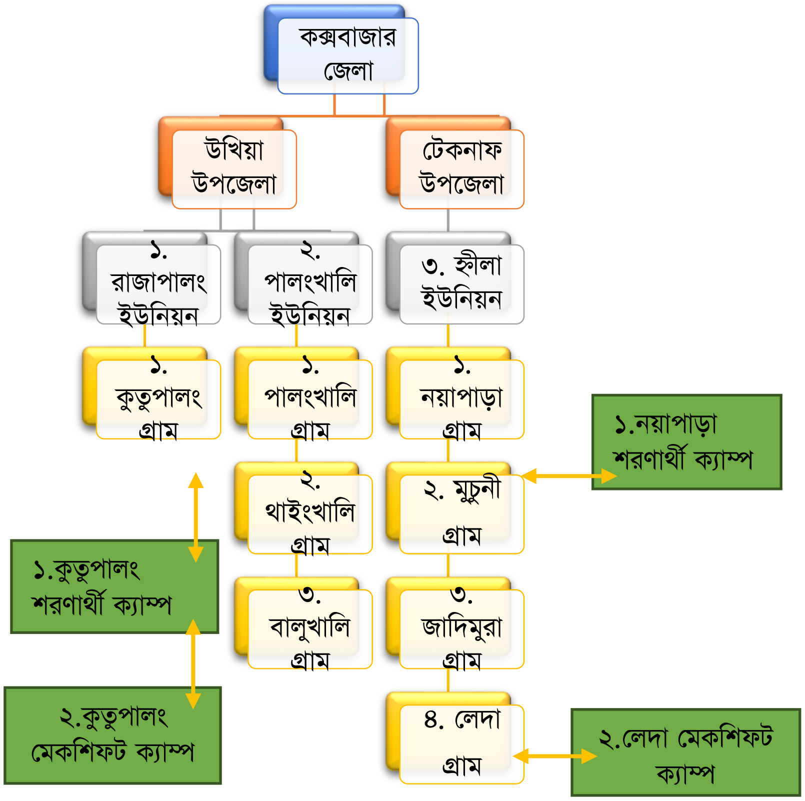

চিত্র-২.১০: গবেষণা তথ্য সংগ্রহের ক্যাম্প ও গ্রামসমূহ

ওপরের চার্ট বা তালিকায় দু'টি শরণার্থী শিবির ও দু'টি মেকশিফ্‌ট শিবিরে অবস্থানরত পুরাতন ও নতুন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে দলীয় আলোচনা পরিচালনার মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে, এখানে উত্তরদাতা পুরুষের উপস্থিতি বেশি ছিল। কারণ মুসলিম প্রভাবাধীন রোহিঙ্গা সমাজের নারীদের তুলনায় পুরুষগণ দলীয় আলোচনায় অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন। এছাড়াও দু'টি উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে দলীয় আলোচনা পরিচালনার মাধ্যমেও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উভয় জনগোষ্ঠী থেকে সর্বমোট ৮৮ জন উত্তরদাতার সাথে এ এফজিডি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

২.১১ তথ্য বাছাই প্রক্রিয়া

তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক পরিকল্পনায় গবেষণা এলাকা সম্পর্কে জানার জন্য 'শরণার্থী শিবির' পর্যবেক্ষণ করা হয়। এখানে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রয়োজন হবে। যথারীতি উক্ত মন্ত্রণালয়ে সচিব বরাবর আবেদন করে অনুমোদন গ্রহণ করে শরণার্থী ক্যাম্পে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা হয়। শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় বাংলাদেশীদের জন্য প্রনীত দু'টি প্রশ্নমালা জরিপের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও গবেষণা সহকারী মারফত বিতরণ এবং উত্তরমালা সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি ক্যাম্পে ১২০ টি প্রশ্নমালা বিতরণ করে এর মধ্যে পরিপূর্ণ তথ্য সম্বলিত ১০০টি উত্তরমালা ৪টি ক্যাম্প থেকে গ্রহণ করা হয়। এ ৪টি ক্যাম্প থেকে প্রাপ্ত উত্তরমালার মতামত গ্রহণ করে (SPSS) ২২ ভারর্সন এসপিএসএস সফটওয়্যার এর মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। একই ভাবে শরণার্থী শিবিরের আশপাশে ৮টি গ্রাম চিহ্নিত করে দৈবচয়ণ এর ভিত্তিতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে উক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক উত্তরদাতার মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। উখিয়া উপজেলায় ৪টি ও টেকনাফ উপজেলায় ৪টি মোট ৮টি গ্রামে ৪০০ জন নির্ধারিত সদস্যদের ওপর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শুরুতে প্রত্যেক গ্রামে প্রশ্নমালা প্রিটেষ্টিং বা পূর্ব-পরীক্ষা করা হয়েছে। উখিয়া উপজেলায় মোট ০৪ (চার) টি গ্রামে ২১০টি প্রশ্নমালা প্রদান করা হয়েছে এবং বাছাই করে সংগ্রহ করা হয়েছে ৫০×৪=২০০টি উত্তরমালা। একইভাবে টেকনাফ উপজেলায় মোট ০৪টি গ্রামে ২১০টি প্রশ্নমালা প্রদান করা হয়েছে এবং তথ্য বাছাই করে (Data Collection Procedure) ৫০×৪=২০০ টি উত্তরমালা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে দু'টি বিষয়ে যৌক্তিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ক. তথ্য সংগ্রহের জন্য তৈরীকৃত প্রশ্নমালার ভুলগুলো পরীক্ষা করা খ. গবেষণা তথ্য সংগ্রহকারীদের এ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট পূর্ব জ্ঞান অর্জনে সহায়তা প্রদান করানো। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা উখিয়া ও টেকনাফের ৩৩টি ক্যাম্পে হয়ে বসবাস করছে। এ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কারণে স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক প্রভাব এ গবেষণার প্রধান উপজীব্য বিষয়। তাই উভয়ের মতামত গ্রহণের নিমিত্তে প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে শরণার্থী ক্যাম্পে বসবাসরত শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা

হয়েছে। উল্লেখিত গবেষণায় বিষয় বিবেচনায় গবেষণার পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য বিন্যাস করা হয়েছে।

২.১২ তথ্য বিন্যাস

বিভিন্ন উৎস হতে উপাত্ত সংগ্রহের পর প্রয়োজনীয় তথ্য বিন্যাস (Information Set-up) ও পর্যালোচনা করে গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিমাণগত ও গুণগত দুইভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া ঐতিহাসিক যৌক্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়েছে।

২.১২.১ তথ্য বিশ্লেষণ কৌশল

এ গবেষণায় তথ্য সংগ্রহে পদ্ধতিগতভাবে তথ্য বিশ্লেষণ কৌশল (Information Analysis Technique) করা হয়েছে। গবেষণায় পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের আগে গবেষণা প্রশ্নে কোড ব্যবহার করা হয়েছে (Wellington, 2001)। এতে গুণগত প্রশ্নের উত্তরগুলো গুচ্ছ শ্রেণিভুক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অনেক বিষয়ে অডিও-রেকর্ড করার পর সে তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করে কয়েক বার পড়া এবং কোড প্রস্তুত করা হয়েছে (Weiss, 1994)। তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি ধাপে ধপে সংগঠিত করার জন্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে (Charmaz, 2006)। তথ্য বিশ্লেষণের শেষ অংশে মাঠ পর্যায়ের তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বর্ণনা, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার (Wolcott, 1994) ত্রিভুজীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর অর্থ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা হয়েছে। এ গবেষণার বেশিরভাগ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত করে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা ছিল। এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এ গবেষণায় কোথায় এবং কীভাবে তত্ত্বকে যুক্ত করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে গবেষণাটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের (Weiss, 1994) ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে মূলত একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের বিশ্লেষণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণকারীদের মতামত, পর্যবেক্ষণ এবং নথি বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে গবেষণা জুড়ে তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ এবং তত্ত্বগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে (Bryman, 2008, pp. 541-542)। গবেষণা প্রশ্নের তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্লেষণের প্রথম অংশ হল শরণার্থীদের কারণে সৃষ্ট সমস্যাগুলোর সাথে কীভাবে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করেছে এবং স্থানীয়রা কোন কোন কৌশল অবলম্বন করে ও কীভাবে জীবনে স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করে টিকে আছে। বিশ্লেষণের চূড়ান্ত অংশটি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির কারণে আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রভাব সম্পর্কে অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের এই সম্পর্কের মধ্যে যোগাযোগ, দ্বন্দ্ব, শ্রম বাজারে চাপ, কৃষি উৎপাদন, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়তি জনসংখ্যার চাপ, জীবন-যাত্রায় প্রভাব, প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস ও জ্বালানী সংকট এবং সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করছে এমন প্রধান উৎসগুলো আরো নির্দিষ্টভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে। দলিল ও প্রামাণিক বিশ্লেষণের (Documentary

Analysis) মাধ্যমে সংগ্রহকৃত এবং মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত গুণবাচক উপাত্ত (Qualitative data) বিশ্লেষণের জন্য ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতির (Historical Research approach) পাশাপাশি আরোহী যৌক্তিক প্রক্রিয়া (Inductive Reasnoning Process) প্রয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস হতে উপাত্ত সংগ্রহের পর তা প্রয়োজনীয় বিন্যাস, পর্যালোচনা করে গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গুণগতভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য অনুসারে তথ্য বিশ্লেষণ ও বিন্যাস করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত বিভিন্ন মাত্রার উপাত্তগুলোকে (Historical & Quantitative data) ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান পদ্ধতি যেমন, গণসংখ্যা নিবেশন (Frequency Distribution) এবং তুলনা করার জন্য (Crosstabe) এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে টেবিল, গ্রাফ, চার্ট অথবা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে এর ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাসবাস, জীবন-যাপন ও এর ফলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনে প্রভাবকে ফোকাস (দৃষ্টি প্রদান) করতে এখানে ত্রিভুজীকরণ পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ গবেষণায় কাজের কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা, অংশগ্রহণকারীদের মনোভাব, তথ্য সংগ্রহের অভিজ্ঞতা, মাঠকর্মের তথ্য, তথ্য সংগ্রহের সময়, সংখ্যা এবং তথ্য সংগ্রহের বিষয় সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

২.১২.২ তথ্যের ত্রিভুজীকরণ পদ্ধতি

ত্রিভুজীকরণ পদ্ধতিটি সাধারণত সাত প্রকারের হয়ে থাকে: ক) তথ্য ত্রিভুজীকরণ; খ) অনুসন্ধানের ত্রিভুজীকরণ; গ) সময়ের ত্রিভুজীকরণ; ঘ) স্থানের ত্রিভুজীকরণ; ঙ) তাত্ত্বিক ত্রিভুজীকরণ; চ) পদ্ধতিগত ত্রিভুজীকরণ এবং ছ) বিশ্লেষণ ত্রিভুজীকরণ (Heale & Forbes, 2013) প্রভৃতি। এ গবেষণায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ, নিবিড় সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা পরিচালনার দ্বারা তথ্যের যথার্থতা ও সত্যতা যাচাই এর মাধ্যমে তথ্য ত্রিভুজীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া ঐতিহাসিক, পরিমাণগত ও গুণগত এই তিন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে পদ্ধতিগত ত্রিভুজীকরণও ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত তথ্যের ত্রিভুজীকরণ বা ট্রায়াঙ্গুলেশন হলো একই গবেষণার লক্ষ স্থির রেখে গবেষণাকে আরও নির্ভরযোগ্য এবং নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করা (Burns & Grove, 2001)। এ গবেষণায় নথি বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নমালা জরিপ, বিভিন্ন ধরণের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ কৌশলগুলো তথ্য ত্রিভুজীকরণের মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপনে প্রভাব বিশ্লেষণে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহারের পাশাপাশি গবেষণার জন্য একাধিক উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য সঠিক বিশ্লেষণ ও সুনির্দিষ্ট ফলাফল পেতে সহায়তা করেছে।

২.১৩ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

"বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আর্থ-সামাজিক প্রভাব" শীর্ষক এ গবেষণাটি স্থানীয় পর্যায়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী পরিচালনার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও এই গবেষণায় কিছু সীমাবদ্ধতা (Limitation of Research) রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ-

* এ গবেষণাটি কক্সবাজার এলাকায় অবস্থিত ৩৩টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মধ্যে নির্দিষ্ট ৪টি শিবির থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক উত্তরদাতা পুরুষ-নারীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আরো অধিক সংখ্যক ক্যাম্প ও অধিক সংখ্যক উত্তরদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হলে গবেষণার ফলাফল হয়ত আরো নির্ভরযোগ্য হতে পারত।

* এ গবেষণাটি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমনের পরে স্থানীয়দের মধ্যে যে প্রভাবগুলো চিহ্নিত হয়েছে তা কক্সবাজার জেলার শুধু উখিয়া-টেকনাফ উপজেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যান্য উপজেলায় বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এ গবেষণায় অর্ন্তভুক্ত ছিল না।

* গবেষণায় উত্তরদাতারা ভিন্ন ভাষায় কথা বলেন; যা তথ্য সংগ্রহের পথে একটি বড় অন্তরায় ছিল। উত্তরদাতার ভাষা বুঝেন এমন স্থানীয় দোভাষি নিয়োজিত করে এ সমস্যা উত্তরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

* সময় সল্পতা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার ফলে নির্দিষ্ট সংখ্যক উত্তরদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বেশি পরিমাণে উত্তরদাতাগণের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে গবেষণার ফলাফল ভিন্ন রকমও হতে পারত।

* রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ধর্মীয় সংবেদনশীল তথা সমাজিক রক্ষণশীল প্রকৃতির হওয়ায় উত্তরদাতা নারী জনগোষ্ঠীর তুলনায় পুরুষ উত্তরদাতার সংখ্যা বেশি ছিল।

* উভয় সম্প্রদায় (শরণার্থী এবং স্থানীয়) প্রায়শই ধরে নিয়েছিল যে এটি জাতিসংঘ বা অন্যান্য মানবিক সংস্থার কোনো কাজ বা গবেষণা এবং এতে অংশগ্রহণ করলে কোনো সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। ফলে প্রায়শই তারা গবেষককে খুশি করার জন্য ইতিবাচক উত্তর প্রদানের চেষ্টা করেছে। এমন কিছু অবান্তর উত্তর তথ্য বাছাইকালে বাদ দিতে হয়েছে।

২.১৪ গবেষণার নৈতিক অনুমোদন

গবেষণার নৈতিক অনুমোদন (Ethical approval of Research) এর বিষয় বিবেচনা করে এটি সম্পন্ন করার জন্য এবং এর বিষয়বস্তু লেখার জন্য একটি বিস্তৃত গবেষণা কৌশল বজায় রাখা হয়েছে। প্রশ্নত্তোরে অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন তৈরিতে সতর্কতা বজায় রাখতে হয়েছে। বিশেষত, গবেষণায় অংশগ্রণকারীদের বাছাই করতে তাদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য দুর্বলতা বিবেচনা করা হয়েছে (BERA, 2004)। গবেষক ১৮ বছরের কম বয়সী উত্তরদাতাকে নির্বাচন করেন নি; কারণ তারা গবেষণায় সঠিক মতামত জানাতে সক্ষম নাও হতে পারেন। তাই এই গবেষণার জন্য বাছাইকৃতরা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন (Wiles at al., 2005)। গবেষণায় একটি গাইডলাইন অনুসারে অংশগ্রহণকারীদের গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য সামাজিক গবেষণায় প্রচলিত তথ্য সুরক্ষা অনুসরণ করা হয়েছে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পক্ষপাতিত্বকে বিবেচনা করা হয়নি। শরণার্থী ক্যাম্প ও এর পাশের গ্রাম এলাকায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর মধ্যে সম্পর্কটি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেজন্য এ গবেষণা পরিচালনার জন্য গবেষক এখানে কোনও পক্ষের সাথে জড়িত নয়; কারণ

তিনি না রোহিঙ্গা শরণার্থী না স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষ। তারপরও গবেষণার ক্ষেত্রে কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে গবেষণার অনুশ্রিত নৈতিক দিকটি স্পষ্ট করা হয়েছে; যা ছিল এ গবেষণাকর্মের নৈতিক ভিত্তি।

২.১৪.১ তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

এ গবেষণায় তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে-

- প্রশিক্ষণ: গবেষণা সহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শরণার্থী শিবিরে ০৫ জনকে সহকারী হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ এর পরে ০৩ জনের সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য একমাস সময় প্রদান করা হয়েছে এবং এরপর মক টেষ্ট সম্পন্ন করে তারা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন।
- বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে স্থানীয় সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ ও উত্তরদাতাদের নিকট থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহে গবেষণা প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করে একটি চেকলিষ্ট তৈরি করা হয়েছে।
- ভাষাগত জটিলতা: ভাষাগত জটিলতা এড়ানোর জন্য স্থানীয় গবেষণা সহকারীর সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্য স্থানীয় ও রোহিঙ্গা ভাষা বুঝেন এমন সহায়তাকারী গ্রহণ করা হয়েছে।
- সংগৃহিত তথ্য পর্যালোচনা: গবেষণা সহকারীদের মধ্যে একজন টিম লিডার ছিলেন। সে ভুল করা তথ্যকে শুদ্ধভাবে সংগ্রহ করতে সহায়তা করেছে। সে লিডার প্রয়োজনে সাথে থেকে সহযোগিতা করেছেন।
- যাচাই-বাছাই: তথ্য এন্ট্রির আগে তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশ্নপত্র আবার রিভিউ করা হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় তথ্য বাদ দেওয়া হয়েছে।
- যৌক্তিক পর্যালোচনা: এক্সেল সীটে তথ্য পূরণের পর যৌক্তিক পর্যালোচনার পর তথ্যসমূহ পরিষ্কার করা হয়েছে।
- তথ্য ম্যাপিং: গবেষণার উদ্দেশ্য অনুসারে তথ্য বিশ্লেষণের জন্য তথ্য ম্যাপিং করা হয়েছে। এরপর তথ্য এক্সেল সীট থেকে এসপিএসএসএ স্থানান্তর করা হয়েছে।
- এ গবেষণায় প্রশ্নমালা জরিপ এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের পূর্বেই গবেষণা সহকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে-কেন এ গবেষণা, এর উদ্দেশ্য কী এবং মতামত কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে।
- বিস্তারিত তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষণার উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
- গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করেছে। তথ্য প্রাপ্তির পর ভুলভ্রান্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। একই প্রশ্ন একাধিকবার করা হয়নি, প্রশ্নপত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ে করা, তথ্য সংগ্রহে সময়ের প্রতি লক্ষ রাখা এবং স্পর্শকাতর কোন প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা হয়েছে।

২.১৫ গবেষণার অনুমোদন

এ গবেষণাকর্মটি ১৬-০১-২০১৪ তারিখে স্মারক নং-রেজিঃ/শিক্ষা-১/৩৩০৮০-সি এর প্রেক্ষিতে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পিএইচ.ডি গবেষণার জন্য আনুমতি প্রাপ্ত; যার শিরোনাম 'বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রভাব'। পরবর্তীতে ২৮-০৮-২০১৯ তারিখে স্মারক নং-রেজিঃ/শিক্ষা-১/২৪৪৫১-সি এর প্রেক্ষিতে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে একই শিরোনামে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুনরেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়।

২.১৬ গবেষণার তথ্য সংগ্রহের অনুমোদন

গবেষণা কর্মের পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রণিত প্রশ্নমালা ও গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রণয়নকৃত চেকলিষ্ট গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। এছাড়া গবেষণায় ব্যবহৃত শরণার্থী ক্যাম্পে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এর নিকট থেকে মাঠপর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমতি গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণায় পর্যবেক্ষণের সময় সাধারণত আরো যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে তা হলো-

২.১৭ তথ্য সংরক্ষণের প্রক্রিয়া

তথ্য সংগ্রহের ধারাবাহিকতায় যে পন্থাগুলো অবলম্বন করা হয়েছে- ডায়েরি সংরক্ষণ ও তথ্য সংরক্ষণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গবেষণার তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নীতিশাস্ত্রের চারটি প্রধান ধারা রয়েছে যা এই গবেষণায় অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম; গবেষণার সময় বা পরে অংশগ্রহণকারীদের নৈতিকতা নিশ্চিতকরণের সাথে বিবেচিত। দ্বিতীয়; নৈতিক বিবেচনায় অংশ নিতে বিষয়ের ঐক্যমত্যের সাথে সম্পর্কিত গবেষণার উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতন হওয়া। তৃতীয় এবং চতুর্থ; নৈতিক দিক হচ্ছে গবেষণা সম্পর্কিত গোপনীয়তা (ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ ও রেকডিংকৃত সাক্ষাৎকার) এবং প্রতারণা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা (Bryman, 2008, pp. 123-124)। এ গবেষণায় তথ্য দাতাদের নাম গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং গবেষণায় কথা ও কাজ দ্বারা ভবিষ্যতের গবেষকদের অধ্যয়নের এলাকায় প্রবেশকে বিপন্ন না করার চেষ্টা করা হয়েছে (Bourois, 1992)। এছাড়া তথ্য দাতাদের আস্বস্ত করা যে, তথ্যের গোপনীয়তা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে এবং এটি শুধু গবেষণা কর্মে ব্যবহার করার জন্য সংরক্ষণ করা হবে।

২.১৮ উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির ফলে এ গবেষণায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাবগুলো পরীক্ষা করা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী এ পরিস্থিতিতে কিভাবে দৈনন্দিন জীবন যাপন পরিচালনা করছে তা পদ্ধতিগতভাবে গভীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া দলিল-পত্র বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রধান তথ্য সরবরাহকারীর থেকে তথ্য সংগ্রহ ও দলীয় আলোচনা পরিচালনার দ্বারা গুণগত এবং পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যার পদ্ধতিগত কার্যকরিতা প্রমাণিত হতে সহায়তা করেছে। এর মাধ্যমে আগত

জনগোষ্ঠীর কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি, স্বতন্ত্র অনুশীলন, প্রভাবসমূহ এবং স্থানীয়দের "জ্ঞানের ভাণ্ডার" থেকে জানতে চেষ্টা করা হয়েছে; যাতে গবেষণার সাথে সম্পর্কিত মানুষের অভিজ্ঞতাগুলো পূর্ণতা পেতে তথ্য-উপাত্ত সনাক্ত করতে পারে (Genzuk, 2003, p. 2)। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সংশ্লিষ্ট গবেষণা বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে; তার প্রেক্ষাপটে শরণার্থী উপস্থিতির ফলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক প্রভাবের ক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ
সংশ্লিষ্ট গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা

৩.১ ভূমিকা

গবেষণার এ পর্যায়ে সাহিত্য পর্যালোচনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; যা এ গবেষণার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়েছে। এ প্রসঙ্গে Creswell বলেন, সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষণার জন্য কাঠামোগত বিকাশের একটি শক্ত ভিত্তি হিসেবে সরবরাহ করে (Creswell, 2007)। সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষণামূলক পাঠ্য হিসেবে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শনের জন্য একটি পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনটি সমস্যার বিবরণে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের প্রতিবেদনগুলো সমর্থন করে। গবেষণার উদ্দেশ্য অনুসরণ করে সাহিত্যে সমস্যার বিবরণী এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারণার ভিত্তি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সাহিত্য পর্যালোচনার উদ্দেশ্যটি হলো কোনোও বিষয় গবেষণাযোগ্য কিনা তা নির্ধারণ, ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফলগুলোর প্রতিবেদন এবং পূর্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করা (Creswell, 2003)। গবেষণার বিষয় জুড়ে বিস্তৃত গবেষণা সমস্যা, উদ্দেশ্য এবং আলোচনার সাথে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে সাহিত্য পর্যালোচনা সুস্পষ্ট, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও পরিশীলিত হিসেবে ভূমিকা রাখে (Boote & Beile, 2005)। তাই সাহিত্য পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে এ গবেষণায় বৈশ্বিক শরণার্থী ইস্যু এবং বিভিন্ন অঞ্চলে শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাবসমূহ, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও বাংলাদেশে আগমন ও স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমস্যাসমূহের ওপর বেশকিছু গ্রন্থ, অভিসন্দর্ভ, প্রবন্ধ ও রিপোর্ট ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এখানে পৃথিবীব্যাপী শরণার্থী প্রভাবের ইস্যুটির সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে; যাতে শরণার্থী প্রভাব সম্পর্কিত লেখাগুলোর আলোচনা রয়েছে। এতে স্থানীয় সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবকে জোর দেয়া হয় (Levy & Ellis, 2006)। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে (কেনিয়া, সুদান, তুরস্ক, বুরুন্ডি, রুয়ান্ডা, উগান্ডা, পাকিস্তান এবং তানজানিয়ায়) অবস্থানরত শরণার্থীদের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরের অবস্থান পর্যালোচনা, জীবন-ধারণ প্রক্রিয়া, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে শরণার্থীদের সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় সম্প্রদায়ের বা ঐ দেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শরণার্থী বিষয়ে এবং শরণার্থী উপস্থিতির কারণে আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব সম্পর্কে বেশ কিছু গবেষকের সংশ্লিষ্ট গবেষণা বিদ্যমান রয়েছে। এসকল গবেষকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গবেষক হলেন-Chambers, R. (1986); Maystadt, J. F. and Verwimp, P. (2009); Whitaker, Beth Elise. (1999), (2003); Alix-Garcia, Jennifer and David Saah, (2010a); Taylor, E. J. et. al., (2016); Ruiz, I. and Vargas-Silva, C (2013); Jacobsen, K. (2002**);** Crisp, J. (2003); Martin, Adrian, (2005); Harrell-Bond, Barbara E. (1986); Mutongu, Zablon Bundi. (2017a); Black, R. and Sessay, M., (1998) & Mogire, Edward. (2011) প্রমূখ। উল্লিখিত বিষয়ে তথ্যসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক পুরাতন ও নতুন রোহিঙ্গা শরণার্থী

দীর্ঘদিন বাংলাদেশে বসবাস করার কারণে স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। বিভিন্ন সাহিত্য বিশ্লেষণ করে স্থানীয় পর্যায়ে এ প্রভাব সমূহের পর্যালোচনা করা হয়েছে। যা নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

৩.১.১ পর্যায়ক্রমিক সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ সাহিত্য পর্যালোচনার তিনটি ধাপ বা শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। নিম্নে উপর্যুক্ত তিনটি ধাপ বা শ্রেণি'র উপস্থাপন করা হলো-

৩.১.১.১ প্রথমত: শরণার্থী উপস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক চিত্র

বৈশ্বিক শরণার্থী প্রভাবের সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে; যেখানে বিশ্বব্যাপী স্থাপিত শরণার্থী শিবিরের কারণে স্থানীয় জনজীবনে প্রভাব সম্পর্কিত লেখাগুলোর আলোচনা করা হয়েছে। এতে ঐ সকল স্থানের স্থানীয় সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবকে তুলে ধরা হয়েছে। এ সম্পর্কিত স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য পৃথিবীর দেশে দেশে অবস্থানরত শরণার্থীদের কারণে স্থানীয় সম্প্রদায় বা আশ্রয়দানকারীদের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.১.১.২ দ্বিতীয়ত: রোহিঙ্গাদের ঐতিহাসিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

বার্মা'র (মিয়ানমারের) উপনিবেশ পূর্ব আমল, উপনিবেশিক আমল ও উপনিবেশ উত্তর আমলের তথা ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশদের থেকে বার্মার স্বাধীনতা লাভের পর (স্বাধীন বার্মার আরাকানীজ মুসলিম বা রোহিঙ্গা মুসলিম) ঐতিহাসিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়ে এদেশে আগমন সম্পর্কে লিখিত অভিসন্দর্ভ, বই ও প্রবন্ধসমূহ কয়েকটি ভাগে পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

৩.১.১.৩ তৃতীয়ত: বাংলাদেশে রোহিঙ্গা আগমন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গ

এছাড়াও মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে অবস্থান গ্রহণ ও জীবন-ধারণ প্রক্রিয়া, স্থানীয় আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠীর সাথে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সম্পর্ক এবং শরণার্থী উপস্থিতির কারণে ঐ অঞ্চলের স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের মতামত আলোচনা করা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের উপস্থিতির কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থানীয় পর্যায়ে (উখিয়া-টেকনাফ) শরণার্থী প্রভাব বিষয়গুলোতে লিখিত অভিসন্দর্ভ, প্রবন্ধসমূহ ও রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে প্রথম ধাপের বৈশ্বিক শরণার্থী পরিস্থিতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন শিবিরে উপস্থিতির ফলে সংশ্লিষ্ট গবেষণাসমূহে উল্লেখিত প্রভাবসমূহ আলোকপাত করা হলো-

প্রথম ধাপ

৩.১.১.১.১ বিশ্বব্যাপী শরণার্থী ইতিহাস

প্রাক খ্রিষ্টীয় যুগে (২২০০ খ্রীষ্টপূর্ব) হজরত ইব্রাহীম আ: এর নির্যাতনের ঘটনা এবং তাঁর জন্মস্থান ইরাকের ফুরাত নদীর এলাকা থেকে সিরিয়ায় হিজরতের ঘটনা শরণার্থী সমস্যার একটি স্বরূপ। শরণার্থী বা আশ্রয়প্রার্থী বিষয়টির ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল গ্রিসের বিখ্যাত লেখক ইউরিপিডিস বা সপোকিলিস এর লেখায়। খ্রিষ্টপূর্ব যুগের শুরুতে রোমান শাসকরা খ্রিষ্টানদেরকে তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে নির্যাতন করত। যার ফলশ্রুতিতে অনেক খ্রিষ্টান ধর্মবিশ্বাসী গোপন (মৃতদের সৎকারে ব্যবহৃত স্থান) স্থানে লুকিয়ে থাকত। হজরত মুহাম্মদ (সা.) কে ৬২২ সালে মক্কা থেকে মদিনাতে হিযরত করতে হয়েছিল প্রায় ৭০ জন অনুসারী নিয়ে এবং তাঁর জীবন ছিল সংকটাপন্ন (Ali, 1994)। মদিনার মানুষ হজরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিরাপত্তা দেবার নিশ্চয়তা দিয়েছিল। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে আসলে তাঁদের মুহাজির বলা হতো। অধিকন্তু তৎকালীন আরবের অন্যতম প্রথা ছিল যে, তাঁরা যে কোনো লোককে আশ্রয় প্রার্থী নিজগৃহে তিন দিন পর্যন্ত আশ্রয় প্রদান করত। মধ্যযুগে ইউরোপ এবং বিশ্বে অন্যান্য জায়গাতে ধর্মযুদ্ধ ও রাজনৈতিক উত্থান-পতন শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। ১৬ শতকে রাণী কুইন মেরী টিউডর (১৫৫৩-৫৮) এই সময়ে ক্যাথলিকদের পুনর্জাগরণে ৩ লক্ষ ইংরেজকে শরণার্থী হতে বাধ্য করেছিল। ১৮শ এবং ১৯ শতকের সময়কালে ইউরোপ থেকে অনেকে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী হয়। শরণার্থী হিসেবে 'জার' (বর্তমান জার্মানি) এই সকল গ্রুপকে যুদ্ধ, সামাজিক পরিবর্তন, ধ্বংসযজ্ঞ, নির্যাতন ও ভয়ভীতির মাধ্যমে মূল উৎপাটন করে। বিশ শতকের প্রাক্কালে শরণার্থীদের জাতিগতভাবে (এথনিক) বর্ণনা করা হয়েছে-রাশিয়ান; আমেরিকান; এ্যাসেরিয়ান-ক্যালেডিয়ান।

১৯১৮ সালে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের কারণে অনেকে তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করেছিল। ১৯২৩ সালে গ্রিস-তুরস্কের চুক্তির মাধ্যমে ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২০ সালে এক মিলিয়ন তুর্কি ও গ্রিক নাগরিককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়। ১৯১৯ সালে ১ম বিশ্ব যুদ্ধের পরে প্রতিষ্ঠিত লীগ অব নেশসনকে (জাতিপুঞ্জ) অসংখ্য শরণার্থী সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছিল। ১৯৩০ এর দশকে স্প্যানিশ গৃহ যুদ্ধের কারণে অসংখ্য নাগরিক ধ্বংস ও ১৯৩৬ সালে হাজার হাজার জার্মান নাগরিক বিশেষত ইহুদিরা হিটলারের নির্যাতনের ভয়ে জার্মান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৩৪ সাল থেকে জার্মানি'র ইহুদি নাগরিকরা ক্রমশ নাগরিক ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে; কুখ্যাত নুরেমবার্গ আইন (যা কিনা ১৯৫৩ সালের নাযি পার্টির কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয়েছিল) জার্মানি'র ইহুদিদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়। ১৯৩৮ সালে ৯-১০ নভেম্বর উত্তেজিত হিটলারের বাহিনী ইহুদিদের উপাসনালয়, বাড়িঘর ও অন্যান্য স্থাপনায় হামলা চালায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-৪৫ সাল পর্যন্ত) অসংখ্য মানুষকে শরণার্থীতে পরিণত করে তা স্থায়ীরূপ লাভ করে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৪২ সালে ইউরোপে কয়েক মিলিয়ন শরণার্থী ও উদ্বাস্তু

ছিল (Judith, 1993)। ভারতীয় উপমহাদেশে পরিবর্তীত রাজনৈতিক অবস্থার কারণে বহু লোকের শরণার্থী হতে হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ব্রিটিশ ভারতের বিভক্তির সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে প্রাণের ভয়ে হাজার হাজার হিন্দু ও মুসলিম তাদের বাড়ি ঘর ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ভারত ও (পূর্ব-পশ্চিম) পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়। হিন্দুরা মূলত আশ্রয় নিয়েছিল ভারতে, আর মুসলিমদের গন্তব্যস্থল ছিল পাকিস্তান। ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পর ঢালাওভাবে শরণার্থীদের এ স্রোত ছিল। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমারা ফিলিস্তিনের ভূমি জবর দখল করে ইসরাইল নামক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। তখনও হাজার হাজার ফিলিস্তিন নাগরিক ঘরবাড়ি ত্যাগ করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এক সমীক্ষা অনুযায়ী বিশ শতকের শেষ দশকে ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ৩.৫ মিলিয়ন (The Daily Australian, 1999)। এক লেবাননেই সাড়ে ৬ লাখ ফিলিস্তিনিশরণার্থীর নিবন্ধন করেছে। শুধু ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত শরণার্থীদের সহযোগিতার জন্য জাতিসংঘ সতন্ত্র একটি সংস্থা তৈরি হয়; যার নাম (জাতিসংঘ রিলিফ এ্যাণ্ড ওয়ার্ক এজেন্সি) সংক্ষেপে ইউএনআরডব্লিউএ নামে পরিচিত। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের সময় বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের সহযোগিতা প্রদানের জন্য এটি গঠিত হয়। প্রায় ৩০ লাখ ফিলিস্তিনি এ সংস্থার নথিভুক্ত হয়; যাঁরা জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া, গাজা শহর ও পশ্চিম তীরে অবস্থান করছে (আবরার, ২০০৩)।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে অসংখ্য শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গের ৯৮,৯৯,৩০৫ জন শরণার্থী ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছিল (আসাদ, ২০০৯)। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে শরণার্থী ফেরত আসা শুরু করে এবং অসংখ্য শরণার্থী পরিবার প্রথমত নিজ উদ্যোগে বাংলাদেশে ফিরে আসে। অল্প দিনের মধ্যে শরণার্থীদের ফেরত আনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানোর কারণে জীবন বাঁচাতে দেশত্যাগের পর ২৫ মার্চ ১৯৭২ সালে সর্বশেষ ব্যাচে ৩,৮৬৯ জন শরণার্থী ভারতের ক্যাম্প থেকে পুরোপুরি এক বছর পর প্রায় সকলেই ফিরে আসে। শরণার্থীদের ফেরত আসার পর ভারত সকল কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের ক্যাম্প বন্ধ করে দেয়া হয়। বলা হয়েছিল কেবল আত্মীয়দের সঙ্গে থাকা ৬০,০০০ শরণার্থী নিজেদের উদ্যোগে দেশে ফেরত আসবে। নিম্নে বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী হিসেবে ভারতে রাজ্যভিত্তিক আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকা সংযুক্ত করা হলো-

সারণী-৩.১ঃ শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশিদের ভারতে রাজ্যভিত্তিক আশ্রয়

রাজ্যের নাম	শরণার্থী শিবির সংখ্যা	সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত শিবিরে অবস্থান	তালিকাবদ্ধ শরণার্থী শিবিরের বাইরে অবস্থান	রাজ্য অনুযায়ী মোট শরণার্থী
পশ্চিম বাংলা	৪৯২ টি	৪৮,৪৯,৭৮৬	২৩,৮৬,১৩০	৭২,৩৫,৯১৬
ত্রিপুরা	২৭৬ টি	৮,৩৪,০৯৮	৫,৪৭,৫৫১	১৩,৮১,৬৪৯

মেঘালয়	১৭ টি	৫,৯১,৫২০	৭৬,৪৬৬	৬,৬৭,৯৮৬
আসাম	২৮ টি	২,৫৫,৬৪২	৯১,৯১,৩	৩,৪৭,৫৫৫
বিহার	৮ টি	৩৬,৭৩২		৩৬,৭৩২
মধ্য প্রদেশ	৩ টি	২,১৯,২৯৮		২,১৯,২৯৮
উত্তর প্রদেশ	১ টি	১০,১৬৯		১০,১৬৯
মোট	৮২৫ টি	৬৭,৯৭,২৪৫	৩১,০২,০৬০	৯৮,৯৯,৩০৫

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী শিবির, ২০০৯

লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের আশ্রয়ের প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের রাজ্যপাল শান্তি ধাওয়ান এক ভাষণে বলেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতের মাটিতে অবস্থানরত শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নীতি বলে বিবেচিত হবে। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী জীবন বাচাঁতে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, কাজেই পাকিস্তানী শাসকদের বুলেটের মাথায় তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে না। এদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান সভায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও গণহত্যা বন্ধের জন্য একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয় (আসাদ, ২০০৯)। সাধারণত কোনো দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের শিকার হয়। কখনো কখনো লক্ষ করা যায় যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বৈষম্য ও নানাবিধ অপব্যবহারের শিকার হয়। যদিও এ সমস্ত দেশের সংবিধান ও অন্যান্য আইন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি কোনো ধরনের বৈষম্যকে অনুমোদন দেয় না, তা সত্ত্বেও অনেক সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে আইন প্রয়োগ করে না। ফলশ্রুতিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অনেক সময় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে; যা কিনা মাঝেমধ্যে তাদেরকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

৩.১.১.১.২ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত শরণার্থী

২০১১ সালে সিরিয়ার সংঘাত শুরুর পর থেকে ৩.৩১ মিলিয়ন মানুষ নিজ দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। ২০১৩ সালের সংখ্যার বিচারে পাকিস্তানের পরের স্থানে উগান্ডায় শরণার্থী উপস্থিতি ছিল ১.4 মিলিয়ন। ২০১৭ এর শেষে বিশ্বের মোট শরণার্থী জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ। সমস্ত শরণার্থীর দুই তৃতীয়াংশ-৬৮% ছিল মাত্র পাঁচটি দেশ থেকে আসা শরণার্থী। এর মধ্যেসিরিয়া, আফগানিস্তান, দক্ষিণ সুদান, মিয়ানমার এবং সোমালিয়া প্রভৃতি ছিল। জাতিসংঘের হিসাব অনুসারে ওই বছর নতুন বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ছিল ১.২২ মিলিয়ন। এই অন্তর্ভুক্ত ১১.৮ মিলিয়ন মানুষ যারা নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে তবে তারা তাদের নিজের দেশে রয়ে গেছে। ২০20 সাল পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সংখ্যক শরণার্থী পাঁচটি দেশ থেকে এসেছে। এর মধ্যেরয়েছে সিরিয়া, ভেনিজুয়েলা, আফগানিস্তান, দক্ষিণ সুদান এবং মিয়ানমার।

Ranking of the major source countries of refugees at the end of 2017

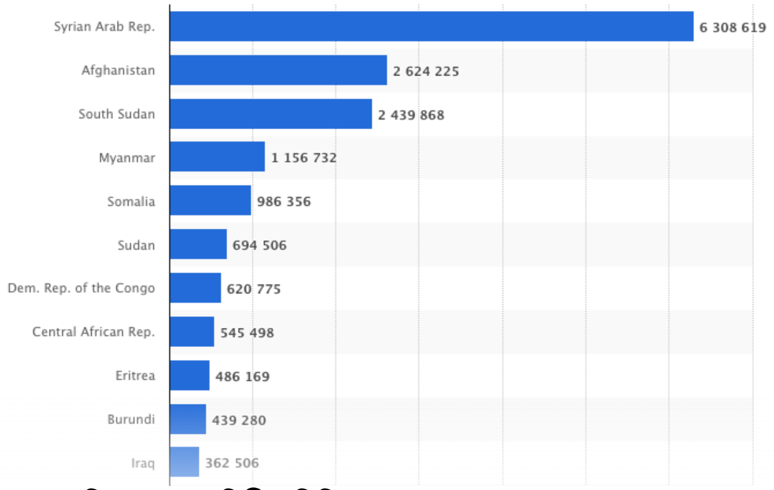

চিত্র-৩.১ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা

ওপরের চিত্রে ২০১৭ সালে পৃথিবী'র বিভিন্ন দেশ থেকে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে সিরিয়ার শরণার্থী রয়েছে সর্বোচ্চ সংখ্যক। এরপর আফগানিস্তান, দক্ষিণ সুদান ও মিয়ানমারের অবস্থান রয়েছে। এর মধ্যে চতুর্থ অবস্থানে থাকা মিয়ানমারের অধিকাংশ শরণার্থী'র বাংলাদেশে অবস্থান রয়েছে। এ আশ্রয়দানকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আজ এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি।

৩.২ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শরণার্থীদের অবস্থান

২০০৯ সালের বিশ্ব ব্যাংকের এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকা বা সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় (৭৫.১৯%) শরণার্থীরা বসবাস করে (World Bank Development Report, 2011)। শর্ত অনুযায়ী শরণার্থীরা আশ্রয়দানকারী দেশসমূহে শরণার্থী হিসেবে সর্বনিম্ন সংখ্যা ১ লাখ। আশ্রয়দানকারী দেশসমূহের সাথে নিজ দেশের মধ্যে সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করে (তবে তুর্কি ও সার্ব জনগোষ্ঠী জার্মানিতে এবং ফিলিস্তিনীরা সিরিয়া, লেবাননে বসবাস করে)। অধিকন্তু কিছু আশ্রয়দানকারী দেশ শরণার্থীদের জন্য অতিরিক্ত কিছু চাহিদা পুরণ করে যেখানে ঐদেশগুলোতে অভ্যন্তরীণ জাতিগত সমস্যা বিদ্যমান (পাকিস্তান, চাঁদ, ইয়েমেন, সুদান, থাইল্যাণ্ড এবং ভারত) (World Bank Development Report, 2011) মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর অফিকা অঞ্চলের দেশগুলোতে শরণার্থী প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়া এবং সাব সাহারা আফিকান অঞ্চলে উল্লেখযোগ্যভাবে শরণার্থী প্রবণতা লক্ষণীয় (UNRWA)। কয়েক দশক ধরে অধিকাংশ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির কারণ অভ্যন্তরীণ সংঘাতের চেয়ে আন্তর্জাতিক সংঘাত বেশি। ইউএনএইচসিআর এর মতে, শরণার্থী বাস্তুচ্যুত এই সংখ্যা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাড়ছে (UNHCR)।

চিত্র-৩.২ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি

ওপরের চিত্রে পৃথিবীব্যাপী আশ্রয়দানকারী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দশটি রাষ্ট্রে অবস্থানরত শরণার্থীদের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ আশ্রয়দানকারী দেশ হিসেবে একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থানে রয়েছে।

৩.২.১ আফ্রিকা অঞ্চলে শরণার্থীর অবস্থান:

স্নায়ুযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে একই রাষ্ট্রের মধ্যে জাতিগত সংঘাত বাড়তে থাকে। বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশে একই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রদায়গত, পরিচয়গত এবং সম্পদ নিয়ে লড়াই বাড়তে থাকে (Harris & Reilly, 2003)। আফ্রিকায় শরণার্থী বা বাস্তুচ্যুত হওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ বিদ্যমান রয়েছে। যার মধ্যে প্রধান কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই, অভাব, অপশাসন; দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম, একে অপরের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই প্রভৃতি যে শুধু দারিদ্র্য তৈরি করে তা নয় বরং উল্লেখযোগ্য মানুষকে শরণার্থীও করেছে (Ogata, 1996)। সাধারণত এর প্রত্যক্ষ কারণগুলো প্রায়শই রাজনৈতিক উত্তেজনা বা রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই উস্কে দেওয়া সামরিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা যায় (Tandon, 1999)। আফ্রিকান শরণার্থীরা জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তন, বৈষম্য, স্বেচ্ছাচারীভাবে গ্রেপ্তার, আটক, চলাচল ও মতপ্রকাশের সীমিত স্বাধীনতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনের শিকার এবং নানা ধরণের বঞ্চনার শিকার হয়ে অবিরাম মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়। ১৯৬৯ সালে অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিয়ন বা ওএইউ কনভেনশন আফ্রিকার শরণার্থী সমস্যার নির্দিষ্ট দিকগুলো পরিচালনা করে। শরণার্থীদের একটি বিস্তৃত ধারণা প্রবর্তনের পাশাপাশি কনভেনশনটি মূলত

শরণার্থী সুরক্ষা মানকে শক্তিশালী করেছে। এর মধ্যে প্রত্যাবর্তন এবং স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের নীতিগুলো ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত রয়েছে।

আফ্রিকায় বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের মোট সংখ্যা ১২.৭ মিলিয়নেরও বেশি এবং দুই মিলিয়নেরও বেশি প্রত্যাবর্তনকারী রয়েছে। যারা তাদের মূল দেশে পুনরায় একত্রিত হয়নি এবং এখনও আন্তর্জাতিক সুরক্ষা সহায়তা পাচ্ছেন (UNHCR, 2012)। ১৯৬৯ সালে আঞ্চলিক শরণার্থী সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ নতুনভাবে সমর্থিত ও OAU কনভেনশন দ্বারা আফ্রিকার শরণার্থী সমস্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল (OAU কনভেনশন, ১৯৬৯)। ওএইউ কনভেনশন শরণার্থীদের সংজ্ঞায়িত করে সাধারণীকৃত সংঘাত ও সহিংসতা এবং শরণার্থী স্বীকৃতি হিসেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি বাহ্যিক আগ্রাসন, পেশা, বিদেশী আধিপত্য বা ঘটনার কারণে সমস্যায় পড়েছেন। তার নিজ বা আদি দেশ এবং জাতীয়তার কারণে ক্রমবর্ধমানভাবে মূল দেশ বা জাতীয়তার বাইরে অন্য জায়গায় আশ্রয় চাইতে ও আবাসিক স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয় ধারা-১ (২)। আফ্রিকার শরণার্থীদের কমিশন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে- আফ্রিকা পুরোপুরি উপলব্ধি করে যে শরণার্থী সমস্যার মূল কারণ আফ্রিকার মধ্যেই অবস্থিত এবং এই কারণগুলো সম্পূর্ণ নির্মূল করার প্রাথমিক দায়িত্ব আফ্রিকানদেরই। দক্ষিণ আফ্রিকার শরণার্থী, প্রত্যাবাসনকারী এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির দুর্দশার ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যা আফ্রিকার শরণার্থীদের সহায়তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন ICARA-I এবং II, (SARRED) নামে পরিচিত।

সেই সাথে জাতিসংঘের সকলেই প্রত্যাবাসন ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং আফ্রিকান শরণার্থী সংকট ব্যাপকভাবে আফ্রিকার রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের ২৬-তম শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনা হয়। যা আফ্রিকার রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ঘোষণাপত্র এবং বিশ্বে সংঘটিত মৌলিক পরিবর্তনের জন্য প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৭০ এবং ১৯৯০ এর দশকে রাজনৈতিক পরিবর্তনে জরুরি সহিংস ঘটনা এবং অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণের অনিচ্ছা বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুরক্ষার জন্য দায়ী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষ সুরক্ষা ছাড়াই বাস্তুচ্যুত হয়। ১৯৫১ সালে শরণার্থীদের আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রদান এবং স্থায়ীভাবে আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থা (IRO, ১৯৪৭-১৯৫০) এর উত্তরাধিকারী হিসেবে সরকারকে সহায়তার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (Feller, 2011, p. 131)। সমান্তরালভাবে ১৯৬৭ সালের প্রোটোকল যা ১৯৫১ সালের কনভেনশনের সংজ্ঞা এবং ভৌগোলিক পরিধির বাইরে থাকা শরণার্থী গোষ্ঠীগুলোকে সুরক্ষা এবং সহায়তা করার জন্য ইউএনএইচসিআর-এর ম্যান্ডেটকে বিস্তৃত করেছে। সুতরাং এ অর্থে কনভেনশনের সংকীর্ণ ভৌগোলিক এবং সাময়িক শর্তগুলো ১৯৬৭ সালের প্রোটোকলের সাথে আংশিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছিল। ১৯৭০ এর দশকে এই আন্তর্জাতিক শরণার্থী ব্যবস্থাও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে গৃহীত হয়েছে। এটি বিশেষ রাষ্ট্রের ব্যাখ্যার সংমিশ্রণের মাধ্যমে আফ্রিকা, ইউরোপ এবং ল্যাটিন-এর সম্পূরক আঞ্চলিক চুক্তির মাধ্যমে

হয়েছে। যদিও কনভেনশনে সব দেশ বিশেষ করে এশিয়ার দেশসমূহ স্বাক্ষর করেনি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আরও উল্লেখযোগ্য সুরক্ষা প্রদান করেছে। এই অবস্থার অধীনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়; যাতে জরুরি প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা যায়। ইউএনএইচসিআর এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারপর থেকে এই পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দেশের অভ্যন্তরে শিবিরের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রতিবেশী দেশগুলির দ্বারা সীমান্ত বন্ধ করা (Loescher et al., 2003)।

৩.২.২ ইউরোপে শরণার্থীর অবস্থান

শীতল যুদ্ধের অবসানের পর ইউরোপে শরণার্থীদের অভ্যর্থনার নীতি-আদর্শের উপযোগিতা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংক্ষেপে ইইউ এর সদস্য দেশগুলোতে আশঙ্কাজনকভাবে শরণার্থী বৃদ্ধি পায়। এক সময়ে তাদের উদার নীতির কারণে ইউরোপীয় দেশগুলো শরণার্থীদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এর ফলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো শরণার্থী এবং আশ্রয়প্রার্থীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তাদের চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং ইউরোপীয় দেশ বিনির্মাণের বিধিনিষেধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে (Petracou, 2004)। এই নীতির লক্ষ ছিল: ইউরোপীয় অঞ্চলে প্রবেশাধিকারকে সীমাবদ্ধ করা; ইইউতে অবস্থান হ্রাস (আটক, নির্বাসন, সামাজিক সুবিধার সীমাবদ্ধতা, অস্থায়ী সুরক্ষা); আশ্রয়ণ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেয়া। ব্যক্তির নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিতকরণ ও মানুষ হিসেবে অধিকার পাওয়ার ধারণাটি জেনেভা কনভেনশনের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। মানবিক সংকটের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং জনগোষ্ঠীর জন্য সহিংসতা, জবরদস্তি, বঞ্চনা ও অপব্যবহারের জন্য ইউরোপীয় কমিশন দ্বারা সংজ্ঞায়িত মানবিক সুরক্ষার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এটি মানবিকতার নীতি ও আন্তর্জাতিক আইনের কাঠামোর মধ্যে এবং বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং শরণার্থী আইনের কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (European Commission, 2016)।

শরণার্থী সুরক্ষার ধারণা বলতে সাধারণত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহায়তাকে বোঝায়। এর ব্যাপক ব্যবহারে সুরক্ষা উন্মুক্ত থাকে এবং শরণার্থী সংক্রান্ত নীতিমালা ভিত্তিক হয় (Puggioni, 2016)। ইউএনএইচসিআর-এর সংবিধান নাগরিকের নিজ দেশে সুরক্ষার অভাবের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা হিসেবে ব্যবহৃত হয় (UNHCR, 2001: p. ৩০)। আন্তর্জাতিক সুরক্ষায় এমন পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে মূল দেশটি সুরক্ষা প্রদান করতে পারে না এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কূটনৈতিক সুরক্ষা বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রদান করে শূন্যস্থান পূরণ করতে আন্তর্জাতিক জনগোষ্ঠীর দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিশ্বব্যাপী এর কাঠামোগত স্পষ্ট নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত শরণার্থীদের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত কনভেনশন (১৯৫১) এবং এর প্রোটোকলসহ (১৯৬৭) শরণার্থীদের ১৯৫১ সালের কনভেনশনটি এখনও একমাত্র সার্বজনীন

শরণার্থী সুরক্ষা আইন হিসেবে পরিচিত (Betts and Milner, 2019, p. 131)। হেল্টন যুক্তি দিয়েছিলেন যে ১৯৯০ এর দশক থেকে নিয়ন্ত্রণের একটি নতুন কৌশল উদ্ভূত হচ্ছে, তা হলো অভিবাসন নিয়ন্ত্রণকে জয় করা; কিন্তু আদর্শকে নয় (Helton, 2001, p. 10)। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র একটি সাধারণ ভিত্তি প্রদান করেছে যাতে ১৪ নং অনুচ্ছেদে আশ্রয়ের অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া হয়েছে। তাই প্রত্যেকেরই অন্য দেশে আশ্রয় চাওয়ার অধিকার রয়েছে। ব্যক্তির সুরক্ষা যেমন জীবনের অধিকার, আইনের সমতা, বাকস্বাধীনতা, সুষ্ঠু বিচারের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। ইউএনএইচসিআর-এর প্রধান দুটি লক্ষহলো শরণার্থীদের আন্তর্জাতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং শরণার্থীদের জন্য স্থায়ী সমাধান খুঁজে পেতে আশ্রয়দানকারী সরকারের সাথে সহযোগিতা করা (Helton, 2001, p. 2)। ইইউ এর কাঠামোর সাথে পরামর্শ করে দু'টি বিষয় প্রথমত, তথাকথিত 'ইউরোপীয় শরণার্থী সংকট' অনুসরণ করে সাধারণ ইউরোপীয় আশ্রয় ব্যবস্থা (সিইএএস); শরণার্থী সুরক্ষা সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি জাতীয় বিধি বাস্তবায়ন এবং প্রবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, ইইউ এর আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কাঠামোতে শরণার্থী সুরক্ষা অ-ইউরোপীয় আইন, নীতিমালা, সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে আশ্রয় ও শরণার্থী সুরক্ষা সংজ্ঞা, ধারণা এবং সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়ন ও অনুশীলন করে। নীতিগত ব্যবস্থাসহ অ-ইইউ দেশগুলির জন্য বিশেষ করে লেবানন এবং ইরাকের জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় কাঠামোর ওপর দৃষ্টি ছিল।

ইউপীয়ান ইউনিয়ন কাঠামোর মধ্যে সুরক্ষা শব্দ দ্বারা প্রদত্ত সংজ্ঞার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ২০১১ সালের বর্তমান যোগ্যতা নির্দেশিকা যা তৃতীয় দেশের নাগরিকদের যোগ্যতা ও স্থিতির জন্য ন্যূনতম মানদণ্ডের ওপর ২৯ এপ্রিল ২০০৪ এর কাউন্সিল ২০০৪/৮৩/ সংশোধন করেছে। রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিরা শরণার্থী হিসেবে এমন ব্যক্তি যাদের আন্তর্জাতিক সুরক্ষার প্রয়োজন নির্দেশ করে। এ নির্দেশিকার জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ করে শরণার্থী সুরক্ষার জন্য আবেদনকারীদের যোগ্যতা এবং এই অবস্থার সুবিধাভোগীদের জন্য প্রদত্ত অধিকারসমূহ সুরক্ষার বিধান, পুনর্বাসন, আবাসিক অনুমতি এবং ভ্রমণ নথির বিষয়ে সংজ্ঞায়িত করে। যদিও কর্মসংস্থান, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, শিশুদের এবং দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট বিধান আইনগত উপকরণে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে এই তুলনামূলক শরণার্থী সুরক্ষার বিষয়ে অন্য সব দিক বাদ দিয়ে আরও বেশি সুনির্দিষ্ট অর্থে প্রতিক্রিয়া জানায়। যোগ্যতা নির্দেশিকা ছাড়াও আশ্রয় প্রক্রিয়া নির্দেশিকায় দেশের প্রতিবেদনের প্রধান রেফারেন্স হিসাবে নেওয়া হয়। এটি নিপীড়ন বা গুরুতর ক্ষতি থেকে পালিয়ে আসা লোকদের আন্তর্জাতিক সুরক্ষার জন্য আবেদন করার অনুমতি দেয়। অস্থায়ী সুরক্ষা সম্পর্কিত কাউন্সিলের নির্দেশনাও বিবেচনা করে নাগরিকদের বিভিন্ন সদস্যদের সমান শর্ত এবং চিকিৎসার গ্যারান্টি দেয়। সুতরাং আশ্রয়ের ক্ষেত্রে তাদের একটি প্রতিকারকারী প্রভাব রয়েছে এবং লঙ্ঘনের প্রতিকার নিশ্চিত করার লক্ষথাকে। ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল অবস্থার অধীনে নিযুক্ত

হওয়ার অধিকার, খাদ্য, বাসস্থান এবং স্বাস্থ্যসেবার অধিকার, সেই সাথে সামাজিক নিরাপত্তার বিধানও রয়েছে। ১৯৬০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখে। যা শরণার্থীদের প্রতি একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে। এটি মানুষের জন্য আত্মীকরণের বাইরে একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বা সুরক্ষা ব্যবস্থার চিন্তা করার জন্য একটি নতুন ক্ষেত্র খুলেছে। ১৯৭০ এবং ৮০ এর দশক-গণতন্ত্রের আরও মৌলিক রূপের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অধিকার প্রবর্তন করেছে প্রধানত: লিঙ্গ সমতা ও পরিবেশগত অধিকার। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত আশ্রয়প্রার্থী এবং শরণার্থীদের আশ্রয়ের জন্য আবেদন করার মুহূর্ত থেকে আন্তর্জাতিক সুরক্ষার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এর মধ্যে সব ধরণের সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে-আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক, শরণার্থী সুরক্ষা, সাময়িক সুরক্ষা এবং জাতীয় সুরক্ষা। এছাড়া ডাবলিন রেগুলেশনের লক্ষ হল শরণার্থীদের এক রাষ্ট্র ও অন্য রাষ্ট্রের মধ্যে চলাফেরা কমানোর জন্য উপযুক্ত রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনোও নিশ্চিয়তা ছাড়াই তাদের আশ্রয় আবেদন পরীক্ষা করা হয় (Favilli, 2018)। ডাবলিন রেগুলেশন তৃতীয় হিসেবে পরিচিত উদাহরণস্বরূপ (ইইউ) নং ৬০৪/২০১৩ এর মাধ্যমে দায়ী সদস্য রাষ্ট্র নির্ধারণের মানদণ্ড এবং পদ্ধতিগুলি আজও কার্যকর রয়েছে। পর্যায়ক্রমিক পুনর্বিবেচনা সত্ত্বেও ডাবলিন নিয়ন্ত্রণের প্রধান নিয়ম তৃতীয় তাৎপর্যপূর্ণভাবে অপরিবর্তিত রয়েছে। আর সুরক্ষার জন্য আবেদনগুলো যাচাই করার জন্য কমপক্ষে রাষ্ট্র যে তাঁর পক্ষে রয়েছে তা নিশ্চিত করা। মূল লক্ষযদি তা না দূর করা হয় তবে আন্তর্জাতিক সুরক্ষার জন্য আবেদনকারীদের সেই আবেদন বেছে নেওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করা হয়েছে (Favilli, 2018)।

সুতরাং, ডাবলিন বিধিবিধান কেবল আন্তর্জাতিক সুরক্ষার আবেদন পরীক্ষা করার জন্য উপযুক্ত সদস্য রাষ্ট্রকেই নির্ধারণ করে না বরং সেই রাষ্ট্রটিও যেখানে সেই ব্যক্তিকে দীর্ঘকাল ধরে থাকার জন্য বোঝায়। ৪ মে, ২০১৬ তারিখে ইসি দ্বারা উপস্থাপিত ডাবলিন রেগুলেশন ১৫ এর প্রস্তাবিত সংস্কার, "আশ্রয়ের প্রথম দেশ" থেকে আগত ব্যক্তিদের ফিল্টার করার দায়িত্ব বহিরাগত সীমান্তে অবস্থিত সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে অর্পণ করেছে। একটি "নিরাপদ তৃতীয় দেশ" বা একটি "নিরাপদ উৎস দেশ" এবং দায়িত্ব বরাদ্দ প্রক্রিয়ার আগে তাদের সুরক্ষা ঝুঁকি মূল্যায়ন করে। ইউরোপীয় আশ্রয় ব্যবস্থা (সিইএএস) ইইউ দ্বারা ১৯৯৯ সালে একটি সাধারণ আশ্রয় নীতি কাঠামো হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। এটি সম্মত নিয়মের একটি কাঠামো গঠন করে যা আন্তর্জাতিক সুরক্ষার জন্য সাধারণ পদ্ধতি স্থাপন করে। এর উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক সুরক্ষার জন্য আবেদনকারীদের সুষ্ঠু ও মানবিক আচরণ নিশ্চিত করা। ইইউতে আশ্রয় মেলানো এবং বাধ্যতামূলক আইনটির ভিত্তিতে সদস্য দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করা, পাশাপাশি জাতীয় আশ্রয় প্রশাসন এবং বহিরাগতদের মধ্যে আশ্রয়ের মাত্রায় ব্যবহারিক সহযোগিতা জোরদার করা। জাতীয় পর্যায়ে ইউরোপীয় আশ্রয় ব্যবস্থা প্রয়োগের সুবিধার্থে ইউরোপীয় আশ্রয় সহায়তা অফিসও (ইএএসও) তৈরি করা হয়েছিল (Favilli, 2018)। ২০১১ সালের যোগ্যতা নির্দেশিকায় ২৯ এপ্রিল, ২০০৪ এর কাউন্সিলের নির্দেশিকা ২০০৪/৮৩/ ইসি সংশোধন করে তৃতীয়-দেশের নাগরিক বা রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের শরণার্থী হিসেবে যাদের আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রয়োজন তাদের ন্যূনতম মানদণ্ডে সুরক্ষা মঞ্জুর করে।

এটি আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য সাধারণ ভিত্তি স্থাপন করে এবং এর সুবিধাভোগীদের (বাসস্থনের অনুমতি, ভ্রমণের নথি, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও স্বাস্থ্যসেবা) মধ্যে প্রবেশাধিকার রয়েছে। আশ্রয় প্রক্রিয়া নির্দেশিকা একটি ন্যায্য এবং দক্ষ আশ্রয় পদ্ধতির জন্য সুরক্ষার সাধারণ মান এবং গ্যারান্টি প্রদান করে (https://eur-lex.europa.eu/legal-content)।[১]

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন আশ্রয়প্রার্থীরা তাদের দাবিটি ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন। বিশেষত নাবালক এবং নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের বৃহত্তর সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকে। এই নির্দেশিকা আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রদান ও প্রত্যাহারের সাধারণ পদ্ধতি অস্থায়ী সুরক্ষা নির্দেশিকা ২০/০৭/২০০১-২০ জুলাইয়ের কাউন্সিলের নির্দেশিকা ২০০১/৫৫/ ইসি ২০০১ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের প্রচুর আগমন ঘটলে অস্থায়ী সুরক্ষার জন্য ন্যূনতম মান নির্ধারণ করে (Directive 2001/55/EC, 2001)।[২] এ জাতীয় ব্যক্তিদের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রচেষ্টার ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যবস্থা করে। সর্বশেষে কাউন্সিল অফ ইউরোপ কনভেনশন ফর প্রোটেকশন ফর হিউম্যান রাইটস এবং ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডমস (ইউরোপীয় কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটস-ইসিএইচআর) অশ্রয়ের অধিকার সরবরাহ করে না। অনুচ্ছেদ ৩-এ নির্যাতন বা অমানবিক শাস্তির নিষেধাজ্ঞার ওপর জোর দেয়। এছাড়াও আশ্রয় প্রত্যাখাত ব্যক্তিদের বহিষ্কারের বিষয়টিও উত্থাপন করতে পারে অনুচ্ছেদ ২-এ জীবনের অধিকার, অনুচ্ছেদ ৫-এ ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সুরক্ষার অধিকার, অনুচ্ছেদ ৬-এ সুষ্ঠু বিচারের অধিকার, অনুচ্ছেদ ৮-এ পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার অধিকার, প্রোটোকল নং ৪-এর অনুচ্ছেদ ৪-ঘ এলিয়েনদের সম্মিলিত বহিষ্কার এবং অনুচ্ছেদ ১৩-এ কার্যকর প্রতিকারের অধিকার (www.echr.coe.int/Doc)।[৩] ইইউ এর প্রতিক্রিয়ার আইনগত, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রসঙ্গে সংকট মোকাবেলায় কৌশল অবলম্বনের জন্য দুটি রায় ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত এবং ইইউ এর আদালত গ্রিক আশ্রয় ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত ঘাটতি চিহ্নিত করেছে।

৩.২.৩ আরব বিশ্বে ফিলিস্তিন শরণার্থী

১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর ফিলিস্তিনিদের প্রায় ৩০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে United Nations Refugee For Work Agence বা (UNRWA) নামে আলাদা একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউএনআরডব্লিউএ ফিলিস্তিনি শরণার্থীদেরকে

---

১. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=en

২. Council Directive 2001/55/EC of 20 July (2001) on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof

৩. https://www.echr.coe.int/Documents/COURTalks_Asyl_Talk_ENG.PDF

সংজ্ঞায়িত করে, যারা বা যাদের বংশধর ১৯৪৮ সালের দ্বন্দ্বের ২ দুই বছর আগে থেকে প্যালেষ্টাইনে বসবাস করছে এবং সেই দ্বন্দ্বের কারণে যারা বসতি ও জীবীকা হারিয়েছে তারা এর আওতায় থাকবে। ইউএনআরডব্লিউএ সকল ফিলিস্তিন শরণার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত নয়, যেসব দেশে তারা আশ্রয় নিয়েছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সে সব দেশের। এ সংস্থাটি ফিলিস্তিন জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন, গাজা ও পশ্চিম তীরে বসবাসরত রয়েছে। উল্লেখ্য অসংখ্য ফিলিস্তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব অর্জন করেছে। আরব রাষ্ট্রের মধ্যে যারা ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের আশ্রয় দিচ্ছে তাদের মধ্যে শুধু জর্ডান উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফিলিস্তিনিকে নাগরিকত্ব দিয়েছে। বাকিদের আইনগত অবস্থান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনিশ্চিত এবং অনেক ফিলিস্তিনি অসহনীয় পরিস্থিতির শিকার (আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইন সহায়িকা, ২০০৩)। জাতিসংঘের তথ্য মতে, ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের ফলে ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংখ্যা লেবাননে ছিল ১০০,০০০; সিরিয়ায় ৭০০,০০০ লাখ ৫০ হাজার; জর্ডানে ৭০০,০০০; মিশরে ৭০০০; ইরাকে ৪০০০ (Gang, 2002)। তবে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংখ্যা সর্বমোট ছিল ১ কোটি ১৬ লাখ যার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে জর্ডানে ৬২ লাখ ৩৬ হাজার; সিরিয়ায় ১ লাখ ১৬ হাজার ৭৭৮; লেবাননে ১৩ লাখ ৭ হাজার ৮৮৪; ইরাকে ১০ হাজার ২০২ ও সৌদি আরবে ১২০০০ (Huai, 1964)। বংশ পরম্পরায় এসকল ফিলিস্তিনি ঐ সব দেশে বেড়েই চলেছে। ১৯৯১ সালে (UNRWA) এর তথ্য মতে, তাদের নিকট নিবন্ধিত ফিলিস্তিনি শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ ২০ হাজার। যার মধ্যে জর্ডানে ৯ লাখ ৬০ হাজার ২১২, লেবাননে ৩ লাখ ১০ হাজার ৫৮৫ ও সিরিয়ায় ২ লাখ ৮৯ হাজার ৯২৩ শরণার্থী রয়েছে (Guoqing, 1993)। ১৯৯৮ সালের ফিলিস্তিনিদের সংগঠন প্যালেষ্টাইন লিবারেশনস অর্গানাইজেশনস (পিএলও) এর পরিসংখ্যান মতে, ফিলিস্তিনি মোট শরণার্থীর জর্ডানে ৩৪.৫%, লেবাননে ৭.৫%, সিরিয়ায় ৮.৪%, সৌদি আরবে ৫.৪%, অন্যান্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ২.৭%, ইরাক ও লিবিয়ায় ১.৪% এবং অন্যান্য আরব দেশে ০.১% বসবাস করে (Brynen and Roula, 2007)।

৩.২.৪ এশিয়ায় শরণার্থী অবস্থান

বিগত বিশ বছর যাবত বিশ্ব শরণার্থী ইস্যুতে দুটি বিষয় প্রাধান্য পাচ্ছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে আফগানিস্থান, বসনিয়া কসোভো, রুয়ান্ডা ও সুদান এর নাগরিক গণহারে শরণার্থী হচ্ছে। অপরটি উন্নত রাষ্ট্রে উন্নত জীবনের আশায় অভিবাসি হচ্ছে। জোরপূর্বক স্থানচ্যুতির মাত্রা আরো বেশি মাত্রায় রয়েছে। ইউএনএইচসিআর (UNHCR) এর ২০০৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বে মোট শরণার্থী ৯.৯ মিলিয়ন এর ১৬% হচ্ছে আশ্রয় প্রার্থী জনগোষ্ঠী (UNHCR, 2006)। ইউএসসিআরাআই (USCRI) ২০০৬ এর মতে বিশ্ব শরণার্থীর ৬৫% শরণার্থী এমন সব দেশে বিচ্ছিন্ন ক্যাম্পে ও বিচ্ছিন্ন বছরের পর বছর বাস করছে সে সব দেশের মাথাপিছু আয় ২০০০ ডলারের নিচে (USCRI, 2006)। শরণার্থী জীবনের দীর্ঘসূত্রিতা আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ

পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যে একই অবস্থা নয়। কিন্তু শরণার্থী জীবনের দীর্ঘসূত্রিতার তীব্রতা সংখ্যার ওপর নয় অবস্থার ওপর নির্ভর করে। বিভিন্ন দেশে শরণার্থী অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায় সন্ত্রাস ও মানবাধিকার লংঘনের কারণে শরণার্থী হতে বাধ্য হয় মানুষ। আফ্রিকা থেকে একটু ভিন্ন অবস্থা হচ্ছে এশিয়াতে তা হচ্ছে এখানে শরণার্থীদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রহীনতাও রয়েছে। ইউএনএইচসিআর এর মতে, শরণার্থী পরিস্থিতি এমন একটি অবস্থা যেখানে ২৫ হাজার বা আরো বেশি, পাঁচ বছর বা ততোধিক সময় নির্বাসনে থাকে (UNHCR, 2009)। ২০০৪ এর হিসাব মতে সারা বিশ্বে প্যালেস্টাইনে এমন শরণার্থী ক্যাম্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে (UNRWA, 2006)। দীর্ঘসূত্রিতার শরণার্থীর এসব ক্যাম্পের জনসংখ্যা হচ্ছে ৫.৭ মিলিয়ন বা ৫৭ লক্ষ (UNRWA, 2009)। ইউএনএইচসিআরের শুধু নিবন্ধিত শরণার্থী সংখ্যার হিসাবের বাইরে অনেক অনিবন্ধিত শরণার্থী রয়েছে। এই সংখ্যার বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুধু মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিনি খসড়াভাবে ৪.৫ মিলিয়ন নিবন্ধিত শরণার্থী রয়েছে। বাকি ১.৫ মিলিয়নের কাছাকাছি শরণার্থী ৫৯টি ক্যাম্পে সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন, পশ্চিম তীর ও গাজায় ক্যাম্পে অবস্থান করছে (UNRWA, 2006)। ২০০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬.৩ মিলিয়ন ৩১টি দীর্ঘসূত্রিতার শরণার্থীর (ফিলিস্তিনি ছাড়া) ক্যাম্পে বসবাস করছে (USCRI, 2007)। দীর্ঘসূত্রিতার শরণার্থীদের সংখ্যা ১০ হাজার পর্যন্ত এবং তারা ৫ বছর পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট ক্যাম্পে বাস করে বলে ধরে নেওয়া হয়। যারা মানবিক সাহায্য পায় না; আবার নিবন্ধিত না তাদেরকেও এই আলোচনায় রাখা হয়েছে।

৩.২.৫ বাংলাদেশে বিহারী শরণার্থী

পৃথিবীর অন্যতম অবহেলিত শরণার্থী বিহারীরা ২০০৬ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠী হিসেবে ছিল। বাংলাদেশে ২.৫ থেকে ৫ লাখ বিহারী রয়েছে। এর মধ্যে ২,৩৮,৪০০ শরণার্থী ১৩টি জেলার ৬৬টি ক্যাম্পে বসবাস করে (Anand, 2006)। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় ১ মিলিয়ন শরণার্থী পূর্ব-পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থান করে। উর্দু ভাষাবাসি এসকল বিহারীরা পূর্ব-পাকিস্তানে সতন্ত্র একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিসেবে বসবাস শুরু করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সমর্থন করায় স্বাধীন বাংলাদেশে তারা রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীর পরিচিতি পায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এসকল বিহারীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে এবং তারা শরণার্থী ক্যাম্পে বসবাস শুরু করে। ১৯৭৪ সাল থেকে '৯২ সাল পর্যন্ত ১ লাখ ৭৫ হাজার শরণার্থী পাকিস্তানে ফিরে গেছে। ৫ লাখ বিহারী শরণার্থী অপেক্ষায় পাকিস্তানে ফিরে যাবার অপেক্ষায় রয়েছে (Refugee International, 2006)। এদের শিক্ষা ও জীবিকা অর্জনের অনুমতি না থাকায় তারা নিরাপত্তাহীন ও দারিদ্রে নিমজ্জিত। পাকিস্তান সরকার এই বিহারীদের প্রত্যাবাসনকে অস্বীকার করছে স্থিতিশীলতা ও ঐক্য বিনষ্টের আশংকায়। বিহারী নেতাদের বক্তব্য প্রত্যাবাসনই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির কারণে বাংলাদেশ সরকার তাদের স্থানীয়ভাবে একিভূতিকরণ করতে পারছে না।

৩.২.৬ থাইল্যাণ্ডে বার্মীজ শরণার্থী

থাইল্যাণ্ডে মিয়ানমারের শরণার্থী রয়েছে ৪ লাখ (USCRI, 2007)। ইউএনএইচসিআরের থাই-বার্মা সীমান্তে ৯টি নিবন্ধিত শরণার্থী ক্যাম্পে ১ লাখ ৪০ হাজার রোহিঙ্গা বসবাস করে (UNHCR, 2006)। এর মধ্যে২০ বছরের অধিক সময় ধরে বেশ কিছু শরণার্থী বসবাসরত রয়েছে। এখানে বেশি মাত্রায় মানুষ বসবাস করে, সুপেয় পানির অভাবের কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে বার্মীজরা। যেহেতু থাই-বার্মা সীমান্তে ক্যাম্পগুলো রয়েছে সেহেতু নিরাপত্তা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বার্মীজ সেনাবাহিনী ও বিদ্রোহীদের সাথে সংঘর্ষের ফলে ক্যাম্পগুলোতে মারাত্বক ক্ষতি সাধিত হয়। ২০০৬ সালে বার্মীজ সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের আবাস স্থলে ১০ বছরের মধ্যে বড় আকারের একটি ব্যাপক সামরিক অভিযান চালায়। থাই সরকার শরণার্থী ক্যাম্পের ভেতরে ও বাইরে কারিগরি শিক্ষার জন্য সাম্প্রতি অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু স্থানীয়দের সাথে একিভূতিকরণ হওয়ার কোনো অনুমতি নেই। তৃতীয় কোনো দেশে পুণর্বাসনের জন্য থাই সরকার, ইউএনএইচসিআর ও শরণার্থী গ্রহণে আগ্রহী দেশগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনা চলছে। ২০০৪ সালে এখানে শরণার্থী ছিল ৭৪৩ জন এবং ২০০৫ সালে এর সংখ্যা দাড়ায় ২৫১৯ জন (UNHCR, 2006)।

৩.২.৭ নেপালে ভুটানি লোটাস্যাম্পস শরণার্থী

১ লাখ ৭ হাজার ভুটানি শরণার্থী ১৬ বছর ধরে পূর্ব নেপালে ৭টি ক্যাম্পে বসবাস করছে। ১০ থেকে ১৫ হাজার অনিবন্ধিত ভুটানিশরণার্থী নেপালে রয়েছে। ১৫ থেকে ৩০ হাজার ভুটানিশরণার্থী ভারতে বসবাস করছে। এসকল শরণার্থীর বাইরে চলাচল ও কাজ-কর্মে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ইউএনএইচসিআর এবং নেপালি সরকার মিলে শরণার্থীদের এনইউআরসিইউ (শরণার্থী সমন্বয়ক জাতীয় ঐক্য কমিটি) এর তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, স্যানিটেশন ও আইনী সহায়তা প্রদান করছে। ভুটানি শরণার্থীদের লক্ষ বহুগোত্রীয় জাতি রাষ্ট্র থেকে সমগোত্রীয় জাতি রাষ্ট্র তৈরি করা। ভুটানি বুদ্ধিষ্ট শাসক গোষ্ঠী বৈষম্য মূলক জাতীয় আইন তৈরি করে লোটাস্যাম্পসদের (অধিকাংশ হিন্দু) ভুটান থেকে বের করে দেয়। ১৯৮৯ সালে ভুটানিসরকার এক জাতি ও এক জনগোষ্ঠী দ্রুক্পা জাতীয় প্রচারণা চালায় (Micael Hutt, 2005)। ভুটানি সরকার নেপালি স্কুল বন্ধ করে দেয় এবং লোটাস্যাম্পসদের বরখাস্ত করে। সরকার যখন এরূপ পদক্ষেপ নেয় লোটাস্যাম্পসদের প্রতিবাদের ফলে নির্যাতিত হওয়ায় তারা প্রথমে ভারত ও পরে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভুটানি জাতীয় আইনে লোটাস্যাম্পসরা রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। ২০০৬ সালের পূর্বে এ সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা দেখা যায় নি। তবে যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ৬০ হাজার ভুটানি শরণার্থী পুনর্বাসনের প্রস্তাব দেয় (IRIN, 2006)। ২০০৭ সালে কানাডা সরকার তিন থেকে চার বছরের মধ্যে ৫ হাজার ভুটানি শরণার্থী পুনর্বাসনের প্রস্তাব দেয়। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, নরওয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই সংকট নিরসনের জন্য এক সাথে কাজ করতে আগ্রহী।

৩.২.৮ ভারতে শ্রীলংঙ্কার তামিল শরণার্থী

দুই দশক যাবৎ তামিল টাইগার বা এলটিটি ও শ্রীলংকান সরকারি বাহিনী ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ফলে ব্যাপক আকারে তামিল শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এছাড়া অভ্যন্তরীণভাবেও স্থানচ্যুত হয়। এর মধ্যে সিংহলী ৮২ শতাংশ ও ৯.৭ হচ্ছে তামিল। যার মধ্যে ১. সিংহলি জাতীয়তাবাদ (সিংহলি ছাড়া অন্যদের অবমূল্যায়ণ করে) ২. বৈষম্যমূলক নীতি ৩. শ্রীলংকা ও ভারতের তামিলদের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সম্পর্ক সিংহলিদের চেয়ে দৃঢ় ৪. ভারত সরকারের নীতির কারণ (Sri Lanka Department of Census and Statistics, 2001)। শ্রিলংকার উত্তর ও পূর্বদ্বীপের তামিলরা বেশি আকারে স্থানচ্যুত হয়। ১৯৮৩ সাল থেকে ভারতের তামিল নাডু রাজ্য এদের আশ্রয় প্রদান করে। ভারত সরকার পরিচালিত ১০০টি ক্যাম্পে ৬০ হাজার শরণার্থী ও বাইরে ৪০ হাজার তামিল শরণার্থী বসবাস করছে। এ সকল শরণার্থীদের রেশন কার্ড, মাসিক ভাতা. স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় তাদের প্রবেশাধিকার রয়েছে।

৩.২.৯ বাংলাদেশে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থী

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে মোট জনসংখ্যার কতভাগ জনগোষ্ঠী মুসলিম তা নির্ভরযোগ্য আদমশুমরীর অভাবে বলা প্রায় অসম্ভব। সবচেয়ে বড় নৃগোষ্ঠী তিব্বতীয় ও চীনাদের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই জনগোষ্ঠী মিয়ানমারের ৪৭ মিলিয়ন জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ। আর তারাই সে দেশের সরকার ও প্রতিরক্ষা বিভাগে প্রভাব বিস্তার করেছে। দেশটি দাবি করে তাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা তিনভাগ মুসলিম। কিন্তু অন্য একটি রিপোর্টে জানা যায় যে, মিয়ানমারের জনসংখ্যার ১৩ ভাগ বা তারও বেশি মুসলিম, যার সংখ্যা প্রায় ৭ মিলিয়ন (Matthews, 2001)। মুসলিমদের প্রধান ভাগই হচ্ছে ভারতীয় মুসলিম যারা ব্রিটিশ শাসনামলে মিয়ানমারে বসতি স্থাপন করে। মিয়ানমারের বেশিরভাগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দেশটির সীমান্তবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে। মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলের আরাকান প্রদেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বাস করে। সেখানকার প্রায় ১ মিলিয়ন রোহিঙ্গা ও কিছু ভারতীয় ও বাঙালির প্রধান ধর্ম ইসলাম। এছাড়া কিছু ধর্মান্তরিত বার্মীজ মুসলিম ও মুসলিম নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যের মানুষ রয়েছে যারা জেরবাদী হিসেবে পরিচিত (Matthews, 2001)। অতীত ইতিহাস থেকেই রোহিঙ্গা বা রোহি হচ্ছে মুসলিম। সম্ভবত ৮ম ও ৯ম শতকে আরব বণিকরা এই রোহি উপকূলে বসতি স্থাপন করে আর সেই থেকেই মুসলিমরা এই অঞ্চলে বাস করছে। পরবর্তী শতকে পার্সিয়ান, মুগল, তুর্কি, পাঠান এবং বাঙালি মুসলিমরা এখানে আসতে থাকে। এছাড়া ব্রিটিশ শাসনামলে (১৮২৪-১৯৪৮) সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম থেকে ব্যাপকভাবে মুসলিমরা এখানে অভিবাসন করে। আরাকান প্রদেশে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমান মুসলিম রয়েছে যদিও তাদের উপেক্ষা করা হয় (KHR, 2002)। যাই হোক এই অঞ্চলে গ্রাম এবং শহরে অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে হিন্দু ও মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাধ্যে অভিবাসী শ্রমিক, দীর্ঘ দিনের বসবাসরত জনগোষ্ঠী (কারেন) (Matthews, 2001)। ব্রিটিশ শাসনামলে রেঙ্গুন (বর্তমান ইয়াংঙ্গুন) থেকে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীকে নামমাত্র

কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় আনা হয়েছিল, যদিও অনেক অঞ্চল স্ব-শাসিত ছিল। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক বার্মীজ জাপানি সেনাদের সাথে যোগ দিয়েছিল আবার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসনের ওপর আস্থাশীল ছিল। এতে উভয়ের মাঝে স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়।

বার্মীজরা সংগ্রাম করেছিল ব্রিটিশ শাসন মুক্ত হতে অন্যদিকে ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীরা চাইত বার্মীজদের আধিপত্য থেকে মুক্তি পেতে। ১৯৪৮ সালে মিয়ানমার ইউনিয়ন স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে প্যাংলং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল (Panglong Agreement of 1947)।[৪] এই চুক্তির মাধ্যমে মিয়ানমারের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে নতুন পরিষদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য রাজি করানো হয়। আর এতে বলা হয় যে, শান এবং কারেন জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনতার এক দশক পর এই নতুন পরিষদ থেকে বিচ্ছিন্ন ক্ষমতা প্রদান করা হবে। তারপরও এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে পালন করা হয়নি। বরং মিয়ানমারের স্বাধীনতার অব্যহতি পরেই সেদেশে পাশবিক জাতিগত দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে যা বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রায় বিরাজমান। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ এবং সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মাঝে একটি সামাজিক সমস্যা বিরাজমান। মুসলিমদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আচরণই এই অঞ্চল ও অন্যান্য অঞ্চলে সামাজিক সংঘাতের মূল কারণ (IRFR, 2003)। ১৯৮৮ সালের দিকে গণতান্ত্রিক দলগুলোর উত্থান ও ১৯৯০ সালে জাতীয় ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমক্র্যাসী (এনএলডি) বিজয়ের পর সামরিক জান্তা সরকার সেদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও ক্ষুদ্র নৃ-তাত্বিক জনগোষ্ঠীর ওপর চড়াও হয়। সেখানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসহ সকল মানবিক অধিকারসমূহ লুণ্ঠিত হচ্ছে (UN ECOSOC)।[৫] পরবর্তী সরকার এই ধরনের সংঘাত জাতীয় ঐক্যমতের জন্য হুমকিস্বরূপ হলে ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। যদিও দেশটিতে কোনো রাষ্ট্রধর্ম নেই তারপরও শাসক শ্রেণি থেরাভেদা বৌদ্ধ মতবাদকে প্রধান্য দিচ্ছে। সব প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সরকার কর্তৃক আনুকল্য প্রদর্শন করা হয়। একটি পরিপত্র জারি করার মাধ্যমে প্রকৃত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধন করা থেকে মুক্তি দেয়। বাস্তবে তারা কোনো সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় করতে পারবে না এবং ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে না। এই নীতির মাধ্যমে বেশিরভাগ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। ১৯৬০ এর দশক থেকে সেদেশের মুসলিম ও খ্রিস্টান দলগুলো ধর্মীয় সাহিত্য প্রবেশ করতে পারেনি। এক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সেদেশে মানবাধিকার কিভাবে লুণ্ঠিত হয়। 'জাস্টিস অন ট্রায়াল' নামক এক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান একটি রিপোর্ট প্রদান করে (Myanmar Justice on trial, 2004)। যখন বার্মীজ বৌদ্ধরা ১৭৮৪ সালে আরাকান আক্রমণ করেছে; তখন থেকেই মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের ইতিহাস পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব মিয়ানমারের মুসলিম রোহিঙ্গাদের ওপর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়। ১৯৯১ সাল থেকেই সরকার এই মুসলিম বিদ্বেষী দাঙ্গার পেছেনে স্পষ্টভাবে

৪. *Panglong Agreement of 1947*

৫. UN ECOSOC, *Commission on human rights, 60th session*, agenda item

পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নির্যাতনে আড়াই লাখেরও বেশি মুসলিম প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে পালিয়ে যায় (The Burma Project)।[৬]

আরাকান প্রদেশের সংখ্যালঘু মুসলিমগণ নানারকম আইনী, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছে। সরকার তাদের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নাগরিকত্ব স্বীকার করে না এই মতের ভিত্তিতে যে, তাদের পূর্ব পুরুষরা মিয়ানমারে ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে বসবাস শুরু করেনি। আর যেটি দেশটির নাগরিকত্ব অধিকার আইনে কঠোরভাবে পালন করা হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাবর্তিত মুসলিম রোহিঙ্গারা সরকারের চরম বিধি নিষেধের অভিযোগ করে। কারণ তারা রোহিঙ্গাদের চলাচল ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। যখন মুসলিমরা গ্রাম থেকে শহরে যাবে তখন তাদের শহরের কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগবে। যদিও ঘুষের বিনিময়ে তারা যদি কোনো অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা করে তারপরও রোহিঙ্গা মুসলিম ইয়াংগুন ভ্রমণে যেতে দেয়া হয় না। রোহিঙ্গারা প্রাথমিক শিক্ষার ওপরে শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এছাড়া তাঁরা সরকারি সিভিল প্রশাসনের কোনো পদ গ্রহণ করতে অক্ষম বলে বিবেচিত হবে। মুসলিমদের চলাফেরা ও ধর্মকর্মের প্রতি নিষেধাজ্ঞা দেশব্যাপী ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ছে (IRFR, 2003)। মুসলিমরা বিশেষভাবে নতুন মসজিদ নির্মাণে অথবা পূর্বের কোনো মসজিদ সম্প্রসারণ করতে পারে না। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর তথ্যমতে, প্রায় এক মিলিয়ন রোহিঙ্গা মুসলিম মিয়ানমারের আইনে নাগরিক হিসেবে গণ্য নয় বলে তারা রাষ্ট্রবিহীন (Amnesty International, 2004)। ফলে নাগরিকত্বহীন হওয়ার কারণে তারা নিজ গ্রাম বা শহরের বাইরে যেতে চাইলে তাদের দাপ্তরিক অনুমতি ও ফি প্রদান করতে হয়। আর এই বিধি-নিষেধ সম্প্রতি বছরগুলোতে আরও জোরালো করা হয়েছে। এতে অনেক মানুষ তাদের নিজ শহর ও গ্রামে আটকাবস্থায় রয়েছে এবং তারা স্বাস্থ্য সেবা, চাকুরী ও উচ্চতর শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক শ্রম পেশায় নিয়োজিত করা হয় যেমন রাস্তা নির্মাণ ও সেনাবাহিনীর ফাঁড়ি নির্মাণ করানো হয়। রোহিঙ্গা মুসলিমরা অপ্রাসঙ্গিক কর ও জমি বেদখলের স্বীকার। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এসপিডিসি কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিমদের নির্দিষ্ট এলাকা থেকে স্থানচ্যুত করেছে এবং অন্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে (SPDC is the new name for SLORC, 1989)। আরাকান মুসলিমদের বাধ্যতামূলকভাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে সময়, অর্থ ও শ্রম প্রদান করতে হয়। মুসলিমরা আরাকানে নতুন করে কেউ প্লট ও বাসা ক্রয় করতে পারেনি এবং নতুনভাবে কেউ প্রবেশও করতে পারেনি। এছাড়া গাও এবং টাউংঘাট শহরে মুসলিমরা বসবাস করতে পারে না এবং শহরগুলোর মসজিদসমূহ ধ্বংস করা হয়েছে ও মুসলিমদের জমিজমা অপদখল করা হয়েছে (International Religious Freedom, 2003)। ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের জায়গাগুলোতে যেন নতুন করে আর কোনো মসজিদ না গড়ে ওঠে সেজন্য সেখানে সরকারী ভবন, বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে।

---

৬. The Burma Project; http://www.burmaproject.org

৩.৩ শরণার্থী উপস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রায় প্রভাব: গবেষণা সূত্রপাত

পৃথিবীব্যাপী শরণার্থী বিষয়টি নিয়ে অনেকেই অনেক ধরনের গবেষণা করেছেন। এর মধ্যে জানা যায়-শরণার্থী শিবিরগুলো সাধারণত দরিদ্র ও অনুন্নত অবস্থায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে প্রায়শই স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলে। এ থেকে বোঝা যায় যে শরণার্থী আগমন ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবনে কিছুটা হলেও প্রভাবিত করে। চেম্বার এর মতে, শরণার্থী আগমন এবং শরণার্থী শিবির প্রতিষ্ঠায় আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাবসমূহের প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের এবং বৈচিত্র্যময় হয়। এই প্রভাবগুলো তারা কীভাবে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোকে প্রভাবিত করে এ ক্ষেত্রে গবেষকদের সঠিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে (Chambers, 1986; Maystadt and Verwimp, P. 2009)। তা সত্ত্বেও এটি কীভাবে প্রভাব ফেলবে তা নির্ভর করে বেশ কয়েকটি কারণের ওপর। যেখানে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় সম্ভাবনা রয়েছে (Maystadt and Verwimp, P. 2009: p. 1-2)। শরণার্থী শিবির স্থাপনাগুলোর ব্যবস্থাপনায় সাধারণত-জাতিসংঘের হাই কমিশনার অব রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর), আশ্রয়দানকারী দেশের সরকার এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদারের পাশাপাশি নেতৃস্থানীয় সংস্থাসমূহকে নিযুক্ত করা হয় (UNHCR: 2012 b.)। ইউএনএইচসিআর যেহেতু তাদের ম্যান্ডেটে সাড়া দেয় তাই সুস্পষ্টভাবে শরণার্থীদের সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা বেশিরভাগই উদ্বিগ্ন থাকে। গবেষণাসমূহ শরণার্থীদের ওপর এ জাতীয় পরিস্থিতিতে আরও বেশি জোর দেওয়ার প্রবণতা দেখায়। শরণার্থীরা একটি সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে থাকে এবং আশ্রয়প্রদানকারী অংশটি সীমিত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শরণার্থী শিবিরগুলোর প্রভাব সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সীমিত মনোযোগি হয় (Chambers, R. 1986: 26)। ১৯৮৬ সাল থেকে চেম্বারসের বিশ্লেষণের পরও এ বিষয়গুলোতে জ্ঞান খুব বেশি উন্নতি হয়নি। এই দাবির প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই গবেষণাটি প্রভাবগুলোর জ্ঞানের খোঁজে অবদান রাখার লক্ষ নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কারণ শরণার্থী শিবির দ্বারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর এবং শরণার্থীদের মধ্যে সম্পর্ককে প্রভাবিত করে (Maystadt and Verwimp, P. 2009, p. 1-2)। শরণার্থীদের কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ প্রায়শই একই রকম কঠিন পরিস্থিতি ভোগ করে থাকে; যদিও তারা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এবং সহায়তার জন্য ক্রমবর্ধমানভবে অবহেলিত হয়। এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি যুক্তিযুক্ত যে শরণার্থী শিবিরগুলো কীভাবে আশ্রয়প্রদানকারী সম্প্রদায়গুলোকে প্রভাবিত করে তার পরিণতির গতিশীলতা বোঝার জন্য এই বিষয়গুলোতে আরও গবেষণা এবং জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন রয়েছে (Maystadt and Verwimp, P. 2009, p. 1-2)। এ গবেষণায় বিভিন্ন স্থানের শরণার্থী শিবিরের প্রভাবকে অধ্যয়ন করতে নিম্নে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকপাত করা হলো-

৩.৪ শরণার্থী শিবিরের উপস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রভাবসমূহ

শরণার্থীরা সংঘাতের পক্ষে এবং জনমিতিক পরিবর্তনে অবদান রাখে। এতদ্ব্যতীত, তারা অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করে যার ফলস্বরূপ সংঘাতের সম্ভাবনা বাড়ায়। এ ধরণের গবেষণার জন্য তিনি সংঘাতের তথ্য-উপাত্ত এবং জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা বা (ইউএনএইচসিআর) এর জনসংখ্যা তথ্য ইউনিট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। এ ফলাফলগুলোর পক্ষে সমর্থন করে এবং তিনি পরামর্শ দেন যে কিছু অন্যান্য প্রভাবের পাশাপাশি শরণার্থীদের চলাচল আন্তঃদেশীয় দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে (Salehyan and Gleditsch, 2006)। ফিস্ক শরণার্থীদের আশ্রয়দানকারী দেশে এবং তাদের প্রেরণকারী দেশেও যে সুরক্ষা হুমকি তা বিদ্যমান ধারণাকে কার্যকরভাবে চ্যালেঞ্জ করেছেন (Fisk, 2018)। মুটোনগু আফ্রিকার শরণার্থীদের সাথে সম্পর্কিত মানবিক প্রতিক্রিয়ার সমস্যাসমূহ পরীক্ষা করেন। তিনি আন্তর্জাতিক সহায়তায় শরণার্থীদের নির্ভরতা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছেন এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর শরণার্থীদের অর্থনৈতিক প্রভাবকেও উদ্ঘাটন করেছেন। গবেষণা নিবন্ধনটি জাতিসংঘের ভূমিকা, শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর তার প্রভাবও প্রতিফলিত করেছেন। তিনি দ্বন্দ্বের মূল কারণগুলো খুঁজে বের করার তাগিদ দিয়ে শেষ করেছেন (Mutongu, 2017a.)। শরণার্থী অধ্যয়নের পূর্বের সংশ্লিষ্ট আলোচনার পাশাপাশি পূর্বের গবেষণাগুলোতে প্রভাব বিশ্লেষণের সময় আশ্রয়দানকারী দেশের সরকারগুলো এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈশিষ্ট্য প্রভাবিত করে এমন শ্রেণির গতিবিদ্যা পূর্ববর্তী আলোচনায় সর্বদা উপেক্ষা করা হয়েছে। তাদের ওপর শরণার্থীদের প্রভাব সম্পর্কে অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্প্রদায়কে একক সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করার পূর্বে বিদ্যমান ধারণাটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে তাদের জনগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর আগমনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন গোষ্ঠী আলাদাভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বুরুন্ডি এবং রুয়ান্ডা থেকে তানজানিয়া আগত প্রচুর সংখ্যক শরণার্থীর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে (Alix-Garcia, Jennifer and David Saah, 2010a)। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব সম্পর্কে বেশ কিছু গবেষণায়ও বিদ্যমান রয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

৩.৪.১ অর্থনৈতিক প্রভাবসমূহ:

চেম্বার কেবল শরণার্থীদের কেন্দ্র করে শরণার্থী বিষয়ের পক্ষপাতিত্বগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন। শরণার্থীদের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্প্রদায়কে একক সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করার পূর্বে তিনি বিদ্যমান ধারণাটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন যে কীভাবে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী আগমনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে বা আলাদাভাবে প্রভাবিত হয়েছে। যদিও চেম্বার দরিদ্র আশ্রয়দানকারী স্থানীয়রা গ্রামাঞ্চলে শরণার্থীদের উপস্থিতির সময় যে সুবিধা এবং ব্যয়গুলো সহ্য করে তা উভয়ই বিশ্লেষণ করেন।

আশ্রয়দানকারীদের সুবিধাগুলো এবং ব্যয় বিশ্লেষণে তিনি পাঁচটি মাত্রা ব্যবহার করেছেন: ক) খাদ্য; খ) জমি, শ্রম এবং মজুরি; গ) পরিষেবা; ঘ) সাধারণ সম্পত্তির সংস্থান এবং ঙ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Chambers, 1986)। সুতরাং এটি বলা যায় শরণার্থী উপস্থিতির ফলে স্থানীয় সমাজে হঠাৎ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরণের প্রভাবই পড়ে থাকে। এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে বিষয়টির ওপর প্রথম অভিঘাত আসে তা হলো স্থানীয় বাজার, খাদ্য মূল্য, শ্রমের মজুরি, কৃষি, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রভৃতি।

৩.৪.১.১ বাজার অর্থনীতিতে প্রভাব

শরণার্থী উপস্থিতির ফলে যে কোনো স্থানীয় সমাজে বাজার অর্থনীতিতে প্রভাব অনস্বীকার্য। এই প্রভাব ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরণের হয়ে থাকে। যার ফলে স্থানীয় সমাজ ও সমাজের মানুষ একটি চাপ অনুভব করে। শরণার্থীদের আগমনের কারণে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য খাদ্য পণ্য এবং (অ-খাদ্য) ননফুড পণ্যগুলোর দাম বৃদ্ধি পায়। বিপুল সংখ্যক শরণার্থী আগমনে তাদের সাথে নিয়ে আসা সম্পদ এবং পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের কারণে শরণার্থী সহায়তা উভয়ই বাজারে প্রভাব ফেলে। শরণার্থীদের আগমনের পরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, চাহিদা এবং সেই সাথে পণ্যের দাম বাড়ায়। তবে ত্রাণ সহায়তা বাজারে নির্দিষ্ট পণ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে; যা ক্ষেত্র বিশেষ চাহিদা এবং মূল্যকে হ্রাস করে। বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর চলাচল পণ্যের দাম বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। প্রচুর সংখ্যক শরণার্থীর বুরুন্ডি এবং রুয়ান্ডা থেকে তানজানিয়াতে আগমনে প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে (Alix-Garcia and Saah, 2010a)। আশ্রয়দানকারী ও শরণার্থীদের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও জাতিগত রাজনীতি সম্পর্কিত নিবন্ধনে দুটি যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে (Jaji, Rose. 2014)। প্রথমত, শরণার্থী-স্থানীয়দের ব্যাপক ধারণাটি ১৯৫১ সালের জেনেভা কনভেনশন আইন এবং ১৯৬৯ সালে আফ্রিকান ইউনিয়ন কনভেনশনের আইনী উপকরণের অধীনে চ্যালেঞ্জ জানায় যে শরণার্থী-স্থানীয় সম্পর্ক রাজনৈতিক নয় এটি পুরোপুরি মানবতাবাদী। দ্বিতীয়ত, সোমালি শরণার্থীদের সাধারণ উপস্থিতিকে খণ্ডন করার জন্য আশ্রয়দানকারী দেশে অবৈধ অবস্থান এবং তাদের সমস্যাযুক্ত ধর্মীয় ও জাতিগত সম্পর্ককে সক্ষম করার ক্ষমতা রাখে (Jaji, 2014, p. 635)। তিনি এই গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে পর্যবেক্ষণ, নিবিড়-সাক্ষাৎকার এবং দলভিত্তিক আলোচনা করেছেন। ২০১৫ সালে ইউরোপে শরণার্থীদের আর্থিক ব্যয় পরীক্ষা করে আরও শরণার্থীদের আগমনের সাথে বিভিন্ন কল্যাণ খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে এমন আশঙ্কা নিয়েও গবেষণা করা হয়েছে (Ruist, 2015)। আশ্রয়দানকারী দেশ ও স্থানীয় সম্প্রদায় যে ব্যয় করতে বাধ্য হয়েছিল; সেখানে শরণার্থীদের আশ্রয়দানকারী দেশে প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটির পক্ষে ছিল (Jacobsen, 2002)। শরণার্থীরা তাদের আশ্রয়দানকারী দেশের জন্য বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক সুরক্ষার হুমকির কারণও হয়। জ্যাকবসন এর মতে, শরণার্থীদের সাথে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা, মানব মূলধন এবং অর্থনৈতিক সম্পদ নিয়ে আসেন।

শরণার্থীদের ত্রাণ সহায়তা, পরিবহন, যানবাহন, স্থানীয় লোকের কর্মসংস্থান, শ্রম ও রেমিট্যান্স এমন কিছু সম্পদ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য যোগ করে (Jacobsen, 2002)। হঠাৎ শরণার্থীদের আগমন খাবারের মতো মৌলিক পণ্যগুলির চাহিদা বাড়িয়ে তোলে। শরণার্থীদের দেওয়া এই জাতীয় মৌলিক পণ্যের দাম কমা বা বাড়ার জন্য সহায়তার উৎসটি নির্ধারিত হয় (Alix-Garcia and Saah, 2009)। বৈদেশিক সহায়তা দামের ওপর নিম্নচাপ দেখায়, অন্যদিকে স্থানীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত সহায়তায় দামের ওপর ঊর্ধ্বমুখী চাপ তৈরি হয়। সরবরাহ পণ্যগুলোর বর্ধিত চাহিদা ধরে রাখতে না পারলে দাম বাড়ার ফলে আশ্রয়দানকারী দেশের জনগণের আরও ক্ষতি হয়। শরণার্থীদের স্থানীয় বাজারে নিযুক্তি সহজ করে তোলে এবং তাদের দ্বারা আশ্রয়দানকারী দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করে।

স্থানীয় বাজারগুলিতে সাধারণত বাজারের দামের তুলনায় কম দামে সহায়তা উদ্বৃত্ত পণ্যের ব্যবসায় জোর দেওয়া হয়। সহায়তার উৎস হিসেবে এটি বিদেশি এবং স্থানীয় একটি মিশ্রণ। ইউএনএইচসিআর জরুরি জীবন রক্ষাকারী সাহায্যে পরিবহন ও স্থানান্তরিত করে থাকে। যার মধ্যে জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র, কম্বল, প্লাস্টিকের শীট, স্লিপিং ম্যাটস, প্লাস্টিকের রোলস, ওষুধ, রান্নাঘরের সেড, জেরি ক্যান, বালতি, আশ্রয় কিট বাঁশের খুঁটি ও দড়ি রয়েছে। (UNHCR, 2018)। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডাব্লিউএফপি) স্থানীয় উৎপাদকদের জড়িত করে যার মাধ্যমে তারা চাল, মসুর ডাল, তেল, লবন এবং চিনি উৎপাদন বাড়াতে সচেষ্ট হয় (WFP, 2017)। জরুরি রেশন সরবরাহ করার পরে একটি ভাউচার পদ্ধতির প্রবর্তন করে মনোনীত দোকানে শরণার্থীদের উনিশটি পণ্য বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয়। সুরক্ষার কারণে কখনও কখনও শিবিরগুলোতে নগদ অনুদানের অনুমতি দেওয়া হয় না (Karim, 2018)। অর্থাৎ শরণার্থীরা নগদ অর্থ কেবল দাতব্যভাবে সহায়তা পায়। এই ধরনের সাহায্য উদ্বৃত্তের সাথে ব্যবসায়ের উৎসাহ দেয় এবং প্রায়শই বাজারের দামের চেয়ে কম দামে স্থানীয় বাজার নিশ্চিত হয়। শরণার্থীরা প্রতি মাসে সহায়তা হিসেবে ৩৫ কেজি চাল, ৪.৪ কেজি মসুর, ২ লিটার সয়াবিন তেল এবং এক কেজি চিনি পায়। তবে অন্যান্য খাবার যেমন শাকসবজি বা মাছ খেতে ইচ্ছা হলে তাদের উদ্বৃত্ত পণ্যগুলো প্রায়শই নগদ অর্থে বিক্রি করতে হয়। তারা সহায়তা উদ্বৃত্ত সহায়তাসমূহ বাজারের দামের অর্ধেকের কমে বিক্রি করে (Malhotra, 2018)। স্থানীয় বাজারের দামে শরণার্থীদের প্রভাব নির্ধারণের জন্য শরণার্থীদের জন্য সরবরাহকৃত উৎস এবং এর বিশ্লেষণের পরে ভোক্তা মূল্য সূচকের (সিপিআই) প্রবণতা নির্ধারিত হয়। এটি বিভিন্ন পণ্য বিক্রয় মূল্যের একটি ওজনযুক্ত গড়, যেখানে গড়ে ওঠা পরিবারের ব্যয়ের শতকরা ভাগের ভিত্তি অনুসারে ওজন নির্ধারিত হয়।

শরণার্থীদের প্রদত্ত সহায়তার উৎস এই মৌলিক পণ্যসমূহের দাম হ্রাস বা বাড়ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে (Alix-Garcia and Saah, 2009)। বৈদেশিক সাহায্য মূল্যের ওপর নিম্নমানের চাপ প্রদর্শন করে, স্থানীয় উৎস থেকে সহায়তাগুলো দামের ওপরে চাপ সৃষ্টি করে। বর্ধিত দাম

আশ্রয়দানকারী দেশের জনসংখ্যার আরও ক্ষতি করে। এতে শরণার্থীরা স্থানীয়দের ব্যস্ত করে তোলে। একই সাহায্যের উদ্বৃত্ত স্থানীয় বাজারগুলোতে সাধারণত বাজারের দামের চেয়ে কম দামে ব্যবসায়ে উদ্দীপ্ত করে। নিরাপত্তার কারণে ক্যাম্পে নগদ অর্থ প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয় না বলে শরণার্থীরা নগদ অর্থ সহায়তা পায় না (Karim, 2018)। তাই শরণার্থীরা বাজার মূল্যের অর্ধেকের ওপর উপার্জনের উদ্বৃত্ত স্থানীয়দের নিকট বিক্রয় করেন (Malhotra, 2018; Mahmud, 2018)। শরণার্থীদের দ্বারা দামকে প্রভাবিত করার সম্ভাব্য তিনটি উপায় রয়েছে। তানজানিয়া, রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডি সম্পর্কিত গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, ক্ষেত্র বিশেষ বেশি সংখ্যক শরণার্থী মৌলিক পণ্যের দামের ওপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ফেলে (Alix-Garcia and Saah, 2009; Whitaker, 2002)। শরণার্থীদের উপস্থিতিতে মূল্য হ্রাস করতে পারে যেমন কেনিয়াতে এটি পাওয়া যায় (Enghoff, M. et. al: 2010)। সেখানে শরণার্থীদের উপস্থিতির ফলে পণমূল্য ২০% কমেছে। এটাও সম্ভব যে, শরণার্থীদের দামের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই, তা তানজানিয়া সম্পর্কিত গবেষণায় উঠে এসেছে (Landau, 2003)। দাম পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত কয়েকটি কারণ ব্যাখ্যা এবং আশেপাশের বাজারগুলোর দামের ওপরে শরণার্থী শিবিরের প্রভাব পরীক্ষা করা হয়েছে (Alix-Garcia and Saah, 2009)।

বর্ধিত জনসংখ্যা পণ্যের চাহিদা বাড়ায়; যা দাম বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। মানবিক সহায়তা বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে দামের ওপর নিম্নগতির প্রভাবসহ পণ্যের বর্ধিত চাহিদা সহজ করতে পারে। সীমাবদ্ধ বিকল্প পণ্য, উচ্চ লেনদেনের ব্যয় এবং অবকাঠামোগত অসুবিধার কারণে সরবরাহে উত্থাপিত চাহিদার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য করতে সক্ষম নাও হতে পারে, ফলে সহজেই দাম বাড়িয়ে তুলতে পারে। সামগ্রিকভাবে অ্যালিক্স-গার্সিয়া এবং ডেভিড সাহা শরণার্থীদের উপস্থিতিতে প্রভাব সম্পর্কিত একটি বড় কারণ হিসেবে বাজারের দামের ওপর তাদের সহায়তাকে চিহ্নিত করেন। শরণার্থীদের অর্থনৈতিক প্রভাব পরীক্ষার আরেকটি পদ্ধতি সহায়তার ধরণের ওপর নির্ভর করে (Taylor et. al., (2016)। নির্দিষ্ট পণ্যটির সাথে বাণিজ্য সীমাবদ্ধকরণ; সে নির্দিষ্ট পণ্যটির চাহিদা নাও থাকতে পারে। সহায়তার ক্ষেত্রে শরণার্থীদের তাদের রেশন বিক্রি করার ঝোঁক থাকে, তবে সাধারণত খাদ্য পণ্যসমূহকে নগদ রূপান্তর করার লেনদেন ও ব্যয়ের কারণে তারা স্থানীয় খুচরা মূল্যের চেয়ে কম লাভ করে। এটি নেতিবাচকভাবে চাহিদাটিকে প্রভাবিত করে সুতরাং বাড়তি প্রভাব কম হয়। সামগ্রিকভাবে শরণার্থীরা শিবিরের বাইরে নগদ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহজে জড়িত হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করে তারা আশ্রয়প্রদানকারী দেশের মোট আয় বাড়ায়।

৩.৪.১.২ স্থানীয় বাজারে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি

শরণার্থীরা স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন সামগ্রীর উচ্চতর দামের কারণ হতে পারে (Taylor et al., 2016, p. 7450; Centlivres, and Centlivres-Demont, 1988, p. 89)। বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর আগমন স্থানীয় বাজারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। শরণার্থীরা নিকটবর্তী স্থানীয়

বাজারে প্রবেশ করে থাকে; যেখানে তারা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করে। স্থানীয় বাজারে প্রচুর সংখ্যক শরণার্থীর আকস্মিক প্রবেশ উল্লেখযোগ্য প্রভাব তৈরি করে। অনেক খাদ্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিম্ন-আয়ের লোকেরা নিজের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য পণ্য কিনতে খুব অসুবিধা বোধ করে। উদ্বাস্তুদের আগমনের পরে প্রাথমিক পর্যায়টি সবচেয়ে কঠিন হতে পারে; কারণ এর জন্য কেউ প্রস্তুত থাকে না। সরবরাহের তুলনায় স্থানীয় বাজারে খাদ্য পণ্যের চাহিদা থাকে অস্বাভাবিক। প্রথম কয়েক মাস পরে সরবরাহ আরও বাড়তে শুরু করায় পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে ভাল হয়। তবুও সামুদ্রিক মাছ এবং মাংসের মতো কিছু খাদ্য সামগ্রীর দাম বেশি থাকে এবং এটি স্থানীয় মানুষকে প্রভাবিত করে। শরণার্থীদের বেশিরভাগ তাদের ত্রাণ হিসেবে পাওয়া পণ্যগুলোর একটি অংশ খুব স্বল্প মূল্য দিয়ে বিক্রি করে (Taylor et al., 2016, p. 7450)। শরণার্থীরা স্থানীয় বাজারে তাদের কিছু ত্রাণ (পণ্য) খুব কম দামে বিক্রি করে, ছোট মুদি দোকান মালিকরা এই ঘটনার কারণে তাদের আয় হারায়। ত্রাণ সামগ্রীর পণ্যের মধ্যে শরণার্থীরা স্থানীয় বাজারে তেল, চাল, ডাল, সুজি এবং সাবান বিক্রি করে কারণ তারা তাদের প্রয়োজনের চেয়ে এই পণ্য বেশি পায়। তাছাড়াও অনেক সময় তাদের খাবারের অভ্যাসটিও আলাদা থাকে এবং তারা বাজার থেকে পছন্দসই খাবার কেনার জন্য ত্রাণ (খাদ্য পণ্যগুলো) বিক্রি করে। ফলস্বরূপ, স্থানীয় লোকেরা খুব কম দামে শরণার্থীদের ত্রাণ হিসেবে পাওয়া পণ্য কিনে নেয় এবং স্থানীয় মুদি দোকানগুলো সেই পণ্যগুলোর দাম কমিয়ে দিতে বা সেই পণ্যটি বিক্রি বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

৩.৪.১.৩ স্থানীয় শ্রম ও মজুরির ওপর প্রভাব

শরণার্থীরা আশ্রয়দানকারী দেশে নিয়মিত মজুরির তুলনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব কম মজুরিতে শ্রম প্রদান করে (Porter et al., 2008, p. 237; Whitaker, 2008, p. 248; Chambers, 1986, p. 250) ঘানার একটি শিবিরের এক দশমাংশ শরণার্থী সেবা খাতে এবং অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কাজ করছে। দুই ভাগ জনগোষ্ঠী অন্যান্য দেশের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল হয়। শরণার্থীদের সস্তা শ্রমের সহজলভ্যতার কারণে স্থানীয় দরিদ্রদের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় প্রভাবই চিহ্নিত করা হয়। সেখানে প্রচুর পরিমাণে শরণার্থী সহায়ক শ্রমিক হিসেবে স্থানীয়দের জমির জন্য অস্থায়ীভাবে উপকৃত করে। ফলে এই শরণার্থীরা স্থানীয়দের আরও পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অন্যদিকে, স্থানীয় দরিদ্র যারা নিজেরাই শ্রম দিচ্ছেন তাদের চাকরির বাজারে আরও প্রতিযোগিতা দেখা যায় এবং বেঁচে থাকার জন্য তাদের মজুরি হ্রাস করতে বাধ্য হয় (Chambers, 1986, p. 250-251)। তাদের ভাষা দক্ষতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার শরণার্থীদের স্থানীয় শ্রম বাজারে প্রতিযোগিতা তৈরি করতে সক্ষম করে তোলে। এছাড়া বর্ধিত পরিমাণ শ্রমবাজারে সরবরাহ বাড়িয়ে তোলে এবং শরণার্থীরা কম মজুরি নিয়েও কাজ শুরু করে, এতে সাধারণত স্থানীয়দের মজুরি হ্রাস পায়। তানজানিয়ায় পরিচালিত বিশ্লেষণে কৃষি শ্রমিক এবং উৎপাদনকারীদের মধ্যে দেখা যায় কৃষি শ্রমে প্রতিযোগিতা

বৃদ্ধির কারণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে উৎপাদকরা শ্রমের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং শরণার্থীদের কাছ থেকে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির অপব্যবহার করতে এবং একই সময়ে দক্ষ শ্রমিকরাও লাভজনক হতে পারেন। জাতীয়-আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দ্বারা সরবরাহ প্রসারের কাজের সুযোগের কারণে স্ব-কর্মসংস্থানযুক্ত লোকেরা প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে নেতিবাচকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় (Ruiz and Vargas-Silva, 2013)। শরণার্থীদের প্রবাহটি যৌক্তিকভাবে শ্রমের সরবরাহ বৃদ্ধি করে, যা কম দক্ষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে মজুরি হ্রাস করে। তবে, স্থানীয় দক্ষ শ্রম একটি সংকটের সাথে জড়িত আন্তর্জাতিক উপস্থিতি থেকে উপকার ভোগ করতে পারে। অধিকন্তু, শরণার্থীরা কোনো এলাকায় পৌঁছানোর ফলে সেখানে শ্রম সরবরাহে একটি শূণ্যতা থাকে তাহলে স্থানীয় শ্রম বাজারে মজুরির কোনো নেতিবাচক প্রভাব ছাড়াই অংশ নিতে পারে (Sood and Seferis, 2014)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ শ্রম বাজারে সরবরাহ বাড়ায় এবং শরণার্থীরা নিম্ন মজুরিতেও কাজ করতে থাকে এতে সাধারণত মজুরি হ্রাস পায়। একই সাথে দক্ষ শ্রমিকরাও লাভজনক, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থার দ্বারা সরবরাহকৃত চাকরির সুযোগের কারণে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হন; ফলে তখন নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয় (Ruiz and Vargas-Silva, 2013)। শরণার্থীদের মানবিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা এড়ানোর জন্য চাকরি খোঁজার গুরুত্ব বুঝতে পারে। এর পাশাপাশি জনসেবা ও অবকাঠামোর ওপর প্রভাবকে তুলে ধরে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর নেতিবাচক চাহিদাগুলি সন্নিবেশ করতে সক্ষম হয় না (Dadush and Niebuhr, 2016)।

৩.৪.১.৪ খাবারের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি

শরণার্থী উপস্থিতিতে খাবারের চাহিদা নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শরণার্থী আগমনের শুরুতে বিপুল সংখ্যক মানুষ সাধারণত স্থানীয় উৎস থেকে খাবার সংগ্রহ করে। বিপুল সংখ্যক শরণার্থী উপস্থিতির ফলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন হয়। এতে খাদ্য পণ্যের বেশি চাহিদা হওয়ায় সরবরাহে ঘাটতি সৃষ্টি করে এবং স্বাভাবিকভাবেই দাম আরও বৃদ্ধি হয়। উচ্চ মূল্যের প্রভাবে স্থানীয় সম্প্রদায় সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। অন্যদিকে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং খাবার সরবরাহকারী মালিকদের উচ্চতর দামের সুবিধা শরণার্থীদের ত্রাণ সহায়তা না দেওয়ায় অতিরিক্ত খাদ্যমূল্যের কারণে জীবিকা নির্বাহের সমস্যার বিষয়ে আরও পুনর্বিবেচনা করা হয় (Chambers, 1986)। শরণার্থীদের সহায়তায় ত্রাণ বা খাদ্য পণ্য সরবরাহ হলেও প্রভাবটি অন্যরকম হতে পারে। যখন ত্রাণ ও পণ্যগুলো প্রচুর পরিমাণে আসে, স্থানীয় খাদ্য সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস করার সাথে সাথে খাদ্যের দাম হ্রাস পায়। স্থানীয় দরিদ্র লোকেরা এ পরিস্থিতি থেকে উপকার পেতে পারে। চেম্বার দেখিয়েছে যে, শরণার্থীদের প্রভাব খাদ্যের চাহিদার ওপর পরিবর্তিত হতে পারে (Chambers, 1986, p. 250)। অন্যদিকে কখনও কখনও স্থানীয় মানুষেরা শরণার্থীদের পাশাপাশি তাদেরকে সহায়তা প্রদানের জন্য সমানভাবে যোগ্য প্রাপক হিসাবে বিবেচনা করেন। এই বিবেচনা শরণার্থী এবং স্থানীয় মানুষের মধ্যে উত্তেজনার একটি ধারণা জন্ম

দিতে পারে (Mogire, 2011, p. 5)। শরণার্থীদের আকস্মিক প্রবাহ মৌলিক পণ্য হিসেবে খাদ্য চাহিদা বাড়ায়। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে (১৯৯২-১৯৯৩) তানজানিয়ায় শরণার্থী শিবিরগুলোতে বিতরণ করা প্রায় ৭৫% খাদ্য রেশন স্থানীয় বাজারে বিক্রি হয় (Chambers, 1986, pp. 246-249; Whitaker, 1999; Whitaker, 1999)। খাদ্য সহায়তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অ-শরণার্থীদের জন্য বাজারে যাওয়ার পথ খুঁজে পায়। এই জাতীয় স্থানীয় বাজার এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রগুলো স্থানীয় এবং শরণার্থী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সামাজিক প্রভাব ফেলতে পারে; যেখানে পারস্পরিক সুবিধার সম্ভাব্য পরিণতি হতে পারে (Chambers, R. 1986: P. 250)। স্থানীয় বাজারে কিছু খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ে; তবে এই ঘটনাটি সব ধরণের খাদ্য সামগ্রীর জন্য প্রযোজ্য নয়।

৩.৪.১.৫ কৃষি ব্যবস্থা

শরণার্থী আগমনে নতুন নতুন বসতি স্থাপনের ফলে কৃষি জমির ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এছাড়া খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং শিবির উন্নয়নের মাধ্যমে জমি হ্রাসের ফলে চাষের জমি, চারণভূমি, গাছপালা কমে যায়; খাদ্য ও পানি শোষণের ফলে কিছু ফলাফল পাওয়া যায়। শরণার্থী উপস্থিতির ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবর্তন হতে পারে। বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত অর্থনৈতিক পর্যালোচনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শরণার্থী ক্যাম্পের অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে, যা উভয় ইতিবাচক এবং নেতিবাচক হতে পারে। স্থানীয় পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে স্থানীয়দের নতুন বাজারের সুযোগের জন্য কিছু ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। একই সাথে ক্ষতিকারক সংস্থার প্রতিযোগিতায় অন্যদের জন্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে তানজানিয়ায় শরণার্থী ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা দেখা যায় যে, শরণার্থীদের কাছ থেকে বর্ধিত খাদ্য চাহিদার (খাদ্য সহায়তা ছাড়া) মাধ্যমে কৃষির সুযোগের সাথে স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। অপরদিকে স্থানীয় অ-কৃষকগণ খাদ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় (Alix-Garcia and Saah 2009, p. 166-167)। শরণার্থী-আশ্রয়দানকারী দেশগুলোর অর্থনীতিতে মারাত্মকভাবে অবনতি ঘটে, কৃষিতে দ্রুত উৎপাদন হ্রাস, সামাজিক সেবার ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যয় বৃদ্ধি এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় (UNHCR, 1997)। তানজানিয়ায় পরিচালিত বিশ্লেষণে কৃষি শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধি প্রতিযোগিতার কারণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এতে শ্রমিকদের বর্ধিত সরবরাহ এবং পণ্যগুলোর চাহিদা বাড়িয়ে তুলে।

৩.৪.১.৬ ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ

শরণার্থী উপস্থিতির কারণে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এর ফলে স্থানীয়দের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কারণ এ সকল ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সবই ছিল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর। কিন্তু শরণার্থী উপস্থিতির ফলে স্থানীয়দের এ সম্পদগুলো নষ্ট বা

হাতছাড়া হবার ভয়ে উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদ লাভের প্রতিযোগিতা বাড়তে পারে (Chambers, 1986: p. 252)। তানজানিয়া থেকে বিভিন্ন প্রভাবগুলোর ওপর চেম্বারের যুক্তিটি পরীক্ষামূলক গবেষণার দ্বারা সমর্থিত যেখানে শরণার্থীরা কৃষি, নির্মাণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আশ্রয়দানকারী দেশে সস্তা শ্রম সরবরাহ করে (Maystadt and Verwimp P. 2009)। চেম্বারস দাবি করেন যে, যেখানে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদগুলো দুর্বল। সেখানে অভিজ্ঞ স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোর জন্য এই সংস্থার ওপর প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে তুলতে পারে (Jacobsen, 2002, pp. 10-11)। সাধারণ সম্পদগুলোর জন্য প্রতিযোগিতা (সিপিআর) অনুসারে শরণার্থী এবং স্থানীয়দের মধ্যে একটি সাধারণ সম্ভাব্য দ্বন্দ্বমূলক সমস্যা কাজ করে (Maystadt and Verwimp P. 2009, pp. 253-254)।

৩.৪.১.৭ জীবিকার সন্ধান

দরিদ্র লোকেরা প্রায়শই তাদের জীবিকার জন্য কর্মসংস্থানের সন্ধানে বাহির হয়। জীবিকার জন্য অনেক সময় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ কর্মসংস্থানসমূহ শরণার্থীদের সাথে ভাগ করে নেয়। তাই এ অবস্থায় জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। এ পরিস্থিতিতে শরণার্থীরা যখন ত্রাণ সহায়তা না পায় তখন জীবিকা নির্বাহের সন্ধানে বের হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বাধার সম্মুখীন হয় (Porter et al., 2008, p. 237)। বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে শরণার্থী পরিস্থিতি বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে আফ্রিকায় ইতিমধ্যে বেকারত্ব বাড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এই বেকারত্বের চ্যালেঞ্জে ফলে অনেকের মধ্যে অলসতা, হতাশা এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব কাজ করে। হতাশা-আগ্রাসন তত্ত্বসমূহ পরামর্শ দেয় যে, ব্যক্তি যখন হতাশাবোধ করে; তখন তারা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। তারা বিশ্বাস করে এমন কিছু যা তাদের একটি প্রবল ইচ্ছা পূরণে বাধা দিচ্ছে। এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যুক্তি যে এই হতাশা এবং আগ্রাসন আপেক্ষিক বঞ্চনার কারণে হতে পারে (Homer-Dixon, 1991; Davies, 1970)। যখন মানুষ তাদের অর্জিত সন্তুষ্টির স্তরের মধ্যে বিস্তৃত ব্যবধান অনুভব করে (অর্থনৈতিকভাবে সংজ্ঞার শর্তাবলী) এবং সে স্তরে তারা বিশ্বাস করে যে শুধু তারাই এসব সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। শরণার্থী এবং স্থানীয়দের মধ্যে খাবারের রেশন নিয়ে তাদের মধ্যে বেশ মারাত্মক ঝগড়াও হয়। শরণার্থীরা ভাবে যে স্বাগতিকরা অযাচিতভাবে উপকৃত হচ্ছে। সম্ভবত এটির কারণ শরণার্থীরা আঘাতমূলক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দিন পার করে যার ফলে বাড়িঘর, প্রিয়জন এবং চাকরি হারিয়ে ফেলে। শরণার্থীদের (মহিলাদের) জন্য এই ধরনের পরিস্থিতিতে টিকে থাকার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং নিয়মিত বিষয় হলো শোষণমূলক যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে বাণিজ্যিক পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে অথবা উপপত্নীর মাধ্যমে যেখানে একজন নারী নিয়মিত যৌন সম্পর্কের কারণে পণ্য এবং উপহার গ্রহণ করে। এখানে কিছু ইঙ্গিত রয়েছে, তরুণ শরণার্থী পুরুষরাও যৌন শোষণমূলক সম্পর্কের শিকার হতে পারে। ঘানার শরণার্থী বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে শরণার্থী নারীরা বিশেষ করে পুরুষদের সাথে সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীলতার জন্য নিজেদেরকে

আর্থিকভাবে টিকিয়ে রাখার এবং তাদের মূল্যবান বিলাসবহুল সামগ্রীর ভোগ করার উপায় হিসাবে সংবেদনশীল হয়। ফলস্বরূপ, শিবিরে অনেক যুবতী বা কিশোরীরা গর্ভাবতী হয় এবং তাদের এ সকল সন্তান হয় অতিরিক্ত বোঝা। শরণার্থী জনবসতি বিশেষ করে বুদুবুরাম শিবিরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শরণার্থী মহিলারা পতিতাবৃত্তির জন্য যৌনকর্মী হিসেবে পরিচিত যা তাদের আয়ের সবচেয়ে সহজ উৎস। লাইবেরিয়ার শরণার্থী নারীরা যৌন দাস বিক্রয় করছে বা সেক্স ক্লাবে কাজ করছে তা উপেক্ষা করা কঠিন কারণ দক্ষিণ ঘানার দুইজন প্রধান তথ্যদাতা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন (Dick, 2002)।

৩.৪.২ সামাজিক প্রভাবসমূহঃ

শরণার্থী উপস্থিতির ফলে স্থানীয় সমাজে হঠাৎ অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। শরণার্থী উপস্থিতিতে স্থানীয় সমাজের মানুষের সাথে পরিচয়, সম্পর্ক, আত্মীয়তা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়ে থাকে। এতে করে স্থানীয় মানুষের জীবনে বিভিন্ন ধরণের অভিঘাত দেখা দেয়। এই অভিঘাতসমূহ স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য এক ধরণের সামাজিক প্রভাব যা নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

৩.৪.২.১ স্থানীয় সম্প্রদায় এবং শরণার্থী জনসংখ্যার মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত

স্থানীয় সমাজে জনসংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি হওয়ায় তানজানিয়া এবং গণতান্ত্রিক কঙ্গোতে শরণার্থী এবং সংঘাত প্রসারের মধ্যে একটি যোগসূত্র উপস্থাপন করা হয়েছে (Whitaker, 2003)। গবেষণাটির একটি অংশে গবেষক জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মানুষের আদি বা নিজস্ব দেশ থেকে তাদের আশ্রয়দানকারী দেশে সংঘাতের সূচনা করে কিনা তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। শরণার্থী ও সংঘাতের মধ্যে যোগসূত্রের পূর্ববর্তী দাবিটি সত্য কিনা এবং কী কী পরিস্থিতি দায়ী ছিল; তা খতিয়ে দেখার জন্য গবেষণা প্রশ্নে আরও জোর দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৪ সালে কঙ্গোতে আশ্রয় নেয়া রুয়ান্ডার শরণার্থীদের তানজানিয়ায় গ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে তানজানিয়ায় যে রুয়ান্ডার শরণার্থীরা চলে এসেছিল তারা শান্তিপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং স্বাগতিক দেশে কোনোও বিরোধ শুরু করেনি। দুটি কেস অধ্যয়ন করার পরে বেশ কয়েকটি অনুমানকে সামনে রেখে যুক্তি এসেছে। এই বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করার সময় আশ্রয়দানকারী দেশের ঘরোয়া রাজনীতি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়। এ গবেষণার জন্য হুইটেকার প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করেছিলেন এবং উপসংহারে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে শরণার্থীরা তাদের সাথে সংঘাত বয়ে আনে না বরং স্থানীয় রাজনৈতিক এবং অন্যান্য গতিবিধি আশ্রয়দানকারী দেশে সংঘাতের জন্ম দেয়। তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন যে, কীভাবে এক দেশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রায়শই অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোতে সংঘাত উদ্ভবের সম্ভাবনা তীব্র করে তোলে। পূর্বের গবেষণার ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়েছে; যেখানে গবেষকগণ এ সংঘাত ঠিক কীভাবে ঘটে তা ব্যাখ্যা করেননি (Salehyan, Idean and Gleditsch. 2006)। বিরোধের কারণ উদ্ঘাটিত করার দাবি করেছে যা দ্বন্দ্বের বাড়তি প্রভাবকে

এবং শরণার্থীদের যাঁরা একটি দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি জমায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছে।

শরণার্থীদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা যে কোনোও ধরণের সংঘর্ষে অনাহুত থাকে। তবে কিছু শরণার্থী-বিদ্রোহী নেটওয়ার্ক তৈরি করে এবং তাদের জন্মের দেশে এবং আশ্রয়দানকারী দেশে সহিংসতা প্রভাবিত করে। এ ক্ষেত্রে শরণার্থীরা দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পক্ষে এবং সংখ্যাগত পরিবর্তনে অবদান রাখে। এতদ্ব্যতীত, তারা অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করে যার ফলস্বরূপ সংঘাতের সম্ভাবনা বাড়ায়। অন্যান্য প্রভাবের পাশাপাশি শরণার্থীদের চলাচল আন্তঃদেশীয় দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। শরণার্থী শিবির নির্মিত হলে শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন সম্পর্ক তৈরি হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা এবং দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি বিভিন্ন কারণে বিদ্যমান থাকে। উগান্ডাতে তুতসি শরণার্থীদের অভিজ্ঞতার কারণে ১৯৯০ সালে গঠিত হয়েছিল রুয়ান্ডান প্যাট্রিয়টিক আর্মি (আরপিএ) এবং তারা উত্তর রুয়ান্ডা আক্রমণ করে (Lomo and Hovil, 2001)। আফ্রিকায় দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক নিরাপত্তা, সহিংসতা এবং শরণার্থী-স্থানীয় জনসংখ্যার মধ্যে ঘন ঘন দ্বন্দ্ব দ্বারা বৈশিষ্ট্যযুক্ত করেছে (Crisp, 2003, pp. 9-15)। শরণার্থী এবং স্থানীয় জনসংখ্যার মধ্যে সংঘর্ষের কারণ অনেক জটিল। এটি প্রাথমিক প্রবাহ পর্যায়ে উত্তেজনা তৈরি করে যা সাধারণত দুই এলাকায় চিহ্নিত হয় (Crisp, 2003, p. 15)। প্রথমটি নির্ভর করে যে স্থানীয়রা শরণার্থীদের প্রদত্ত প্রকল্প এবং পরিষেবাদি থেকে তাদের সুবিধাগুলো অর্জন করতে চায়। অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর ওপর নির্ভরশীল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাপ বাড়ানোর ফলে তাদের তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের আরেকটি সম্ভাব্য উৎস। যখন শরণার্থীরা নতুন কোনো এলাকায় পৌঁছায় তখন শরণার্থী এবং স্থানীয় সম্প্রদায় উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির নিরাপত্তা সমস্যার ঝুঁকি থাকে (Jacobsen, 2002, p. 6; Crisp, 2003)। স্থানীয় সংঘর্ষ ও সহিংসতার ফলে সংগঠিত অপরাধ, মাদক চোরাচালান ও মানব পাচারের দ্বন্দ্বসমূহ বিস্তৃত হতে পারে (Jacobsen, 2002, pp. 8-9)। একটি দুর্বল অর্থনৈতিক এলাকার সম্পদগুলোতে আরো চাপ প্রয়োগে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থনৈতিক সমস্যা তৈরি করতে পারে। তবুও শরণার্থী প্রবাহের অর্থনৈতিক প্রভাবগুলো প্রায়শই মিশ্র হয় কারণ শরণার্থীরাও তাদের সম্পদসমূহ আনতে পারে বা ঐ অঞ্চলে অর্থনৈতিক উদ্দীপনায় অবদান রাখে (Jacobsen, 2002, pp. 10-11)। শরণার্থী ক্যাম্পসমূহ প্রতিষ্ঠিত হলে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো প্রায়শই দুর্লভ হয় এবং শরণার্থী শিবির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এই সংস্থানগুলিতে আরো চাপ সৃষ্টি হয়; যা দুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বের লক্ষণ হিসেবে কাজ করে (Martin, 2005, pp. 330-331; Jacobsen, 2002, p. 11)। সাধারণত স্থানীয় জনসংখ্যা এবং শরণার্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এমন বিভিন্ন প্রভাবসমূহের সমন্বয় ঘটে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবসমূহও এই জটিল পরিস্থিতিতে ভূমিকা পালন করতে পারে। শরণার্থী ক্যাম্পে ইউএনএইচসিআর খাদ্য ও আবাসন সরবরাহ করে থাকে, যখন স্থানীয় কমিউনিটিসমূহ প্রায়ই

দূরবর্তী এলাকায় অবস্থিত তাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে সংগ্রাম করে (UNHCR, 2012 b.)। জ্যাকবসেন, কেনিয়া (দাদাব ও কাকুমা) শরণার্থী ক্যাম্পে সংঘটিত সহিংসতার পরিমাণ চিহ্নিত করে পরিমাপ করতে অসম্ভব বলে বর্ণনা করেছেন। সেখানে মৃত্যু ও গুরুতর আঘাতের দৈনন্দিন ভিত্তিতে শরণার্থী ক্যাম্পের মধ্যে নিরাপত্তা এবং ভয় ছিল। সাধারণত শরণার্থীদের আন্দোলনে সীমাবদ্ধতা থাকে যখন ক্যাম্পের মধ্যে নিরাপত্তার সমস্যা হয় (Crisp, 2003, p. 14-15)। এছাড়ও শরণার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে সহিংসতা ও সংঘর্ষের ঘটনাবলি ক্যাম্পের বাইরেও উপস্থিত হয়। এই পরিস্থিতিতে যদি সংস্থাগুলো সহায়তার সময় পায় তবে শরণার্থীদের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকা বা সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য প্রলুব্ধ করতে পারে। তাই স্থানীয়দের সাথে এই ধরনের সংস্থানসমূহের ওপর ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার ফলে সম্ভাব্য উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে (Loescher & Milner, 2006, pp. 8-9)।

৩.৪.২.২ সামাজিক পরিষেবা

সামাজিক পরিষেবার শর্তাবলী স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা যেমন স্কুল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নয়নের মাধ্যমে সহায়তা করা হয়। শরণার্থী প্রবাহের প্রাথমিক পর্যায়ে এটি শরণার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। যদিও দীর্ঘ মেয়াদে তারা স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোতেও সুবিধা আনতে পারে কারণ তারা এই পরিষেবাদিতে আরো সুযোগ পেতে চায় (Chambers, 1986, pp. 252-253)। একটি উন্নয়ন প্রতিবেদন চেম্বারের যুক্তিসমূহকে সমর্থন করে যে, শরণার্থীরা স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোতে সামাজিক পরিষেবাগুলো গ্রহণে প্রায়শই উন্নত হয়। চেম্বার ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকের মেক্সিকোতে এ অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেন (World Bank, 2011, pp. 16-17)। একইভাবে ইউএনএইচসিআর এর মতে শরণার্থীদের স্বাস্থ্য সেবা ও স্যানিটেশন উন্নতি করা জরুরি। তানজানিয়ায় শরণার্থী ক্যাম্পের তথ্য (১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের এর মধ্যে) থেকে জানা যায় যে প্রায় ৩০% স্বাস্থ্যসেবায় সুবিধাভোগী ছিল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ (Maystadt and Verwimp P. 2009, p. 8)। যদিও জীবিকা নির্বাহে শরণার্থীদের উদ্যোগসমূহ খুব টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব ছিল। তবুও এই উদ্যোগগুলো ভুলভাবে ব্যাখ্যা এবং উপেক্ষা করা হয়। পূর্ববর্তী গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে শরণার্থীরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কারণসমূহে প্রভাব ফেলে। এই প্রভাবগুলোর মধ্যে রয়েছে খাদ্য, শ্রম ও মজুরি, সাধারণ সম্পদ, অর্থনীতি, সুরক্ষা, উন্নয়ন এবং পরিবেশ প্রভৃতি। মার্টিনের শরণার্থী এবং পরিবেশের মধ্যে দ্বন্দ্বের ওপর ধারণামূলক মডেল আশ্রয়দানকারী সম্প্রদায়ের বিবেচনায় ছিল (Martin, Adrian, 2005)। এটি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ ও ঘাটতি-অনুপ্রাণিত অনিরাপদ প্রশস্তকরণ অবদান রাখতে; জাতিগত পার্থক্য এবং বৈষম্য অপ্রতিরোধ্য দ্বন্দ্ব তৈরি করে।

৩.৪.২.৩ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম

শরণার্থীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে অনেক ধরণের গবেষণা হয়েছে। তাই কোনো শরণার্থী অবস্থিত এলাকায় তাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সুদানে আশ্রয় গ্রহণকারী উগান্ডার শরণার্থীদের জন্য পরিচালিত মানবিক সহায়তা পরিকল্পনায় প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিতরণ পর্যন্ত বিস্তৃত কার্যক্রম নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে এবং শরণার্থীদের ওপর প্রদত্ত সাহায্যের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে (Harrell-Bond, 1986)। এ গবেষণায় মানবিক সহায়তা সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল; যখন সেই সংস্থাগুলো তাদের কাজের নৈতিকতা সম্পর্কিত কোনোও ধরণের সমালোচনা থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্তি ভোগ করছিল। এতে আশ্রয়দানকারী দেশে শরণার্থীদের বসতি স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এটি করার ক্ষেত্রে মানবিক সহায়তা সংস্থার ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আফ্রিকার শরণার্থীদের সাথে সম্পর্কিত মানবিক প্রতিক্রিয়ার সমস্যাগুলো পরীক্ষা করে শরণার্থীদের মর্যাদা সম্পর্কিত ১৯৫১ সালের জাতিসংঘের সম্মেলনের ওপর ভিত্তি করে 'শরণার্থী' সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হয়। আফ্রিকান বাস্তবতা অবলম্বন করার জন্য 'আফ্রিকান ঐক্য' প্রসারিত করে (Mutongu, 2017a.)। আন্তর্জাতিক সহায়তায় শরণার্থীদের নির্ভরতা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা এবং স্বাগত জনগোষ্ঠীর ওপর শরণার্থীদের আর্থিক সুরক্ষার প্রভাবকেও উদ্ঘাটন করা হয়েছে। জাতিসংঘের ভূমিকা এবং শরণার্থী ও স্থানীয় সম্প্রদায় পরিচালনায় তার প্রভাবও প্রতিফলিত হয়েছে।

৩.৪.৩ পরিবেশগত বিষয়সমূহ:

শরণার্থী উপস্থিতির ফলে স্থানীয় সমাজে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বসবাস করায় ঐ স্থানের পরিবেশগত বিভিন্ন ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারে। এতে স্থানীয় পরিবেশ বিশেষ করে বনাঞ্চল ধ্বংস, জ্বালানী সংকট ও ভারসাম্যহীন পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ফলে স্থানীয় মানুষের জীবনে বিভিন্ন ধরণের অভিঘাত দেখা দেয়। এই অভিঘাতই হলো স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য পরিবেশগত প্রভাব যা নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

৩.৪.৩.১ প্রাকৃতিক পরিবেশ

শরণার্থী উপস্থিতিতে স্থানীয়দের পরিবেশগত বিষয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ হলো এর একটি মারাত্মক পরিণতি রয়েছে (Mbakem, 2017a.)। Mbakem, কঙ্গোর স্থানীয় সম্প্রদায় এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মানুষদের মধ্যে পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাবগুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি কঙ্গোতে বসবাসকারী শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈরী সম্পর্কের জোর দিয়েছেন। তথ্য সংগ্রহে মিশ্র পদ্ধতির প্রশ্নমালা জরিপ ও নিবিড় স্বাক্ষাৎকার এর ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি উপস্থাপন করেছেন যে আশ্রয়দানকারী দেশে চলমান অবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক সহিংসতার পাশাপাশি জীবিকা ও সম্পদের অনিশ্চয়তা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতদের প্রতি তিক্ততার তীব্রতা বাড়িয়ে তোলে। যদিও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ তাদের নির্দিষ্ট সহযোগিতা

প্রদানে চুক্তিবদ্ধ হয়। Mbakem, জীবিকার সংস্থান এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের মধ্যে আন্তঃনির্ভরশীল সম্পর্কের গভীরতা বোঝার প্রস্তাব দিয়েছে। জীবিকা নির্বাহে শরণার্থীদের উদ্যোগসমূহ খুব একটা টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব নয়। অথচ স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং শরণার্থী সম্পর্কের ক্ষেত্রে টেকসই পরিবেশ একটি মূল ভূমিকা রাখে। পূর্ববর্তী গবেষণায় এটি প্রমাণিত হয়েছে যে শরণার্থীরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ন্যায় প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রভাবও স্পষ্ট করেছে। এই প্রভাবসমূহের মধ্যে রয়েছে খাদ্য, শ্রম, মজুরি, সাধারণ সম্পদ, অর্থনীতি, সুরক্ষা, উন্নয়ন এবং পরিবেশ। অনেক গবেষণায় এগুলোর প্রভাবসমূহকে ব্যাখ্যাও করা হয়েছে Alix-Garcia and Saah. (2010)a; UNHCR. (1996); Martin, Adrian, (2005a); Porter et al., (2008); Ruist, Joakim. (2015; Chambers, R. (1986); Mogire, Edward. (2011)। এর একটি উদাহরণ হলো অতিমাত্রায় কাঠ ব্যবহারের ফলস্বরূপ রিপাবলিক অফ কঙ্গোতে শরণার্থীদের দ্বারা বন উজাড় হয়েছে (Mbakem, 2017a, p. 371; Mogire, 2011, p. 2)। অনুসন্ধানগুলো কেনিয়া এবং তানজানিয়ার ক্ষেত্রেও একই রকম। শরণার্থী আগমনে পরিবেশ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব পড়ে (UNHCR, 1996; Martin, 2005a, p. 332)।

নতুন আগত শরণার্থীদের শিবির তৈরি এবং প্রাথমিক জীবন-যাপনের জন্য জমি, জলাশয় এবং কাঠের প্রচুর যোগানের প্রয়োজন হয়। এছাড়া শরণার্থীদের দ্বারা পরিবেশের ওপর প্রভাবগুলো হলো-ক) প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় খ) পরিবেশের ওপর অপরিবর্তনীয় ক্ষয়ক্ষতি গ) স্বাস্থ্যগত প্রভাব ঘ) সামাজিক পরিস্থিতির ওপর প্রভাব ঙ) স্থানীয় জনসংখ্যার ওপর সামাজিক প্রভাব এবং চ) অর্থনৈতিক প্রভাব (UNHCR, 1996, p. 5)। ইউএনএইচসিআর ব্যাখ্যা করে যে পরিবেশগত প্রভাবগুলো অন্যান্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবগুলিকেও প্রভাবিত করে এবং প্রায়শই স্থানীয় জনগোষ্ঠী শরণার্থীদের সাথে সমানভাবে প্রভাবিত হয়। পরিবেশগত অবক্ষয়ে শরণার্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে সর্বাধিক জনপ্রিয় বিতর্ক হলো শরণার্থীর সংখ্যা। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর শরণার্থীদের প্রভাব নিয়ে পূর্ববর্তী গবেষণার বেশিরভাগই প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়েছে Porter et al., (2008, pp. 230-252); Mogire, (2011); Harrell-Bond, (1986); Chambers, (1986, pp. 245-263)।

৩.৪.৩.২ বন এবং জ্বালানী কাঠ

হুইটেকারের মতে, আফ্রিকার বেশিরভাগ অংশে অনেক শরণার্থী বসতি অবস্থিত রয়েছে। এখানে পরিবেশগত অবক্ষয় এবং শরণার্থীদের আগমনের আগেই মরুভূমি একটা সমস্যা হিসেবে ছিল (Whitaker, 2002)। ঘানা পরিস্থিতি বিশেষত উত্তরের জনবসতিগুলোর এই পর্যবেক্ষণের বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যতিক্রম নয়। এ অঞ্চলে গাছগুলো জ্বালানীর প্রাথমিক উৎস, বন উজাড় একটি গুরুতর বিষয়; যা স্থানীয় জনসংখ্যা এবং শরণার্থী উভয়ের জন্যই সমস্যা হয় (UNHCR, 2005)। ঘানায় পরিবেশগত সুরক্ষা সংস্থা (ইপিএ) বনাঞ্চলে প্রবেশ এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে উপ-

আইন রয়েছে। তবে এই আইনগুলো প্রায়শই উপেক্ষা করা হয় এবং এতে নিযুক্ত কাঠকয়লা পোড়ানোর জন্য জ্বালানী কাঠ নির্বিচারে কাটা হয়। জ্বালানীর জন্য কাঠ এবং কাঠকয়লার কম দাম, সহজলভ্যতা এবং বাজারের প্রস্তুত থাকার কারণে মানুষ বেশি পছন্দ করে। শরণার্থী এবং স্থানীয় উভয়ই রান্না এবং খাবার গরম করার জন্য জ্বালানী কাঠ এবং কাঠকয়লার ওপর নির্ভর করে। শরণার্থী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিরোধের কেস স্টাডি খুঁজে পায় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এটি দ্রুত ঘটে এবং এতে স্থানীয় সংস্থানগুলোতে অতিরিক্ত চাপ হয় (Martin, 2005)। শরণার্থীদের আগমনে বনজ সম্পদ কর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; যা প্রত্যাশার চেয়েও তুলনামূলক বেশি এবং বিস্তৃত হতে পারে। 'ব্যতিক্রমী সংস্থান ব্যবহারকারী' হিসেবে শরণার্থীদের উপলব্ধি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনও জনপ্রিয় (Martin, 2005)।

দক্ষিণ ঘানার বুদুবুরাম শরণার্থী শিবিরে অন্যতম জনপ্রিয় কাঠকয়লা বিক্রেতার বক্তব্য ছিল: 'শরণার্থী আগমন এ অঞ্চলে জ্বালানী কাঠ এবং কাঠ কয়লার চাহিদার পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় (Whitaker, 2002)। ঘানার বিভিন্ন অংশে বন ধ্বংসে পরিসংখ্যানগত প্রমাণ পাওয়া সম্ভব হয়নি। অন্যান্য গবেষণায়ও দেখা গেছে জ্বালানী কাঠ এবং কাঠ কয়লার কারণে বনের ধ্বংস হতে পারে (Chambers, 1986)। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে, সোমালিয়ান শরণার্থী পরিস্থিতিতে একটি শিবিরের শরণার্থী মহিলাদের ছয় থেকে আট কিলোমিটার পর্যন্ত আগুনের কাঠ সংগ্রহ ও বন উজাড় করে। কেস স্টাডিতে আইভরি কোস্টে দেখায় যায় প্রতি বছর কৃষির জন্য জমি কমার মাধ্যমে এই অঞ্চলটি উচ্চহারে বাসস্থান হারাতে বসেছে। এটি খাদ্যের ওপর এ অঞ্চলের পরিস্থিতি বিশেষত স্থানীয় দরিদ্রদের জন্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। জ্বালানী কাঠের চাহিদার কারণে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বনাঞ্চলে দখল রয়েছে এবং শরণার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি সম্ভব হয়। Chambers-এর রচনায় 'লুকানো লোকেরা' যথাযথভাবে নির্দেশ করেছে যে প্রায় সমস্ত কিছুতে শরণার্থীদের উপস্থিতির কারণে স্থানীয়রা হেরে যায়। কাঠ কেবল জ্বালানী শক্তি হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না। এ কাঠ ঘর এবং অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীতেও ব্যবহৃত হয়; বিশেষত অসংখ্য শরণার্থীর আবাসন কাঠামোতে। এর মধ্যে দিকনির্দেশনা হিসেবে আরও প্রমাণ দেয় যে সম্পদের চাহিদা অনুসরণ করে নাটকীয়ভাবে জনবসতি বৃদ্ধি পেতে পারে। কাঠের সংকট প্রমাণ করে যে শরণার্থীদের আগমনে স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর যথেষ্ট চাপ দেয়; যা পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব উভয়ের নেতৃত্ব দেয় (Martin, 2005)। যার মধ্যে প্রাসঙ্গিক হলো বনজ আমিষ, কৃষিজমির অবক্ষয় ও অতিরিক্ত ব্যবহার, জলের সরবরাহ সংকট, দূষণ এবং মাছের মজুদ হ্রাস পায়। যদিও হোমার-ডিকসন বলেন এই সমস্যাগুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, এর মধ্যে কিছু সমস্যা (বন উজাড় এবং জলের সরবরাহের অবনতি) ও সংঘাতসহ গুরুতর সামাজিক ব্যাঘাতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে উন্নত হয়। আদিসা পর্যবেক্ষণ করেছেন গ্রেট লেক অঞ্চলে স্পষ্টতই ক্যাম্পে বসতি স্থাপন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদ আরও হ্রাস পায় (Adisah, 1996)। স্থানীয় আশ্রয়দানকারী জনসংখ্যার সমন্বয় করতে এবং

জ্বালানী এবং সঙ্গে নির্মাণ কাঠের ঘাটতি সামলাতে হয়েছিল। এটি বিশেষ করে মহিলাদের এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য একটি অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে আরোপিত হয়। এর স্থায়ীত্বের ওপর পরোক্ষ প্রভাব স্থানীয় চাষ ও বনজ সম্পদ হ্রাস হিসেবে মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি সমানভাবে যথেষ্ট দূষণ এবং আশ্রয়দানকারী সম্প্রদায়ের ব্যবহারযোগ্য পানি ও সম্পদ ওপর যথেষ্ট ক্ষতি হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবেশগত এবং সামাজিক উভয় নেতৃস্থানীয় প্রভাব হয়। এছাড়াও ব্ল্যাক আরো ব্যাখ্যা করেন যে সম্পদের চাহিদা নেতৃস্থানীয় বসতি নির্মাণের প্রভাবে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে বনের কৃষি জমির দ্রুতগতিতে রূপান্তর, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, পয়োঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, জলের মাছ ধরা বা শিকার বৃদ্ধি পেতে পারে (Black, and Sessay, 1998)। শরণার্থী আশ্রয়দানকারী অঞ্চলের পরিবেশগত প্রভাবগুলো প্রায়শই বন উজাড়ের সাথে সম্পর্কিত যা শিবির ব্যাপস্থাপনার সময় ঘটে। আবাসন নির্মাণের জন্য কাঠ ব্যবহৃত হয় এবং রান্নার জ্বালানী হিসেবেও কাঠ ব্যবহৃত হয় (Mogire, 2011, p. 72)। জনসংখ্যার হঠাৎ বৃদ্ধি, বাড়ি নির্মাণ এবং রান্নার জ্বালানীর জন্য প্রচুর পরিমাণে কাঠ কাটার প্রয়োজন হয়। এর ফলস্বরূপ বনভূমি ধ্বংস হয়ে থাকে (Martin, 2005a, p. 332; Mogire, Edward. 2011, pp. 71-72)।

বার্মার অধিভুক্ত হওয়ার বহুকাল পূর্ব থেকে স্বাধীন আরাকানে বসবাসরত জনগোষ্ঠী, স্বাধীন রোসাঙ্গ রাজ্য, ও শাসকগোষ্ঠী, ইতিহাস-ঐতিহ্য ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ, অভিসন্দর্ভ ও গবেষণাধর্মী রিপোর্ট রয়েছে। যা থেকে স্বাধীন আরাকানের উপরোক্ত বিষয়সমূহে লিখিত তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়। নিম্নে এ সকল বিষয় পর্যালোচনার মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট এসব বিষয়ে একটি ধারণা পেতে সহায়ক হিসেবে এ সাহিত্য পর্যালোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপ

৩.৫ বার্মা: উপনিবেশ পূর্ব, উপনিবেশিক ও উপনিবেশ উত্তর আমলের পর্যালোচনা

Yegar, Moshe, (1972), *The Muslim of Burma: A Study of Minority Groups*, Hebrew University, Jerusalem গ্রন্থটি বার্মার মুসলিমদের ইতিহাস পর্যালোচনায় একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক রচনা হলেও গ্রন্থটিতে গবেষণা পদ্ধতি বা গবেষণার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা হয়নি। এ গ্রন্থের লেখক ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে ইসরাইলি দূতাবাসের সেকেণ্ড সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এসময় তিনি বার্মার মুসলিমদের ওপর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার জন্য বহু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে ইসরাইলের জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে গবেষণা অভিসন্দর্ভ হিসেবে তিনি '*The Muslim of Burma'* বিষয়টি নির্বাচন করেন। উক্ত বিষয়টির ওপর গবেষণা করতে গিয়ে তিনি বার্মা, ভারত এবং আরাকানের বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের সম্পাদিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং রচিত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য বার্মার বিভিন্ন জনপদে অবস্থিত মসজিদ এবং কবরস্থানসহ মুসলিমদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দর্শন করেন এবং স্থানীয় মুসলিমদের অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি প্রত্যক্ষ করেন। লেখক নবম শতাব্দীতে

মুসলিম নাবিকদের বার্মায় প্রথম অবতরণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের কাছে (মুসলিম) বার্মা নামে যে এলাকাটা পরিচিত ছিল তা নিম্ন বার্মার উপকূলীয় অঞ্চল ও আরাকান। তিনি এখানে মুসলিমদের অবস্থানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে চীনা ও মুসলিম পরিব্রাজকগনের ভ্রমণ বৃত্তান্তের আশ্রয় নিয়েছেন। এতে বার্মাসহ আরাকানে মুসলিমদের আগমন, আরাকান রাজদরবারে মুসলিম প্রভাব, রাজতন্ত্রের আমলে বার্মায় মুসলিমদের অবস্থা, ব্রিটিশ শাসনাধীনে মুসলিমদের অবস্থা ও স্বাধীনতা উত্তর বর্মী শাসকগণ কর্তৃক মুসলিম নির্যাতনের খন্ডিত চিত্রও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থটিকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এতে তিনি মুসলিমদের বার্মার ইরাবতী উপত্যকায় অভিবাসনের কথা উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে লেখক আরব মুসলিমদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ধারনা দিয়েছেন। মুসলিম নাবিকগণ নবম শতাব্দীতে বার্মায় প্রথম অবতরণ করেছে বলে উল্লেখ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্মী সেনা বাহিনীতে মুসলিমদের ভূমিকা সম্পর্কে হেনরী জুর প্রত্যক্ষ বিবরণ উল্লেখ করেছেন এভাবে- "গোলন্দাজ বাহিনীতে সদস্য সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত) জন। এদের মধ্যে প্রায় আশিজন আমরাপুরায় বসবাসরত ভারতীয় বংশোদ্ভুত। অবশিষ্টরা বর্মী, মণিপুরী এবং পাথি বা স্থানীয় মুসলিমান"। আরাকানে মুসলিম অভিবাসন শিরোনামে লিখিত অংশের শেষে তিনি বলেছেন, "রোহিঙ্গারা বৌদ্ধ পরিবেশের অভিঘাত থেকে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য রক্ষা এবং কেবলমাত্র ধর্ম নয় বরং সংস্কৃতির অন্যান্য দিকগুলোর ব্যাপারেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে"। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রিটিশ শাসনাধীনে বার্মায় ভারতীয় মুসলিমদের সমাজ, সংগঠন ও পুর্ণজাগরণ অন্দোলন বিষয়ক বর্ণনা করেছেন। মুসলিম সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন, মুসলিম কংগ্রেস, মুসলিম সংগঠন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বার্মার ভারতীয় মুসলিম, তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম ও আরাকানী মুসলিমদের অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। আর গোটা বার্মার মুসলিমদের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে আরাকান ও রোহিঙ্গাদের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্তই বর্ণিত হয়েছে। এর শেষে অধ্যায়ে প্রধান মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামের কিছু বিষয়ের আইনগত দিক অর্থাৎ বিচার, ওয়াকফ, অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত এবং তালাকের ব্যাপারে আর মুসলিমদের পরিসংখ্যান, পত্র-পত্রিকা এবং সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কেরও বর্ণনা আছে।

Younus, Dr. Mohammed, (1994), *A History of Arakan: Past & Present*, Magenta Colour, Chittagong এ গ্রন্থটিতে আরাকান ও রোহিঙ্গাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আরাকান রাজদরবারে মুসলিম প্রভাব, বার্মা কর্তৃক আরাকান দখল এবং আরাকানের সামরিক শাসন ও রোহিঙ্গা নির্যাতনের কিছু খন্ডিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রণীত এ বইটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থের শেষ অংশে আরাকান ও বার্মার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মানচিত্র, মুদ্রা, শিলালিপি ও মসজিদ এর ছবি সংযোজন করায় গ্রন্থটির মান বৃদ্ধি পেয়েছে। লেখক এ গ্রন্থটি দশটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। আরাকানের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাচীন আারাকানের রোহিঙ্গা ও মগ (রাখাইনদের) জনগোষ্ঠী

সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস তথা ধন্যাবাতী ও বৈশালী রাজ্য, আরাকানে ইসলামের আগমন, চন্দ্র বংশের সময় ভারতের মগদ (ভারতের প্রাচীন বিহার থেকে) বৌদ্ধদের আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ এবং এ সময় আরাকানে মোঙ্গল অভিযান সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন। আরাকানে ম্রাউক-উ বংশের সময় মুসলিম বিজয়, মুসলিম শাসকদের তালিকা ও শাসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আরাকান সাম্রাজ্যের পতন অর্থাৎ সান্দা থু ধাম্মার নিকট থেকে বোধপায়ার আরাকান বিজয়, শাহ শুজার আরাকানের বিয়োগান্তক ঘটনা এবং মোগলদের চট্টগ্রাম অধিকার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আরাকানে ম্রাউক-উ শাসনকালের সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে এবং বোধপায়ার আরাকান অধিকারের ইতিহাস রয়েছে। ব্রিটিশ অধিকারে বিভিন্ন পর্বে আরাকান ও বার্মার স্বাধীন হওয়ার কথা এবং স্বাধীনতা উত্তর আরাকানে মুজাহিদ আন্দোলন এবং আরাকানের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নাগরিকত্ব বিষয়ে এবং কেন এটি স্বাধীন রাষ্ট্র হয়নি তার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর বার্মার অধীনে আরাকান শাসন এবং সর্বশেষ আরাকানের সামরিক শাসনামলে রোহিঙ্গাদের ওপর পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনমূলক অপারেশান ও রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের প্রশ্ন নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

Razzaq, Abdur & Mahfuzul Haque, (1995), *A Tale of Refugees: Rohingyas in Bangladesh*, Centre for Human Rights, Dhaka এ গ্রন্থটি রোহিঙ্গা সমস্যা ও তাঁদের মানবাধিকার লংঘনের ওপর একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে পরিচিত। এতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে রোহিঙ্গাদের পরিচয়, শরণার্থী আশ্রয়নে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের ভূমিকা, মানবাধিকার লংঘন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনসহ বাংলাদেশ-মিয়ানমার ও বাংলাদেশ-UNHCR- এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারকের অনুলিপি সংযোজিত হয়েছে। তবে গ্রন্থটিতে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে এবং এতে কোনো কাল বিভাজনও নেই। লেখক এ গ্রন্থকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। এর মধ্যেতিনি রোহিঙ্গাদের আশ্রয়ের সন্ধান বিষয়ে আলোচনা করেছেন। লেখক মিয়ানমারে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সেখানকার রোহিঙ্গাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বার্মার বর্বরতার কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশে অবস্থিত রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের অবস্থা, এখানে রোহিঙ্গাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত দাঙ্গা ও এনজিওদের ভূমিকা বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইন সম্পর্কে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের ভূমিকার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সম্পর্কে লিখেছেন। এছাড়া এ সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার (যার সংক্ষিপ্ত নামে ইউএনএইচসিআর) উদ্যোগে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার একসাথে কাজ করার চুক্তি হয়েছে; যদিও মায়ানমার এক্ষেত্রে খুব বেশি এগিয়ে আসেনি। এখানে দেখা যায় বাংলাদেশের ওপর দু'ধরনের চাপ প্রথমত শরণার্থী আগমনের চাপ ও দ্বিতীয়ত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশসমূহের চাপ রয়েছে।

Karim, Abdul, (2000), *The Rohingyas: A Short Account of their History and Culture,* Arakan Historycal Society, Chittagong এ গ্রন্থখানি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস ভিত্তিক রচনা। এতে আরাকানের মুসলিমদের আগমন, রোহিঙ্গাদের ইতিহাস, আরাকানের রাজদরবারের উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তাদের বিবরণ, আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এবং ব্রিটিশ শাসনামলে আরাকানে রোহিঙ্গাদের অবস্থার সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থটি ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী লিখিত হলেও তাতে কাল বিভাজন সুস্পষ্ট নেই। আরাকানের ভৌগোলিক বিবরণ, বিদেশীদের আরাকানে আগমন এবং বেশ কিছু প্রাচীন মানচিত্র এবং দেশটির নাম নিয়ে আলোচনা রয়েছে। আরাকানে চার পর্বে মুসলিম আগমন বিষয়ে স্থান পেয়েছে। আরাকানের রাজসভায় মুসলিম মন্ত্রী, মুসলিম মন্ত্রীদের বিভিন্ন পদে থাকার বিষয় নিয়ে, এর মধ্যেরয়েছেন- প্রতিরক্ষামন্ত্রী বুরহান উদ্দিন ও লস্কর ওয়াজির, সৈয়দ মুসা, নবরাজ মজলিস (প্রধানমন্ত্রী) সৈয়দ মুহাম্মদ এবং পীর মাসুম শাহ প্রভৃতি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলিম, বার্মার বিভিন্ন অংশে প্রধান প্রধান নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মানচিত্র সংযোজন করেছেন, রোহিঙ্গা মুসলিমদের পরিসংখ্যান এবং আরাকানের প্রধান পাঁচটি নদীর তীরে রোহিঙ্গা মুসলিমদের বসবাস সম্পর্কে লিখেছেন। শেষ অধ্যায়ে ১৯৪৮ সালে বার্মার স্বাধীনতা অর্জনের পর রোহিঙ্গা মুসলিমরা তাদের অবস্থান ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় এবং তাদের ওপর বিভিন্ন নির্যাতন চালানো হয়। ফলে জীবনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বাংলাদেশে শরণার্থী আগমনের মানচিত্রসহ এদেশে জীবন যাপনের একটি পরিসংখ্যান দিয়েছেন লেখক। তাই এটি ইতিহাস ভিত্তিক তথ্যের আলোকে রচিত একটি সার্থক রচনা।

Maung Lu, Shew, (1989), *Burma in the Family of Nations,* The University Press Limited, Dhaka লেখক বার্মার নাগরিক হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বার্মার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে বার্মা কেন্দ্রীক বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। তবে তৎকালীন আরাকানের অর্থাৎ ম্রাউক-উ-বংশের মুসলিম শাসনকালের প্রাচীন ইতিহাসকে তুলে ধরেননি। তিনি বার্মায় ব্রিটিশ শাসনকালের ঘটনা, ইতিহাস এবং ব্রিটিশদের নীতি ভাগকর ও শাসন কর নীতির বর্ণনা করেছেন। লেখক বার্মার স্বাধীনতা ও বিভিন্ন জাতি ধর্মের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বার্মার সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও উ নু এর শাসনকালে নে উইনের সামরিক অভ্যুত্থান এর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ধাপে বার্মার স্বাধীনতার কথা বলেছেন। সামরিক শাসনকালে ঘটনাবহুল অধ্যায়ের বর্ণনা দিয়েছেন। সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে রড় শক্তি হিসেবে ধাক্কা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, বার্মায় সমাজতন্ত্র-সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও ধর্ম যুদ্ধের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। বার্মার জাতীয়তাবাদের মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বার্মার আদর্শ, সামরিক একনায়কতন্ত্র, সামরিক সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে বার্মার

ইতিহাস, ব্রিটিশদের অধীনে বার্মা, স্বাধীন বার্মা, সংসদীয় গণতন্ত্রে বার্মা ও স্বাধীন বার্মায় সামরিক শাসন ব্যবস্থা ও বার্মার জাতীয়তাবাদ নিয়ে উপনিবেশিক শাসন এর আলোকপাত করা হয়েছে।

Ahmed, Imtiaz, (2010) *The Plight of the Stateless Rohingyas*, The University Press Limited, Dhaka বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়ক এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহুল গ্রন্থ। ভূমিকায় বাংলাদেশের শরণার্থীদের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের দূর্দশার ধারনায় রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গা, রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসেবে জন্ম এবং বাংলাদেশে তাদের জীবন ও মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মিয়ানমারের আরাকানে রোহিঙ্গাদের শোচনীয় অবস্থা, তাদের অতীত পরিচয় এবং ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শরণার্থীদের কারণে নিরাপত্তাহীনতা বিষয়ে লেখক বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তার কথা বলেছেন। এর মধ্যেরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত নিরাপত্তার কথা উল্লেখ রয়েছে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেছেন। আশ্রয়প্রদানকারী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা, আইন-শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি, শরণার্থী সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ, আইনগত বিষয়াদি এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ খেয়াল রাখা ইত্যাদি। সিভিল সোসাইটির ভূমিকাতে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের দায়িত্ব পালন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব পালনের মধ্যে রাষ্ট্রসমূহ ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সমস্যা দূরীকরণ, আঞ্চলিক সংগঠনগুলোকে নিয়োজিত করা, রাষ্ট্রের বাইরে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রয়েছে তাদের রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত করা। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মূলত এ গবেষণা গ্রন্থটি বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থী, তাঁদের পরিচয়, নিরাপত্তা সমস্যা, এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির ভূমিকা, আন্তর্জাতিক জনগোষ্ঠীর দায়িত্ব ও তাঁদের প্রতি করণীয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

Uddin, Nasir, Edi. (2012), *To Host or To Hurt, Center-narratives on Rohingya Refugee Issue in Bangladesh*, Institute of Culture & Development Research, Dhaka এটি একটি গবেষণাধর্মী সম্পাদনা গ্রন্থ। এ গ্রন্থখানি মোট আটটি অধ্যায়ে রচিত হয়েছে। লেখক নাসির উদ্দিন, যিনি আবার নিজেই এ গ্রন্থটির সম্পাদক। এখানে তিনি রোহিঙ্গা ইস্যুর একটি ভূমিকা, বইটির সূচীপত্র বিষয়ে একটু ধারনা এবং এক নজরে বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর বর্ণনা দিয়েছেন। লেখক এখানে রোহিঙ্গা আরাকান ও রোহিঙ্গাদের উৎপত্তি, আরাকানের ভূমি ও জনগণ, প্রথম দিকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও আরাকানে মুসলিম অভিবাসন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। শরণার্থী সমস্যা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক, রাষ্ট্র এবং রোহিঙ্গাদের মর্যদা, শরণার্থী সমস্যার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক যোগাযোগ, কৌশলগত এবং ধর্মীয়-সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। গবেষণার সমস্যা ও রোহিঙ্গা সমস্যার তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ, মিয়ানমার-বাংলাদেশের সম্পর্ক ব্যহত হওয়া এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের

চেষ্টা প্রভৃতি আলোচনা হয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বাংলাদেশে দুর্দশা ও সমস্যার আইনগত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখানে লেখক ১৯৫১ সালের শরণার্থী অধিকার আইন, শরণার্থী সুরক্ষার আন্তর্জাতিক বিধি বিধান, বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাংবিধানিক ও আইনগত সুরক্ষা, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের টেকসই সমাধান এবং জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার (যার সংক্ষিপ্ত নামে ইউএনএইচসিআর) নিকট এ বিষয়টি দায়ভার অর্পণ করার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয়দান ও নিপীড়ন বিষয়ে বর্তমান অবস্থার উল্লেখ করেছেন। আর সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে একসময় স্থানীয় জনগনের বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয়দান এবং বর্তমানে কেন স্থানীয়রা তাদের পছন্দ করে না। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের গ্রামীন জীবন যাপনের ফলে বাংলাদেশের বনভূমির ওপর শরণার্থী প্রভাব বিষয়ে একটি গবেষণা হয়েছে। এখানে গবেষণা পদ্ধতি, ফলাফল ও আলোচনা আর সর্বশেষ উপসংহার ও সুপারিশ রাখা হয়েছে। এটি গবেষণাকর্মের একটি মৌলিক দিক হিসেবে গৃহীত হতে পারে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী মানবিক বিষয়, অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও বহি:শক্তির ভূমিকা বিষয়ে লিখিত হয়েছে। এখানে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ব্যাপারে বিভিন্ন উদ্যোগ, বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় বাহিরের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের ভূমিকা, অনিবন্ধিত শরণার্থী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ বিষয়ে লেখা হয়েছে। এছাড়া এ গ্রন্থে আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রাথমিক ইতিহাস-উৎস, রোহিঙ্গা ইস্যুতে বার্মা-বাংলাদেশ সম্পর্ক, শরণার্থী সমস্যাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সীমান্ত সমস্যা, এসকল শরণার্থীদের আইনগত সমস্যা, শরণার্থীদের জীবন-জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ওপর বিরূপ প্রভাব এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক বিষয়গুলোর ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করে গ্রন্থটি সম্পাদনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বসবাসের ফলে এদেশের আর্থনীতি ও পরিবেশের প্রভাব নিয়েও কিছু আলোকপাত রয়েছে।

Chowdhury, Mohammed Ali, *BENGAL-ARAKAN RELATION (1430-1666 A.D.)*, Kolkata: India, Firma KLM Privet Limited, 2004. এ গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-আরাকান সম্পর্কের ওপর অভিসন্দর্ভটি জমা দেন এবং সেখান থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য গৃহীত হয়েছে। গবেষক এ গ্রন্থকে আটটি অধ্যায়ে বিন্যাস্ত করেছেন। একটি ভূমিকা, বাংলা এবং আরাকানের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচয় দেয়া হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা-আরাকার সম্পর্কের নতুন মেরুকরণ এর ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। ১৪৩৩-১৫৩৮ সাল সময়ের মধ্যে চট্টগ্রামের অবস্থান, হুসেন শাহী বংশ এবং বাংলা-আরাকান-ত্রিপুরার ত্রিপক্ষিয় যুদ্ধে চট্টগ্রামের অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রতিবেশী শক্তিসমূহের চট্টগ্রাম দখল, ১৪৯১-১৫৮৬ সাল পর্যন্ত একশত বছর ব্যাপী সংঘাত, আরাকানীদের চট্টগ্রাম অধিকার, ১৬৬৬ সালে মুগলদের চট্টগ্রাম বিজয় এবং চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের প্রবেশ ও স্থানীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মোগল শাসক বাদশাহ জাহাঙ্গীর এবং শাহ্জাহানের

সময়ে মুগল আরাকান সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মোগল-আরাকান সম্পর্কের চূড়ান্তরূপ। শাহ্‌শুজার স্বপরিবারে নিহত হওয়ায় মোগল শক্তির চট্টগ্রাম বিজয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলা-আরাকানের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে আলোচিত হয়েছে। আরাকানে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি, আরাকানী শাসনে বাঙালী মুসলিমদের বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত এবং তাদের জীবন ও সংস্কৃতিতে আরাকানী প্রভাব বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে অর্থাৎ উপসংহারে এ গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Jilani, AFK. (2001), *A Cultural History of Rohingya:* (Place of Publication: Unknown, Published by Ahmed Jilini, July; Jilani, AFK. (2005), *THE MUSLIMS OF SOUTHEAST ASIA*, THE TAJ LIBRARY, Chittagong: May; and Jilani, AFK. (2002), *HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN ARAKAN*, THE TAJ LIBRARY, Chittagong: June এ.এফ.কে জিলানী আরাকানী মুসলিম ঐতিহাসিক যিনি নিজেই একজন রোহিঙ্গা বংশোদ্ভূত বিদ্যান ব্যক্তি। তিনি এক সময় আরাকান রাজ্যের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা (এমপি) ছিলেন। যদিও তিনি আরাকানী নাগরিক এবং জনপ্রতিনিধি ছিলেন তারপরও তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। তবে এ গ্রন্থগুলো প্রকাশের বিভিন্ন স্থানের ঠিকানা দেওয়া হলেও প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশের কোনো স্থানই উল্লেখ নেই। প্রথম গ্রন্থের প্রকাশক হিসেবে জিলানী নিজের নাম ব্যবহার করেছেন এবং প্রকাশকাল ২০০১ সালের উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থে লেখক কোনো অধ্যায় ভাগ করেননি। এখানে লেখক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সোনালী অতীত ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে ঊনসত্তুর পর্যন্ত ক্রমানুসারে সাজিয়েছেন। ম্রাউক উ রাজবংশের মুদ্রা তথা ঐতিহাসিক প্রমান তুলে ধরেছেন। রোহিঙ্গা শব্দের উৎপত্তি, পরিচিতি, ধর্ম- বিশ্বাস, ভাষা ও সাহিত্য চর্চা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অনুসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রকাশের স্থান উল্লেখ আছে চট্টগ্রামের। প্রকাশক মাহমুদুল হক এবং প্রকাশকাল ২০০৫ সালের উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থে লেখক একুশটি অধ্যায় ভাগ করেছন। এ গ্রন্থে তিনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের আগমন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন ইসলামী নেতাদের সম্পর্কে আলোচনা, মিয়ানমারের মুসলিমদের অবস্থা এবং সেখানকার রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর নিপীড়ন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তৃতীয় গ্রন্থটি প্রকাশের স্থান উল্লেখ আছে চট্টগ্রামের। প্রকাশক মাহমুদুল হক এবং প্রকাশকাল ২০০২ সালের উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থে লেখক বাইশটি অধ্যায়ে ভাগ করেছন। এ গ্রন্থে তিনি মানবাধিকার প্রসঙ্গ, ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মিডিয়ায় মিয়ানমারের মুসলিমদের অবস্থা এবং তাদের তথ্য, বিভিন্ন ধাপে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর শরণার্থী হওয়া, ধর্মীয় স্বাধীনতার অনুপস্থিতি এবং আকিয়াব ট্রেজেডির বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

Berlie, J.A., (2008) *The Burmanization of Myanmar’s Muslims*, White Lotus press, Thailand এ মূল্যবান গ্রন্থখানা আটটি অধ্যায়ে ভাগ করে রচনা করেছেন। মুসলিমদের আরাকান

আগমনের বিভিন্ন কালকে উল্লেখ করেছেন। লেখক বঙ্গোপসাগরীয় সভ্যতায় মুসলিম আরাকান ও দক্ষিণ চট্টগ্রাম সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যেরয়েছে আরাকান-বাংলা সম্পর্ক ও আরাকানীদের সর্বনাশ, রোসাঙ্গ রাজ্যে বাংলা সাহিত্য চর্চা, রোহিঙ্গা শব্দের উৎপত্তি, রোহিঙ্গা পরিচিতি, বঙ্গোপসাগরে মগ-পর্তুগীজ জলদস্যূতা, টেকনাফ সর্বশেষ সীমানা হলো কি করে, কক্সবাজারের নামকরণ ও কক্সবাজারের জনবসতি প্রভৃতি বিষয়। আরাকানের কবি সাহিত্যিকদের বর্ণনায় বাংলা সাহিত্য চর্চায় লস্কর উজির আশরাফ খান, কোরেশী মাগন ঠাকুর ও মহাকবি আলাওল নিয়ে লিখেছেন। স্বাধীন আরাকানের পতন ও মোগলদের চট্টগ্রাম বিজয় এবং পঞ্চম অধ্যায়ে মগ-রাখাইন বিতর্ক এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে ম্রাউক উ রাজবংশের মুদ্রা তথা ঐতিহাসিক প্রমান তুলে ধরেছেন। আরাকানের রাজনৈতিক-উত্থান পত্তন ও তিনটি এ্যাংলো-বার্মা যুদ্ধের আলোচনা করেছেন। রোহিঙ্গাদের স্বাধীনতা আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, রাজনৈতিক চিন্তাধারা, মুসলিম কংগ্রেসের আত্মপ্রকাশ, মুসলিম ব্যবসায়ীদের সংগঠন তৈরি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

HTUT, ZAW MIN, (2003), *Human RIGHTS ABUSES AND DISCRIMINATION ON ROHINGYA*, (BURMESE ROHINGYA ASSOCIATION IN JAPAN (BRAJ), Chittagong, September এ মূল্যবান গ্রন্থে আঠারোটি অধ্যায়ে রচনা করেছেন। মানবাধিকার, মানবাধিকারের উন্নয়ন, নাগরিকত্ব আইন, ১৯৭৮ সালের শরণার্থী আগমন, রোহিঙ্গা সমস্যা, বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবস্থা, জবরদোস্তীমূলক শ্রম আদায়, আরাকানের কোথাও ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই, নিরব হত্যাকাণ্ড এবং ২০০১ সালে আকিয়াবে ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Siddiquee, Mohammad Mohibullah, Edi. (2014), *THE ROHINGYAS OF ARAKAN History and Heritage*, ALI PUBLISHING HOUSE, Chittagong: June এ গ্রন্থটি একটি সম্পাদনা গ্রন্থ হলেও এতে রয়েছে ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। গ্রন্থটির প্রচ্ছদে আরাকানে ম্রাউক-উ শাসনামলের রাজধানী ম্রোহং শহরের জনবসতি নিয়ে একটি ছবি স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থটিতে ২৮টি অধ্যায় এবং দেশী-বিদেশী রোহিঙ্গা-রাখাইন বৌদ্ধসহ মোট ২৮ জন প্রথিতযশা গবেষকবৃন্দের কিছু দুর্লভ ও পুরাতন প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির ভেতরে রঙিন পাতায় তৎকালীন আরাকানের বেশকিছু ম্যাপ, পরিসংখ্যান, মুসলিম শাসনামলের কালেমা খোচিত মুদ্রা ও সে সময়ের মুসলিমদের মসজিদ এবং বদর শাহের মাজার এর ছবি স্থান পেয়েছে। লেখকদের মধ্যে অন্যতম হলেন, Dr. Abdul Karim, D.G.E Hall, A.F.K. Jilani, Dr. Moshe Yegar, G.E Harvey, Dr. Abid Bahar, Yunus Min Tun, Dr. Habib Siddiqui, Dr. Francis Buchanan, M. S. Collis & San Shwe Bu, Dr. A.B.M. Habibullah প্রমুখ এবং গ্রন্থের সম্পাদক মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী। রোহিঙ্গাদের হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য, আরাকান রাজসভায় অবস্থান, ইসলামী সংস্কৃতির লালন,

আরাকানে (রোসাঙ্গে) বাংলা সাহিত্যের চর্চা, মুসলিমদের আরাকানে আগমন, আরাকান-বাংলা সম্পর্ক তৃতীয় অধ্যায়ে আরাকানে ম্রাউক-উ বংশের সময় মুসলিম বিজয়, মুসলিম শাসকদের তালিকা ও শাসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আরাকান সাম্রাজ্যের পতন অর্থাৎ সান্দা থু ধাম্মার নিকট থেকে বোধপায়ার আরাকান বিজয়, শাহ্‌শুজার আরাকানের বিয়োগান্তক ঘটনা এবং মোগলদের চট্টগ্রাম অধিকার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আরাকানে ম্রাউক-উ শাসনকালের সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে এবং বোধপায়ার আরাকান অধিকারের ইতিহাস রয়েছে। ব্রিটিশ অধিকারে বিভন্ন পর্বে আরাকান ও বার্মার স্বাধীন হওয়ার কথা এবং স্বাধীনতা উত্তর আরাকানে মুজাহিদ আন্দোলন, আরাকানের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নাগরিকত্বের বিষয় এবং কেন এটি স্বাধীন রাষ্ট্র হয়নি তার কথা রয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর বার্মার অধীনে আরাকান শাসন এবং আরাকানের সামরিক শাসনামলে রোহিঙ্গাদের ওপর পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনমূলক অপারেশন ইত্যাদি ছাড়াও আরাকানে রোহিঙ্গাদের স্বাধীকার আন্দোলন সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

Hossain, Md. Shayeed, (2015), *Bangladesh-Myanmar Relations*, Institute Of Bangladesh Studies, IBS, Rajshahi University এটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইবিএস)-এর বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পিএইচডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ হিসেবে গৃহিত হয়েছে। এটি ইতিহাস ভিত্তিক রচনা এবং এখানে গবেষণা পদ্ধতি বা গবেষণার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা হয়েছে। এ গ্রন্থে ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিভিন্ন সম্পর্ক নিয়ে আলোচিত হয়েছে। আরাকানের সাথে বাংলার সম্পর্ক, রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিভিন্ন আমলে মিয়ানমারের সাথে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এ গ্রন্থটি ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী হলেও তাতে কাল বিভাজন সুস্পষ্ট নেই। গবেষণা সংক্রান্ত বিষয় যেমন: গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার ধরণ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও গবেষণার যৌক্তিকতা আলোচনা রয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের ঐতিহাসিক, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্পর্কে দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সমুদ্রসীমা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সম্পর্কের ক্ষেত্রে শুধু রোহিঙ্গাদের কারণে সম্পর্ক কিরূপ তা আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সম্পর্কের সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোচনা রয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংস্থাগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এটি ইতিহাস ভিত্তিক রচনার আলোকে রচিত অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সমুদ্রসীমা ও আঞ্চলিক সংগঠনের তৎপরতা সম্পর্কে একটি সার্থক গবেষণা। তবে, গবেষক গবেষণাকর্মের শেষে আলাদাভাবে গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের বিষয়টি তুলে না ধরলেও নীতি নির্ধারনী বিষয়ে রোহিঙ্গা নিয়ে শুধু না ভেবে অন্যান্য ইস্যুতে গুরুত্ব দেয়া, সমুদ্রসীমা ও সীমান্ত বিষয়ে সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে সরাসরি বাংলাদেশ ও মিয়ানমার দ্বিপাক্ষিকভাবে অগ্রসর হওয়ার সুপারিশ করেছেন।

Farhana Rahman, Sonia, (2014), *BANGLADESH-MYANMAR BILATERAL RELATIONS AND REGIONAL IMPLICATIONS*, (Department of International Relations, University of Dhaka, Dhaka এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ এমফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ হিসেবে গৃহিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত অভিসন্দর্ভটিতে গবেষণা পদ্ধতি বা গবেষণার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা হয়েছে। এ গ্রন্থে ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিভিন্ন সম্পর্ক নিয়ে আলোচিত হয়েছে। আরাকানের সাথে বাংলার সম্পর্ক, রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিভিন্ন আমলে মিয়ানমারের সাথে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। গবেষণা সংক্রান্ত বিষয় যেমনঃ গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার ধরণ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও গবেষণার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের ঐতিহাসিক বিশেষ করে রোহিঙ্গা ইস্যু, সমুদ্র সংক্রান্ত, সীমান্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, যোগাযোগ এবং জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তন বিশেষ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার ও নৃতাত্ত্বিক সংঘাত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের প্রধান বাধাগুলো যেমন রোহিঙ্গা ইস্যু, অবৈধ অস্ত্র, মাদক, মানুষ ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী, আগামী দিনের অর্থনৈতিক শক্তি মিয়ানমার ও ট্রানজিট ইস্যু সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ও সুযোগ কিরূপ তা আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের ভূ-কৌলগত ও অর্থনৈতিক বিষয়ে বৃহৎ শক্তির আগ্রহ আলোচনা রয়েছে। এছাড়া মিয়ানমারকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও চীনের আগ্রহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষক গবেষণাকর্মের শেষে আলাদাভাবে গবেষণার সুপারিশের বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

হক, মুহাম্মদ এনামুল এবং আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ-এর, (১৯৯৩) '*আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য*', মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন বিষয়ে ৭টি ভাগে আলোচনা করা হলেও ৩য় ভাগে 'আরাকান-রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' অধ্যায়কে আবার নতুন করে সাতটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আরাকান রাজসভা, রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবি, রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবি, রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবি, (দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়েঃ রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবি সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও ভিন্ন ভিন্ন কবিদের সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে) রোসাঙ্গ-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য-বিকাশের ধারা, রোসাঙ্গ-রাজসভার আশু প্রভাব, সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলিম সমাজ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আরাকানে ইসলামের আগমন ও বিস্তৃতি, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনুকূলে ইসলামী পরিবেশ গড়ে ওঠা এবং আরাকান রাজসভা থেকে বাংলা সাহিত্যকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে দৌলতকাজী ও মহাকবি আলাওলসহ অনেক প্রতিভাধর মুসলিম কবির আবির্ভাব ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ সম্পা. *মুহাম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী*, (১৯৯৪), বাংলা একাডেমী, ঢাকা। এ গ্রন্থটি মূলত একটি তথ্য সংকলন গ্রন্থ বলা যায়। তবে, এটি সংকলোন গ্রন্থ হলেও এর ইতিহাস মূল্য অনেক বেশি। তাই গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য বিশ্লেষণ ও গবেষণা পদ্ধতিও অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়নি। তবে এখানে গবেষণার উপাদান হিসেবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাণ্ডার রয়েছে। তারপরও তিনি ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে মুসলিম, ব্রহ্মে মুসলিম বণিক আরাকান ও মুসলিমদের ঐতিহাসিক উত্থান সম্পর্কে, কক্সবাজারের প্রতিষ্ঠাতা হিরাম কক্স, চট্টগ্রামে আরাকানী উদ্বাস্তু ও শাহ্‌শুজা'র জীবন-সন্ধ্যা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

হাবিবউল্লাহ, এন এম *'রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস'* (১৯৯৫), বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:, ঢাকা। এ মূল্যবান গ্রন্থখানা সাতটি অধ্যায়ে রচনা করেছেন। মুসলিমদের আরাকান আগমনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাল থেকে শুরু করে শাহ্ সূজার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে ভারতীয় মুসলিমদের আরাকান আগমন উল্লেখ করেছেন। বঙ্গোপসাগরীয় সভ্যতায় মুসলিম আরাকান ও দক্ষিণ চট্টগ্রাম সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যেরয়েছে আরাকান-বাংলা সম্পর্ক ও আরাকানীদের সর্বনাশ, রোসাঙ্গ রাজ্যে বাংলা সাহিত্য চর্চা, রোহিঙ্গা শব্দের উৎপত্তি, রোহিঙ্গা পরিচিতি, বঙ্গোপসাগরে মগ-পর্তুগীজ জলদস্যুতা, টেকনাফ সর্বশেষ সীমানা হলো কি করে, কক্সবাজারের নামকরণ ও কক্সবাজারের জনবসতি প্রভৃতি বিষয়। আরাকানের কবি সাহিত্যিকদের বর্ণনায় বাংলা সাহিত্য চর্চায় লস্কর উজির আশরাফ খান, কোরেশী মাগন ঠাকুর ও মহাকবি আলাওল নিয়ে লিখেছেন। স্বাধীন আরাকানের পতন, মোগলদের চট্টগ্রাম বিজয়। মগ-রাখাইন বিতর্ক এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে ম্রাউক উ রাজবংশের মুদ্রা তথা ঐতিহাসিক প্রমান তুলে ধরেছেন। আরাকানের রাজনৈতিক-উত্থান পত্তন ও তিনটি এ্যাংলো-বার্মা যুদ্ধের আলোচনা করেছেন। রোহিঙ্গাদের স্বাধীনতা আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, রাজনৈতিক চিন্তাধারা, মুসলিম কংগ্রেসের আত্মপ্রকাশ, মুলিম ব্যবসায়ীদের সংগঠন তৈরি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

চৌধুরী, আব্দুল হক, ১৯৯৪) *'প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী'* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ও চৌধুরী, আব্দুল হক, *চট্টগ্রাম-আরাকান*, (কথামালা প্রকাশনা, চট্টগ্রাম: ১৯৮৯)। এ গ্রন্থ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। গ্রন্থদ্বয়ে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম গ্রন্থটিকে লেখক পাঁচটি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস থেকে আধুনিক ইতিহাসের (অর্থাৎ ১৯৮২ সালে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাতিলের খড়্গ ও ক্ষমতার পালাবদলে রোষের শিকার রোহিঙ্গাদের) সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রোহিঙ্গাদের পরিচয়, আরাকানের রাজদরবারে তাদের প্রভাব, দক্ষিণ চট্টগ্রামের ভৌগোলিক ইতিহাস এবং স্বাধীনতা উত্তর মিয়ানমার সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গা নির্যাতনের কিছু খন্ডচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ম্রা-উক-উ রাজবংশ: নির্বাসিত আরাকানরাজ নরমিখলার সিংহাসন পুনরুদ্ধার থেকে আরাকানে বর্মী শাসন পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। আরাকান

রাজসভায় মুসলিম সভাসদ, বিভিন্ন মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন এবং আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা; এছাড়া কবি দৌলত কাজী, কবি আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর এর ন্যায় বিখ্যাত কবিদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আরাকানের মুসলিমদের আকর ও আকৃতি রোহিঙ্গা, আরাকানে শাহ্ শুজার বিপর্যয়, বর্মী জাতীয়তাবাদের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আরাকানে চট্টগ্রামী বংশোদ্ভূত হিন্দু, বৌদ্ধ অধিবাসী ও মুসলিমদের চারটি গোত্র সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনার ধারাবাহিকতা না থাকলেও এ গ্রন্থটির ইতিহাস সূত্রে গুরুত্ব রয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে লেখক এক থেকে দ্বাদশতম পরিচ্ছেদে বিন্যাস করেছেন। চট্টগ্রামের আদি নাম, নামের উৎস, ভৌগোলিক পরিচিতি ইত্যাদি লেখা হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে চট্টগ্রাম, প্রাচীন যুগ ইত্যাদি নিয়ে; আরাকানের ইতিহাস প্রচীন যুগ; চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রাচীন যুগ; আরাকান-চট্টগ্রামের ইতিহাস, ব্রহ্মদেশের পঁগা রাজ্যভূক্ত আরাকান; চট্টগ্রামের ইতিহাস, সমতট রাজ্যভূক্ত চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামে প্রথম মুসলিম; আরাকানের ইতিহাস মধ্যযুগ; বিচ্ছিন্ন আরাকানী ও ত্রিপুরা অধিকার; আফগানীদের আরকান ও ত্রিপুরা অধিকার; চট্টগ্রামের ইতিহাস আরাকানী আমল; চট্টগ্রামে মোগল অভিযান ও বিজয়; আরাকানের ইতিহাস পতন যুগ ও দক্ষিণ চট্টগ্রামে আরাকানী শাসন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উভয় গ্রন্থের মধ্যে লেখক আরাকান ও রোহিঙ্গা মুসলিমদের বহুবিধ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় লিখিত বইয়ের মধ্যে এধরনের আলোচনা কম গ্রন্থেই দেখা যায়।

ছিদ্দিকী, মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ, সম্পা. (২০০০), *আরাকানের মুসলিম: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, আরাকান হিস্ট্রিক্যাল সোসাইটি, চট্টগ্রাম। এ গ্রন্থটি একটি সম্পাদনা গ্রন্থ হলেও এতে রয়েছে ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। গ্রন্থটিতে ১৫ জন প্রথিতযশা গবেষকবৃন্দের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এর মধ্যেএই উপমহাদেশ খ্যাত ইতিহাসবিদ ড. আব্দুল করিম, মোহাম্মদ ছিদ্দিক খান, ছৈয়দ আহমদুল হক, ড. এবনে গোলাম সামাদ, আব্দুল হক চৌধুরী, ড. মহাম্মদ এনামুল হক, এম এন হাবিব উল্লাহ, ড. অমৃতলাল বালা, ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, এ গ্রন্থের সম্পাদক মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, সামিউল আহমদ খান ও মোঃ মাহফুজুর রহমান প্রমুখ। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে ইসরাইল দূতাবাসের সেকেণ্ড সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী গবেষক মোশে ইগার এর ইংরেজী বই এর লেখা থেকে একটি অধ্যায়ের অংশ বিশেষ অধ্যক্ষ মোশতাক আহমদ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। রোহিঙ্গাদের হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য, আরাকান রাজসভায় অবস্থান, ইসলামী সংস্কৃতির লালন, আরাকানে (রোসাঙ্গে) বাংলা সাহিত্যের চর্চা, মুসলিমদের আরাকানে আগমন, আরাকান-বাংলা সম্পর্ক ইত্যাদি ছাড়াও আরাকানে রোহিঙ্গাদের স্বাধীকার আন্দোলন সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটির শেষে একটি আরাকানের ম্যাপ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'আরাকান হিষ্ট্রিক্যাল সোসাইটি বাংলাদেশ' এর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

খান, মোঃ মাইমুল আহসান, (১৯৯৮), *'মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা। এটি রোহিঙ্গাদের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। এতে আরাকানে ইসলাম প্রচার, বিকাশ এবং ব্রিটিশ শাসনাধীনে আরাকানে মিয়ানমার শাসকগোষ্ঠীসহ স্থানীয় রাখাইন (মগ) কর্তৃক রোহিঙ্গাদের নির্যাতন ও মানবাধিকার লংঘনের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার নিয়ে লেখার স্বল্পতায় এ গ্রন্থ খানির মূল্য অবশ্যই অনস্বীকার্য। লেখক এ গ্রন্থের সূচীতে কোনো অধ্যায়ের মাধ্যমে বিষয়গুলোকে তুলে ধরেননি। বলা যায় এক প্রকার বিক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়টিগুলোকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সাজানোর চেষ্টা করেছেন। এছাড়া এক থেকে ১৫টি পরিশিষ্টের মাধ্যমে বেশ কিছু নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে রোহিঙ্গাদের ওপরোক্ত বিষয়সমূহে ঐতিহাসিক ও তথ্যবহুল আলোকপাত করা হয়েছে।

চক্রবর্তী, রতনলাল, (১৯৮৪), *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক ১৭৮৫-১৮২৪*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। এটিও একটি মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ বলা যায়। যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ এবং একটি মূল্যবান গবেষণাকর্ম। উক্ত অভিসন্দর্ভে গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য বিশ্লেষণ অপ্রতুল ছিল। এতে ১৭৮৫ সাল থেকে ১৮২৪ সাল পর্যন্ত বাংলার সীমান্ত পরিস্থিতি, চট্টগ্রামে আশ্রয়দানকারী আরাকানী উদ্বাস্তু সমস্যা এবং এ বিষয়ে বার্মা ও বাংলার প্রতিক্রিয়া, বর্মী অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আরাকানীদের তৎপরতা, বার্মা-বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্কসহ প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। এতে একটি সীমিত সময়ের মধ্যে প্রায় ৪০ বছরের ইতিহাসের চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। এর পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত হয়েছে ক. ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেলের নিকট বর্মীরাজ বোধপায়ার পত্র খ. চট্টগ্রামে আগত আরাকানী উদ্বাস্তুদের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ গ. গভর্ণর জেনারেলের নিকট লিখিত চিন পিয়ানের পত্র ঘ. বার্মার বিরুদ্ধে কোম্পানীর যুদ্ধ ঘোষণা ঙ. রেংগুন কর্তৃপক্ষের নিকট রেংগুনে বাণিজ্যরত ইংরেজ বণিকদের আবেদন ইত্যাদি। সর্বশেষে গ্রন্থটিতে সাহাপূরী দ্বীপের অবস্থান ও কোম্পনীর দখলকৃত বর্মী ভূখণ্ডের দুটি মানচিত্র দেয়া হয়েছে। গ্রন্থটিতে রোহিঙ্গাদের ওপরোক্ত বিষয়সমূহে ঐতিহাসিক ও তথ্যবহুল আলোকপাত করা হয়েছে।

বালা, অমৃতলাল, (১৯৯১), *'আলাওলের কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি'* বাংলা একাডেমী, ঢাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতিতে প্রণীত একটি সাংস্কৃতিক ইতিহাস গ্রন্থ। এতে আরাকানে ইসলামের আগমন ও বিস্তার, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনুকূলে ইসলামী পরিবেশ গড়ে উঠা এবং যারা আরাকান অমাত্যসভা থেকে বাংলা সাহিত্যকে বিকশিত করেছেন- বিশেষ করে দৌলতকাজী ও মহাকবি আলাওলসহ অনেক প্রতিভা সম্পন্ন মুসলিম কবির আবির্ভাব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি আরাকানে ইসলাম বিস্তারের প্রেক্ষাপট অনুধাবনে বেশ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বলা যায়।

ইসলাম, মো: সিরাজুল, (১৯৯৮), *'ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক' ১৬৪৭-১৮৮৫*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। এ গবেষণা গ্রন্থটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এতে সিরিয়ামে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করার সময় থেকে ১৮৮৫ সালে তৃতীয় ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের অনিবার্য ফলস্বরুপ কিভাবে ইংরেজরা বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিবেশী দেশ বার্মাকে সম্পূর্ণভাবে দখল করে তার একটি ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাসের পাশাপাশি এতে বার্মার অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতি ও জাতিসত্তার বিভিন্ন দিক এবং এগুলো কিভাবে বার্মাকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর্যায়ে নিয়ে যায় তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে লেখকের শিরোনামে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে বার্মা-ব্রিটেন সম্পর্ক এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইঙ্গ বর্মী যুদ্ধ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

আখন্দ, মোঃ মাহফুজুর রহমান, (২০০5), *রোহিঙ্গা সমস্যাঃ বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ও (২০১৩)*আরাকানের মুসলিমদের ইতিহাস*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, সেপ্টেম্বর, চট্টগ্রাম-ঢাকা। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ দু'টি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি থিসিস হিসেবে যথাক্রমে ২০০২ সালে ও ২০০5 সালে গৃহীত হয়েছে। যদিও দ্বিতীয় গ্রন্থটির অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল "আরাকানে ইসলামঃ প্রসার ও প্রভাব ১৪৩০-১৭৮৫"। প্রথম গ্রন্থটি সাতটি অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে। একটি ভূমিকা দিয়ে শুরু; আরাকানের ভৌগোলক পরিচয় ও রোহিঙ্গাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। ১৯৪২-১৯৭৮ সাল পর্যন্ত রোহিঙ্গা সমস্যা অর্থাৎ ব্রিটিশ ও জাপানী শাসনামলে বার্মা ও রোহিঙ্গা, স্বাধীনতা উত্তর বার্মায় আরাকান ও রোহিঙ্গা, রোহিঙ্গা নির্যাতনের খতিয়ান ও তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৭৮-১৯৯৪ সাল পর্যন্ত রোহিঙ্গা সমস্যায় বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও এবং পত্র-পত্রিকায় প্রতিফলন (১৯৭৮-১৯৯৪ সাল) পর্যন্ত রোহিঙ্গা শরণার্থী জীবন ও বাংলাদেশ, শরণার্থীদের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহায্য, সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা, প্রত্যাবাসন চুক্তি স্বাক্ষর, প্রত্যাবাসন চুক্তির সমালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সচেতন জনগোষ্ঠির দৃষ্টিভঙ্গিঃ ১৯৭৮-১৯৯৪ প্রশ্নের বিষয়বস্ত ও ধরন এবং উপসংহার এর মধ্যদিয়ে গ্রন্থটির পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে ভূমিকায় প্রাসঙ্গিক রচনাবলী পর্যালোচনা ও গবেষণা পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। আরাকান ও মুসলিমদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে গিয়ে আরাকানে ইসলামের আগমন ও ম্রাউক-উ রাজবংশ থেকে বর্তমান আরাকান পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে আরাকানের মুসলিম প্রশাসন ও মুসলিম সভাসদ, আরাকানী সমাজে মুসলিম অর্থাৎ আরাকানী সমাজে মুসলিমদের গোত্রগত শ্রেণী বিন্যাস, অবস্থানগত বিন্যাস ও তাদের সামাজিক উৎসব এবং লোকাচার বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। আরাকানের বাংলা সাহিত্যে ইসলামী উপাদানের ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আরাকানের শিল্পকলা ও সংস্কৃতিতে মুসলিম প্রভাব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আরাকানে মুসলিম অমুসলিম সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি

চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষ অধ্যায়ে আরাকানী মুসলিম ইতিহাসের সার্বিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। গবেষক আলোচ্য প্রথম গবেষণাকর্মে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা জরিপ ও বিশিষ্ট গবেষকবৃন্দের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণাকর্মটি শেষ করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে গবেষক এখানে ইতিহাস গবেষণাকর্ম হিসেবে আরাকানী মুসলিম সমাজের ঐতিহাসিক বিষয়াদি নিয়ে গবেষক সার্থকভাবে গবেষণাটি করেছেন।

রায়, সুধাংশু রঞ্জন, (২০০৩), *'বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক' (১৮৮৬-১৯৪৭)* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা। এ অপ্রকাশিত গবেষণাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। উক্ত অভিসন্দর্ভে গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য বিশ্লেষণ অপ্রতুল ছিল। এতে বার্মায় বাঙালী বসতি স্থাপন ও তার প্রভাব বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বর্মী ও বাঙালী সম্প্রদায় এর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বার্মায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাপানী অধিকারে বার্মা ও বাঙালী সম্প্রদায় এবং ভারত বিভাগোত্তর কালে বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশে বার্মায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে বঙ্গীয় সরকারের নথিপত্র প্রভৃতি বিষয়ে বার্মা ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকা অবস্থায় ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভের আগ পর্যন্ত বার্মা ও বাঙালীদের ওপর একটি ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া গবেষক সারণী তালিকা দ্বারা বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে এ গবেষণায়। এখানে বার্মায় কর্মরত ভারতীয় শ্রমিকদের সংখ্যা, বার্মা থেকে চট্টগ্রাম ও কলকাতা বন্দরে আগত প্রদেশ ওয়ারী শরণার্থী সংখ্যার সারণী ব্যবহার করেছেন।

এলাহী, খোঃ লুৎফুল, (২০০০), *রোহিঙ্গা সমস্যাঃ ঐতিহাসিক পটভূমি বাংলাদেশে এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব*, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা। এ অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি থিসিস হিসেবে গৃহীত হয়েছে। উক্ত অভিসন্দর্ভে গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য বিশ্লেষণ অপ্রতুল বলে মনে হয়েছে। রোহিঙ্গাদের উৎপত্তি ও পরিচয়, ঔপনিবেশিক আমলে অর্থাৎ বোধপায়া কর্তৃক আরাকান অধিকারের পর থেকে ১৯৪৮ সালের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব আইনের রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাতিলের সময় পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের অবস্থান ও সমস্যা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ-বার্মা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আর নব্বই এর দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর রোহিঙ্গাদের প্রভাব বিষয়ে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। যদিও গবেষণার শিরোনামে আর্থ-সামাজিক প্রভাব এর বিষয়টি উল্লেখ আছে। তবে গবেষক আলোচ্য গবেষণাকর্মে আর্থ-সামাজিক প্রভাব এর ক্ষেত্রে শুধু কয়েকটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ দেখিয়েছেন।

নাসির উদ্দিন, রাহমান, (২০১৭), *"রোহিঙ্গা নয় রোয়াইঙ্গা" অস্তিত্বে সংকটে রাষ্ট্রহীন মানুষ*, মূর্ধণ্য প্রকাশনী, একুশে বইমেলা কলকাতা। এই গ্রন্থটিতে অনেকটা ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। লেখক সমগ্র গ্রন্থে ১০টি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে লেখকের দু'টি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। একটি একাত্তর টিভি এবং অপরটি পরস্পর.কম-এর জন্য প্রদত্ত স্বাক্ষাৎকার এ দু'টি সপ্তম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। নৃবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে লেখক এখানে রোয়াইঙ্গাদের ঐতিহাসিক বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি রোহিঙ্গা নিয়ে রাজনীতি, মানবতার সংকট, এথনিক ক্লিনজিং, জেনোসাইড ও এথনোসাইড ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া রোয়াইঙ্গা সমস্যায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা, বহুপাক্ষিক সমঝোতা জরুরি, বাংলাদেশের নিরাপত্তা ঝুঁকি, আরাকানের ভূমিপুত্র রোয়াইঙ্গা, তাদের অব্যক্ত কষ্ট ও অনিশ্চিত ভবিষ্যত এসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষক আলোচ্য গবেষণাকর্মে রোহিঙ্গাদের বেশ কয়েকটি কেস স্টাডি তুলে ধরেছেন। কিন্তু গবেষক গবেষণাকর্মের শেষে গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের বিষয়টি তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। গবেষক উক্ত কাজগুলো করতে পারলে গবেষণাকর্মটি একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করে মৌলিক গবেষণা হতে পারত। তারপরও মানবতার সংকট, এথনিক ক্লিনজিং, জেনোসাইড ও এথনোসাইড এবং বাংলাদেশের নিরাপত্তা ঝুঁকি, আরাকানের ভূমিপুত্র রোয়াইঙ্গা, অব্যক্ত কষ্ট ও অনিশ্চিত ভবিষ্যত এর মতো এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তথ্য প্রমাণ স্বাপেক্ষে অবতারনা করার জন্য গবেষক ধন্যবাদ পাবার যোগ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জলিল, মুহাম্মদ আব্দুল, (১৯৯৩), *বঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গি ও বর্গীর অত্যাচার*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে গবেষক এ অভিসন্দর্ভটির পরিশিষ্ট ভাগে 'বঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গি ও বর্গী অত্যাচার' শীর্ষক একটি অধ্যায় সংযোজন করেন। তাই এটি একটি গবেষণার খণ্ডিত অংশ মাত্র। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি থিসিস হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং এ খণ্ডিত অংশটিই একটি প্রকাশিত গ্রন্থ হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেছে। গবেষণার খণ্ডিত অংশ নিয়ে মন্তব্য করা যদিও কঠিন তারপরও বলতে হয়, উক্ত গ্রন্থে গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য বিশ্লেষণ অপ্রতুল বলে মনে হয়েছে। বাংলার বিশেষ করে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন তিনি। পূর্ববঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গিদের এদেশের মানুষের প্রতি অত্যাচারের ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। এ অঞ্চলে ফিরিঙ্গি অর্থাৎ পর্তুগীজদের লুণ্ঠণ, অত্যাচার ও দস্যুতাসহ নানামুখি কর্মকান্ড এ গবেষণায় তুলে ধরেছেন। লেখক বর্গীদের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বর্গীদের ব্যাপারে এখানে বলা হয়েছে নবাব আলীবর্দীর রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকেরা চৌথ আদায়ের নামে বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। তারা সুদীর্ঘ সময় নগর-গ্রাম জ্বালিয়ে, শস্য ক্ষেত্র বিমর্দিত করে, বাঙ্গালী প্রজার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে, তাদের নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়ে, বঙ্গদেশের একাংশকে জনশূণ্য করে তোলে। বঙ্গের এই মহাত্রাস সৃষ্টিকারী মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকেরাই 'বর্গী' নামে পরিচিত।

মাহমুদ, মুহাম্মদ আবুল হোসেন, (১৯৭৮), *'বার্মায় মুসলিম গণহত্যা'* ঢাকা: বর্মী মুসলিম কেন্দ্রীয় সাহায্য কমিটি। গ্রন্থটি একটি বুকলেট জাতীয় গ্রন্থ বলা যেতে পারে। এখানে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত না হলেও ১৯৭৮ সালে কিং ড্রাগন অপারেশনের নামে বার্মা সরকার রোহিঙ্গাদের ওপর যে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বিশেষত নির্যাতনের যে সকল খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার সংকলন করা হয়েছে এ গ্রন্থে। এছাড়াও নির্যাতনের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের প্রতিরোধ আন্দোলন এবং বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় এ সমস্যাকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছে তার বিবরণ এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

উপর্যুক্ত গ্রন্থ ও অভিসন্দর্ভ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, বেশির ভাগ গ্রন্থ বা অভিসন্দর্ভ রচনাতেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমনের শুরু থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ঐতিহাসিক বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করলেও স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক প্রভাবের বিষয়টি অধিকাংশ গবেষণায় গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়নি। উল্লেখিত তথ্য ভান্ডারের মধ্যে রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন বিষয়াবলী উল্লেখ থাকলেও বিপুল সংখ্যক শরণার্থী দীর্ঘদিন বাংলাদেশে বসবাস করার কারণে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশের ক্ষেত্রে কিরূপ প্রভাব ফেলছে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত পর্যালোচনা পাওয়া যায়নি। রোহিঙ্গা বিষয়ক এ সকল গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পদ্ধতিগতভাবে রচিত হয়নি বরং অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো দলিল-পত্রসমূহের তথ্যগত সমাবেশ মাত্র। এসব কারণে রোহিঙ্গা বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ থাকলেও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শরণার্থী হওয়া এবং পাশাপাশি বাংলাদেশে এর প্রভাব সংক্রান্ত সমৃদ্ধ, দিক নির্দেশনামূলক ও ভবিষ্যত বাংলাদেশের করণীয় ঠিক করতে সমৃদ্ধ গবেষণার গবেষণার সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

তৃতীয় ধাপ

৩.৬ বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রভাব

বাংলাদেশে অবস্থিত দু'টি শরণার্থী ক্যাম্প যথাক্রমে উখিয়ায় ও টেকনাফ উপজেলার কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প ও নয়াপাড়া রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প এবং পাশাপাশি দু'টি মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প যথাক্রমে উখিয়ায় ও টেকনাফ উপজেলার কুতুপালং মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প ও লেদা মেকশিফ্‌ট ক্যাম্পে শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব সম্পর্কে কিছু সংখ্যক সংশ্লিষ্ট গবেষণা পাওয়া যায়। এসকল গবেষণার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হলো- Bhattacharya, R: (2017); Sood, A. and Seferis, L: (2014); Wahiduzzaman Siddique: (2019); Muhammad Hossain Bin Idrish, (2015); Ullah, Akm Ahsan. (2011) & Dadush, U. and Niebuhr, M: (2016) প্রমুখ। এসকল সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষকগণ শরণার্থীদের উপস্থিতির ফলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভাব বিষয়ে কিছু গবেষণাধর্মী ধারণা বিশ্লেষণ করেছেন যা এই গবেষণাকে সমৃদ্ধ ও নতুন কোনো জ্ঞান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। পক্ষান্তরে, রোহিঙ্গা প্রভাবের বিষয়টি বহুমাত্রিক হবার

ফলে UNHCR-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা দেশসমূহ অনেক কাছে থেকে এ বিষয়গুলো দেখার দেখার ও কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। এর মধ্যেসমস্যাটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা সমস্যাকে প্রথমত মানবিক বিবেচনায় দেখলেও সংগত কারণে ধীরে ধীরে তা 'বোঝা' হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। মিয়ানমার সরকারের দীর্ঘদিনের চলমান অমিমাংসীত রাজনৈতিক বিষয়টি আজ শুধু বাংলাদেশের জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে তা নয়; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কখনো কখনো এ বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছে। যদিও রোহিঙ্গারা পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশে আজ চরম অমানবিক পরিস্থিতির স্বীকার। এরপরও রোহিঙ্গাদের অব্যাহত অনুপ্রবেশ বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি ও পরিবেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাবিত করছে। এতে করে উখিয়া-টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠী অনেক বেশি সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়ছি কি না গবেষণার মাধ্যমে সে বিষয়টি উঠে এসেছে। আর এজন্যই উল্লেখিত বিষয়ে গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশের এ সকল রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব সম্পর্কে সাহিত্যের আলোকপাত করা হলো-

৩.৬.১ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মজুরীতে প্রভাবঃ

শরণার্থী উপস্থিতির ফলে স্থানীয় সমাজে শ্রমের বাজারে মজুরির প্রভাব অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়। স্থানীয় শ্রম শক্তির পরিবর্তনে দক্ষতাসহ প্রধানত নিম্ন দক্ষ কর্মীদের হঠাৎ আগমন স্থানীয় শ্রম বাজারের মজুরিতে নেতিবাচক চাপে ফেলতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে শরণার্থীদের ভাষা দক্ষতা এবং শিক্ষাগত পটভূমির ওপর ভিত্তি করে এটি হয়। বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গারা স্থানীয়দের সাথে নিজ ধর্মীয় পরিচয়েই বসবাস করছে ও বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব বা কর্মকাণ্ডে একসাথে অংশ নিচ্ছে। তাদের ভাষা বাঙালি মুসলিমদের থেকে আলাদা হলেও চিটাগনিয়ান উপভাষার সাথে অনেক মিল রয়েছে। উখিয়া এবং টেকনাফ এর কোল ঘেঁষে প্রবাহিত নাফ নদীর ওপারেই মংডুসহ বিভিন্ন জেলায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বসবাস। তাই ধীর্ঘদিন থেকেই উভয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য এপার-ওপার আসা যাওয়া চলে। তাই তারা স্বাভাবিকভাবে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাষা বুঝতে এবং বলতে সক্ষম। উখিয়া এবং টেকনাফ অঞ্চলসমূহ যেহেতু বাংলাদেশের দরিদ্রতম হিসেবে বিবেচিত হয়। কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় মানুষের ভিড় এবং দরিদ্র বসতিপূর্ণ এলাকায় হাজার হাজার বসতি স্থাপনকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বছরের পর বছর ধরে স্থানীয় সম্প্রদায়ে সাথে বসবাস করছে। এ জন্য তারা মূলত এ এলাকায় ইতিমধ্যে স্বল্প সম্পদের মালিকানা এবং স্থানীয় চাকরির বাজারের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে (Uddin and Ahamed, 2008)। এটি আসলে সমালোচনামূলক মাইগ্রেশন তত্ত্ব অনুসারে, যা প্রস্তাব দেয় যে মাইগ্রেশন সস্তা শ্রম ছড়ানোর এক অন্যন্য উপায়। এই অর্থে রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক অভিবাসনের ফলে সস্তা শ্রম জমা হয়েছিল। যদিও সরকারীভাবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শরণার্থী শিবিরের বাইরে কাজে যেতে দেওয়ার স্বীকৃত হয়নি। তবে তাদের ভাষাগত ও শারীরিক গঠনে মিলের কারণে তারা তাদের

পরিচয় গোপন করতে সক্ষম হয়েছে। স্থানীয় কর্মীরা সস্তা কাজের বিনিময়ে তাদের পরিচয় উদ্ঘাটন করতে পারেন। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা মূলত নির্মাণ বা মৎস্য খাতে স্থানীয় বাংলাদেশীদের তুলনায় (প্রতিদিন ৫০০ টাকা) যথেষ্ট কম মজুরিতে কাজ করে থাকে (Bhattacharya, 2017)। শরণার্থীদের আগমন যৌক্তিকরূপে শ্রম সরবরাহ বৃদ্ধি যা স্বল্প দক্ষ চাকরির ক্ষেত্রে মজুরি হ্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে স্থানীয় দক্ষ শ্রম শরণার্থী সঙ্কটের কারণে বর্ধিত আন্তর্জাতিক উপস্থিতি থেকে সুবিধা উপভোগ করতে পারে। তদুপরি, শরণার্থীরা এমন কোনোও অঞ্চলে পৌঁছে, যেখানে শ্রম সরবরাহের ব্যবধান রয়েছে। তারা বেতনের ওপর কোনোও নেতিবাচক প্রভাব ছাড়াই স্থানীয় শ্রমবাজারে অংশ নিতে পারে (Sood and Seferis, 2014)। স্থানীয় শ্রমিকদের প্রতিস্থাপনের ক্ষমতাসহ কম দক্ষ শ্রমিকের আকস্মিক প্রবাহ স্থানীয় শ্রম বাজারের মজুরিতে নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি করে। প্রতিস্থাপন শরণার্থীদের ভাষা দক্ষতা এবং শিক্ষাগত পটভূমির ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে ভিত্তি তৈরি করে। রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের জনগণের সাথে ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ করে। তবে তাদের ভাষা বাঙালি থেকে আলাদা, এটি চিটাগনিয়ান দ্বান্দ্বিকের অনুরূপ, অতএব রোহিঙ্গা শরণার্থীগণ চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাষা বুঝতে এবং কথা বলতে সক্ষম। প্রধানত অশিক্ষিত শ্রমশক্তির জন্য একটি প্রতিযোগিতা করে। যেহেতু উখিয়া ও টেকনাফ অঞ্চলে বাংলাদেশের অন্যতম দরিদ্রতম মানুষ, তাদের অর্ধেক জনসংখ্যা অশিক্ষিত শ্রমশক্তি যার অর্থ স্থানীয়দের উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয় (Baldwin and Marshall, 2018)।

সস্তা শ্রমের বিনিময়ের স্থানীয় নিয়োগকর্তারা তাদের পরিচয়কে গোপন করে করতে সহায়তা করে। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা প্রধানত নিজেদের জন্য কিছু আয় বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় বাংলাদেশিদের (৫০০ টাকা প্রতি দিন) তুলনায় যথেষ্ট সস্তা বেতন (প্রতিদিন ৩০০ টাকা), নির্মাণে মৎস্য খাতে কাজ করে থাকে (Baldwin and Marshall, 2018)। এই সম্ভাব্য প্রভাব বোঝার জন্য বাংলাদেশে মজুরি হার সূচক (ডব্লিউআরআই) এবং বিশেষ করে চট্টগ্রাম জেলাগুলোতে মাসিক আয় পরিবর্তন অধ্যয়ন করা হয়। যাই হোক, এই যুক্তিতে একটি সতর্কতা, যে শরণার্থী অবৈধ শ্রম বাজারে অংশগ্রহণকারী হতে পারে। পরিসংখ্যান অনুসারে, যেহেতু শরণার্থীরা স্থানীয় শ্রম বাজারে একত্রিত হয় না তখন তারা সরবরাহকৃত সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয় বা অনানুষ্ঠানিক শ্রম বাজারের অংশ হয়ে যায় (Dadush and Niebuhr, 2016)। তারা দেশের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়; প্রথম বিকল্প অর্থ বা বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে থাকে। তবে এর অর্থ হচ্ছে রাজস্ব ক্ষতি এবং শ্রমিকদের শোষণ ও অপব্যবহারের সম্ভাবনা বেড়ে যায়; যার ফলে নিরাপত্তা সমস্যা হয়।

৩.৬.২ কাঠ ও জ্বালানীতে বন উজাড়

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বসতি স্থাপনের শুরু থেকেই শরণার্থী শিবিরের অঞ্চলে পরিবেশগত অবক্ষয়ে একটি উদ্বেগ রয়েছে। সর্বশেষ যাত্রা শুরুর আগে রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশে দুইটি বিদ্যমান শরণার্থী শিবির ছিল। পূর্ব-বিদ্যমান সমস্ত শিবিরগুলি বন বিভাগের

রিজার্ভ অঞ্চলে ছিল এবং বেশিরভাগ নতুন শিবির সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলোতে স্থাপন করা হয়েছে। ২৫০০ একরেরও বেশি বন জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য ও শিবির স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল (OCHA, 2018, p. 17)। বন ও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল স্থানীয় বাংলাদেশিদের জীবন-জীবিকার পাশাপশি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের একটি বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী জ্বালনী কাঠ সংগ্রহের কারণে রিজার্ভ অরণ্য এলাকা ধ্বংস বা হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে বর্ষা মৌসুমে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং ভূমিধসের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। শরণার্থী শিবিরের কারণে পরিবেশগত অবক্ষয়ের ঘটনা পূর্ববর্তী কিছু সাহিত্যেও দেখা যায়। কক্সবাজারে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীর বসতি পরিবেশের জন্য একই রকম হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩.৬.৩ পণ্যমূল্য বৃদ্ধি

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমনের পরে যে পণ্যের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে সেই পণ্যগুলোর দামও বেড়েছে। এর মধ্যে দু'টি পণ্যের উদাহরণ হলো সামুদ্রিক মাছ, শাক-সবজি এবং আলু। এই ঘটনাটি শরণার্থী আগমনের শুরুতে বিশেষত দৃশ্যমান ছিল। স্থানীয় বাজারে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি যদিও অনন্য ঘটনা নয়। "প্রারম্ভিক পর্যায়ে শরণার্থীরা স্থানীয় খাদ্য সরবরাহ কমিয়ে দিতে এবং খাদ্যমূল্য বাড়িয়ে তুলতে পারে"(Chambers, 1986, p. 246-249)। স্বল্প পরিমাণে সরবরাহসহ পণ্যগুলোর উচ্চ চাহিদা থাকায় এটি ঘটে। বিপুল সংখ্যক শরণার্থী আগমন বিভিন্ন ধরণের খাদ্যপণ্যের চাহিদা বাড়ায়। রোহিঙ্গা শরণার্থী সঙ্কটের ক্ষেত্রে খাদ্য সরবরাহের প্রাথমিক চাহিদা সরবরাহের তুলনায় অত্যন্ত বেশি ছিল। জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করতে কিছুটা সময় নিয়েছিল এবং শরণার্থীদের স্থানীয় বাজার থেকে খাদ্য পণ্য কিনতে বাধ্য করেছিল। বিভিন্ন এনজিও এবং আইএনজিওর (দেশি-বিদেশি) জরুরি ত্রাণ কর্মীরাও শরণার্থী আগমনের পরপরই তৎপরতা চালাতে কক্সবাজার অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছিল। ত্রাণকর্মীদের সংখ্যাও ছিল বড় এবং তারা স্থানীয় বাজারে কিছু খাদ্যপণ্যের চাহিদা বাড়িয়ে তোলে।

৩.৬.৪ রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশীদের মধ্যে আত্মীয়তার মিশ্র বন্ধন

১৯৯০ এর দশকের শুরুতে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী বহুসংখ্যক রোহিঙ্গার নাগরিকত্ব সনদ ও দলিলপত্র কেড়ে নেয়ায় সময় প্রায় ৩ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশের কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলার বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে (Gain, ed., 1992)। তাই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগণের মিশ্র বিবাহ অস্বাভাবিক নয়। শরণার্থী ক্যাম্পের হিসাব অনুযায়ী স্থানীয় নারী-পুরুষের সাথে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নারী-পুরুষের মিশ্র বিবাহ আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমতি দেওয়া হয় না কিন্তু এটির ঘটতে পারে। ক্যাম্পে নিবন্ধিত শরণার্থীদের বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট রোজিস্ট্রি ফরম রয়েছে। তাদের বিবাহ ও তালাক উভয়ই ক্যাম্প-ইন-চার্জ দ্বারা অনুমোদিত হয়। রোহিঙ্গাদের মধ্যে অল্প বয়সে বিয়ের প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। একইভাবে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় বাংলাদেশি জনসংখ্যার মধ্যেও অল্প বয়সে বিয়ের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। রোহিঙ্গা ও স্থানীয় বাংলাদেশিদের মধ্যে মিশ্র বিয়ের মধ্যে সামাজিক সমন্বয় রয়েছে বলে উভয়

জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে বিদ্যমান রয়েছে। তবে, পূর্বে এটি সম্ভবনা থাকলেও ২০০৮ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে ছবিসহ এনআইডি রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের প্রবর্তনের ফলে ২০০৭ সালে এটি আর আগের মতো সম্ভব হয় না। এক গবেষণায় দেখা যায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতাদের ১০০% স্বীকার করেছেন যে উখিয়া-টেকনাফের স্থানীয় ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে বিবাহ একটি সাধারণ ঘটনা। প্রায় ৯৩% স্থানীয় উত্তরদাতারা মত প্রকাশ করেছেন যে স্থানীয় এবং রোহিঙ্গাদের মধ্যে বেশিরভাগ বিবাহের মধ্যে কোনো বৈধ পদ্ধতি নেই। রোহিঙ্গা নারীর সাথে বিয়ে করার আগে স্থানীয়দের জন্য তাদের ভবিষ্যৎ স্ত্রীকে জন্মের প্রশংসাপত্র পরিচালনার জন্য স্থানীয়দের উৎসাহিত করা হয়। এই ধরনের সমস্যা রোহিঙ্গা নারী ও স্থানীয় পুরুষদের মধ্যে বিয়ের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ঘটে। স্থানীয় পুরুষ ও রোহিঙ্গা নারীর মিশও বিয়ে করেন এবং ৫৬% স্থানীয় মানুষ বলেছে বিবাহিত স্থানীয় পুরুষ রোহিঙ্গা নারীর সাথে বিয়ে করছে। এমনকি স্থানীয়দের অনেকে বিয়ে করে শরণার্থী ক্যাম্পে বসবাস শুরু করে। স্থানীয় উত্তরদাতাদের ৯৪% মনে করেন যে এই ধরনের বিয়ে সমাজে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। স্থানীয় উত্তরদাতাদের প্রায় ৮১% পুরুষ এবং ১৯% মহিলার মতে স্থানীয়রা রোহিঙ্গাদের সাথে বিবাহে জড়িত। ফলে এনজিওর কাছ থেকে সাহায্য ও ত্রাণ লাভের মতো সুবিধা পায় এবং অপর দিকে রোহিঙ্গাদের বিয়ে করা যায় কম খরচে (Idrish, 2015)।

৩.৬.৫ পরিবেশগত বিপর্যয়

রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে গবেষণা এলাকায় তীব্র পানির চাহিদা, পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া ও জ্বালানি কাঠের চাহিদা ব্যাপক পরিমাণে বেড়েছে। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবারের জন্য সংরক্ষিত বন থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করা হয় (FAO & IOM, 2017)। বিদ্যমান প্রায় সব শরণার্থী বসতি এবং রোহিঙ্গাদের জন্য নতুন প্রস্তাবিত ক্যাম্প এলাকায় বন বিভাগের সংরক্ষিত বনভূমি রয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষ এখানে সামাজিক বনভূমির নামে পরিবেশ ধ্বংস এবং একটি বিস্তৃত জনগোষ্ঠী দ্বারা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ স্থানীয় সম্প্রদায় এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে (FAO & IOM: 2017)। এছাড়াও বাংলাদেশের কক্সবাজার এলাকায় দীর্ঘ সময় মাটি ক্ষয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি (বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) এবং ভূমিধ্বসে সৃষ্ট সমস্যা দেখা দিচ্ছে (The Washington post, 2018)। উপোরন্তু এর মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের ধোঁয়া, হাজার হাজার গাড়ির নিয়মিত আসা যাওয়া, গাড়ি শ্রমিক পরিবহণ, দর্শক আগমন, শিবিরের জন্য পণ্য সরবরাহে বায়ু দূষণ উখিয়া ও টেকনাফ অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনে অবদান রাখছে (The Washington post, 2018)। ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গড়ে ওঠা টেকনাফের ৪টি শরণার্থী ক্যাম্পের ১৭,৪৯৭ টি শরণার্থী পরিবারের জন্য ৩৮২.৪৬ হেক্টর বনভূমির বনজ সম্পদ নির্বিচারে উজাড়ের চিত্র পাওয়া যায় (Hossain and Rahman, 1992)।

৩.৬.৫.১ বনের ওপর নির্ভরতা

রোহিঙ্গা শরণার্থীরা জ্বালানী কাঠ, ঘর তৈরির উপকরণ, ফলমূল, শাকসজী, বাঁশ, বেত, ঔষধি গাছ এবং অন্যান্য পণ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বনের ওপর নির্ভর করে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের পরিধির মধ্যে বসবাস করে। শরণার্থীরা তাদের প্রতিদিনের পরিবারের প্রয়োজনীয়তার জন্য বনের ওপর নির্ভরশীল করে এবং অতিরিক্ত আয়ের উৎস হিসেবে বনজ পণ্যের ওপর নির্ভর করে থাকে। রোহিঙ্গাদের বনের ওপর নির্ভরতার শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে: সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, পরিমিত নির্ভরশীল এবং কম নির্ভরশীল। রোহিঙ্গাদের মতামত অনুযায়ী পুরোপুরি বনের ওপর নির্ভরশীল ৯২.৫%, মাঝারি নির্ভরশীল ৫% এবং কম নির্ভরশীল ২.৫%। বন ধ্বংসের প্রধান কারণগুলি অনুসন্ধান করে কিছু কারণ চিহ্নিত কর হয়েছে; যার মধ্যে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, ঘাস, ফসল, বাঁশ এবং বেত উত্তোলন, বনের জমি দখল, ঔষধি গাছ এবং শাকসজ্জি সংগ্রহ, সবুজ ও শুকনো পাতা সংগ্রহ করতে রোহিঙ্গারা সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছে। তারা ইট, বালি, পাথর এবং সুপারি পাতা সংগ্রহেও নিযুক্ত ছিল। উত্তরদাতারা তাদের আয়ের পরিপূরক হিসাবে বাঁশ এবং বেত সংগ্রহ করেছিলেন মোট ২৭.৫%। বাড়ি নির্মাণে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি বাঁশ এবং বেত সংগ্রহ করে যা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের আশেপাশের অনেকগুলো কুটির শিল্পকে উপলক্ষকরে গড়ে উঠেছিল। অনুসন্ধানে প্রায় ২৫% রোহিঙ্গা শরণার্থী রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধি গাছ ব্যবহার করেন। কিছু উত্তরদাতা (৮%) অতিরিক্ত আয়ের জন্য তাদের প্রতিবেশী বাজারে এই পণ্যদ্রব্য বিক্রি করেছিলেন (khan & Others, Uddin (Ed.,) 2012)।

৩.৬.৬ মাদক

স্থানীয়ভাবে ‘ইয়াবা’ (মেথামফেটামিন এবং ক্যাফিনের সংমিশ্রণ) নামে পরিচিত ড্রাগ কক্সবাজারের স্থানীয় সমস্যাই নয়কেবল নয়, এটি গত কয়েক বছর ধরে সারা বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে ব্যবহৃত এ ড্রাগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে বাংলাদেশে ইয়াবার ব্যবহার বাড়ছে বলে জানা গেছে (Thompson, 2017)। ইয়াবা কেবল বাংলাদেশে জনপ্রিয় নয়, এটি থাইল্যান্ডের মতো অন্যান্য পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে মিয়ানমারের মূল উৎস যেখানে এ মাদক উৎপাদন করে এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে রফতানি করে। বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সর্বশেষ আগমনের আগে এই ড্রাগের বিস্তারকে ভালভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছিল। এ সত্বেও স্থানীয় জনগণের ধারণা প্রভাবিত করেছে এবং সরকারী কর্মকর্তারা বিবেচনা করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাধ্যমে ইয়াবা আমদানি বেড়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মাদক ব্যবসার বিষয়ে যথাযথ ও সঠিক তথ্য উদ্ধার করা কঠিন ছিল। যেহেতু এটি একটি সংবেদনশীল বিষয় প্রায় ৭৪% রোহিঙ্গা বলেছিলেন যে এই ক্যাম্পগুলিতে কোনো ধরনের ক্রিয়াকলাপ নেই। অন্যদিকে বাকিরা স্বীকার করে যে মাদকের প্রভাব ও উপস্থিতি এই ক্যাম্পের মানুষের ওপর খুব

ফেলছে। তারা আরও বলেছে যে অনেক তরুণ রোহিঙ্গা মাদকে আসক্ত এবং কিছু মাদক সম্পর্কিত ব্যবসায় জড়িত। ড্রাগ বিশেষ করে ইয়াবা ব্যবসায় রোহিঙ্গাদের জড়িত ক্যাম্পগুলোর একটি চলমান ঘটনা। প্রায় ৯% রোহিঙ্গা উত্তরদাতারা জবাবে বলেন তাদের এই ধরনের সক্রিয়তার সাথে কোনো সংযোগ নেই। অন্যদিকে, ৯১% রোহিঙ্গা উত্তরদাতারা উত্তর দিয়েছেন যে রোহিঙ্গারা ইয়াবা বহনে জড়িত কিন্তু স্থানীয় মাদকদ্রব্য বিক্রেতারা তাদের ব্যবহার করছে। রোহিঙ্গারা বলেছেন যে মিয়ানমার ও স্থানীয় মাদক ব্যবসীদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ জরিপে ২% রোহিঙ্গা বলেছে যে তাদের পরিবারের সদস্যরা ইয়াবার সাথে জড়িত ছিল (Idrish, 2015)।

৩.৭ উপসংহার

ওপরোক্ত আলোচনায় শরণার্থী প্রভাবের সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনায় বিশ্বব্যাপী স্থাপিত শরণার্থী শিবিরের কারণে স্থানীয় জনজীবনে প্রভাব সম্পর্কিত প্রর্যালোচনা পর্যালোচনা মাধ্যমে ঐ সকল স্থানের স্থানীয় সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ের আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া এ সম্পর্কিত স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য পৃথিবীর দেশে দেশে অবস্থানরত শরণার্থীদের কারণে স্থানীয় সম্প্রদায় বা আশ্রয়দানকারীদের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বার্মা'র (মিয়ানমারের) উপনিবেশ পূর্ব আমল, উপনিবেশিক আমল ও উপনিবেশ উত্তর আমলের তথা ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশদের থেকে বার্মার স্বাধীনতা লাভের পর (স্বাধীন বার্মার আরাকানীজ মুসলিম বা রোহিঙ্গা মুসলিম) ঐতিহাসিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশে আগমন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে লিখিত অভিসন্দর্ভ, বই ও প্রবন্ধেসমূহ কয়েকটি ভাগে পর্যালোচনা রয়েছে। অধিকন্তু মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে অবস্থান গ্রহণ ও জীবন-ধারণ প্রক্রিয়া, স্থানীয় আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠীর সাথে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সম্পর্ক এবং শরণার্থী উপস্থিতির কারণে ঐ অঞ্চলের স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে লেখকগণের মতামতসহ রোহিঙ্গাদের উপস্থিতির কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থানীয় পর্যায়ে (উখিয়া-টেকনাফ) শরণার্থী প্রভাব বিষয়ে পর্যালোচনা রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়:
ধারণামূলক কাঠামো ও স্থিতিস্থাপকতার তাত্ত্বিক আলোচনা

৪.১ ভূমিকা

ধারণাগত কাঠামো হলো এমন একটি কাঠামো যা গবেষক বিশ্বাস করেন যে গবেষণার জন্য ঘটনার প্রাকৃতিক অগ্রগতি সর্বোত্তমভাবে ব্যাখ্যা করতে পারা যায়। এটি কিভাবে গবেষণা সমস্যাটি অন্বেষণ করা হবে তা গবেষকের ব্যাখ্যা স্বরূপ হয়ে থাকে। যা গবেষক দ্বারা প্রণীত জ্ঞান বিতরণ এবং ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত ধারণার সাথে যুক্ত হয় (Peshkin, 1993)। ধারণামূলক কাঠামোয় গবেষণা কিভাবে গবেষণার সমস্যা অন্বেষণ করবে তার একটি সংহত উপায় উপস্থাপন করে গবেষণার অধীনে থাকা নির্দিষ্ট একটি সমস্যার দিকে লক্ষ করা হয় (Liehr & Smith, 1999)। একটি ধারণাগত কাঠামো হলো অন্তর্নিহিত চিন্তাভাবনা, কাঠামো, পরিকল্পনা এবং যা সম্পূর্ণ অনুশীলনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে। ধারণাগত কাঠামো একটি বিস্তৃত ধারণা যা কার্যত গবেষণার সমস্ত দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে গবেষণার বিষয় চিহ্নিতকরণ, তদন্ত করার সমস্যা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, সাহিত্য পর্যালোচনা করা, তত্ত্বগুলো প্রয়োগ করার পদ্ধতি অর্ন্তভুক্ত হয়। তাছাড়া ধারণাগত কাঠামোয় পদ্ধতির ব্যবহার ও পদ্ধতির উপকরণগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা, তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল, সুপারিশ এবং ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগও থাকে (Ravitch, & Riggan, (2017)।

এ ক্ষেত্রে পুরো পদ্ধতিটি অবশ্যই প্রসঙ্গের সাথে একমত হতে হবে। গবেষক বিদ্যমান কাঠামো অবলম্বন করতে পারে তবে তাদের গবেষণায় প্রসঙ্গের প্রকৃতির পাশাপাশি তাদের গবেষণামূলক প্রশ্নের প্রকৃতি অনুসারে এটি পরিবর্তন করতে হয় (Fisher, 2007)। Fisher আরো যোগ করেছেন যে, একটি ভাল ধারণাগত কাঠামোটিও পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য লিখিতভাবে প্রকাশ করতে হয়। এর অর্থ এই যে কোনো গবেষক চূড়ান্তভাবে গবেষণার জন্য একটি নকশা উপস্থাপন করতে পারেন। এটি পরিপূরক নির্ধারণে প্রধান গবেষণা সমস্যার উত্তর দিতে সহায়তা করে। এ গবেষণায় বেশ কিছু ধারণাগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা এর উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়েছে। এটি গবেষণার জন্য গাইড হিসেবেও কাজ করে (Grant & Osanloo, 2014)। গবেষণার ক্ষেত্রে এটি বিদ্যমান তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি কাঠামো সম্পর্কিত গবেষণার অনুমানকে প্রতিফলিত করে। গবেষণার ছোট ছোট অনেকগুলো বিষয়ে ধারণা দেওয়ার মাধ্যমে কাঠামোগতভাবে একটি যুক্তিকে প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে গবেষণার বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে (Radhakrishna, & Ewing, 2007)। সুতরাং এ গবেষণায়ও অনুরূপভাবে একটি ধারণাগত কাঠামো উপস্থাপিত হয়েছে। ধারণাগত কাঠামো একটি গবেষণার মূল ধারণার মধ্যে সম্পর্ককে বর্ণনা করে। কোনো গবেষণায় ধারণাগুলো একে অপরের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তার চিত্র বা দৃশ্যমান একটি যৌক্তিক কাঠামোয় সাজানো হয় (Grant, & Osanloo, 2014)। গবেষণার এ ধারণাগুলো গবেষণার লক্ষ্য উন্নত করতে, গবেষণা প্রশ্নগুলোকে

এগিয়ে নিতে, উপযুক্ত পন্থাসমূহ গ্রহণে এবং সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করতে সহায়তা করে (Lederman, 2015: p. 597; LeCompte & Goetz, 1993)।

শরণার্থী ও আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠী বা ঐ অঞ্চলে মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে প্রভাব লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশিরভাগ দেশ তাদের সীমিত বাস্তুসংস্থানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শরণার্থী আশ্রয় প্রদান করেছে। এতে কখনো আশ্রয়দানকারী দেশের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বিষয়ে তথা জীবন মানে প্রভাবিত করে থাকে। গবেষণা এলাকার পরিবেশগত ঘাটতি ও অবনতি, রোগ বিস্তার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ধরণের বিপর্যয়ের গভীরতা দ্বারা বহিরাগত হুমকির উপর সামান্য মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয় (Paris, 2001)। এ গবেষণায় আন্ত-সম্পর্কিত ধারণা এবং এই ধারণার সংজ্ঞায়িত একটি ধারণাগত কাঠামোর ভিত্তিতে ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা থাকে (Berman, J 2013: p. 2)। এ অধ্যায়ে গবেষণার অনুসন্ধানের সুবিধার্থে কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন: রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অবস্থানের ফলে স্থানীয়দের জীবন-যাপন প্রক্রিয়া ও একই সাথে স্থানীয় পর্যায়ে এ এলাকায় বসবাসকারী জনসংখ্যার ওপর প্রভাবসমূহ।

৪.২ গবেষণার ধারণামূলক কাঠামো (Conceptual Framework)

এ গবেষণাকর্মের ধারণাসমূহ কিভাবে এতে সহায়ক হয়েছে তার একটি কাঠামোগত চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

চিত্র-৪.১ঃ ধারণাগত কাঠামোর চিত্র

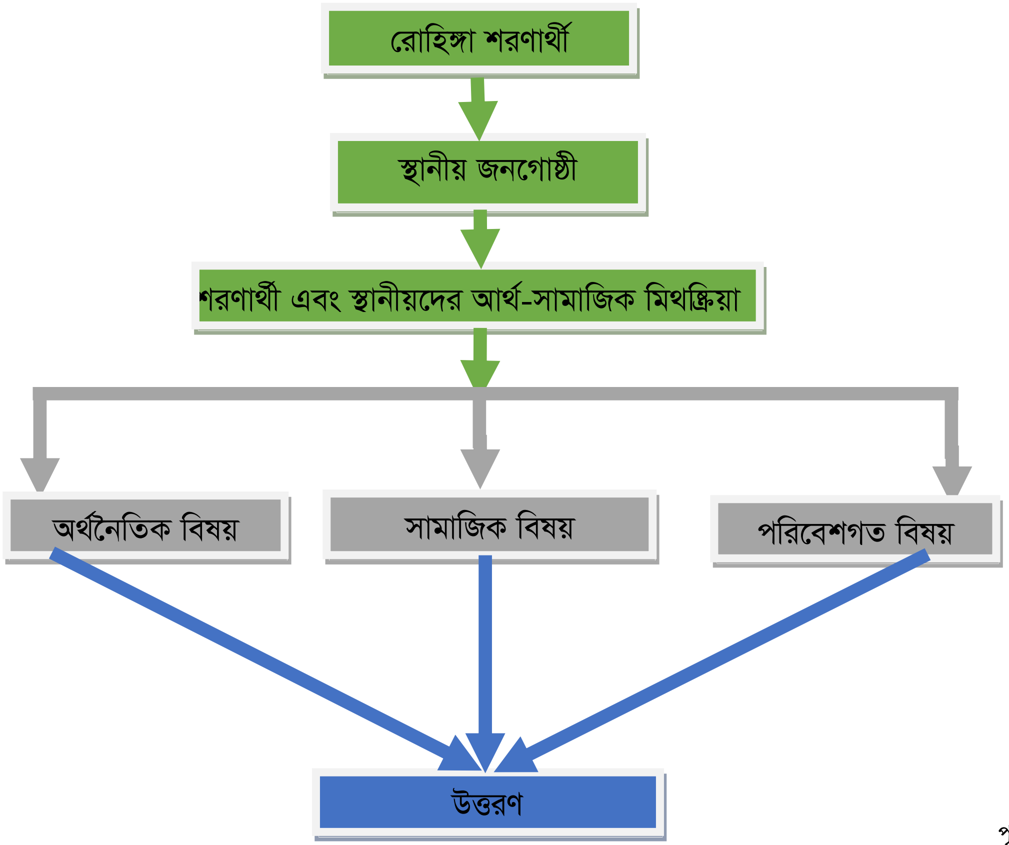

নিপীড়ন থেকে পালিয়ে আসা মানুষের বিদেশের মাটিতে আশ্রয় লাভের অনুশীলন সভ্যতার শুরু থেকেই হয়ে আসছে। যে সমস্ত লোকেরা তাদের নিজ দেশের বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছেন এবং নির্যাতনের ভয়ে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করেছে। এ নির্যাতনের কারণ হচ্ছে বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা, বিশেষ কোন সামাজিক গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণ (সশস্ত্র সংঘর্ষ, ব্যাপক সহিংসতা, মানবাধিকারের লংঘন ও প্রাকৃতিক এবং মানব সৃষ্ট বিপর্যয়)। অত্যাচার জনিত কারণে অথবা জীবন বা স্বাধীনতার প্রতি হুমকী দেখা দিলে বা অবৈধ বিচারের হাত থেকে বাঁচতে, যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে মানুষ শরণার্থী হতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে নিজেদেরকে শরণার্থী দাবীর যথার্থতা প্রমাণের জন্য অনিশ্চিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে; এ সমস্ত শরণার্থী আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী শরণার্থী হিসেবে মর্যাদা না পাওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দেশে মৌলিক মানবিক অধিকার পায় না।

৪.৩ রোহিঙ্গা শরণার্থী

১৭৮৫ সালে বার্মা কর্তৃক অধিগ্রহণের আগে আরাকান একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল। বর্মিরা ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথেই মুসলিমদের বার্মিজ সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করেছিলেন (Human Rights Watch, 2002)। বার্মাকে বিভক্তকরণ থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জেনারেল নে উইন বার্মার নামটি '*Socialist Republic of the Union of Burma*' নাম হিসাবে পরিবর্তন করেছিলেন। পূর্ববর্তী ব্রিটিশ-বার্মা অঞ্চলে প্রতিশ্রুত ফেডারেল রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি ইউনিয়ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বার্মিজ জেনারেলের নেতৃত্বে রোহিঙ্গারা হুমকী, দুর্দশা এবং ভয়ের ছায়ায় বাস করত। একই সময়ে ১৯৭৪ সালের জরুরি ইমিগ্রেশন আইন প্রণীত হয় যা রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে নাগরিকত্বের মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং তাদের নিজের দেশে বিদেশী করে তুলেছিলো (Nemoto, 2005)। নে উইন এর অপারেশন নাগা মিন বা অপারেশন অফ ড্রাগন নামে একটি বৃহৎ আকারের সামরিক অভিযান শুরু করেন। অভিযানের লক্ষ্যটি ছিল মূলত আরাকান অঞ্চলে মুজাহেদীন বা মুজাহিদ নামক মুসলিম বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত। সেনাবাহিনীর দ্বারা নির্যাতন ও হত্যার কাহিনী সম্পর্কে রোহিঙ্গাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় আরাকানের রোহিঙ্গা শরণার্থীরা ১৯৭৮ সালে প্রথম যাত্রায় বাংলাদেশে এসেছিল। মিয়ানমার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সরাসরি আলোচনা (বহিরাগত চাপের ফলে) এবং বার্মায় রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনও করা হয়।

রোহিঙ্গাদের বার্মায় সরকারিভাবে আটটি প্রধান নৃগোষ্ঠী বা ১৩৫টি অন্যান্য (ক্ষুদ্র) নৃগোষ্ঠীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় নিবন্ধকরণ পত্রের ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন কার্ড বা (এনআরসি) পরিবর্তে রোহিঙ্গাদের কেবল বিদেশী নিবন্ধকরণ হিসেবে ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন কার্ড বা (এফআরসি) দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সামরিক সরকারের জারি করা ভবিষ্যতে নাগরিকত্বের স্বীকৃতির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এটি ছিল

তার অস্থায়ী নিবন্ধন কার্ড (টিআরসি); যা “সাদা কার্ড” নামেও পরিচিত। মিয়ানমার রাষ্ট্র কর্তৃক রোহিঙ্গা এবং জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (UNHCR) উভয়কে “প্রতারণা” করার জন্য সাদা কার্ড ব্যবহার করা হয়েছিল। যেটি সেই সময়ে রাখাইন রাজ্যে কার্যকর ছিল এবং রোহিঙ্গাদের জন্য নথিপত্রের জন্য সমর্থন করেছিল (HRW, 2019)। মিয়ানমারের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়ের লোকদের নাগরিকত্ব কার্ডের পরিবর্তে ১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশ থেকে জোরপূর্বক প্রত্যাবাসনের পর সমস্ত রোহিঙ্গাদের সাদা কার্ড ইস্যু করা হয়েছিল (Index ASA, 16/7484/2017)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্থানীয় আরাকানিজ সমাজের মধ্যে সামাজিক বিভাজন ছিল। বৌদ্ধ আরাকানিরা জাতীয়তাবাদী ও উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন যা জাপানী বাহিনী সমর্থন করেছিল। মুসলিম আরাকানিজ বা রোহিঙ্গারা তাদের আনুগত্য ব্রিটিশদের পক্ষে রেখেছিল। রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার ফলস্বরূপ ইঙ্গ-বার্মিজ যুদ্ধের সময় এই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক সহজেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মায় একে অপরের সাথে লড়াই করা মূল বাহিনী (ব্রিটিশ এবং জাপানি) ইতিমধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। জেনারেল নে উইন বার্মায় একটি নতুন যুগ নিয়ে এসেছিলেন, সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের যুগ হিসেবে তিনি বার্মার পুরো ইতিহাসকে ঘিরে থাকা ঐতিহাসিক বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য করলেন। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ব্রিটিশদের শাসনাধীনে থাকা অবস্থায় বার্মার নেতাদের নিকট থেকে রোহিঙ্গারা নৃতাত্ত্বিক স্বীকৃতি পায়নি। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশদের নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভের পরেও বার্মা (পরবর্তী নাম মিয়ানমার) রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে অভিবাসী হিসেবে বিবেচনা করে তাদের নৃতাত্ত্বিক বিষয়টি অস্বীকার করে। প্রধানমন্ত্রী উ নু’র নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সরকারের অধীনে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের ১৩৫ টি নৃগোষ্ঠীর স্বীকৃতি না পেলেও কিছু নাগরিক সুযোগ-সুবিধা তাদের ছিল। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে নে উইন এর সামরিক শাসনামলে তাদের মিয়ানমারের নাগরিক অধিকার লঙ্ঘিত করা হয়েছিল।

১৯৭৮ সালের মিয়ানমার সেনা বাহিনীর পক্ষ থেকে নাগামিন অপারেশন ছিল একটি ছাড়পত্র অপারেশন যা রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করেছিল এবং তাদের পরিচয় সমাপ্ত করার জন্য গণধর্ষণ ও হত্যার মতো গুরুতর অত্যাচার চালিয়েছিল (Cheesman, 2017)। অথচ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্য (Albert, 2015)। ১৯৮২ সালে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। রোহিঙ্গারা একটি সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী এবং ধারাবাহিক সরকারগুলো তাদের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে তাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করেছে। এটি তাদের রাষ্ট্রহীন করে তুলেছে; তাই তাদের নাগরিক সুবিধা এবং অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। মিয়ানমার সরকার তাদেরকে অবৈধ বলে বিবেচনা করেছে কারণ তাদের দাবি যে, ব্রিটিশ শাসনামলে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমার পাড়ি জমিয়েছে। ইরাকের কুর্দিদের এবং রোহিঙ্গাদের অবস্থা একই রকম কারণ; উভয়ের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রহীন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর যে অঞ্চল থেকে তাদের বহিষ্কার করা হয়েছে বা সেখানে থাকার জন্য লড়াই করা হয়েছে তার

ঐতিতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। উভয় পরিস্থিতি সমান কারণ দ্বন্দ্বটি সরকার এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মধ্যে চলমান ছিল (Garrie, 2017)। ব্রিটিশ কর্মী ও মানবাধিকার বিষয়ক মন্তব্যকারী সালমা ইয়াকুব ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭-তে আল জাজিরা সংবাদ মাধ্যমের সাথে সাক্ষাৎকারে ব্রিটিশ সরকারকে রোহিঙ্গা সংকটের বীজ রোপণকারী বলে অভিযোগ করেছিলেন (Yaqoob, 2017)। উপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশরা মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করেছিল। স্বাধীনতার সংগ্রাম তীব্র হওয়ার সাথে সাথে মুসলমান ও বৌদ্ধদের মধ্যে বিভেদও বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে বৌদ্ধরা ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন এবং মুসলমানদের তাদের নিজস্ব ইচ্ছায় তাড়িত করেছিল। বার্মা সরকার এ কথার যুক্তি দিয়েছিল রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অভিবাসী যারা উপনিবেশিক আমলে এসে বসতি স্থাপন করেছিল।

২০০৩ সালে ইউএনএইচসিআর এর তথ্য অনুসারে রোহিঙ্গাদের অত্যাচারিত করা হয়েছিল। তাদের মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা এবং মিয়ানমারের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ফলে এসকল রোহিঙ্গা শরণার্থীরা শক্তিহীন ও রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে (UNHCR, 2003)। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে শরণার্থীদের প্রবেশ ও বসবাসের অনুমতি দেওয়ার পরে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইন অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের প্রাথমিক চাহিদা পূরণে চেষ্টা করে চলেছে। যদিও বাংলাদেশ ১৯৫১ সালের জেনেভা কনভেনশন ও ১৯৬৭ সালের প্রোটোকলের স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে স্বাক্ষর করেনি। কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফে স্থানীয় জনসংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী বসবাস করছে (banglapedia.org, 2014)। ১৯৯১-৯২ নির্মিত শরণার্থী ক্যাম্পদ্বয়ে ২৮,০০০ নথিভুক্ত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বসবাস করে এমন দুটি শিবির এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশে আনুমানিক অনিবন্ধিত ২,২০,০০০ থেকে ৩,৩০,০০০ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী রয়েছে (Parnini, and Ghazali, 2013, p. 137)। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কয়েক পর্বে আগমণের সর্বশেষ আগমণ ২৫ আগস্ট, ২০১৭ সালে শুরু হয়েছিল। যার ফলে ৭,০০,০০০ এরও বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসেছিল। এই শরণার্থীদের বেশিরভাগই ছিলেন নারী ও শিশু (UNHCR, 2018b, p. 7-9)। এ উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার শরণার্থী আশ্রিত অঞ্চলসমূহের গ্রামীণ অংশে জীবনের গতি বেশ ধীর হলেও শরণার্থী আগমনে জীবনের গতি বেশ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। মিয়ানমার সামরিক বাহিনী এবং বৌদ্ধ রাখাইনদের এই পদক্ষেপকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে 'টার্গেট সহিংসতা' এবং এই নির্বাসনকে বিশ্বের দ্রুত বর্ধমান শরণার্থী সঙ্কট হিসাবেও বর্ণনা করা যায়। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ও জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সর্বশেষ ২০১৭ সালে মানবিক কারণে বাংলাদেশ সরকার তার সীমানা খুলেছে এবং মানবিক প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছে। এরও পরে আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী সম্প্রদায় দ্রুত জরুরি ত্রাণের কার্যক্রম শুরু করে। সেখানে ৩৩ টি নতুন শিবিরের শরণার্থীরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আবাসন সুবিধাও ভাগ করে নিয়েছে। স্থানীয় গ্রামগুলোতে

৫,৬০০০ এরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আবাসন সহায়তা দেয়া হয়েছে এবং তারা শিবিরের আশেপাশের গ্রামগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে (UNHCR, 2018c)।

স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের সীমিত সম্পদের মধ্যে থেকেও সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, জ্বালানী কাঠ, বিশুদ্ধ পানি, খেলার মাঠ ও কৃষি জমি ভাগাভাগি করে ব্যবহার করেছে। কিন্তু বছরের পর বছর এভাবে চলতে থাকলে স্থানীয়দের মধ্যে রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে এক ধরণের ক্ষোভ তৈরী হচ্ছে এবং নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠছে। এতে করে স্থানীয়দের সাথে রোহিঙ্গাদের আগের সেই সম্পর্ক আর থাকছে না। এ অবস্থায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একটি অংশের অবস্থা আরো নাজুক হয়ে পড়ছে এবং তারা এই অবস্থার জন্য রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে দায়ী বলে মনে করছে। নিম্নে উল্লিখিত মানচিত্রটিতে ইন্টার সেক্টর কো-অর্ডিনেশনস গ্রুপ উখিয়া এবং টেকনাফের শরণার্থী শিবিরগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করেছে (humanitarianresponse, 2019)।[১]

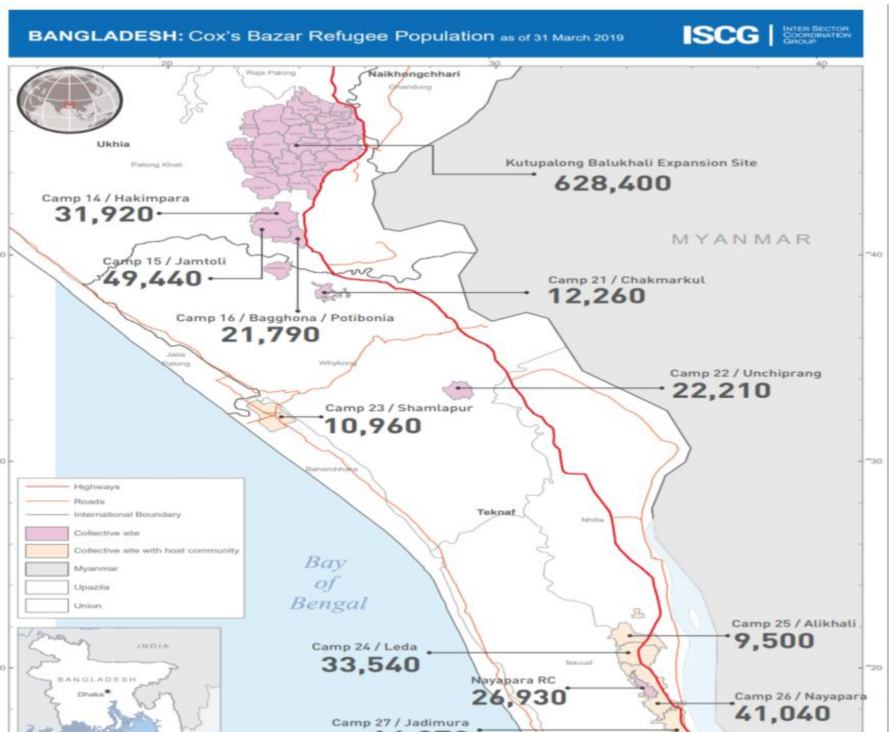

মানচিত্র-৪.২ঃ উখিয়া এবং টেকনাফের শরণার্থী শিবিরগুলোর অবস্থান

১. www.humanitarianresponse.info (Accessed: April 24, 2019)

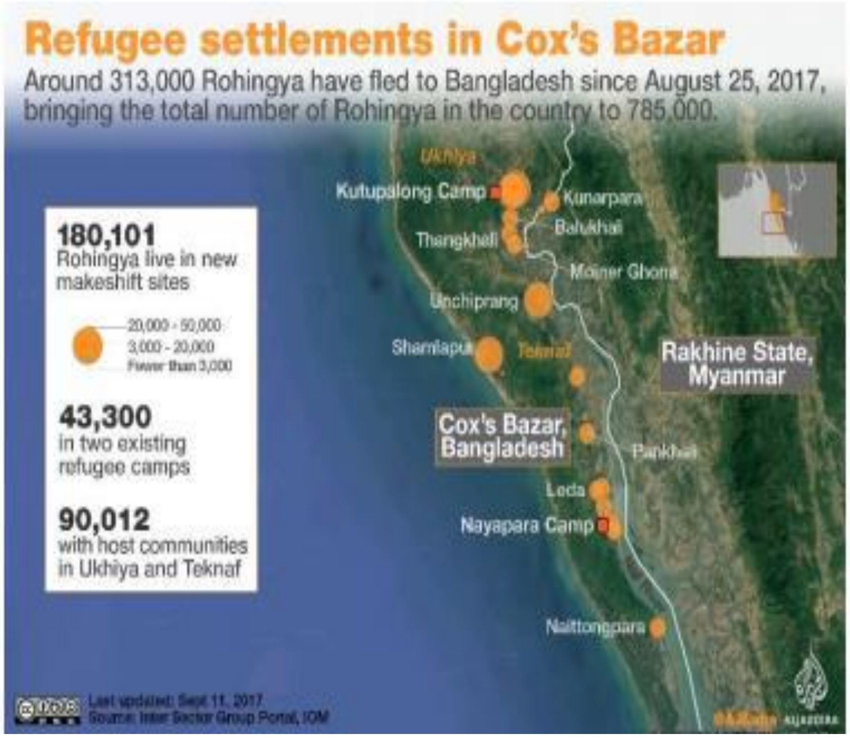

Source: European Commission Humantarian Operation

চিত্র-৪.৩ঃ ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা

৪.৪ স্থানীয় জনগোষ্ঠী

কক্সবাজারের বেশিরভাগ মানুষ কৃষি ও মৎস্য চাষের উপর নির্ভরশীল এবং তাদের শিক্ষার হার জাতীয় গড় শিক্ষার তুলনায় যথেষ্ট নীচে। বাংলাদেশের এ অঞ্চলের লোকেরা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা ও উপভাষায় কথা বলে। কক্সবাজারের উত্তরে চট্টগ্রাম জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তর-পূর্বে বান্দরবান জেলা, পূর্বে নাফ নদী, আরাকান (মিয়ানমার) এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর দ্বারা সীমাবদ্ধ। কক্সবাজারের অর্ধেকটি পার্বত্য অঞ্চল এবং বাকি অর্ধেকটি উপকূলীয় দ্বীপগুলি নিয়ে গঠিত। এ গবেষণায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী বলতে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় বসবাসরত বাঙালী হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ বড়ুয়া ও রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদেরকে বুঝানো হয়েছে। শরণার্থী উপস্থিতির কারণে যে কোনো ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে এটি অস্বাভাবিক বিষয় নয়। তাই কেনিয়া, তুরস্ক, ভারত ও জার্মানি ইত্যাদির মতো বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় শরণার্থীদের স্থানীয় করা হয়েছে (Lydia and Denise, 2015)। আশ্রয়দানকারী দেশ শরণার্থীদের মোকাবেলা করার জন্য কম-বেশি আর্থ-সামাজিক সঙ্কটে নিপতিত হয়েছে; বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে রোহিঙ্গা বিষয়টি অন্যান্য শরণার্থী বিষয় থেকে আলাদা এবং সাম্প্রতিক ২০১৭ সালের পর থেকে এর প্রভাবে তা আরও তীব্রতর হয়েছে। যদিও বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমারের সাথে এই বিষয়টি মিমাংসার জন্য আলোচনার মাধ্যমে সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তবে মিয়ানমারের অসহযোগিতার কারণে এই সঙ্কট সমাধানে কতটা

অপেক্ষা করতে হবে তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন (The Daily Star, 2017)। উল্লেখযোগ্য রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চল কক্সবাজার জেলায় বসবাস করছে। সম্প্রতি মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের আগমনের কারণে বাংলাদেশ বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যক শরণার্থী আশ্রয় প্রদান করেছে (UNHCR, 2018)। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা এসকল স্থানীয় মানুষের বাড়ি-ঘরে আশ্রয় গ্রহণ, চাষের জমিতে ঘড়-বাড়ি তৈরী, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রির জন্য বাজার স্থাপন ও বনভূমি দখল করে বসতি স্থাপন করেছে। পরবর্তীতে প্রশাসনের সহায়তায় উখিয়া উপজেলার রাজাপালং, পালংখালি ইউনিয়নে ও টেকনাফ উপজেলার হোয়াক্যাং ও হ্নীলা ইউনিয়নের নতুন নতুন শরণার্থী শিবির তৈরী করে সেখানে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে ক্যাম্প হয়েছে মোট ৩৩টি ও শরণার্থী জনসংখ্যা ১১ লাখ ছাড়িয়ে গেছে (UNHCR, 2018b)। এছাড়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কক্সবাজারের মানুষের সাথে জাতিগত, ভাষাগত এবং ধর্মীয় মিল রয়েছে। আবার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেও কক্সবাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সর্বদা পছন্দনীয় গন্তব্য ছিল। তাই এই বিশাল সংখ্যক রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে না পারলে তারা বাংলাদেশকে তাদের বাসস্থান হিসেবেই ভাবতে শুরু করবে।

৪.৪.১ স্থানীয়দের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

কক্সবাজারে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত এর ১২০ কিলোমিটার বালুকাময় উপকূল রেখা রয়েছে (International Crisis Group, 2017)। এ জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা একটি কৃষি প্রধান ও পর্যটন নির্ভর এলাকা। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের এখানে আগমনের আগে গড়ে ৩৩% মানুষ দারিদ্র্য রেখার নিচে বাস করত এবং চরম দারিদ্র্য সীমার নিচেছিল ১৭% (ISCG, 2018)। সম্প্রতি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমন এবং বিস্তৃত শিবির নির্মাণে দেশের এ দরিদ্রতম এলাকায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্বেগ জাগিয়ে তুলেছে। রোহিঙ্গা সম্প্রদায় সম্পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বন এবং কৃষির ব্যাপক ক্ষতিতে লিপ্ত রয়েছে। এ এলাকায় জমি এবং খাদ্য থেকে শুরু করে আবাসন মূল্য সবকিছুর জন্য মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে (Linah Alsaafin, 2018)। উখিয়া ও টেকনাফে দু'টি "শরণার্থী শিবির"এ পুরাতন রোহিঙ্গাদের বসবাস থাকলেও নতুন রোহিঙ্গাদের সম্প্রসারণ ক্যাম্পে মূল (পুরাতন) শরণার্থী শিবিরের সঙ্গে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম শরণার্থী শিবির হয়ে উঠেছে কুতুপালং-বালুখালী "মেগা ক্যাম্প"। এখানে নতুন করে ৬,০০,০০০ এরও বেশী রোহিঙ্গাদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। শরণার্থী শিবিরের মধ্যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা স্থানীয় বাসিন্দাদের ভয় ও অস্বস্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। বর্তমানে শরণার্থী জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে স্যানিটেশন সুবিধা এবং দুর্বল শিবির পরিকল্পনা, কৃষি জমি, সুপেয় পানির দুষ্প্রাপ্যতা, দূষিত বাতাস এবং সেই সাথে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে শিবিরের আশেপাশে স্থানীয় জনগোষ্ঠী যারা বসবাস করে তাদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার জন্য প্রধান উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে (ISCG, 2018)। তাছাড়া দ্রুত শিবির

সম্প্রসারণের ফলে স্থানীয় বনভূমির দ্রুত অবনতি হয়েছে। কারণ গবেষণা অঞ্চলের পরিবেশগত সমস্যা স্থানীয় সম্প্রদায় এবং বন্য প্রাণীদের আবাস স্থল বিঘ্নিত করেছে (Hassan, 2018)। এখানকার পরিবেশের চরম আবহাওয়া অর্থাৎ কক্সবাজারে প্রায় ২,১৫,০০০ শরণার্থী ভূমিধস এবং বন্যার বিপদের মধ্যে রয়েছে। উপকূলীয় জেলা হওয়ায় কক্সবাজার অঞ্চলটি প্রায়শই ভূমি ক্ষয়ের ফলে ভূমির গঠন শৈলীতে পরিবর্তন হয়েছে (Banglapedia, 2017)।

কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুরাতন ক্যাম্প দু'টি দুই দশক পূর্বে স্থাপিত এবং নতুন ক্যাম্পগুলো ২০১২ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সর্বশেষ ২০১৭ সালে ব্যাপক সংখ্যায় রোহিঙ্গা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। নতুন শরণার্থী প্রবাহ নিঃসন্দেহে গবেষণা এলাকায় বসবাসকারী স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন-জীবনকে ক্রমশ বিপর্যস্ত ও বিপন্ন করে তুলেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমণ ও বসবাসের ফলে স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের অংশগ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শরণার্থীদের চলাফেরা ও জীবন-যাপনে সবদেশেই আইনগত সীমাবদ্ধতা থাকে এ অবস্থায় রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতিও বাংলাদেশে ভিন্ন নয়। স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ স্থানীয়দের জন-জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। শরণার্থীদের স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নেতিবাচক না ইতিবাচক এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে শরণার্থী উপস্থিতি গ্রামীণ অর্থনীতিকে এবং গ্রামীণ জীবনযাত্রাকে ব্যাপকভাবে বদলে দিয়েছে। এর কাঠামোগত পরিবর্তন ও বহিরাগত প্রভাব ঘটেছে জীবিকা নির্বাহ ও জীবন-যাত্রায়। মূলত গ্রামীণ অর্থনীতির প্রসার এবং নবাগতদের গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত হওয়ায় এর কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে। শরণার্থী উপস্থিতিতে সকল ক্ষেত্রে একই ধরণের ফলাফলের কোনও নিশ্চয়তা নেই (Cookson, 2017b)। তবে বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে সাহায্য সহযোগিতা করছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে। বাস্তবে এসব সাহায্য সহযোগিতা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় বলেই প্রতীয়মান হয়েছে।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোহিঙ্গা পুরুষ স্বল্প মজুরিতে শ্রম বিক্রি করে থাকে। রোহিঙ্গা আগমণের ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কিছু ব্যবসায়ীর ব্যবসা প্রসার, ভূ-সম্পত্তির মালিকগণ তাদের জমিজমা বিভিন্ন এনজিও সংস্থার বা ব্যক্তির নিকট ভাড়া প্রদান করেছে এবং রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকা স্বল্প কিছু ঠিকাদার শ্রেণি ঠিকাদারী প্রাপ্তির মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রায়শই সহায়তা বা সুবিধা খুব কমই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রান্তিক পর্যায়ের দরিদ্রদের কাছে পৌঁছে (Chambers, 1986, p. 245)। কিন্তু সাধারণভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এ ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষ দিন মজুরীর কাজ হারানোর ফলে আরো

দরিদ্র হচ্ছে (Whitaker, 2002: p. 339)। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, স্থানীয় জনসংখ্যার উপর শরণার্থী উপস্থিতির চাপ বিভিন্ন ভাবে পড়ছে; যা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয়ই হতে পারে। এ ক্ষেত্রে শরণার্থীদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে গিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাপকভাবে ব্যহত হচ্ছে (Madanat, 2013: p. 3)।

৪.৫ শরণার্থী এবং স্থানীয়দের আর্থ-সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া

যে কোনও ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে এবং পরিস্থিতিতে অন্য কোনো দেশে স্থানান্তরিত হতে পারেন। এই স্থানান্তর অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত এবং রাজনৈতিক কারণে ঘটে থাকতে পারে (Parkins, 2011, p. 12) মানুষ প্রায়শই ধর্মীয় এবং জাতিগত সংঘাত; যুদ্ধ এবং দারিদ্র্যের কারণে স্থানান্তর হতে বাধ্য হয় (Grinvald, 2010, p. 17)। ১৯৯১ সাল থেকে ৩০০,০০০ এর বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে শরণার্থী হিসাবে বসবাস করে আসছিল। যদিও ২৫ আগস্ট, ২০১৭ সাল থেকে এই সংখ্যা আরো ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে (UNHCR, 2017)। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশেও রোহিঙ্গারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অনুরূপ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার এবং চলাচল বা কর্মসংস্থানের স্বাধীনতা উপভোগ করে না (Imran, & Mian, 2014)। রোহিঙ্গাদের দীর্ঘকাল বাংলাদেশে বিশেষত কক্সবাজার জেলায় অবস্থান করায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে আর্থ-সামাজিক বিষয়ে মিথষ্ক্রিয়া ঘটছে। শরণার্থী শিবিরগুলো সাধারণত দরিদ্র ও অনুন্নত প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে প্রায়শই আশ্রয়দানকারী বা স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকেন। শরণার্থী আগমন এবং শরণার্থী শিবির প্রতিষ্ঠার কারণে স্থানীয় সম্প্রদায় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের এবং বৈচিত্র্যময় সম্পর্কের সূচনা হচ্ছে।তারপরও স্থানীয় সম্প্রদায় উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে (Martin & Vaughn, 2017)। সাধারণভাবে রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রবাহের দ্বারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন-জীবনে চাপ বিষয়ে মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাস্তব প্রতিফলনমূলক অবস্থা তুলে ধরার প্রয়োজনে আর্থ-সামাজিক বিষয়ের তিনটি ধাপকে বুঝাবে। তাই এ গবেষণায় (ক) অর্থনৈতিক সম্পর্ক (খ) সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া এবং (গ) পরিবেশগত বিষয় নিয়ে পরিচালিত হয়েছে বিধায় নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো-

৪.৫.১ অর্থনৈতিক বিষয়

অর্থনৈতিক বিষয় বলতে গবেষণা এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণকে বুঝানো হয়েছে। শ্রম বাজারে চাহিদা ও কর্মের ধরণ বুঝতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শ্রম বাজারে অবস্থান অর্থাৎ বাংলাদেশের শ্রমবাজারে তাদের প্রবেশ, কাজের সাথে সম্পৃক্তার ধরণ, বর্তমান পেশা ও ঝুঁকির ধরণ, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, স্থানীয়দের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিতে অংশগ্রহণ বুঝতে সহায়ক হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থনৈতিক রিপোর্ট অনুসারে, শরণার্থী

উপস্থিতির কারণে আশ্রয়দানকারী জনসংখ্যার উপর অর্থনৈতিক চাপ তৈরী হয় (Alix-Garcia & Saah, 2009, p. 16)। শরণার্থীরা বেকার হলে এটি একটি বোঝা এবং কাজে নিযুক্ত হলে স্থানীয়দের চাকরির বাজারে চাপ তৈরিও হুমকির কারণ হতে পারে। এই জটিল পরিস্থিতি সামলানো সংশ্লিষ্ট সমাজ বা রষ্ট্রের সামাজিক স্থায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রার উপর নির্ভর করে। ক্ষেত্র বিশেষ শরণার্থী প্রবাহের অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ প্রায়শই মিশ্র হয় কারণ শরণার্থীরাও তাদের সাথে সংস্থান নিয়ে আসতে পারে বা অর্থনৈতিক উৎসাহে অবদান রাখতে পারে (Jacobsen, 2002, p. 10-11)। সীমান্তবর্তী এ এলাকায় আগে থেকেই কাজের সুযোগ সীমিত ছিল। এর সাথে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যুক্ত হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো সংঙ্কুচিত হয়েছে। ফলে পর্যাপ্ত শ্রমের যোগান থাকায় শ্রমের মূল্য ক্রমশ কমেছে এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বেশি লাভবান হয়েছে (Deikun & Zetter, 2010, p. 6)। তাই পরিবর্তিত অর্থনৈতিক কাঠামো ও কৃষি খাতে বিশেষ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী উপস্থিতির কারণে স্থানীয়দের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এজন্য স্থানীয় শ্রম বাজারে তাদের চাহিদা ও কর্মের অবস্থান বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্যের বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। এতে স্থানীয় অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ও স্থানীয় শ্রম বাজারে চাহিদা ও কাজ-কর্মে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অবস্থান বুঝতে সহায়ক হয়েছে। শরণার্থী শিবিরের উপস্থিতির ফলে অভিজ্ঞতাগুলো প্রায়শই সেই অঞ্চলের কর্মসংস্থানে এবং নতুন কাজের সুযোগের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিযোগিতা আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে পারে। যা সবচেয়ে দুর্বল ও দরিদ্রদের জন্য আরও চ্যালেঞ্জের হতে পারে। ফলে উল্লিখিত শরণার্থী জনসংখ্যা প্রবাহের আকস্মিকতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য আরও প্রতিযোগিতার চাপ তৈরি করতে পারে (Chambers, 1986)। শরণার্থীদের উপস্থিতির সময় এনজিওর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অনেক সময় এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি হ্রাস পেতে সহায়তা করে। শরণার্থীদের উপস্থিতিতে 'বিজয়ী এবং হারের' মধ্যবর্তী ভারসাম্যটি ১৯৯১ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে তানজানিয়ায় পরিচালিত গবেষণায়ও স্পষ্ট হয়েছে (Maystadt and Verwimp, 2009, p. 8-9)। যদিও তাদের অনুসন্ধানসমূহ প্রমাণ করে যে শরণার্থীদের উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সকলে একইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। তারা এটিও প্রকাশ করে যে অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি অসময়ে স্থানীয় জনসংখ্যার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। তাদের গবেষণার নথিভুক্ত তথ্য হলো শরণার্থী শিবিরের মধ্যে প্রায়শই নতুন নতুন সাধারণ বাজারের সৃষ্টি হয়। তাদের গবেষণা আরও ধারণা দেয় যে শরণার্থীদের বিতরণযোগ্য পরিমাণে খাদ্য রেশনগুলো শরণার্থী শিবিরের বাজারের পাশাপাশি স্থানীয় বাজারসমূহে শরণার্থী এবং স্থানীয় উভয়ই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় বা বিনিময় হয়ে থাকে (Maystadt and Verwimp, 2009)। কৃষক এবং কৃষি শ্রমিকদের সাথে আশ্রয়প্রদানকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাও চিহ্নিত করা হয়েছিল। পুরাতন শরণার্থীরা সস্তা শ্রমের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছিল; যখন তারা পরবর্তী শ্রমবাজারে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। গবেষণা পরামর্শ দেয় যে স্থানীয় সম্প্রদায় যত কাছাকাছি

বাস করে শিবিরগুলোতে জনবসতিযুক্ত হওয়ায় তত বেশি ইতিবাচক সম্ভাবনা থাকে (Maystadt and Verwimp, 2009, p. 27-28)। হুইটেকার বেশ কয়েক বছর পশ্চিম তানজানিয়ায় গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে এই অঞ্চলে শরণার্থী শিবির থাকার ব্যয় এবং সুবিধাসমূহ স্থানীয় জনসংখ্যার মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করা হয়নি। যদিও আশ্রয়দানকারী সম্প্রদায়ের কিছু সদস্য সেখানে শরণার্থী হিসেবে (ছদ্মবেশে) থাকার ফলে উপকৃত হয়েছিল, অন্যরা উপকৃত হয়নি এবং শরণার্থীর উপস্থিতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। হুইটেকার মূলত অর্থনৈতিক সুবিধার ব্যয়গুলোতে বিশেষত শ্রম ও ভোক্তা বাজার এবং আন্তর্জাতিক সহায়তায় মনোনিবেশ করেছেন (Whitaker, 2002)। এ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কিছু সিদ্ধান্ত বর্তমান এ গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয়। প্রথমত, শরণার্থীদের আগমনের পরে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ শরণার্থীরা বাজারে গ্রাহক এবং সস্তা শ্রমের সরবরাহকারী উভয়ই হয়। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর যারা সুশিক্ষিত এবং অর্থনৈতিকভাবে উন্নত তারা চূড়ান্তভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অশিক্ষিত এবং দরিদ্রতম সদস্যদের চেয়ে ভাল অবস্থায় ছিল (Whitaker, 2002, p. 366)।

৪.৫.২ সামাজিক বিষয়

সামাজিক বলতে এখানে গবেষণা এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক ও প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণের ফলে সংঘটিত সামাজিক মিথষ্ক্রিয়াকে বুঝানো হয়েছে। শরণার্থী ক্যাম্পের (পুরাতন) রোহিঙ্গাদের দীর্ঘদিনের বসবাস প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন পর্যায়ে (নতুন) রোহিঙ্গাদের মেকশীফ্ট ক্যাম্পে বসবাসের মধ্যদিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থায় মানিয়ে চলা বা খাপ খাওয়ানো, স্থানীয়দের সাথে পরিচয়-সম্পর্ক ও পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলার মধ্যদিয়ে জীবন যাপন প্রক্রিয়া চালু রাখা ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। এছাড়া ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠী বা তার বাড়তি জনসংখ্যা, শরণার্থীদের সামাজিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক মিশ্রণ, ধর্মীয় অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে ধরণা লাভের চেষ্টা করা হয়েছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার ফলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, জনসংখ্যার বাড়তি চাপ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি ইত্যাদিও অনুধাবন করা হয়েছে। শরণার্থী উপস্থিতির ফলে স্থানীয়দের দৈনন্দিন কার্যক্রম ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন ব্যাহত হয়ে থাকে। এতে আশ্রয়দানকারী দেশে শরণার্থীদের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত প্রবাহে বিপর্যয় ও বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে সামাজিক চাপ সৃষ্টি এবং স্থানীয় সমাজের জন-জীবনে ভঙ্গুরতাও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা তৈরী হয়ে থাকে (Lee: 2005, p. 74)। শরণার্থী উপস্থিতি স্থানীয় জনবসতি অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী ভারসাম্যকে অচল করে দিতে পারে; যা অনেক সময় সংঘর্ষের কারণও হতে পারে (Betts, 2009, p. 9)। তাদের উপস্থিতি সাধারণত স্থানীয় জনগণের সামাজিক জীবনে জাতিগত, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক মূল্যবোধ এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হিসেবে তৈরি করে। এছাড়া চুরি, ডাকাতি, খুন, পতিতাবৃত্তি, মানব পাচার ও মাদকদ্রব্য ব্যবসা বৃদ্ধির কারণ

হতে পারে (Gomez & Christensen, 2010, p. 11)। শরণার্থীদের উপস্থিতি এবং স্থানীয়দের সাথে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ প্রথাগত এবং অনানুষ্ঠানিকতা উভয় সংযুক্ত সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি। এটি ব্যক্তির নাগরিক ব্যস্ততার স্তর এবং সম্প্রদায়ের জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ ও সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থায় কোনও ব্যক্তির প্রবেশাধিকার প্রতিফলিত করতে পারে (Gesthuizen & Scheepers, 2009)।

প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনের সময় আর্থিক, সামাজিক বা আবেগিক সহায়তার জন্য একজন ব্যক্তি কতটা অন্যের সাথে (পরিবারের বাইরে) অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগে সক্ষম হন; তার প্রতিফলন ঘটে থাকে। প্রায়শই একটি ব্যবহৃত পদ্ধতি শরণার্থীদের আগমনকে ব্যাখ্যা করে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করে। এ ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য বাড়ার ফলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সম্মিলিত জীবন থেকে সরিয়ে নিতেও পারে (Putnam, 2007, p. 150-1151)। বিশেষত শরণার্থীরা স্থানীয়দের সাথে সামাজিক যোগাযোগের দিকে মনোনিবেশ করে। গবেষণামূলক অধ্যয়নের দৃষ্টিতে রুয়ান্ডায় কঙ্গোলিজ শরণার্থীদের দীর্ঘ সময়ের কথা শরণার্থীদের স্বল্প আয়ের সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্র তানজানিয়ার কথা বিবেচনা করে তুলনা করা যায়। তানজানিয়ায় স্থানীয়রা শরণার্থীদের সাথে বিশেষত শিবিরগুলোর নিকটবর্তী অঞ্চলে ব্যাপক সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সম্পর্কের মধ্যে একে অপরকে দেখা, বিবাহ এবং পরিচিতির মতো সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া এবং এমনকি স্থানীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে (Whitaker, 1999)। বাংলাদেশেও রোহিঙ্গা আগমনের ফলে এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়েও পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে রুয়ান্ডা ও তানজানিয়ার মতো পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

৪.৫.২.১ স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং শরণার্থী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব

যখন শরণার্থী শিবিরগুলো নির্মিত হয় তখন শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরণের সম্পর্ক তৈরি হয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রায়শই দেখা যায় যে শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন কারণে এক পর্যায়ে উত্তেজনা ও সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরী হয় (Crisp, 2003, p. 9-15)। আফ্রিকার দীর্ঘায়িত শরণার্থী উপস্থিতি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, সেখানে সীমিত শারীরিক সুরক্ষা, সহিংসতা, শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঘন ঘন দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই জাতীয় দ্বন্দ্বের মূল কারণসমূহ জটিল (Crisp, 2003, p. 15)। এইজটিলতা দুই ধরণের পরিস্থিতি তৈরি করেছে। প্রথমটি নির্ভর করে যে স্থানীয়রা শরণার্থীদের জন্য সরবরাহ করা প্রকল্প এবং পরিষেবাগুলো থেকে তাদের সুবিধাসমূহের স্বীকৃতি চায়। এ দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় সম্ভাব্য উৎস হচ্ছে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বর্ধিত চাপ যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের উপর নির্ভর করে। অনেক ক্ষেত্রে শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণগুলো সরাসরি চিহ্নিত করা যায় না,

কারণ বিভিন্ন পরিবর্তনশীল বিষয়ের উপর তা প্রক্রিয়াগত হয় (Jacobsen, 2002; Crisp, 2003)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শরণার্থী আগমণের শুরুর দিকে শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উভয়ের মধ্যেই বিভিন্ন প্রকৃতির সুরক্ষার সমস্যা ও ঝুঁকি থাকতে পারে। এ কারণে শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, স্থানীয় পর্যায়ে অপরাধ ও সহিংসতা, মাদক চোরাচালান, মানব পাচারসহ এ জাতীয় ঘটনা ঘটতে পারে (Jacobsen, 2002, p. 8-9)। এই বিবাদসমূহ কেন সংঘটিত হয় তা অনেকটা বিদ্যমান পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। যে সকল এলাকায় শরণার্থী থাকে সেখানে স্থানীয়দের সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়। স্থানীয়দের অভিজ্ঞতা প্রায়শই এমন হয় যে তাদের 'জমিতে' বসবাসকারী শরণার্থীরা তাদের অবহেলা করে, প্রদত্ত পরিষেবা এবং সহায়তাও পায়। ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠী শরণার্থীদের কর্মকাণ্ড দ্বারা তিক্ত অভিজ্ঞতার শিকার হয় এবং এ সবই এ দু'পক্ষের সংঘাতের সম্ভাব্য কারণ (Aukot, 2003, p. 74-75)।

Bolesta কেনিয়ার শরণার্থী শিবিরগুলোতে যে পরিমাণ সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে তা চিহ্নিত করেন (দাদাব ও কাকুমা শরণার্থী শিবির); যা আরও পরিমিত করা অসম্ভব বলে বর্ণনা করেছেন (Bolesta, 2005, p. 22-28)। যেখানে প্রতিদিনই মৃত্যু এবং গুরুতর জখমগুলো ঘটে। এ ঘটনাগুলোর মধ্যে শরণার্থী শিবিরের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার আশঙ্কা উভয়ই শরণার্থীদের মধ্যে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে আন্ত-সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব তৈরী করে। শরণার্থী শিবিরগুলো যে অঞ্চলে রয়েছে সে অঞ্চলে ছোট অস্ত্রের প্রবেশও সহিংস লড়াইয়ের এই পরিস্থিতিতে বড় ভূমিকা পালন করে (Bolesta, 2005, p. 227-28) ক্ষেত্র বিশেষ শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে বিরোধ প্রায়শই শরণার্থী শিবিরের মধ্যে হয়; এর প্রধান কারণ পরিষেবা এবং সংস্থানসমূহ। শরণার্থী শিবিরের অভ্যন্তরে নিরাপত্তাহীনতার সমস্যা থাকলে সাধারণত চলাচলে সীমাবদ্ধতা দেখা দেয় (Crisp, 2003, p. 14-15)। শিবিরগুলোর বাইরেও শরণার্থী এবং স্থানীয়দের মধ্যে সহিংসতা ও সংঘাতের পরিস্থিতি হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে যদি দাতাদের সহায়তা হ্রাস পায়; তবে শরণার্থীরা জীবিকার প্রয়োজনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকার সংস্থানে ভাগ বসায়। ফলে সীমিত কর্মসংস্থানে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতায় দু'পক্ষের উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে (Loescher & Milner, 2006, p. 8-9)। কর্মসংস্থানের অভাবে এরূপ পরিস্থিতিতে শরণার্থীরা চুরি ও দস্যুতার মতো বিকল্প কৌশলগুলো অনুসরণ করা শুরু করতে পারে; যার ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কের উপর আরও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। কেনিয়ার কাকুমা শরণার্থী শিবিরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায় সুদানীস ডিংকা উপজাতিদের শরণার্থীরা স্থানীয় তুর্কানাদের গ্রামে প্রবেশ করে চুরি, মারামারি উস্কে দেয়া, ধর্ষণ এবং হত্যা পর্যন্ত করে (Aukot, 2003, p. 76)। অন্যদিকে শরণার্থীরা দাবি করে যে, স্থানীয় তুর্কানার লোকেরা শিবিরের গবাদি পশু ছিনিয়ে নেয়া ও সহিংসতার মতো অপরাধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এর ফলে স্বাভাবিক কারণেই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ও সহাবস্থানে নেতিবাচক পরিস্থিতির তৈরী

হয়েছিল। তাই কোন নির্দিষ্ট এলাকায় শরণার্থী শিবির থাকার ফলে স্থানীয়দের সাথে শরণার্থীদের সামাজিক দন্দ্বের সূত্রপাত হয়, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং রাজনৈতিক নিপীড়ন একটি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয় (Aukot, 2003, p. 755)।

৪.৫.৩ পরিবেশগত বিষয়

পরিবেশগত বিষয় বলতে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে শরণার্থীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জ্বালানী সম্পর্কে বুঝানো হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষ শরণার্থী উপস্থিতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয় ঘটতে দেখা যায়। এ পরিস্থিতিতে স্থানীয় ও শরণার্থীদের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হয়। তাই শরণার্থীদের জীবন জীবিকার প্রয়োজনে জ্বালানী সংগ্রহে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরতা লক্ষ্য করা যায়। এখানে শরণার্থী-স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের উপর পরিবেশের অবনতির বিষয়টিকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা হয়েছে। শরণার্থী শিবির স্থাপনের ফলে অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয়দের কিছু নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। যদিও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার নিয়ে উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও উত্তেজনা তৈরি হতে পারে (Kobia & Cranfield, 2009, p. 6)। একইভাবে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমণের ফলে স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। পৃথিবীর অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও শরণার্থী শিবির স্থাপন করার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যথেষ্ট চাপ হয়েছে। ক্রমাগত শরণার্থী আগমণের ফলে বসতি নির্মাণ হলে সম্পদের চাহিদার বৃদ্ধি ঘটতে পারে (Black and Sessay, p. 1998)। স্বভাবতই শরণার্থী উপস্থিতির কারণে হঠাৎ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের জন্য বন দ্রুতগতিতে কৃষি জমিতে রূপান্তর হয়, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য বন উজাড় হয়, পয়:নিষ্কাশন এবং স্থল-জলের সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং সীমিত মৎস সম্পদে অধিক সংখ্যক জেলে মৎস শিকারে জড়িত হওয়ায় স্থানীয় সম্পদের উপর বড় চাপ তৈরী করে। অধিকন্তু শরণার্থী অবস্থানের ফলে স্থানীয়দের চাষাবাদ ও জমির উপর পরোক্ষ চাপ, বনজ সম্পদ হ্রাস, মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি, দূষণ এবং প্রাণি সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এমনকি সীমিত কাজের জন্য প্রতিযোগিতা বাড়ার ফলে স্থানীয় দরিদ্রেরা হারাতে পারে বননির্ভর খাদ্য, কাজ, মজুরি, সেবা এবং সাধারণ সম্পত্তি। এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের নারী এবং শিশুরা বেশি সমস্যায় পড়ে। সাধারণভাবে স্থানীয়-শরণার্থী সমস্যায় কিছু মানুষ সম্পদ হারায় এবং আবার এ পরিস্থিতির সুযোগে কিছু মানুষ বেশি অর্থ-সম্পদ বাড়াতে সক্ষম হয়। এ পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষতিগ্রস্তদের মৌলিক চাহিদার জন্য সবচেয়ে বেশি সংগ্রাম করতে হয় (Chambers, 1986)।

শরণার্থী শিবির স্থাপনের কারণে আরও চাপ তৈরি করতে পারে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় (Martin, 2005, p. 330-331; Jacobsen, 2002, p. 11)। এতে স্থানীয়দের প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ প্রায়শই কঠিন হয়ে পড়ে। এই পরিবেশগত সমস্যা ছাড়াও স্থানীয়

আদিবাসী গোষ্ঠী এবং শরণার্থীদের সাথে প্রায়শই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। নতুন আগত শরণার্থীরা নতুন স্থানান্তরিত এলাকায় বা ভূমিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে পরিবেশগত সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় (Black, 1994)। কেনিয়ার কাকুমা শরণার্থী শিবিরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিশেষত স্থানীয় তুর্কানা এবং সুদানীস ডিংকা উপজাতির শিবিরে উপস্থিতির শুরুর দিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে বসবাস শুরু করেছিল। এতে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষের স্থানচ্যুতি ঘটে; কারণ শরণার্থী উপস্থিতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ক্ষতির মধ্যে এ এলাকায় বনভূমি ও আশপাশে সম্পদের অবক্ষয়জনিত সমস্যার সৃষ্টি হয় (FAO: 2003)। শরণার্থী আগমন পরিবেশ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে (UNHCR, 1996; Martin, 2005a, p. 332)। আগত শরণার্থীদের শিবির তৈরি এবং জীবন যাপনের জন্য জমি, কাঠ, পানি এবং জ্বালানীর জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োজন। শরণার্থীদের দ্বারা পরিবেশের উপর কিছু সমস্যা হয় এবং সেগুলো হলোঃ ক) প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় খ) পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি এবং গ) অর্থনৈতিক সমস্যা (UNHCR, 1996)। পরিবেশগত বিষয় অন্যান্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাকেও স্পষ্ট করে। তাই পরিবেশগত অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে শরণার্থীদের প্রচুর পরিমাণে জ্বালানী কাঠের মাধ্যমে রান্নার ব্যবস্থা এবং এর ফলস্বরূপ বনভূমি উজাড় হয়ে থাকে (Martin, 2005a, p. 332; Mogire, 2011 p. 71-72)।

৪.৬ উপসংহার

শরণার্থী আগমণে স্থানীয়-শরণার্থী দ্বন্দ্বে জাতিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত সংযোগ উপেক্ষা করে এক ধরণের বিভক্তি তৈরি করে। এই দ্বন্দ্বগুলো সুস্পষ্টভাবে সমাধান করার অভাবে তারা নাগরিক কলহ এবং সমাজের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের দিকে পরিচালিত হয়। এ গবেষণার উদ্দেশ্যটি মূলত শরণার্থীদের কর্মকাণ্ডের ফলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের উপর তাদের প্রভাব বোঝা। এ জন্য প্রথমত শরণার্থীদের কর্মকাণ্ড এবং দ্বিতীয়ত স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক সুক্ষভাবে বুঝতে কিছু কাঠামোগত ধারণা পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ শরণার্থীদের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেনের ফলে স্থানীয়দের সাথে আর্থিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্ট স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থার নাজুক বা ভঙ্গুর অবস্থার একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

তত্ত্বগত কাঠামো: শরণার্থী, দুর্দশা ও স্থিতিস্থাপকতা

৪.২.১ ভূমিকা

তত্ত্ব ও গবেষণা একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং পরিপূরক। পূর্ব ধারণা ও নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে তত্ত্ব গবেষণাকে পথ প্রদর্শন করে। এছাড়া গবেষণায় তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা, সূত্রবদ্ধকরণ, পূণর্গঠন ও সংশোধনের পদ্ধতির কৌশলও প্রদান করে। তত্ত্ব ও গবেষণার এই পরস্পর নির্ভরশীল সম্পর্কটি অবরোহ ও আরোহ যুক্তির মাধ্যমে একটি বৃত্ত তৈরী করে। গবেষণার মাধ্যমে তত্ত্বের পরীক্ষা এবং তত্ত্ব নির্মাণ দু'টি উদ্দেশ্যই সাধন করা যায়। তত্ত্ব পরীক্ষার ক্ষেত্রে অবরোহী যুক্তির নিরীখে গবেষণার শুরু হয়। তত্ত্ব নির্বাচন করে সেই তত্ত্ব থেকে যৌক্তিকভাবে কতগুলো প্রস্তাবনা গ্রহণের মাধ্যমে তা থেকে প্রত্যয়গুলোকে চিহ্নিত করা হয়। কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ভ্রমণের সময় মানচিত্রটি যেমন পথ দেখায়; তেমনি তাত্ত্বিক কাঠামো গবেষককে নির্দেশনা প্রদান করে। যাতে গবেষণাটি গৃহীত চূড়ান্ত তত্ত্বগুলোর সীমানা থেকে বিচ্যুত না হয় (Sinclair, 2007; Fulton, 2010)। তবে সাধারণভাবে তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে একটি তত্ত্বের তাত্ত্বিক নীতি, গঠন ও ধারণা উপস্থিত থাকে (Grant & Osanloo, 2014)

৪.২.২ গবেষণায় তাত্ত্বিক কাঠামোর গুরুত্ব

তাত্ত্বিক কাঠামো একটি গবেষণা কাজের বিভিন্ন সুবিধা দেয়। গবেষক তার গবেষণাকে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং বিশ্লেষণাত্মকভাবে সংজ্ঞায়িত করে তাতে কাঠামো তৈরী করেন (Grant, C. & Osanloo, A: 2014)। তাত্ত্বিক কাঠামো গবেষণাকে প্রথাগত তত্ত্বের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল ও প্রাসঙ্গিক করতে সহায়তা করে। তাত্ত্বিক কাঠামো গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এবং এটি গবেষণা সমস্যার সাথে যুক্তহয়। অতএব এটি গবেষণা নকশা এবং তথ্য বিশ্লেষণ পরিকল্পনাকে নির্দেশনা প্রদান করে। তাত্ত্বিক কাঠামোটি নির্দিষ্ট গবেষণার জন্য কি ধরণের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তাও নির্দেশ করে (Lester, F: 2005)। এইভাবে গবেষককে তার তাত্ত্বিক কাঠামো ও গবেষণার জন্য উপযুক্ত গবেষণা পদ্ধতি, বিশ্লেষণাত্মক কৌশল এবং পদ্ধতি চূড়ান্তকরণে সহায়তা করে। তাত্ত্বিক কাঠামো একটি উপযুক্ত গবেষণার সন্ধানে যথাযথ দিক নির্দেশনা এবং গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলোর বিষয়ে গভীর পর্যালোচনা করে। গবেষণার জন্য তাত্ত্বিক কাঠামো একটি সাধারণ দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে; যা তথ্যগত সমস্যা এবং বিশ্লেষণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করে (Grant & Osanloo, 2014)। তাত্ত্বিক কাঠামোটি গবেষণা সম্পর্কিত সকল বিষয় যেমন-সমস্যার সংজ্ঞা, সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা, জরিপ পদ্ধতি, উপস্থাপনা এবং ফলাফল আলোচনার পাশাপাশি গবেষণার প্রক্রিয়াগত দিক নির্দেশ করে। তাত্ত্বিক কাঠামো গবেষককে বিকল্প তত্ত্বকে বিবেচনা করতে সহায়তা করে যা অনেক সময় তার দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এবং এর ফলে গবেষণাটি আরও সমৃদ্ধ হয় (Eisenhart, 1991)। সুতরাং, গবেষণা প্রস্তাবের জন্য প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক কাঠামো অবশ্যই স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে হবে যা উদ্দিষ্ট গবেষণাকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে সহায়তা করে।

৪.২.৩ উপযুক্ত তাত্ত্বিক কাঠামো নির্বাচন

গবেষণার ধারণাগত কাঠামো তৈরি হওয়ার সময় থেকেই তাত্ত্বিক কাঠামোটি বাছাই এবং স্পষ্ট করা যেতে পারে (Sire, 2004)। অনেক পণ্ডিত পরামর্শ দিয়েছেন যে,অভিসন্দর্ভ রচনার শুরুতে তাত্ত্বিক কাঠামোটি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ। একটি শক্তিশালী তাত্ত্বিক কাঠামো গবেষককে গবেষণা সম্পর্কে বিদ্যমান প্রবণতা প্রকাশ, তথ্যবিন্যাসে এবংব্যাখ্যা প্রদানে সহায়তা করে (Collins & Stockton, 2018)। তাত্ত্বিক কাঠামোটি এমন একটি বিষয় যা গবেষণার বিষয়বস্তুকে ধারণ বা সমর্থন করতে পারে। গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য তাত্ত্বিক কাঠামোটি গবেষণা সম্পর্কে গবেষকের নিজস্ব চিন্তার সংক্ষিপ্তসার নয়; বরং এটি তার গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ চিন্তার প্রকাশ। কারণ তাত্ত্বিক কাঠামো প্রস্তাবিত গবেষণার সাথে সম্পর্কিত এই তত্ত্বগুলো বুঝতে এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য বোঝার জন্য ব্যবহার করা হয় (Swanson, 2013, p. 122)। সংগত কারণেই এর মাধ্যমে তথ্য পরীক্ষা, বিশ্লেষণ পরিচালনা এবং ফলাফলগুলো ব্যাখ্যা করা যায়। ফলে গবেষক গবেষণা বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা,পর্যালোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সুপারিশমালা উপস্থাপন করতে পারেন। সামগ্রিকভাবে কোন গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্বাচনের জন্য গবেষণার সমস্যা, উদ্দেশ্য, তাৎপর্য এবং গবেষণামূলক প্রশ্নসমূহ সম্পূর্ণরূপে বোঝা প্রয়োজন। তাই নির্বাচিত তাত্ত্বিক কাঠামোতে অবশ্যই গবেষণার উদ্দেশ্য এবং গুরুত্বকে বুঝতে হয় (Grant, & Osanloo, 2014)। তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের যথাযথ বাছাই করতে গবেষককে অবশ্যই গবেষণার নীতিসমূহ বিবেচনা এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যাটি নির্ধারণ করা দরকার। গবেষণাতথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের পর তাথেকে প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফলসমূহ পর্যালোচনা করে বিদ্যমান তত্ত্বকে সংশোধন কিংবা প্রসারিত করা যায় (Lester, 2005)। সাধারণত গবেষণার ফলাফল গবেষণায় উপস্থাপিত তত্ত্বের সমালোচনা, বিকাশ এবং প্রসারণ করতে নির্দেশক হিসেবে কাজ করে (Grant & Osanloo, 2014)। গবেষণা তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন তত্ত্বের সমালোচনা প্রায়শই গবেষণার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তেপৌঁছাতে সহায়তা করে (Munhall & Chenail, 2008)।

এ গবেষণার উদ্দেশ্য সাধনে তত্ত্ব সহায়তা করেছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমণ ও অবস্থানের ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে যে আর্থ-সামাজিক প্রভাব পড়েছে তা তত্ত্ব দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে। আর এ জন্য গবেষণাটির আর্থ-সামাজিক প্রভাব বুঝতে স্থিতিস্থাপকতা (Resilience)তত্ত্বটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ তত্ত্ব স্থিতিস্থাপকতার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অর্থাৎ কোনো এলাকায় শরণার্থী আগমণের ফলে হঠাৎ করে ঐ স্থানের জনসংখ্যা বেড়ে গেলে এবং এর ফলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক প্রভাব পরতে পারে। তার ধরণ বুঝার জন্য এ গবেষণায় স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ তত্ত্ব দ্বারা আরও বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে স্থানীয় সম্প্রদায় প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে টিকে থাকতে পারে; নাকি ভঙ্গুর অবস্থায় পতিত হয়। এ তত্ত্বকে নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

৪.২.৪ তত্ত্ব ও গবেষণার পারস্পরিক সম্পর্ক

স্থানীয় সম্প্রদায় সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর সাথে একটি বিরূপ পরিবেশ দ্বারা বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তাই চেম্বার'স শরণার্থী শিবিরে উপস্থিতি দ্বারা প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন কিভাবে প্রভাবিত করে তার তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন (Chambers, 1986)। তিনি যুক্তি দেন যে প্রাকৃতিক সম্পদগুলোতে শরণার্থীদের প্রবেশের কারণে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ এতে কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতা বাড়তে পারে। চেম্বার'স আরও দাবি করেন যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণ সম্পত্তিতে অংশগ্রহণ অনেক ক্ষেত্রে ক্যাম্প স্থাপন ও উন্নয়নের কারণে হয় (Chambers, 1986)। কাকুমার প্রেক্ষাপটে চেম্বার'স একটি এলাকার বর্ণনায় সীমিত পরিসরে এটি দেখিয়েছেন এবং তাঁর তত্ত্ব অনুসারে কাকুমাতে স্থানীয়দের এই অত্যাবশ্যক কর্মসংস্থানের কাছে হেরে যাওয়াকে দেখিয়েছেন (Chambers, R. 1986)। আলিক্স-গার্সিয়া এবং শাহ্ ও চেম্বারস নিশ্চিত করেছেন যে, শরণার্থী জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি সম্পদগুলোর জন্য প্রতিযোগিতার ফলে স্থানীয় সম্প্রদায় এবং তাদের পরিবারের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতে পারে (Chambers, 1986)। এছাড়াও তিনি একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করে তাতে স্থানীয়দের ক্রয়, বিক্রিয় এবং শরণার্থীদের সাথে পণ্যদ্রব্য বাণিজ্যের জন্য নতুন বাজারের সুযোগগুলো স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলেছেন। Maystadt and Verwimp, তানজানিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটিকে সমর্থন করেন; কারণ তারা শরণার্থীদের কাছে বিতরণ করা খাদ্যের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পণ্য প্রায়ই স্থানীয় বাজারগুলোতে বিক্রি বা বিনিময় করতে দেখেছেন (Maystadt and Verwimp, 2009)। এ সকল গবেষণাকর্মে দেখা যায় যে, শরণার্থী উপস্থিতির ফলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনে নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় ধরণের প্রভাব পড়তে পারে।

৪.২.৫ গবেষণায় তত্ত্বগত কাঠামো (Theoretical framework)

গবেষণার ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই গবেষণাকর্মে তত্ত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা 'তত্ত্ব' অনুসন্ধানকারীকে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। তত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে- প্রচলিত জ্ঞানকে বুঝতে সহায়তা ও কাঠামো গঠণ করে। তত্ত্বই নির্ধারণ করে দেয় গবেষক কোন ধরনের তথ্য পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করবেন। তত্ত্ব সব সময় পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের কাজে তার গণ্ডির মাঝে ধরে রাখে। কোন ঘটনা প্রাসঙ্গিক অথবা অপ্রাসঙ্গিক তা নির্ধারণ করতে তত্ত্ব গবেষককে সাহায্য করে থাকে। এ পর্যায়ে এই গবেষণার তত্ত্বগত বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা হলো।

৪.২.৬ তাত্ত্বিক আলোচনাঃ শরণার্থী-স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানো (Refugee-Local Community and Social Resilience)

প্রতিটি গবেষণা কাজের তাৎপর্যতার ভিত্তি হচ্ছে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাত্ত্বিকভাবে বিষয়টিকে বুঝতে চেষ্টা করা। এ গবেষণায় শরণার্থী (Refugee) বিষয় সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক গবেষণা

অবলম্বনে আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্রে বা সমাজে শরণার্থী উপস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর (Local Community)জন্য উদ্ভূত সংকট পরিস্থিতি তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপন করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। সে হিসেবে শরণার্থী আগমনের ফলে এরূপ পরিস্থিতির জটিলতাকে বুঝতে সাহায্য করবে।এ জটিল পরিস্থিতিতে জীবন-যাপন প্রক্রিয়ার নাজুকতায় টিকে থাকার মতো কঠিন অবস্থাকে তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ দ্বারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্থিতিস্থাপকতা (Resilience) বুঝাবে। এ ক্ষেত্রে শরণার্থী উপস্থিতির ফলে স্থানীয় জন-জীবন ঝুঁকির মধ্যে পতিত হওয়ায় যেমন স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়; তেমনি সেই সমাজের স্থিতিস্থাপকতাও ঝুঁকির মুখে পড়ে। এ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের স্থিতিস্থাপকতা, স্থিতিস্থাপকতার ধারণা, স্থিতিস্থাপকতার সাথে বিষয় ভিত্তিক পর্যালোচনায় সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা ও বাস্তুতন্ত্র বা পরিবেশগত বিষয়ের আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে গভীরভাবে উপলব্ধির চেষ্টা করা হয়েছে যে, শরণার্থী ও স্থানীয়দের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আশ্রয়দানকারী ব্যক্তি ও সমাজে স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করে; নাকি তাঁদের জীবন ও সমাজকে নাজুক বা ভঙ্গুর পরিণতির দিকে ধাবিত করে। স্থিতিস্থাপকতা অধ্যয়নের উদ্ভব মনোবিজ্ঞানের শৃঙ্খলায়, বিশেষত উন্নয়নমূলক এবং ইতিবাচক মনোবিজ্ঞানের বিষয় (Masten, 2001)। এতে আর্থ-পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির একটি বৃহত্তর অন্তর্ভুক্তি রয়েছে, যা গবেষণা প্রচেষ্টা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে (Greve, 2006)। এ গবেষণায় শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় আশ্রয়দানকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিকুল সামাজিক অস্থিরতার মুখে জন-জীবনে প্রভাবের বিষয়টি কিরূপ তা তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে পর্যালোচনাসহ স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে আলোকপাত করা হয়েছে। শরণার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে সম্পর্ক তাত্ত্বিকভাবে বুঝতে গিয়ে অনেকেই তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শরণার্থী ও উন্নয়ন তত্ত্ব Kuhlman, (1990); আশ্রিত দেশে শরণার্থীরা বোঝা নয় বরং উপকারি তত্ত্ব Whitaker, B.E., (2002); ওয়ার্ল্ড সিস্টেম বা বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্ব Fazito D. and McCarty C., (2009) সমালোচনামূলক তত্ত্ব Betts, A. (2009) সামাজিক পরিবর্তন তত্ত্ব Sheldon, Eleanor B. and Moore, Wilbert E. (eds), (1968) ও সুরক্ষাকরণ তত্ত্ব McGahan, K. (2009) প্রভৃতি। এই তত্ত্বসমূহ দ্বারা শরণার্থী ও স্থানীয় সমাজের অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা হলেও এ গবেষণায় শরণার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে সম্পর্ক তাত্ত্বিকভাবে বুঝতে স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্ব দ্বারা বুঝার চেষ্টা করা হয়েছে। নিম্নে স্থিতিস্থাপকতার ধারণা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

৪.২.৭ স্থিতিস্থাপকতার ধারণা

ইংরেজি শব্দ 'resilience' এর অর্থ 'bounce' or 'rebound' এবং ল্যাটিন শব্দ '*resilīre* বা রিসিলায়ার' যার অর্থ পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা (Alexander, 2013) এর উৎস মূল শব্দ পাওয়া যায়"*resilīre*"-এ (Resnick, 2011); যা *resili(ēns)* থেকে *resilīre* এবং resilient+ence হয়েছে। যার অর্থ স্থিতিস্থাপকতা বা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন।

স্থিতিস্থাপকতা শব্দটির ব্যবহার গ্রিক ভাষায় পাওয়া যায়। ফ্রান্সিস বেকন যিনি প্রথম শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তার আধুনিক বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে তার Sylva Sylvarum (1625) এ এবং টমাস দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রথম এর ব্যবহার করেন (Tomes, 1857)। 'পিছনে ফিরে' যাওয়ার ক্রিয়া নীতি বিজ্ঞানে ভারসাম্যহীনতা এবং পরবর্তীকালে বাস্তুশাস্ত্র, প্রকৌশল এবং দুর্যোগ পরিচালনায় স্থিতিস্থাপকতা বোঝার বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছে (Holling, 1973; Manyena, 2011; Wilkinson, et al., 2012)। ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৮০ এর দশকের গোড়ার দিকে মনোবিজ্ঞানের বিষয়ে গবেষকদের দীর্ঘ তালিকায় এটি যুক্ত হয় (Alexander, 2013, pp. 2709-10)। শব্দটি নমনীয়তার মতো ইতিবাচক গুণাবলী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছিল এমনকি কখনও কখনও নেতিবাচক যেমন চঞ্চলতা বুঝাতেও ব্যবহৃত হয় (Alexander, D. E: 2013)। স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা হলো-একটি নতুন বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিছু বাহ্যিক অভিঘাত মোকাবেলা করে যে পদ্ধতিতে বা প্রক্রিয়ায় পুণরায় স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে আসা (Davoudi, Wilkinson, C., et al: 2012; Bond, & Retief, F: 2014)। Oxford Dictionary-তে বলা হয়েছে-*The capacity to recover quickly from difficulties; toughness,orThe ability of a substance or object to spring back into shape; elasticity* প্রভৃতি। স্থিতিস্থাপকতার অর্থ হলো পুনরায় ফেরা, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা এবং নমনীয়তা বা পুনরুদ্ধারযোগ্য। এছাড়াও অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি Resilience (n.d.) (In *Oxford English Dictionary*, 1989) (এন.ডি) দুটি অর্থ প্রদান করে। ক. পুনরুদ্ধারে সক্ষম বা প্রসারিত ও সংকুচিত হওয়ার পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে (উপাদানগুলোর বিষয়ে বলা হয়) খ. সক্ষম কঠিন অবস্থা থেকে দ্রুত প্রতিরোধ বা পুনরুদ্ধার করে (ব্যক্তির বিষয়ে); যা একটি নাজুক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। স্থিতিস্থাপকতা দুর্বলতা এবং ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্কের একটি স্পষ্ট বিবরণের রূপরেখা সত্ত্বেও ডেটন-জনসন অর্থনৈতিক দিকের বাইরে স্থিতিস্থাপকতাকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেন নি (Dayton-Johnson, 2004)।

প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক দুর্বলতার উপর যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন সামাজিক স্থিতিস্থাপকতাকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। স্থিতিস্থাপকতার জন্য সংজ্ঞার প্রাচুর্য এবং এই ধারণাটি যে বিভিন্ন শাখার দ্বারা ভাগ করা হয়েছে তা বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। যার বিশেষভাবে বিস্তৃত সংজ্ঞা হলো-অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক সংকট মোকাবেলা করার ক্ষমতা এবং এটিকে কার্যকরভাবে সমাধান করা নয় বরং ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী এটি থেকে শিখতে, শক্তিশালী হতে এবং পৃথক হয়ে উঠতে পারে (Brenson-Lazan, 2003)। এই সংজ্ঞার মধ্যে ৪ টি প্রধান উপাদান রয়েছেঃ প্রতিক্রিয়া, স্ব-সংগঠন, শেখা এবং অভিযোজন। এ উপাদানগুলো সমস্ত সামাজিক বিভাগে সমানভাবে প্রযোজ্য-ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় বা সংস্থায়। তদুপরি, তাদের জড়িত সকলের স্বেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণ প্রয়োজন: কেউ জোর করতে পারে না বা ব্যক্তিকে স্থিতিস্থাপক হতে বাধ্য করতে পারে না। বরং স্থিতিস্থাপকতা চারটি উপাদান তৈরির ফলাফল।

যদিও দারিদ্র্য হ্রাস (সামাজিক দুর্বলতা কমানোর মূল ভিত্তি) একটি জটিল প্রক্রিয়া যা ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বাইরেও জড়িত। সামাজিক স্থিতিস্থাপকতার বিকাশ একটি তৃণমূল প্রক্রিয়া; যার জন্য বৃহৎ স্তরের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না।

স্থিতিস্থাপকতার প্রাথমিক ধারণাটি এসেছে ইকোলজিক্যাল তথা পরিবেশগত বা বাস্তুসংস্থান থেকে। চলমান পরিবর্তনের দিকে এর সাধারণ অভিমুখীকরণের মাধ্যমে মিলিত সামাজিক-পরিবেশগত বিষয় এবং এর প্রশ্নগুলো মানুষের অভিযোজন প্রকৃতি, তার প্রয়োজনীয় সমন্বয় এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের মুখে সামাজিক রূপান্তর হয়। এর অন্তর্নিহিত নীতিগুলো স্থিতিস্থাপকতার ধারণা গঠন করে যেমন: অধ্যবসায়, অভিযোজন যোগ্যতা এবং রূপান্তর ক্ষমতা। স্থিরতা হিসেবে স্থিতিস্থাপকতাকে ১৯৭৩ সালে ক্রফোর্ড হলিং এর নিবন্ধ-পরিবেশগত পদ্ধতিগুলোর স্থিতিস্থাপকতা স্থায়িত্ব এর গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে (Walker & Salt, 2006)। তিনি মূলত অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসায় স্থিতিশীলতার পরিবেশগত ভারসাম্যভিত্তিক পদ্ধতি দেখিয়েছেন। এর পরিবর্তন এবং ব্যাঘাত শোষণ করার ক্ষমতা এবং একই সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য জনসংখ্যা এবং রাষ্ট্র পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে (Holling, 1973)। 'স্থিতিশীলতা' একটি পদ্ধতির দক্ষতা বর্ণনা করে যা টেকসই অধ্যয়নের জন্য অস্থায়ী অস্থিরতার পরে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় ফিরে যেতে ব্যাঘাত ঘটে (Holling, 1996) এবং তৃতীয় বিষয়ে পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সময় ফিরে আসার জন্য অভিযোজন সম্পর্কিত বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে (Berkes and Folke, 2003)। স্থিতিস্থাপকতার প্রবক্তারা এর যুক্তি, চিন্তাভাবনা, জলবায়ু এসবের মধ্যেই তাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এটি এমন একটি অবস্থা যা ধীরে ধীরে অগ্রগতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এ অগ্রগতি ওঠা-নামার লক্ষণ এবং অনিশ্চিত ফলাফলসহ দীর্ঘ সময়কাল একাধিক অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়ে (Bury, 1982)। দীর্ঘমেয়াদী যোগাযোগ, প্রত্যাশিত বা প্রতিক্রিয়াশীল এবং যা লোকেরা প্রবেশ করতে সক্ষম হয়; তাদের ফলাফল সম্মিলিতভাবে স্থিতিস্থাপকতা সংস্থান নির্ধারণ করে (Turner, 2003)। মৌলিক মানবিক এবং অন্যান্য জৈবিক পদ্ধতি স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞায় প্রাথমিক প্রভাব বজায় রাখে শারীরিক বিজ্ঞান থেকে; যা একটি উপাদানের ক্ষমতা হিসেবে স্থিতিস্থাপকতা সংজ্ঞায়িত করে অনুসরণ ও এর মূল রূপে ফিরে আসে (Kirmayer, 2011)। এই প্রারম্ভিক প্রভাবগুলো বুঝাতে ঘটনার যে উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত থাকে, তা জটিল ফলাফলের উন্নয়ন হয়। স্থিতিস্থাপকতা ধারণায় প্রাথমিকভাবে দুটি সংজ্ঞা রয়েছে যা বর্তমানকে প্রভাবিত করেছে। একটি ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বাচ্ছন্দ এবং অন্যটি একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে দেখায়। স্থিতিস্থাপকতা একটি স্বতন্ত্র স্থিতিশীল বৈশিষ্ট্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা প্রতিকূলতা থেকে ফিরে এসে অভিযোজন করে (Jacelon, 1997)। স্থিতিস্থাপকতা একটি ধারণা যা পদ্ধতি ও দক্ষতার সরাসরি সাংগঠনিক, নীতিগত ও কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের সাথে সক্ষমতাকে সংযুক্ত করে। যে কোনো ধরণের বিপর্যয়ের

মুখে একই কর্মক্ষম অবস্থা বজায় রাখার ক্ষমতা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে। এ অবস্থায় ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের স্থিতিস্থাপকতা বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

৪.২.৮ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের স্থিতিস্থাপকতা

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন চাপের কারণে ও প্রতিকূলতার মুখে প্রতিরক্ষার শক্তি হিসেবে কাজ করে (Gooding, 2012)। যা ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হয়। তাই স্থিতিস্থাপকতা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধারণ করে প্রাসঙ্গিক ঝুঁকির পরিণতিতে অবদান রাখেতে সচেষ্ট হয় (Leipold & Greve, 2009)। ইতিবাচক অভিযোজন প্রতিক্রিয়া হিসেবে বা একটি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা থেকে ফিরতে স্থিতিস্থাপকতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে (Hardy & Gill, 2004)। স্থিতিস্থাপকতার প্রক্রিয়ার মধ্যে পুনর্বিবেচনা, পুনরুদ্ধার এবং পুনর্নির্মাণ পরিভাষা অন্তর্ভুক্ত বা ব্যবহার করা হয় (Earvolino, 2007)। স্থিতিস্থাপকতা অর্জনে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াগুলো মোকাবেলা করার প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয় (Richardson, 2002)। ব্যক্তির মধ্যে একটি অনুপ্রেরণামূলক শক্তি হিসেবে স্থিতিস্থাপকতা আত্মিক সম্প্রীতি এবং আত্ম-গঠনের জন্য ক্ষমতা সরবরাহ করে। কারণ তা ব্যক্তির মধ্যে আত্মিক, অনুপ্রেরণাদায়ক সম্প্রীতি এবং আত্মগঠনের শক্তি গঠন করে (Richardson, 2002)। মূলত স্থিতিস্থাপকতা শুধু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা প্রক্রিয়া নয়; অনেকগুলো বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত প্রক্রিয়া যা নির্দিষ্ট প্রতিকূলতা প্রসঙ্গে পরিবেশের সাথে যোগাযোগ রাখে (Leipold & Greve, 2009)। স্থিতিস্থাপকতা অনেকগুলো প্রতিকূলতার মোকাবেলা করে থাকে যেমন, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শারীরিক সক্ষমতা প্রভৃতি। স্থিতিস্থাপকতা ব্যক্তিগত এবং পরিবেশগত দিকগুলোয় অবদান রাখে এবং দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি ধারণা তৈরি হয় (Ungar, 2011)। সুতরাং স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সক্রিয় সংস্থান এবং প্রতিকূলতার মুখে পুনরুদ্ধারের সক্ষমতা বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এ অবস্থায় স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি গভীর অনুসন্ধানে বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক পর্যালোচনা দ্বারা স্পষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

৪.২.৯ স্থিতিস্থাপকতার সাথে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক (ডিসিপ্লিন) পর্যালোচনা

স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি পরীক্ষা করতে একটি বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিক ধারণা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন। এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ধারণার গতিশীল প্রকৃতি এবং মানকে মূল্যায়ণ করে (Rodgers, 1989)। স্থিতিস্থাপকতা শব্দটি জীব-বিজ্ঞানে উদ্ভব এবং তা জীবন্ত বিষয়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। যখন জীব-বিজ্ঞানের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়; তখন এই শব্দটির সমন্বয় ও রূপান্তরের গতিশীল প্রক্রিয়া সংহত করার জন্য বিকশিত হয় (Kirmayer & Williamson, 2011)। এছাড়াও স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্ব বিভিন্ন বিষয়ে যেমন সামাজিক, পরিবেশগত, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল, জলবায়ু পরিবর্তন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এ গবেষণায় স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বটি আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিদ্যার অংশ হিসেবে নিম্নে বর্ণিত হলো-

৪.২.৯.১ সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা

বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধে শরণার্থী উপস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে। এই দুই ধরণের প্রভাবকে স্থিতিপকতা তত্ত্ব দ্বারা এই গবেষণায় ব্যক্তি ও সমাজের ভঙ্গুর, ঝুঁকিপূর্ণ বা হুমকীর মুখে পড়া বিভিন্ন ধরণের স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বাস্তুতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি জোর দেয় ব্যক্তির সামাজিক ব্যবস্থা এবং এর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও আন্তঃনির্ভরতাকে (Hobfoll & Gellar, p. 1990)। বিভিন্ন সামাজিক-বাস্তুসংস্থানের পরিবেশ চিত্রিত করার জন্যএটি ব্যক্তির চাহিদা ও দক্ষতার ভারসাম্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে (Greve & Staudinger, 2006)। তাই গবেষণায় স্থিতিস্থাপকতা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবেশগত প্রভাব এবং মিথস্ক্রিয়ার বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন (Masten, 2007)। সমাজবিজ্ঞানীরা মানুষের দক্ষতার ব্যাখ্যা দিতে ‘resilience’ শব্দটি ব্যবহার করেন। এই স্থিতিস্থাপকতা কিছুটা মানসিক চাপ শোষণ করার পরে বা কিছু নেতিবাচক পরিবর্তন থেকে টিকে থাকার পরে তা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে (Surjan & Shaw, 2011, p. 117-18)। স্থিতিস্থাপকতার মূল কথা হলো প্রতিকূলতাকে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা, সৃজনশীলতা ও সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের সাথে বিদ্যমান সামাজিক ব্যস্ততাসমূহ শক্তিশালী করা। নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং সম্মিলিত সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় (Cacioppo, & Zautra, 2011, p. 44)। মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তা কিংবা সামাজিক আলোচনায় স্থিতিস্থাপকতার সাফল্যের উদাহরণগুলো ছড়িয়ে পড়ে এবং কঠিন সময়গুলোতে দৃঢ়তার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। এক কথায় স্থিতিস্থাপকতা শব্দটি পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতাকে বোঝায়। বাস্তুসংস্থান পদ্ধতির মতো হলিং এর সামাজিক ব্যবস্থা গতিশীল, পরিবর্তনশীল, জটিল, বহু-স্থিতিশীল, স্ব-সংগঠিত এবং অভিযোজিত বলে বিবেচিত হয়। সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমান ভারসাম্য এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার একক অবস্থানে ফিরে আসার দিক থেকে স্থিতিস্থাপকতা এমন একটি বিষয় যা সামাজিক জটিলতা কম-বেশি বিবেচনা করে। সামাজিক স্থিতিস্থাপকতার সমস্ত সংজ্ঞা সামাজিক নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সম্পর্কিত সত্ত্বা, সামাজিক পরিবর্তন এবং বিকাশ সম্পর্কিত সমস্যার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে (Marshall and Marshall, 2007)।

সামাজিক স্থিতিস্থাপকতার উপর প্রশ্নটি হলো-“আর্থ-সামাজিক স্থানান্তরের রূপান্তর, অর্থনৈতিক সংকট এবং অনিশ্চয়তা সাধারণত এর সাথে বাহ্যিক উৎস হিসেবে ধরে নেওয়া হয় (Zingel and Bohle, 2011)। বিভিন্ন লেখক সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা সংজ্ঞায়িত করেন চাপ (আয়ের অভাব, সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক-চাপ-দুর্বলতা-ঝুঁকি) বোঝার ক্ষেত্রে। স্থিতিস্থাপকতার গতিশীলতা হুমকিস্বরূপ বিবেচিত হতে পারে এবং সামাজিকভাবে বিকশিত হয়; কারণ এটি শেখার ধারণা অন্তর্ভুক্ত করে এবং সাধারণত একাধিক চাপের সংস্পর্শে আসে (Leichenko, 2008)।

স্থিতিস্থাপকতার হুমকি বিস্তৃত পরিসরে এর গুরুত্ব স্বীকার করে ক্ষমতা, রাজনীতি এবং অংশগ্রহণের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে পর্যালোচনা করে। কোনো কোনো গবেষণায় অর্থিক, সামাজিক ও মানসিক চাপ-ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ও ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা লক্ষ করা যায়।

সামাজে বিরাজমান বিভিন্ন সংস্থা সামাজিক বিভিন্ন বিপদ এবং বিপজ্জনক ঘটনার প্রস্তুতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে। একটি সামাজিক ব্যবস্থার অনুরূপ ক্ষমতাসহ ঝুঁকিপূর্ণভাবে সামাজিক সত্ত্বা হিসেবে টিকে থাকে (Turner and Schiller, 2003)। এর সাথে ভবিষ্যতে কীভাবে আরও ভালোভাবে টিকে থাকা যায় সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাদের দুর্বলতার মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা অতীত থেকে শেখার এই ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াটি এবং ভবিষ্যতে অনিশ্চয়তার সাথে আরও ভালোভাবে মোকাবেলা করার জন্য সঙ্কট থেকে সক্ষমতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়। এ সংজ্ঞাগুলোর আলোকে স্থিতিস্থাপকতার কাজে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে থাকে (Glavovic and Overton, 2003)। সামাজিক দুর্বলতা এবং সামাজিক স্থিতিস্থাপকতার ধারণাগুলো একে অপরের উপর নির্ভরশীল সম্পর্ককে বুঝায় (Bogardi, 2006)। অন্য কথায় যখন কোনও গ্রাফে উপস্থাপন করা হয় তখন সামাজিক ক্ষতিগ্রস্থতা এবং সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা একে অপরের উপর প্রতিলম্ব হিসেবে অবস্থান করে (‘এক্স’ এবং ‘ওয়াই’ অক্ষ দ্বারা উপস্থাপন করা হয়)। সামাজিক দুর্বলতা অর্থনৈতিক বা মানবিক হোক তা পরিমাপ করা যায় এবং টাকার অংকে প্রকাশ করা সম্ভব। অন্য কথায় ঝুঁকি থাকলে এর মোকাবেলা জন্য কত খরচ হবে এবং কত জনজীবন ক্ষতিগ্রস্থ হবে তা পরিমাপ করা যায়। সামাজিক স্থিতিস্থাপকতার বিপরীতে সময় দ্বারা পরিমাপ; বিশেষত কোনো সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া জানাতে কত সময় লাগবে, স্ব-সংগঠিত এবং পুণরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য প্রদত্ত শিক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত। কোনও দূর্যোগ অবস্থা থেকে উত্তরণে কী পরিমাণ সময় লাগবে তা কেবল এর আর্থিক সাবলীলতাকেই প্রভাবিত করে না বরং সম্প্রদায়ের সামাজিক সম্পর্ককে ‘মজবুত’ করে। এটি পুনরুদ্ধার করতে যত বেশি সময় প্রয়োজন; ব্যক্তির স্থানচ্যুতির কারণে, আর্থিক স্থবিরতার কারণে মনোবল ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা এবং বিস্তৃত মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে যায়। এ অবস্থায় সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা সংকটের মুখে পরে। সামাজিক স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের পরিকল্পনার ধারাবাহিকতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। স্থিতিস্থাপকতা অগ্রগতিতে বৃদ্ধি, পুন:অন্তর্ভুক্ত এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন করে। যা কিছু প্রতিকূলতার ফলে আসে; এটি জীবনের কিছু নতুন অর্থ বহন করতে পারে। মানুষ নতুন একটি চাপযুক্ত পরিস্থিতি থেকে দক্ষতা, বুদ্ধি, উন্নত আত্ম-সম্মান এবং সাধারণভাবে জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির উপলব্ধিসহ বেরিয়ে আসতে পারে (Murray 2012, pp. 337-338)।

স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটি মূলত বাস্তুসংস্থানগত ঘটনাসমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য তৈরি হয়েছিল; যা আরও পরিমার্জিত এবং সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে এর জড়িত হওয়ার ফলস্বরূপ এটি তত্ত্ব হয়ে ওঠার আরও কাছাকাছি

আসে (Röhring et al., 2010, p. 9)। কানাডিয়ান বাস্তুবিদ ক্রাফোর্ড স্ট্যানলি (বাজ) ১৯৭৩ সালের লেখায় হোলিং এর বাস্তুশাস্ত্রের সাথে নমনীয়তার ধারণাটি সংযুক্ত করেন (Holling, 1973, p. 15)। বাস্তুশাস্ত্র ধারণাটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে মনোবিজ্ঞানে। যা ঘটনাসমূহ মোকাবেলা করার জন্য কোনও সত্তার (ব্যক্তি, বাস্তুশাস্ত্র ব্যবস্থা ও সংস্থা ইত্যাদি) ক্ষমতা এবং তা আবার কার্যকরী অবস্থায় ফিরে আসে (The Young Foundation, 2012, pp. 11-12) সমাজতাত্ত্বিকগণ এই ফিরে আসার মধ্যে মানবিক ক্ষমতা বোঝাতে 'স্থিতি' শব্দটি ব্যবহার করেন। এখানে কিছু চাপ শোষণের পরে বা কিছু নেতিবাচক পরিবর্তন থেকে বেঁচে যাওয়ার পরে স্বাভাবিক অবস্থা বোঝায় (Surjan et al., 2011, pp. 1-18)। এর অনন্য স্বাক্ষরটি প্রতিকূলতাকে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা সৃজনশীল ও সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের সাথে বিদ্যমান সামাজিক সংযোগসমূহকে শক্তিশালী করে এবং নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত বৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হয় (Cacioppo et al., 2011, p. 44)। স্থিতিস্থাপকতা এমন কিছু স্বতন্ত্র গুণাবলীর প্রতিনিধিত্ব করে যা স্বতন্ত্র ব্যক্তিদেরকে চাপযুক্ত পরিস্থিতিতে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলে এবং যা তাদের অভিজ্ঞতাগুলো থেকে খাপ খাইয়ে নিতে এবং শিখতে সহায়তা করে। সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতা একটি জটিল প্রক্রিয়া; যা ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী ও পরিবেশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সম্প্রদায় একটি গতিশীল এবং পরিবর্তনযোগ্য সামাজিক কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত, স্বার্থ দ্বারা আবদ্ধ ব্যক্তি এবং সংস্থার একই দলে অন্তর্ভুক্ত থাকে (Withanaarachchi, 2013, p. 6)। অন্যদিকে সম্প্রদায়ের লোকেরা একই উপায়ে এক সাথে স্থিতিস্থাপক হতে পারে। যার অর্থ এই যে সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতা স্বতন্ত্র স্থিতিস্থাপকতার নিশ্চয়তা দেয় না (Brown et al., 1996/97, p. 43)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে সেই ব্যক্তিরাও যেগুলো অন্যের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক বলে মনে করে তারাও কিছুটা আঘাত-সম্পর্কিত চাপ সহ্য করে, যদিও সম্ভবত কিছুটা কম পরিমাণে হয়। চাপপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সময়ে এই ধরনের ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াগুলো বেশিরভাগ মৃদু এবং সাধারণত স্বল্পস্থায়ী হয়। যা সাধারণত ব্যক্তির কাজ করার ক্ষমতাকে ব্যাহত করে না। সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতার সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতা কমানোর উপায় রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে প্রভাব, অভিযোজিত, বিকশিত এবং বৃদ্ধি দ্বারা এই জাতীয় ঘটনার সময় এবং পরে দ্রুত পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হয় (Withanaarachchi, 2013)।

৪.২.১০ স্থিতিস্থাপকতার (Resilience) তত্ত্ব গ্রহণের যৌক্তিকতা

এ গবেষিত এলাকায় ব্যাপক সংখ্যক শরণার্থী আগমণের ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন-জীবনে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রভাব এই গবেষণায় অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ গবেষণায় স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্বটি দ্বারা শরণার্থীদের বিভিন্ন ধরণের ঘটনা এবং কিভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রভাব তৈরী করছে তা বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে। স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বের আলোকে এই গবেষণায় পর্যবেক্ষণ, পরিস্থিতি অনুধাবন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী উখিয়া

ও টেকনাফ উপজেলায় অবস্থান করায় কিভাবে সেখানকার সামাাজিক পরিস্থিতি পরিবর্তীত হয়েছে; অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে স্থানীয় জন-জীবনে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শরণার্থী আগমনে বিভিন্ন চাপ তৈরী হয়; যারমধ্যে অর্থনৈতিক নাজুকতা খাড়াখাড়িভাবে নিচের দিকে খাদে চলে যায়। সেই খাদে পড়া আর্থ-সামাজিক সূচক আবার স্বাভাবিক গতিতে আগের জায়গায় চলে আসতে সময় লাগে। স্থানীয়দের আর্থিক সংকট আগের চেয়ে আরও খারাপ অবস্থায় চলে এলে বুঝতে হবে দ্রুত 'পুণরুদ্ধার' বাস্তব সম্মত নয়। এ অবস্থায় তাদের পরবর্তী অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদি রক্তস্বল্পতায় ভুগতে পারে। এতে শরণার্থী সম্প্রদায়ের লোকেরা বেঁচে থাকার তাগিদে স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকদের ওপর আর্থ-সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি করা অস্বাভাবিক বিষয় নয়। কিছু গবেষণায় নির্দিষ্ট চাপের (মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক) দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, যা দুর্বলতা বিশ্লেষণকে প্রতিফলিত করে (Cinner, 2009)। সাধারণত তিনটি ক্ষেত্রে এ ধরনের গবেষণা হয়ে থাকে-১) প্রাকৃতিক বিপদ ও বিপর্যয় কেন্দ্রিক ২) সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা এবং ৩) খরা (Leichenko et al., 2008)।

স্থিতিস্থাপকতার প্রাথমিক সংজ্ঞাগুলো দুর্বল অবস্থার সাথে চাপের অধীনে ইতিবাচক বিকাশের ধারণার বিপরীত এবং স্থিতিস্থাপকতা চাপের মুখে ভঙ্গুর নয় এমন অবস্থার সমার্থক (Anthony, 1987; Cannon, 2008; Cutter et al., 2003)। এক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞায় প্রান্তিকতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং এটি বোঝার জন্য কল্যাণমূলক কাজসমূহ অনন্য মাত্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (কমবেশি স্থিতিস্থাপক এবং স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা নাজুকতার সাথে সম্পূরক নয়)। পরিবর্তন সত্ত্বেও একটি অনুকূল পরিমাণে স্থিতিস্থাপকতা এবং উচ্চতর স্থিতিস্থাপকতা কম দুর্বলতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। প্রিন্স-এম্বুরি এর মত গবেষকরা ধরে নিয়েছিলেন যে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য আরও শিক্ষাগত সহায়তা তাদের কুসংস্কার, টিজিং বা কিশোর অপরাধের মতো ঝুঁকি হ্রাস করে (Prince-Embury, ২০১৩)। এতে সত্যের অবয়ব থাকতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিশুদেরকে স্থিতিস্থাপক করে তোলার কারণগুলো বৃদ্ধি পায় বা দুর্বলতা হ্রাসের সাথে অর্থনৈতিকভাবে সম্পর্কিত হয়। Keyes পরামর্শ দিয়েছেন, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানোর কারণগুলো মানসিক ব্যাধি বৃদ্ধি করার বিষয়গুলো থেকে আলাদা (Keyes, 2002)। একটি শিশু শ্রেণি কক্ষের শিক্ষাগত সুযোগ বা সহায়তা পেতে পারে, যা তাকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে পারে। কিন্তু বিদ্যমান বিষাক্ত সামাজিক পরিবেশ অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষের বাইরের পরিবেশ তার মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের বিকাশের জন্য হুমকি স্বরূপ। দুর্বলতার একটি পদ্ধতিগত সংজ্ঞায় তিনটি বিভাগ চিহ্নিত হয়- জৈবিক (জেনেটিক এবং শারীর বৃত্তীয় স্বভাব), ঐতিহাসিক (ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থা) এবং মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা (একজন ব্যক্তির জ্ঞান এবং শিক্ষাগত আচরণ) (Scotti et al., 1995)। মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার বিষয়ে প্রতিকূলতার সাথে একজনের অতীত অভিজ্ঞতা (Paton et al., 2000) এবং চাপযুক্ত ঘটনার সময় ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অবস্থা,

ক্লান্তি এবং মানসিক চাপ সবই দুর্বলতার পরিমাণে ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় প্রভাবিত করতে পারে (Flin, 1996)। যাই হোক এর কোনটিই স্থিতিস্থাপকতার সাথে আপস করে না যেহেতু ব্যক্তির স্থিতিস্থাপকতা তার মোকাবেলার দক্ষতা, অর্জিত প্রতিরক্ষা এবং বাহ্যিক উৎস থেকে সমর্থন প্রতিফলিত করে (Anthony, 1987: p. 28)।

এই কারণে যেখানে দুর্বলতায় ব্যক্তি পূর্ব স্বভাবের স্থিতিস্থাপকতা দেখায় সেগুলো এমনভাবে কাজ করতে পারে যা সমাজপ্যাথি হয় (সে বেঁচে থাকে কিন্তু অন্যদের কল্যাণের জন্য কোনরকম প্রতিকূলতা থেকে ফিরে আসার পথ দেখায় না)। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না অদম্যতা প্রেক্ষাপট-নির্ভর এবং তা সবসময় মানসিক স্বাস্থ্য, পেশাজীবী, শিক্ষাবিদ, নিয়োগকর্তা এবং সরকারি নীতিনির্ধারকদের মতো প্রাতিষ্ঠানিক নেতাদের দ্বারা ইতিবাচক হিসেবে বিবেচিত হয় না (Ungar, 2004)। দুর্বলতার ধারাবাহিকতা থেকে স্থিতিস্থাপকতার ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষমতা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যকারিতা কম অনুকূল থেকে কার্যকরী এবং বাস্তবসম্মত হতে পারে। একইভাবে মিথ্যা আশার লক্ষণ প্রবর্তন করেছেন যেগুলো ব্যাখ্যা করার উপায় হিসেবে ব্যক্তিগত পরিবর্তন প্রক্রিয়ার শুরুতে উচ্চ আশা এবং প্রত্যাশা রাখে প্রকৃতপক্ষে তারা আশাবাদ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে: যখন এই অবাস্তব প্রত্যাশাগুলো পূরণ হয় না। স্ব-সংশোধনের প্রচেষ্টার ফলাফল হতাশা, সাহস এবং ব্যর্থতা হিসেবে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে (Polivy et al, 2000 p. 2)। আত্মবিশ্বাস এবং উচ্চ স্তরের কার্যকারিতা-ব্যক্তিগত স্থিতিস্থাপকতার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ কেবল তখনই সহায়ক হয় যখন কাঙ্খিত ফলাফল বাস্তবিকভাবে অর্জনযোগ্য হয়। (Tomes, 1857) দ্বারা দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের সাথে এর প্রথম ব্যবহার হয় এবং অবশেষে (Holling, 1973) সামাজিক বাস্তুসংস্থায় এর ব্যবহার করেন, তারপর এটি মনোবিজ্ঞানে একটি দীর্ঘ তালিকা দ্বারা সামাজিক পরিবেশগত ব্যবস্থার গবেষণায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শরণার্থী উপস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার ফলে মানসিক চাপ, আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত ও প্রাকৃতিক পরিবেশগত ক্ষতিকে (ব্যক্তি এবং সমাজের কল্যাণে স্বাস্থ্য, আবাসন, রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা, গতিশীলতা এবং সাম্যতাকে স্থিতিশীল সম্প্রদায়ের সামাজিক স্থায়িত্বের ভিত্তিতে) কিভাবে পুষিয়ে নিচ্ছে বা এই ভঙ্গুর অথবা নাজুক অবস্থায় নিজেদের জন-জীবনকে কিভাবে মানিয়ে নিচ্ছে তা স্পষ্ট করা। তাই এ গবেষণায় মানিয়ে চলার একটি প্রতিচ্ছবি দ্বারা এ তত্ত্বের আলোকে স্থিতিস্থাপকতা বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং বিপুল সংখ্যক শরণার্থী উপস্থিতিতে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে যে অভিঘাত এসেছে এবং সেই অভিঘাতগুলো যে সকল প্রক্রিয়ায় মনিয়ে তাদের জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছে তার উপাদানগুলো এ তত্ত্বের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে।

৪.২.১১ স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্বগত ব্যবহার

এই গবেষণায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তাদের জনসংখ্যার উপস্থিতিতে পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কৌশলগুলো জানার চেষ্টা করা হয়েছে। শরণার্থীরা সাধারণত যখন জোরপূর্বক উচ্ছেদের শিকার হয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে আসে তখন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লোকেরা কিভাবে এবং কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে টিকে থাকার সামর্থ্য অর্জন করে। যুদ্ধ, বন্যা, প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে শরণার্থীদের পরিস্থিতি মোকাবেলার কৌশলগত ব্যাখ্যায় কিভাবে বা যে কোন পরিস্থিতিতে সামর্থ্য বাড়ায়। শরণার্থীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক কৌশল অর্জনে মানুষের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে জীবন যাপন ব্যবস্থায় অভ্যস্থ হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। ফলে শরণার্থীদের পরিস্থিতি মোকাবেলার কৌশলগত ব্যাখ্যায় স্থানীয়দের সাথে সম্পর্ক তৈরী হয় না দ্বন্দ্ব তৈরী হয়। শরণার্থী উপস্থিতিতে স্থানীয়দের স্থিতিস্থাপকতার ফলে অভিঘাত সহ্য করার ক্ষমতা তৈরি হয় কিনা তা স্পষ্ট করা।

শরণার্থী উপস্থিতির ফলে স্থানীয়দের আর্থ-সামজিক জীবন-যাপন বিশেষ করে অর্থনৈতিক চাপ ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে অভিঘাত হওয়ায় উখিয়া-টেকনাফ এর মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে স্থানচ্যুত হয় নি বা নিঃশেষ হয়ে যায় নি। এই পরিবর্তিত অবস্থায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছেন। যা ঐ স্থানের মানুষের জন্য স্থিতিস্থাপকতাকে বোঝায়। যেমন সিরিয়ার শরণার্থীরা তাদের আঘাতমূলক অভিজ্ঞতা চলাকালীন এবং চাপপূর্ণ ঘটনাগুলো সহ্য করার এবং স্বীকার করা সত্ত্বেও তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজের সময় ইতিবাচক বা নেতিবাচক মোকাবিলা করার ক্ষমতা সম্পর্কে কম জানা যায়। জর্ডানে শরণার্থী পুনর্বাসন গবেষণায় এই শরণার্থীদের মোকাবেলার কৌশলগুলিকে একটি প্রধান অধ্যয়নের পরিবর্তনশীল হিসেবে উল্লেখ করেনি; অন্যান্য পরিবর্তনীয় মোকাবেলা করার কৌশল যেমন মানসিক অবস্থা, শরণার্থী পরবর্তী অবস্থা, সাহায্য চাওয়ার আচরণ বা জীবনযাত্রার মান নিয়ে আলোকপাত করেছে (Goodman, 2004)। তাত্ত্বিক বিষয়ে কিছু গবেষণায় মোকাবেলা করার কৌশলগুলোর সাথে তাদের প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যালোচনায় বেশিরভাগ গবেষণা বলছে, ব্যক্তির সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষাগত স্তর তাদের ব্যবহৃত মোকাবেলা কৌশলের স্তরের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে (Crabtree, 2010; Gladden, 2012)। রিপোর্ট করা ফলাফলগুলের প্রাথমিকভাবে উদ্বেগ এবং বিষন্নতার মতো মানসিক স্বাস্থ্যের ফলাফলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। অন্যান্য মাত্রায় যেমন মানসিক ও সামাজিক পরিণতি সম্পর্কে খুব কম রিপোর্ট করা হয়েছে। পারিপার্শিক বা সামাজিক কারণে শৈশবকালে ব্যক্তি যে ধরণের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়; বয়ঃসন্ধিকালে কিংবা আরো পরে একই কারণে সুরক্ষার বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হতে পারে। তাই সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা অধ্যয়নে ঝুঁকির বিষয়ে গুরুত্ব বুঝতে এ তত্ত্ব সহায়তা করে (Fraser et al., 1999)। পূর্বে উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয়সমূহ ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন, সামাজিক বাস্তুসংস্থান বা শরণার্থী উপস্থিতির ফলে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে

স্থিতিস্থাপকতার বিষয়ে খুব বেশি গবেষণা দেখা যায়নি। তাই শরণার্থী আগমণের ফলে উখিয়া-টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবন-যাত্রায় যে অভিঘাত এসেছে তা এ গবেষণায় তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.৩ উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, স্থিতিস্থাপকতা হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায়ের অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার সামর্থ্য বা ক্ষমতা। যেখানে ব্যক্তি খারাপ বা বৈরী অবস্থায় পতিত হয়েও সে এই খারাপ অবস্থা থেকে নিজেকে ভালো অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই ভালো অবস্থায় নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা। এ গবেষণার মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী আসার কারণে কক্সবাজারের দু'টি উপজেলা উখিয়া ও টেকনাফের স্থানীয় মানুষের জীবনে প্রভাব বোঝার ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন সে বিপদকে মোকাবেলা করার সামর্থ্য বা শক্তি অর্জন করাই স্থিতিস্থাপকতা। কাজেই এ স্থানে যখন রোহিঙ্গারা আসে তখন নতুন একটি দেশের বৈরী পরিবেশে কিভাবে তারা মোকাবেলা করে নিজেদের টিকে রাখতে চেষ্টা করেছে। আবার এই বিপুল পরিমাণ শরণার্থী আসায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ কোন অবস্থায় প্রভাবিত হয়েছে; এতে তাদের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ছে না কমেছে এটিই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যেটি গবেষণার আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। রোহিঙ্গারা এখানে আসায় তাদের বিপদকে মোকাবেলা করার সামর্থ্য বেড়েছে না কমেছে। একইভাবে রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বেড়েছে না কমেছে অর্থাৎ তাদের জীবন-জীবীকার এক ধরনের ধারাবাহিকতা ছিল সেটি কমেছে না বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় স্থানীয়দের কী ধরনের ব্যাঘাত ঘটেছে এবং যদি ব্যাঘাত ঘটেই থাকে তাহলে কোন ধরণের ব্যাঘাত ঘটেছে এবং কিভাবে তারা মোকাবেলা করে নিজেদের টিকে রাখতে চেষ্টা করেছে। তাদের যে একটি স্থিতিস্থাপকতা বা শক্তি অথবা সামর্থ্য ছিল সেটি কী শক্তিশালী হয়েছে নাকি নষ্ঠ হয়ে গেছে। কাজেই এই গবেষণায় মূলত এ দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে আলোকপাত করা হয়েছে। যা পরবর্তীতে অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবারের মানুষের জীবনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্দশা কমায় আবার বাড়ায়। যা আগামীতে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কিভাবে প্রভাব ফেলছে, তার উত্তর অন্য কোনো গবেষণায় খুব একটা পাওয়া যায়নি। তাছাড়া গবেষণার পূর্বে জানা যায়নি রোহিঙ্গা শরণার্থী আগমণে কক্সবাজারের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ের কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্দশার মাত্রা কিরূপ; তাদের স্থিতিস্থপকতা বাড়ছে না ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়:

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পরিচয়

৫.১ ভূমিকা

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পরিচয় নিরূপণে আরাকান রাজ্য বর্তমান নাম রাখাইন অঞ্চল ও সেখানে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর পরিচয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আরবদের এ অঞ্চলে আগমন ও বিয়ে-শাদীর ফলে মিশ্র জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। আরাকানীজ মুসলিম পরিচয় ও ঐ সকল মিশ্র জনগোষ্ঠীর সাথে অন্যান্য জনগোষ্ঠীসহ বাঙালির সম্পর্কের সূত্র ধরে রূপান্তরিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পরিচয় এবং বিকাশধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ গবেষণায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে যে ত্রিমাত্রিক বিষয়বস্তুর আলোকপাত করা হয়েছে তা হলো- প্রথমত, আরাকান রাজ্য ও রাখাইন 'প্রে' বা প্রদেশ; দ্বিতীয়ত, আরাকানের রাখাইন জনগোষ্ঠী এবং তৃতীয়ত, রাখাইনে আগত আরব-অনারব মুসলিম, আরাকানীজ মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এক সময় পরিচিত আরাকান রাজ্য পরিবর্তিত হয়ে রাখাইন প্রে হয়; একপর্যায়ে সেখানে বসবাসরত উল্লেখযোগ্য দুই ধরণের জনগোষ্ঠী রাখাইন এবং আরব-অনারবসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী থেকে আগত মুসলিম পিতার ঔরসে ও রাখাইন মাতার গর্ভজাত সন্তান অর্থাৎ আরব, পাঠান, আফগান, পারস্যদেশীয় এবং ভারতীয় মুসলিম বণিকদের সন্তানরা আরাকানীজ মুসলিম হিসেবে পরিচিতি পায়। তাঁরা নিজেদের বার্মীজ মুসলিম হিসেবেও দাবী করে। পরবর্তীতে সপ্তদশ শতাব্দীতে ১৭৯৯ সালে প্রথম ফ্রান্সিস বুকানন, 'কিছু সংখ্যক মুসলিম নিজেদের '*Rooainga*' বা রোয়াইঙ্গা বলে পরিচয় দেয়' বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু এই বার্মীজ মুসলিম বা আরাকানীজ মুসলিম জনগোষ্ঠী বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং রোহিঙ্গা নেতা উ আবদুল গাফফার রোহিঙ্গা পরিচয়ে প্রথম ১৯৫১ সালে লিখিতভাবে নিজেদের দাবীর পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেন। সুতরাং এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অবস্থান পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে বুঝতে চেষ্টা থাকবে কেন, কিভাবে এবং কিসের ভিত্তিতে তাঁরা আজ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পরিচয়ে পরিচিত। এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাঁদের নৃ-গোষ্ঠীগত, ভাষাগত স্বকীয়তা ও ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এ পরিচয়কে স্পষ্টকরণের চেষ্টা থাকবে। ১৯৬২ সালে এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের পর রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এক অনিশ্চিত গন্তব্যে যাত্রা শুরু করে। এরপর তারা নির্যাতিত হয়ে চার দশক ধরে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। মিয়ানমার রাষ্ট্র, সরকার, বৌদ্ধ মিলিশিয়া ও ভিক্ষুদের ধারাবাহিক আক্রমণে রাষ্ট্রহীন জাতিতে পরিণত হয়েছে।

৫.১.১ আরাকান ও আরাকানী জনগোষ্ঠীর পরিচয়

৫.১.১.১ আরাকানের ভৌগোলিক পরিচয়

বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূল ধরে ৩৫০ মাইল বিস্তৃত আরাকান জেলা একটি দূরতিক্রম্য পর্বত শ্রেণি দ্বারা বার্মা থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রাকৃতিক বৈচিত্রের প্রভাবে বার্মার আরাকান রাজ্য উত্তর অক্ষাংশের

২১°৩০´´ ও ১৭°৩০´´ এর মধ্যে এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ৯২°১০´´ও ৯৪°৫০´´ এর মধ্যে অবস্থিত (ইসলামি বিশ্বকোষ, ১৯৯২)। এর দৈর্ঘ্য ৩৬০ মাইল কিন্তু প্রস্থে স্থান বিশেষে ভিন্নতা রয়েছে। পূর্বে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী ইয়োমা (Yoma) পর্বতমালা। এই সুদীর্ঘ, দূর্গম, সুউচ্চ ও বিশাল ইয়োমা পর্বতমালা দূর্ভেদ্য প্রাচীরের মত বার্মা (মিয়ানমার) থেকে আরাকানকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ বার্মার (বর্তমান মিয়ানমার) একটি প্রদেশ আরাকান (Far Eastern Economic Review, 1989)। নিম্ন বার্মার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল আর বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে বঙ্গোপসাগরের উপকূবর্তী পাহাড় ঘেরা একটি রাজ্য আরাকান। খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এটি একটি স্বাধীন (রাজ্য) রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল (Hall, 1994)। ব্রিটিশ শাসিত আরাকানের আয়তন ছিল ২০,০০০ বর্গ মাইল। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা উত্তর পার্বত্য আরাকন বার্মার চিন প্রদেশ এবং দক্ষিণ আরাকানের কিছু অংশ নিম্ন বার্মার ইরাবতি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করায় বর্তমানে এর আয়তন ১৪,২০০ বর্গমাইল (The High School Geography of Burma, 1999)। তবে আরাকানের মোট আয়তন ছিল ১৮,৫০০ বর্গমাইল (চৌধুরী, ১৯৯৪)। সমগ্র আরাকান অঞ্চল ১৭১ মাইলব্যাপী নৌ ও স্থল সীমারেখা দ্বারা বাংলাদেশের সীমান্ত পরিবেষ্টিত (Jilani, 1999)। আরাকানে মোট সাতটি উল্লেখযোগ্য নদী রয়েছে। নাফ নদী আরাকান ও বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্ত রেখা হিসাবে কাজ করে। সমগ্র আরাকানকে পাঁচটি জেলায় বিভক্ত করে প্রশানিক কাঠামো গঠিত। এসকল জেলার অধীনে ১৭টি টাউনশীপ শহর রয়েছে (ইসলাম, ২০১৮)। ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে কেন্দ্রিয় শক্তিবিহীন চট্টগ্রামের পাঠান শাসন উচ্ছেদ করে আরাকান রাজ্যভুক্ত করা হয়। তখন থেকে ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত একাধীক্রমে সমগ্র চট্টগ্রাম পঁচাশি বছরকাল আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল।

মানচিত্র নং-৫.১ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকানের মানচিত্র

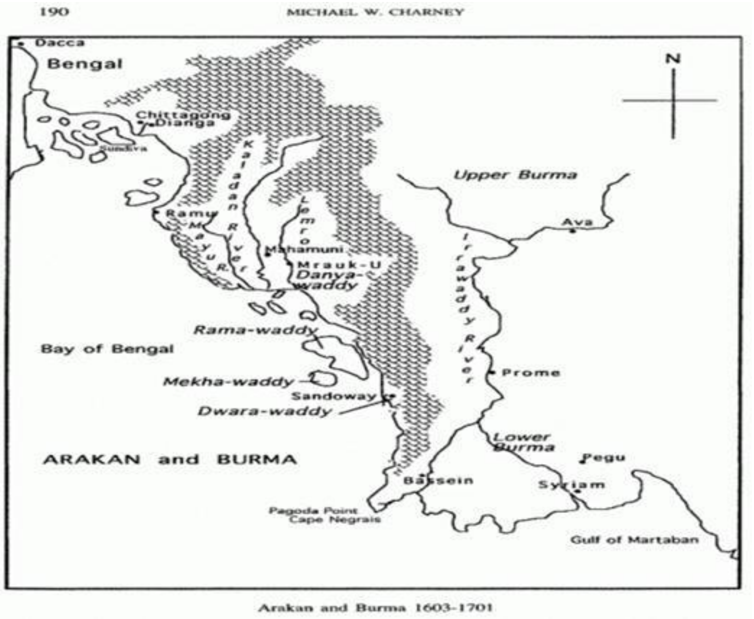

http://arakanindobhasa.wordpress.com/2010/08/09/arakan-kingdom-map-up-to-modern-age

প্রাচীনকাল থেকেই মিয়ানমার (বার্মা ভূখণ্ড) রাষ্ট্রটি কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল যার মধ্যে শান রাজ্য, কাচিন রাজ্য, কায়হা রাজ্য, চিন রাজ্য, মন রাজ্য ও আরাকান বা রাখাইন, কাখ্যাইং ও বার্মান রাজ্য নিয়ে গঠিত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৪ সাল থেকে আরাকানের বর্তমান নাম রাখাইন হয় (*The Constitution of the Sociolist Republic of Union of Burma*, sec. No. 30/5)।[১] এখানে আরাকানী বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের একটি অংশ রাখাইন জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। ১৭৮৫ সালে বার্মানরা আরাকান দখল করে বার্মার সাথে যুক্ত করে। বার্মার উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব দিকে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের তিব্বত ও ইউনান প্রদেশ; উত্তর-পশ্চিমে ভারত; দক্ষিণে মার্তাবান ও আন্দামান সাগর; পূর্বে চীন, লাওস ও থাইল্যাণ্ড এবং পশ্চিমে বাংলাদেশ ও বঙ্গোপসাগর (ইসলাম, ১৯৮৯)।

৫.১.১.২ আরাকান নামের উৎস

প্রাচীনকাল থেকেই আরাকানীরা নিজেদেরকে রাখাইং এবং তাদের জন্মভূমিকে 'রাখাইং প্রে' বলে পরিচয় দিয়ে আসছে। রাখাইং হচ্ছে জনগোষ্ঠীর নাম আর 'প্রে' হচ্ছে দেশ বা প্রদেশ। রাখাইং শব্দটি 'রখইঙ্গতঙ্গী' বা রখাইংপি থেকে গৃহীত বলে অনুমান করা হয় (Phayre, 1984)। রাখাইং শব্দ সংস্কৃত রক্ষঃ (রাক্ষস) এবং পালি শব্দ সখখো থেকে গৃহীত হয়েছে এবং রাখাইং শব্দের অর্থ হলো দৈত্য বা রাক্ষস (হক ও করিম, ১৯৩৫)। কারো মতে আরাকান নামটি ইউরোপীয়দের দেয়া; এটি রক্ষইংগ, আরখং বা রাখাংগ থেকে আরাকানে পরিণত হয় (করিম, ১৯৯২)। বার্মার ঐতিহাসিক আর্থার ফেয়ার আরাকান (Aracan) নামকে রাখাইং নামের বিকৃতি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, উচ্চারণে 'অ' ও 'র'-এর স্থিতি বিপর্যয়ের জন্যই রাখাইং আরাকান হয়েছে (আক্তারুজ্জামান, ১৯৯৯)। সুপ্রসিদ্ধ আরব ভৌগোলিক সুলায়মান ৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিলসিলাত উত তাওয়ারিখ' নামক গ্রন্থে বঙ্গোপসাগরের তীরে রুহমী নামক একটি দেশের পরিচয় দিয়েছেন। যাকে আরাকানের সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করা যেতে পারে (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। আরাকানের রাজবংশীয় উপাখ্যান 'রাদজাতুয়ে'তে উল্লেখ আছে ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা 'সুরতন' বিজয় করে এক বিজয় স্তম্ভে লিখে দেন চেত্তগৌং। যার অর্থ-'যুদ্ধ করা উচিত নয়'। চট্টগ্রাম শব্দটি চেত্তাগৌং শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন (করিম, ১৯৮০)। ভূগোলবিদ টলেমী যে দেশকে উল্লেখ করেছেন, সে দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে ঐতিহাসিকরা আরাকানকে অভিন্ন মনে করেন (চৌধুরী, ১৯৯৪)। তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারকানাথ আরাকানকে 'রকন' বলে উল্লেখ করেছেন (দাস, ১৮৯৮)। আবুল ফজলের আইন-ই আকবরীতে আরাকানের নাম 'আখরঙ্গ' লিখিত হয়েছে। মীর্জা নাথান রচিত

---

১. ১৯৭৪ সালে মিয়ানমার সরকার নে উইন আরাকানকে 'রাখাইন ষ্টেট' নামকরণ করে একটি অঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা দেয়। [*The Constitution of the Sociolist Republic of Union of Burma*, sec. No. 30/5.] তবে এ অভিসন্দর্ভের কোথাও কোথাও 'রাখাইন ষ্টেট' এরস্থলে আরাকান বা আরাকান রাজ্য ও রাখাইন বা রাখাইন রাজ্য উভয়ই ব্যবহার করা হয়েছে। স্থানীয়দের নিকট এটি 'রাখাইন প্রে' (দেশ বা প্রদেশ) নামেও বেশ পরিচিত।

বাহারিস্তানই গাইবী'তে আরাকানকে 'আরখঙ' ও সেখানকার অধিবাসীদেরকে 'রখই' বলে উল্লেখ করেছেন। মোঘল ঐতিহাসিক শিহাবউদ্দিন আহমদ রচিত 'ফতোয়াই ইব্রিয়াতে' আরাকানের নাম "রখঙ"। পিলুভিনোর ল্যাটিন ভাষায় লিখিত ভূগোলে 'আরাকান' নাম দেখা যায় (জে. এ. এস. বি. ১৯৫১)। ফনলি চটোয়েনের অংকিত মানচিত্র ও ফাদার ম্যানরিকের ভ্রমণ কাহিনীতে 'আরাকান' নাম লিখিত হয়েছে (চৌধুরী, ১৯৯৪)। গোলাম হোসেন সলীম রচিত 'রিয়াজুস সালাতিনে' আরাকানের নাম 'আরখাঙ্গ' লিখিত আছে (সলিম, ১৯৭৪)। ফারসি আকর গ্রন্থে 'আরাকানক' নামও দেখা যায়। আলমগীর নামার ৯৪০ পৃষ্ঠায় আরাকানের নাম লিখিত হয়েছে 'রাঙখ' (চৌধুরী, ১৯৯৪)। আরাকানের রোহিঙ্গা অধিবাসীদের ধারণা আরাকান আরবি আলরেকন বা আররুক্ন শব্দের অপভ্রংশ (চৌধুরী, ১৯৯৪)। তুর্কি এডমিরাল সিদি আল-রইস লিখিত বিবরণীতে আরাকানের নাম 'রকঞ্জ' (চৌধুরী, ১৯৯৪) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। চট্টগ্রামবাসীরা আরাকানকে 'রোয়াং> 'রোহাং> 'রোসাং' নামে খ্যাত করেছে চিরদিন। সমসাময়িক ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডগরেজিষ্ট্রারসমূহে আরাকানকে 'আরাকান' নামে আখ্যায়িত করেছেন (অং, ২০১৩)। পরবর্তীতে স্বাধীন আরাকান হয়, ইউনিয়ন অব বার্মার অধীন একটি 'রাজ্য'। বিভিন্ন জনগোষ্ঠিতে অবদান রেখেছে মঙ্গোলয়েড নৃ-গোষ্ঠীর বিভিন্ন নৃ-জাতি রূপের মানুষ, যারা ভারতীয় ও আরবীয় বংশোদ্ভূত। অতএব একথা প্রমাণিত হয় যে, রাখাইয়ং শব্দ থেকেই আধুনিক আরাকান (Aracan) নামের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 'রোয়াং', 'রোসাঙ্গ' ও 'রোকাম' শব্দগুলি যে রাক্ষাইনদের আদিবাস 'আরাকান'কে নির্দেশ করতো তার স্বপক্ষে অনেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন (খান, ১৯৭৮)। কবির ভাষায়-

ক. কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতরী।

খ. ক্ষিতিতলে অনুপাম
রোসাঙ্গ শহর নাম।

গ. ভুবন বিখ্যাত আছে রোসাঙ্গ নগরী।

কর্ণেল ফেয়ার পেগুতে 'রাখাইন' নামে একটি জন-গোষ্ঠীর সন্ধান পেয়েছেন। অবশ্য উক্ত জন-গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের কোন সাদৃশ্য নেই (Phayre, 1884)। আরাকানী মুসলিম জনগোষ্ঠী বাস করে বার্মার উত্তর পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত আরাকানে। আরাকানীদের মূল জনগোষ্ঠী বার্মা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের অতীত ইতিহাস রয়েছে। প্রধানত মধ্য-বার্মা এবং আরাকান উপকূলভাগে পার্বত্য অঞ্চলের দ্বারা এই বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। আর এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগেই দীর্ঘ সময় ধরে বার্মা থেকে স্বাধীন থেকেছে আরাকান। বার্মার মানচিত্রের দিকে তাকালেই বর্মীদের জাতিগত আকৃতি ও অবস্থান সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অধিবাসীদের অধিকাংশ চিন, নাগা এবং কাচিন নামে পরিচিত (Charles, 1964)। ১৯৮৯ সাল থেকে মিয়ানমার নামে পরিচিত বার্মা দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত প্রায় ১৫০০

মাইল বিস্তৃত (Matthews, 2001)। এলাকাটির জনসংখ্যা প্রায় ৪৮ মিলিয়ন এবং আয়তন ৬৭৮,৫০০ বর্গ কিমি, দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়া। এটি দুটি এশিয়ান এর মধ্যে অবস্থিত রাষ্ট্র, ভারত ও চীন, এবং বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড এবং লাওস এর সাথে সীমান্ত রয়েছে। বার্মা অন্যান্য দেশে তুলনায় আরো উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ পশ্চিম এবং দক্ষিণে, এটি দ্বারা বেষ্টিত অঞ্চলে ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান সাগর। অনেক জাতির সাথে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং কনফুসিয়ান সভ্যতা বার্মা বা মিয়ানমার একটি জাতি এবং প্রায় ১৩৫ জাতিগতগোষ্ঠী রয়েছে (Huntington, 1996)। মিয়ানমারে বামার, তবে শান, কাচিন, চিন, রাখাইন, আরাকানীজ মুসলিম, ভারতীয় মুসলিম, চীনা মুসলিম এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু গ্রুপ রয়েছে। বর্মী ও অ-বর্মী উপজাতিদের মধ্যকার এই ব্যবধান মূলত মাতৃভাষা ভিত্তিক, কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যবধানভিত্তিক নয়। নবম শতকে উক্ত উপজাতিগুলো এই পার্বত্য এলাকা পরিত্যাগ করে সমতল ভূমি এলাকায় বসতি স্থাপন করে এবং এগারো ও বারো শতকের মধ্যে সিতাং উপত্যকার দক্ষিণ দিক থেকে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত ভূখণ্ডে তাদের বসতি বিস্তার লাভ করে। পশ্চিম দিকে তারা পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করে আরাকানে প্রবেশ করে (Tony, 1979)। আরাকানে বসবাসরত উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধানত রাখাইন ও আরাকানীজ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে পাওয়া যায়।

৫.১.১.৩ আরাকানে মুসলিম সম্প্রদায় ও আরব মুসলিমদের আগমন

খ্রিষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকের আরবীয় ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকরা বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী 'রুহমী' নামক একটি রাজ্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন। রুহমী রাজ্যটির বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, বর্তমান আরাকান রাজ্যই আরবীয়দের কাছে রুহমী নামে পরিচিত ছিল। জাহাজ ডুবির কারণে এদের মধ্যে কতিপয় লোক বাধ্য হয়েই তীরবর্তী এলাকায় আশ্রয়ের সন্ধান করতঃ বসতি স্থাপন করে থেকে যায় (Smart, 1917)। বর্মী ঘটনাপঞ্জিতে সর্ব প্রথম যে ব্যবসায়ীদের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং যাদের মুসলিম বলে ধারণা করা হয় তারা হল জনৈক আরব ব্যবসায়ীর সন্তান। এদেরকে মার্তাবান উপকূলের কাছে ধ্বংস প্রাপ্ত জাহাজ থেকে উদ্ধার করা হয়। স্পষ্টতই ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা অনহ্রথের (১০৪৪-১০৭৭) রাজত্বকালে তারা বার্মা পৌঁছে। এছাড়াও অনেক সূফী দরবেশের প্রচারের মাধ্যমেও আরাকানে ইসলামের প্রচার ঘটে। রুহমী দেশের বাদশাহর সাথে বাগদাদের আব্বাসীয় শাসকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের উল্লেখও ইতিহাসের বিভিন্ন সূত্রে রয়েছে। ৩৪০ হিজরীতে আল-মাসুদ লিখিত 'মুরউস-আল যাহার ওয়া মা' আদীনুল জওহর" গ্রন্থে রামরী রাজ্যের বর্ণনা রয়েছে। আরাকানের লঙ্গিয়েত বৃহৎ সংখ্যায় মুসলিমদের আগমন ঘটে ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে। স্বাধীন আরাকানের ম্রাউক-উ রাজবংশ নরমিখলা ওরফে মোহাম্মদ সোলাইমান শাহ-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)।[২] এই নরমিখলা চন্দ্র সূর্য বংশের রাজা অযুথুর পুত্র। ১৪০২ সালে

২. ঐতিহাসিকগণ ম্রাউক-উ বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম 'মিন সি মোয়ান' (Min Saw Muan) উল্লেখ করেছেন। বার্মার ঐতিহাসিকগণ তার নাম উল্লেখ করেছেন নরমিখলা। প্রতিয়মান হয় যে 'মিন স মোয়ান' নরমিখলার পরিবর্তিত নাম; হাবিবউল্লাহ, এমএন ১৯৯৫, পৃ. ২০

নরমিখলার পিতা অযুথুকে হত্যা করে চাচা রাজধানীর পৈতৃক সিংহাসন দখল করেন। অতঃপর ১৪০৪ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ বছর বয়স্ক যুবরাজ 'নরমিখলা' চাচাকে উৎখাত করে পিতার সিংহাসনে আরোহন করেন (Smart, 1957)। বাংলার সুলতানদের সহায়তায় সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার পর নরমিখলা চার বছর (১৪৩০-১৪৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। নরমিখলার সময়ে আরাকানে বসবাসরত মুসলিমরা আরাকানীজ মুসলিম হিসেবে পরিচিতি পায়। গৌড়ীয় সৈন্যদের সহায়তায় নরমিখলা ম্রাউক-উ নামক এক স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৩০ সাল থেকে ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত আরাকান কর্তৃক বার্মা দখলের আগ পর্যন্ত একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। যদিও নরমিখলার মৃত্যুর পর ১৪৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মিনখেরী আলী খাঁ রাজা হয়ে গৌড়ের অধীনতা ছিন্ন করে, আরাকান স্বাধীন হয়ে যায়। তখন গৌড়ের সেনাবাহিনী স্বদেশে ফিরে এলেও শ্রমিক ও সেনাবাহিনীভুক্ত চট্টগ্রামীদের আরাকান থেকে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। নরমিখলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরাকানের ম্রাউক-উ-রাজবংশকে অনেক গবেষকই বিভিন্ন পর্যায় পর্যন্ত 'আরাকানে মুসলিম শাসনের যুগ' বলে উল্লেখ করেছেন। মুসলিম শাসনের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ৯৫৭-১৪৩০ সাল পর্যন্ত আরাকানকে তারা বৌদ্ধ রাষ্ট্র মনে করেন (Harvey, 1968)। নরমিখলার ব্যাপারে দুই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়, তা হল এক. অরাকানরাজ নরমিখলা (Narameikhla) ১৪০৪ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে অননথিউ (Ananthiu) নামক জনৈক সামন্তরাজের বোন চৌরোঙ্গিকে (Tsaubongyo) বলপূর্বক গ্রহণ করলে অননথিউ বোনের প্রতি এ অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার মানসে বর্মীরাজ মেং শো আই (Men-Tshwai ১৪০১-১৪২২ খ্রিষ্টাব্দে) এর নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করেন। তিনি রাজা নরমিখলাকে পরাজিত করেন। নরমিখলা পলায়ন করে বাংলার ইলিয়াসশাহী বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের নিকট সাহায্য প্রার্থী হন। তিনি তাঁকে সাদর-সম্মানে গ্রহণ করে আশ্রয় দান করেন (খান, ১৯৯৮)। দুই. নরমিখলার রাজ্য আক্রমণের পিছনে অন্য কারণ পাওয়া যায়, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলাম প্রচারিত হবার কারণে আরাকানের শাসকদের সাথে মুসলমানদের তেমন কোন বিরোধ ছিল না। হিন্দু ও মুসলমানদের উপস্থিতিতে বৌদ্ধরা অন্য ধর্মালম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার চেয়ে সহযোগিতার ভেতর দিয়েই স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করতো। কিন্তু মুসলমানদের উত্তরোত্তর প্রভাব বৃদ্ধির ফলে বৌদ্ধরা আস্তে আস্তে মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করে। তদুপরি রাজা স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর ফলে স্থানীয় বৌদ্ধরা তা মোটেই পছন্দ করেনি। মূলত: রাজা নরমিখলার মুসলিম প্রীতির কারণেই তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে এবং কয়েকজন সামন্ত রাজা নরমিখলার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে অস্বীকার করে সকল রাজাই আরাকানে হস্তক্ষেপ কামনা করে (Collis, M.S. 1995)। এ সময়ে আরাকানে রাখাইন জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বসবাসরত মুসলমানরা 'আরাকানীজ মুসলিম' হিসেবে পরিচিতি পায়।

তখন থেকেই আরাকান রাজ নরমিখলা বাংলার সুলতানদের অনুকরণে মুদ্রায় ফারসি অক্ষরে কালেমা ও মুসলিম নাম লেখার রীতি চালু করেন। তাঁর পরবর্তী রাজাগণ বাংলার অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েও মুদ্রায় ফারসি অক্ষরে কালেমা ও বৌদ্ধ নামের সঙ্গে মুসলিম নাম ব্যবহার করতেন (Collis, 1995)।

এজন্য আরাকানীজ মুসলিমদের সাথে ভৌগোলিক, ধর্মীয়, গোষ্ঠীগত এবং ভাষাগতভাবে এশিয়ার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে সাযুজ্য লক্ষ্যণীয়। আরাকান-চট্টগ্রামের ভৌগোলিক সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্রহ্মদেশের তুলনায় অনেক সহজ, দু'দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নাফ নদীর পারাপার মাত্র। রাজধানী ল্যাঙ্গিয়েতকে (Langgyet) দুর্ভাগ্যজনক জায়গা মনে করে ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দে নরমিখলারসময় আকিয়াব জেলার ম্রোহং (Mrohaung) এ নতুন রাজধানী শহর স্থাপন করা হয়। যা পরবর্তী চারশত বছর ধরে আরাকানের রাজধানী হিসেবে থেকে যায়। এই ম্রোহং এ সিন্ধি খানের মুসলিম সহচরগণ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যার নাম দেন 'সিন্ধি খানের মসজিদ' (Temple, 1925)। সপ্তদশ শতকে আরাকানের রাজধানী ম্রোহং-এ বসবাসকারী বাঙালি কবি আলাওল এর কাব্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষের আরাকানে আগমনের কথা উল্লেখ আছে-

নানান দেশী নানান লোক শুনিয়া রোসাংগ ভোগ
আইসন্ত নৃপ ছায়াতল।
আরবী, মিসরী, সামী, তুরকি, হাবসী, রুমি
খোরাসানী উজবেগী সকল।
লাহোরী, মুলতানী, সিন্ধি, কাশ্মিরী, দক্ষিণী, হিন্দী,
কামরূপী আর বংগ দেশী।
নানান জাতি আছে পুত্তকিস (চৌধুরী, ১৯৮৯)

আরাকানে মুসলিমদের আগমনের শুরুর দিকে নৌ-বাণিজ্যে আরব মুসলিমদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নবম শতক থেকে বার শতকের মধ্যে সুলাইমান, ইব্ন খুরদাদইবিহ্ ও ইদ্রিসীর চট্টগ্রাম-আরাকান অঞ্চলের (রুহমী বা রহমী) রাজনৈতক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এবং ময়নামতির ধ্বংসস্তুপের মধ্যে পাওয়া আব্বাসীয় দিনার ও দিরহাম এই সিদ্ধান্তের সমর্থক। ইসলামের আবির্ভাবের ৫০ বছরের মধ্যে (৬১০-৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ) আরাকান এলাকায় মুসলিমদের আগমন শুরু হয় (Haque, 1978)। এ সময় থেকেই মুসলিমরা আরাকান থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব চীনের ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত নৌ-বাণিজ্য বহর নিয়ে যাতায়াত করত। চীনের ক্যান্টনে মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবির মাজার রয়েছে (Chawdhury, 1995-96)। আরাকান ও চীনের স্থলভাগে মুসলিমরা অনেক মসজিদ ও বাণিজ্য বন্দর স্থাপন করেছিল (Chawdhury, 1995-96)।

আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেই আরাকানের সাথে মুসলিমদের সর্বপ্রথম পরিচয় ঘটে বলে ঐতিহাসিক সূত্রগুলো থেকে জানা যায়। মুসলিম ব্যবসায়ীগণ ভারতের উপকূলীয় অঞ্চল বরাবর এবং এর পূর্বদিকের দেশসমূহেও ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি কিছু স্থানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং বাণিজ্য-কলোনীও স্থাপন করে। বাংলায় স্থাপিত তাদের ব্যবসা-কেন্দ্র থেকে তারা বার্মা, সিংহল, মালাক্কা এবং মালাবারের শহরগুলোর সাথে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত (khan, 1936)। মুসলিম নাবিকগণ নবম শতাব্দীতে বার্মায় প্রথম অবতরণ করে। তাদের কাছে বার্মা নামে যে এলাকাটা পরিচিত ছিল তা নিম্ন বার্মার উপকূলীয় অঞ্চল ও আরাকান (Harvey, 1967)। যদিও

ভৌগোলিক দিক দিয়ে বার্মার অবস্থান ছিল প্রধান বাণিজ্যিক পথগুলোর বহিঃপরিসীমায় তবুও প্রাণবন্ত নৌ-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বার্মা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আবির্ভূত হয়। এর ফলশ্রুতিতে মুসলিমদের বসতি স্থাপনের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। চীনা পরিব্রাজকগণ ৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের দিকেও বার্মা ও ইউনান সীমান্তে পারস্য দেশীয়দের কলোনী দেখতে পেয়েছিলেন। মুসলিম পরিব্রাজকদের মধ্যে তারা পূর্বদিকে পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল, যাদের অধিকাংশ চীন পর্যন্ত পৌঁছে যাবার আশা করেছিল, তাদের মধ্যে কতিপয় পরিব্রাজক বার্মায়ও ভ্রমণে এসেছিল (Fatimi, 1959)।

পারস্যদেশীয় পরিব্রাজক ইব্‌ন খুর্‌ দাদইবিহ্‌ এবং আরবের অধিবাসী সোলায়মানের রচনায় দক্ষিণ বার্মার উল্লেখ রয়েছে। দশম শতাব্দীতে পারস্যদেশীয় পরিব্রাজক ইবনে আল ফকিহ-এর রচনাতেও দক্ষিণ বার্মা সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। আরব ঐতিহাসিক আল মাগদিসী (দশম শতাব্দী) ভারতীয় উপকূল হয়ে বার্মা, মালয় উপদ্বীপ, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং সিংহল পর্যন্ত বাণিজ্যিক তৎপরতার বিবরণ দিয়েছেন। মুসলিম বাণিজ্য কলোনীগুলো ইতিপূর্বে নবম শতাব্দী নাগাদ পেগুতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আরবদের বাণিজ্যতরীগুলো প্রায়ই এখানে ভিড়ত (Khan, 1936)। দক্ষিণ বার্মা, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে আরাকানের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ, ইরাবতী, পেগু এবং টেনাসেরিম নদীর ব-দ্বীপগুলো সে সময়ের মুসলিম নাবিকদের কাছে পরিচিত ছিল যারা পূর্ব সমুদ্রের বন্দরগুলোর সাথে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। নবম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কাল ধরে মুসলিম বণিকদের সাথে বার্মার অব্যাহত যোগাযোগ নিশ্চয়ই কিছু আলামত রেখে গিয়েছিল। এ যোগাযোগের ফলে বর্মী শব্দভাণ্ডারে কিছু আরবি ও পারস্য শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে বিশেষ করে এগুলো ছিল নৌ-চালনাবিদ্যা ও বাণিজ্যিক ব্যাপার সম্পর্কিত। এ সব শব্দের অন্তর্গত কতিপয় শব্দের সমার্থক শব্দ বর্মী ভাষায় দুর্লভ (Shin, 1961)। দৃষ্টান্তস্বরূপ ‘নাখোদা’ উপাধির উল্লেখ করা যায়। ‘নাখোদা’ শব্দের অর্থ “ক্যাপটেন”। ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র ভারত মহাসাগর ব্যাপী বন্দরসমূহে বিদেশী জাহাজ ও বণিকদের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের ‘শাহবন্দর’ অর্থ ‘বন্দর প্রধান’ উপাধি প্রদান করা হত। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন উচ্চ পদস্থ শুল্ক কর্মকর্তা। বর্মী বন্দরগুলোতে প্রধানত আর্মেনীয় এবং মুসলিমরা এ সব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (Khan, 1936)। বস্তুত প্রাচীনকাল থেকেই আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নৌ-বাণিজ্য ছিল আরব বণিকদের নিয়ন্ত্রণে। ভারত মহাসাগরের এক সময় জনপ্রিয় নাম ছিল আরব লেক (Arab Lack) (Hourani, 1963)। আরব বণিকগনের চীন সমুদ্র যাত্রার পথে আরাকানের প্রসিদ্ধ সমুদ্র-বন্দর রামরীতে যাত্রা বিরতি ঘটানো অসম্ভব কিছু নয়। তবে তখন রামরীতে মুসলিমদের সংখ্যা কত তা জানা না গেলেও মুসলিমদের অবস্থান যে সেখানে ছিল তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো আকিয়াবে আরব বণিকদের নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট ‘বদর মোকাম মসজিদ’ (Buder-Mokam)। ফলে মুসলিমদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে (সরকার, ১৯৮৭)। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আরব বণিক ও সুফি দরবেশদের মধ্যে বদরুদ্দিন (বদরশাহ) নামে জনৈক পীর আরাকান অঞ্চলে আসেন এবং ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং তাঁর নামানুসারে আসামের সীমা

থেকে শুরু করে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত নানা স্থানের নাম বদর মোকাম এবং ঐ নামে বিভিন্ন স্থানে মসজিদও নির্মিত হয়েছে (Maung and Luce, 1913)। পরবর্তীতে এই সমস্ত মুসলিম নাবিকগণ বাণিজ্য পেশা পরিত্যাগ করে আরাকানী রমনী বিয়ে করে স্থায়ীভাবে আরাকানে বসবাস শুরু করেন (করিম, ১৯৮০)। অনেকে মনে করে থাকেন মহত ইং চন্দ্রের রাজত্বকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাণিজ্য বহর থেকে ভেসে আসা মুসলিমদের আগমনের পূর্ব থেকেই আরাকানে মুসলিমদের অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তীকালে আরবীয় মুসলিমদের পাশাপাশি পারস্যদেশীয় মুসলিমদেরও আন্তর্জাতিক নৌ-বাণিজ্যে প্রসার লাভ করে। ফারসী শব্দ এক-আব থেকেই আকিয়াব নামের উৎপত্তি।

৫.১.১.৪ ব্যবসা-বাণিজ্যে আরব মুসলিমগণ

আরব মুসলিমগণ আরাকানে নৌ-বাণিজ্যের পাশাপশি ব্যবসা-বাণিজ্যে ও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। সুই লু মঙ (SHWEL-U-MAUNG) আরাকানী জনগোষ্ঠীর সম্প্রদায়গত হিসাবের একটি ছক প্রদন করেছেন। আরাকানের সর্বমোট ৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা বৌদ্ধ, মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিষ্টান দেখিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন, আরাকানের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠি হলো মুসলিম। ১৯৩১ সালের হিসাব মতে, আরাকানের মোট জনসংখ্যার ১৬ ভাগ মুসলিম (Maung, 1989)। বস্তুত আরাকানের সব ধর্ম মতই আরাকানের বাহির থেকে এসে ধীরে ধীরে সেখানে ঠাঁই করে নিয়েছে। মুসলিম জনসংখ্যা বিষয়ে Jaha বলেন,

> *“Arakan is the only Muslim majority provience among the 14 provinces of Burma. Out of the 7 million Muslim population of Buma half of them are in Arakan”* (Jaha, 1994).

বণিক, সৈনিক ও নাবিক হিসেবে তারা আরাকানের গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। তাদের জাহাজ মেরামত করার জন্য কিংবা মৌসুমী বায়ুর অপেক্ষায় ছয় মাসের অধিককাল এখানে অবস্থান করতে হতো। দূরবর্তী বাণিজ্য মিশনে তারা স্ত্রীদের সাথে আনতেন না। পক্ষান্তরে ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে অবৈধভাবে যৌন প্রয়োজন মিটানোও সম্ভব ছিল না বলে তারা স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করত। স্বদেশে ফিরে যাবার সময় আরাকানের স্থানীয় আইনে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল বলে মুসলিম বণিকগণ এখানেই দ্বিতীয় আবাস হিসেবে বসতি স্থাপন করত এবং এ সূত্রে অনেকেই স্থায়ী আবাস গড়ে তুলতো। আবহাওয়া, সমুদ্র ও জলবায়ুর কারণে অনেক জাহাজ বন্দরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হত। অন্যান্য জাহাজগুলোর টাটকা খাবার এবং পানীয় জল অথবা মেরামতের কাজের জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে এ সব বন্দরে প্রবেশ করত এবং এ প্রক্রিয়ায় অনেক মুসলিম নাবিক এ সকল বন্দরে বসতি স্থাপন করে থেকে যায়।

বছরের পর বছর ধরে এরূপ দীর্ঘ সময়ের জন্য অবস্থানের কারণে সেখানে মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বস্তুতঃ বর্মী গভর্ণররা অস্থায়ী বসবাসকারী বিদেশীদের স্থানীয় রমনীদের বিয়ে করার ব্যাপারে উৎসাহ যোগাত, কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় তাদের স্ত্রী বা সন্তানদের সাথে নিয়ে যাওয়া অনুমোদন করত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকেও বিদেশী পর্যটকেরা এ প্রথা

সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন (Khan, 1936)। এসব আরব, পারস্যদেশীয় এবং ভারতীয় মুসলিম বণিকদের বংশধরগণ "বার্মান মুসলিম" সম্প্রদায়ের আদি নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং বর্মী রাজাদের আমলে এরা পাথি বা কালা নামে পরিচিত ছিল (Youle and Burnell, 1903)। এই 'কালা' অর্থ বিদেশী। হিন্দুদেরও 'কালা' বা বিদেশী বলা হতো। কিছুটা মিশ্রবিবাহের ফলশ্রুতিতে এদের সন্তান-সন্ততিদের ক্রমশঃ বৃদ্ধি এবং কিছুটা মুসলিম বণিক এবং অভিযাত্রীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার কারণে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, ধর্মান্তকরণের ফলে বার্মায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ; অভিবাসন এবং মিশ্র বিবাহ সঞ্জাত সন্তান-সন্ততিও কারণ ছিল (Khan, 1936)।

৫.১.১.৫ আরাকানে রাখাইনদের আগমন

আরাকানে রাখাইন জনগোষ্ঠীর বসবাস দীর্ঘ দিনের। ম্রোহং এর ২২ মাইল উত্তরে অবস্থিত প্রাচীন রাজধানী-শহর দিন্নিওয়াদি পেটিকায় স্থাপিত বুদ্ধের মহামুনি মুর্তিটি প্রথম খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকের হতে পারে; আরাকানীরা এটিকে সানদাথুরিয়ার (১৪৬-'৯৮ খ্রি.) (Harvey, 1967) দায়িত্বে ন্যাস্ত করেছিল। আরাকানে আগত ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যে সবার আগে পৌঁছে বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধগণ সেখানে পৌঁছে বার্মার মূল অংশে অর্থাৎ অভ্যন্তরে প্রবেশের আগেই। অতি প্রাচীন কালে মগদ ও আরাকানের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। হিন্দু, জৈন্য ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করার জন্য বহু ব্যক্তি তখন আরাকানে গিয়েছিল এবং কালক্রমে তাঁদের মধ্যে অনেকে আরাকানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু রাজানুগ্রহে একমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম আরাকানে টিকে যায় (Sharif, 1996)। একটি আরাকানী কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে উত্তর ভারতের এক ক্ষত্রিয় গোত্র ব্রহ্মদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। এরা পরবর্তীকালে আরাকানে কয়েক বৎসর রাজত্ব করেছিল। উক্ত কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে নবম শতাব্দীর আরাকানের চন্দ্র বংশীয় নৃপতিবর্গ নিজেদের মগধ বংশীয় বলে পরিচয় দিতে শুরু করেন। চন্দ্র বংশীয় রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং আরাকানের বৈশালী নগর ছিল তার রাজধানী (Thin, 1960)। দশম শতকের পরে আরাকান স্বঘোষিত বৌদ্ধ-অধ্যূষিত একটি দেশ ছিল এবং একই সময় আরব থেকে আগত ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে জাহাজে করে পূর্বদিকে যাওয়ার পথে আরাকানের সমুদ্র বন্দরে প্রবেশ করে। তবে যাদেরকে আমরা মগ বলে জানি, তারা দাবি করছে জাতিগত নামে তারা মগ নয়, তারা রাখাইন। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, ইতিহাসে যাদেরকে আমরা মগ বলে উল্লেখ পাই, তারা কারা? রাখাইন শব্দটি আমরা কিছুটা বিকৃতভাবে হলেও ইতিহাসে পায়। অতীতের লেখকেরা আরাকানীদেরকে মগ বা মঘ নামে অভিহিত করলেও আরাকানীরা এই নাম গ্রহণে অস্বীকার করে। তারা কেবলমাত্র বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্তবর্তী মিশ্র বংশধরদের ক্ষেত্রে 'মঘ' শব্দ প্রয়োগ করতে চায় (Hall, 1950)। তাদের মতে 'মঘ' একটি নিন্দাবাচক শব্দ, যার অর্থ হলো হিংস্র প্রকৃতির লোক (খান, ১৯৮৭)। বস্তুত 'মঘ' নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা জনের নানা মত পরিলক্ষিত হয়। বর্মী 'মঙ' (Maung) থেকে 'মঘ' শব্দের উৎপত্তি অনুমান করা হয়ে থাকে। 'মঙ' হচ্ছে বর্মীদের ধর্মীয় উপাধী (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯)। অতি প্রাচীন কালে (খ্রিষ্টপূর্ব ২২০০-২০০ খ্রিষ্টাব্দ) মগধ থেকে অনেক হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন

বঙ্গে, আরাকানে ও বার্মায় ধর্ম প্রচার ও উপনিবেশ স্থাপন করতে আসে (Phayre, 1844)। এ প্রসঙ্গে আরাকানে বৌদ্ধ ধর্ম অনুপ্রবেশ উল্লেখের দাবীদার। আরাকানী ও বর্মীদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ব্রাক্ষণ্যবাদ, বৌদ্ধ ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম (Mohammadanism)। বস্তুত সমুদ্র যোগাযোগের সুবিধার জন্য প্রথম দিকেই বার্মা ও আরাকানে বৌদ্ধ ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে। বৌদ্ধরা নিজেদের 'মগধী' বলে পরিচয় দিতে থাকেন। মুহাম্মদ ইউনুস বলেন,

> *In Magadah, old Bihar of India, Buddhists were so ruthlessly oppressed by chauvinist Hindus and rival Mahayana sect of Buddhists that large numbers of Hinayana Buddhists had been compelled to flee estward who ultimately found shelter in Arakan under the Chandra kings* (Younus, 1994)

তিনটি মহান ধর্ম পাশাপাশি বিকাশ লাভ করছিল, তখন থেকে উত্তর আরাকানের উপর দিয়ে মঙ্গোলিয়ান আক্রমণ প্রবাহিত হয়েছিল যা ৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু ধর্মের মধ্যে চন্দ্রবংশের অবসান ঘটায়, পূর্ব হিন্দু রাজ্য ভেসালি এভাবে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল। চন্দ্র যুগে এই আক্রমণটি কেবল বন্ধ হয়নি, একই সাথে বাংলার পাল রাজাদেরও উত্থান ঘটে। ভেসালি কখনও পুনরায় উঠতে পারেনি; তবে বাংলায় হিন্দুরা তাদের আধিপত্য ফিরে পেয়েছিল। বর্বর মঙ্গোলিয়ানদের আরও গভীর পার্বত্য অঞ্চলে ফিরিয়ে দিয়েছিল।[৩] কয়েক বছর মঙ্গোলিয়ানরা আগমনের পরে পাঁচ শতাব্দী আরাকানের তিব্বতো-বর্মণদের অন্ধকারের যুগ ছিল।[৪] তবে আক্রমণকারীরা যে দেশটি জয় করেছিল তারা মিশ্র সংস্কৃতিতে শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল এবং দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীতে এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের সাথে শেষ পর্যন্ত একীভূত হয়েছিল। হিন্দু ধর্মের অন্তর্ধানের পরে মঙ্গোলিয়ান এবং তিব্বতো-বর্মণদের মধ্যে কেবল দুটি স্বতন্ত্র জাতি রয়ে গিয়েছিল। রোহিঙ্গা এবং মগরা যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী আরাকানে একসাথে বসবাস করেছিল। D.G.E. Hall মন্তব্য করেন যে, 'মগ' শব্দটি 'মাঙ্গাল' বা মঙ্গোলীয় শব্দের বিকৃতরূপ ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আরাকানের অধিবাসীদের চেহারাগত দিক দিয়ে মিল সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় (Hall, 1968)। বিখ্যাত ভাষাবিদ ড. গ্রীয়ারসনের মতে, মগ শব্দটি ইন্দোচীন জনগোষ্ঠী থেকে আগত (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯)। প্রাচীনকালে মগধ এবং আরাকানের মধ্যে যোগাযোগের কথা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। কিংবদন্তি অনুসারে সেই সময়ে উত্তর ভারতের একটি ক্ষত্রিয় গোত্র আরাকানে অবস্থান করে এবং পরবর্তী সময়ে শাসন ক্ষমতাও গ্রহণ করে। তার অনেক পরে অর্থাৎ ষোড়শ শতকে মা য়া য়ু বংশের রাজত্বকালে আরাকানের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজন্যবর্গ নিজেদের মগধ বংশীয় বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। মায়োউ রাজাদের এই পরিচয় সম্ভবত তদানীন্তন আরাকানবাসির কাছে তাদের নিজেদের অভিজাত হিসেবে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা ছিলো। পরবর্তী সময়ে মায়উ রাজাদের যশ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার কারণে আরাকানবাসী মগ নামে পরিচিত হয়। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক মনে

৩. Arakan's place in the vivilisation of the Bay, JBRS, Vol. II Fiftieth Anniversary Publications No. 2, p. 488

৪. Burma the Golden, designed and photographed by Gunter Pfannmuller, written by Wilhem Klein, First edition p.94

করেন যে, মগধ> মগহ> মগ এইরূপ মগ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। চাকমা রাজা ভুবনমোহন রায় লিখিত চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস গ্রন্থেও আরাকানী এই সম্প্রদায়কে মগ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে দীর্ঘদিন ধরে রাখাইন জনগোষ্ঠীর পাশাপশি বসবাসরত আরাকানের মুসলিম জনগোষ্ঠীরও পরিচয় তুলে ধরা প্রয়োজন।

৫.১.১.৬ ১৭৮৫ সালে স্বাধীন আরাকান রাজ্যের পতন

১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে থামাডা (Thamada) নামক রামরীর জনৈক সামন্ত আরাকানের ক্ষমতা দখল করলে অন্যান্য সামন্তগণ হারি (ঘা-থীন-ডা) (খান, ১৯৭৮) নামক জনৈক সামন্তের নের্তৃত্বে একতাবদ্ধ হয়। আরাকানী রাজা থামাডা সৈন্য বাহিনী নিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মরনপণ যুদ্ধ করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যুদ্ধে বর্মী রাজা জয়ী হন এবং আরাকানকে বার্মার সাথে সংযুক্ত করেন। ১৭৮৫ সালে বর্মীদের আরাকান দখলের পর রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিদ্রোহ, হত্যা ও ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে আরাকানে জনজীবন বিপন্ন ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। থামাডা পরাজিত হয়ে স্বপরিবারে নৌকা যোগে চট্টগ্রামে পলিয়ে যাবার সময় বর্মী সেনাদের হাতে ধরা পড়েন এবং তাঁকে শিরোচ্ছেদ করা হয় (খান, ১৯৭৮)। বোধপায়া আরাকান বিজয় শেষে হারিরির সাথে সম্পাদিত চুক্তি অস্বীকার করে আরাকানকে বার্মার অংশ হিসেবে তাকে রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেবার পরিবর্তে আরাকানের গভর্ণর হিসেবে নিয়োগদান করেন (Harvey, 1967)। এ পর্যায়ে বোধপায়া আরাকানকে রামরী, স্যান্ডুয়ে, ম্রোহং এবং আরাকান এ চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে স্ব-মনোনীত চারজন প্রতিনিধির হাতে আরাকানের শাসনভার অর্পণ করেন। এ সকল প্রতিনিধিগণের রাষ্ট্র শাসন বিষয়ে গৃহিত নীতি, ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বর্মীরাজের অনুমোদন ছিল অত্যাবশকীয় (চক্রবর্তী, ১৯৮৪)। ক্ষমতা লোভী সামন্তদের অনুপ্রেরণায় আরাকানীরা বর্মী সৈন্যদের স্বাগত জানালেও একমাস যেতে না যেতেই আনন্দের পরিবর্তে বর্মী সৈন্যদের বর্বরতা, নির্মম উন্মত্ততা ও পাশবিকতার হিংস্র থাবা নেমে আসে। মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ, অনুন্নত বর্মী সৈন্যরা আরাকানের মুদ্রা ব্যবস্থা ও ব্যবসা বাণিজ্য দেখে হতবাক হয়ে লুণ্ঠন, হত্যা, নির্দোষ মানুষকে বন্দী করে মুক্তিপণ আদায়, এমনকি চরম নির্যাতনের পর আগুনে পুড়িয়ে মানুষকে হত্যা করত। ত্রাণকর্তা হিসেবে এসে বোধপায়া কয়েক বছরেই আরাকানকে দেউলিয়া করে ফেলে (রহমান, ২০০৫)। আরাকান বিজয় সাম্রাজ্যবাদী বোধপায়াকে দিগ্বীজয়ে উৎসাহিত করে এবং ১৭৮৬ সালে বার্মার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রতিবেশী রাজ্য শ্যাম (বর্তমান থাইল্যান্ড) দখলের মনোভাব পোষণ করে (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। এরই প্রেক্ষিতে বোধপায়া আরাকান থেকে প্রচুর লোক, অস্ত্র-সস্ত্র ও রসদ দাবি করে (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। এ সকল দাবীর অর্ধেক পূরণের অঙ্গীকার করলে হারির বড় ছেলেকে স্বপরিবরে রাজ দরবারে ডেকে হত্যা করে। আরাকানের নিহত গভর্ণর হারি (ঘা থিন ডা) এর একমাত্র জীবিত পুত্র সিন পিয়ান (Sin Pian) বর্মীরাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে রুখে দাঁড়ান। এরপর থেকে প্রচুর পরিমানে আরাকানীজ মুসলিম ও রাখাইন বৌদ্ধরা প্রাণ বাচাঁতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে। আরাকান রাজ ওয়েমো চট্টগ্রামের লাহোমরাং, আরাকানী সর্দার এ্যাপালং এবং সিন পিয়ানের তৎপরতা রাজদ্রোহী মনে হলেও তা ছিল মূলতঃ বর্মীদের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধ সোচ্চার প্রতিবাদ (Harvey, 1967)।

মং বা অং নামে একজন রাখাইন লেখক পরিস্থিতিকে এভাবে তুলে ধরেছেন যে, এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবার আশায় এবং হৃত স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নিমিত্তে অসংখ্য রাখাইন এককালে নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত তৎকালীন ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক শাসিত দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে (মং বা অং, ২০১৩)। ফ্রান্সিস বুকানন এর প্রতিবেদনে আরাকানে বার্মীজ আক্রমণকারীদের নির্যাতনের কথা স্পষ্ট ফুটে ওঠে। পুরাণের ভাষ্য মতে বার্মীজরা ১৭৮৫ সালে আরাকান দখলের পর একই দিনে ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার মানুষকে মেরে ফেলে। যখনই কোন সুন্দরি নারী দেখত তখন তার স্বামীকে হত্যা করে তাকে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয় বাবা-মাকে উপেক্ষা করে যুবতি মেয়েদেরকে তারা নিয়ে যায়। এভাবে এই গরিব জনগোষ্ঠী তাদের ভূ-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। এইভাবে পূর্ব ভারতে বৃদ্ধরা বেশীর ভাগই তাদের দূর্বলদের সাহায্য করত। পুরাণকে মারাত্নকভাবে ভীত মনে হয়েছিল কারণ বাংলার শাসক তখন আরাকান থেকে আসা শরণার্থীদের আবার ফিরে যেতে বাধ্য করতে পারে (Buchanan, 1798)।

বাংলাদেশের রাখাইন জনগোষ্ঠী গ্রন্থটির ভূমিকাতে লেখক মং বা অং উল্লেখ করেছেন, ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দেই বর্মীরাজ বোধপায়ার (Bo daw paya) অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে প্রায় ৩ লক্ষাধিক রাখাইন বর্তমান কক্সবাজার জেলা, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা, বরগুনা ও পটুয়াখালী অঞ্চলকে বসতযোগ্য করে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। ১৭৮৪ সালে বর্মী রাজ মং ওয়েইং আরাকান রাজ থামাদা রাজাকে হত্যা করে ১৭৮৫ সালে সমগ্র আরাকানকে দখলে নিলে এবং দখলদার বর্মী বাহিনী আরাকানবাসীর জন্য হত্যা, লুট ও নির্যাতনের মাধ্যমে এক বিভীষিকাময় পরিবেশ গড়ে তুলেন। এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতির থেকে রক্ষা পাবার আশায় এবং হৃত স্বাধীনতাকে পুনরোদ্ধারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহনের নিমিত্তে অসংখ্য রাখাইন এককালে নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত তৎকালীন ব্রিটিশ কোম্পানী সরকার কর্তৃক শাসিত দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে (মং বা অং (মং বা), ২০০৩)। এসকল আরাকানী শরণার্থীদের আগমনের প্রেক্ষিতে ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শরণার্থী পুনর্বাসনকল্পে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সকে (Hiram Cox) প্রথমে তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) ও পরে তত্ত্বাবধায়কের ক্ষমতাসহ কমিশনার নিযুক্ত করে। দায়িত্ব গ্রহণ করে কক্স কলকাতাস্থ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আগত শরণার্থীদের চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জমি ছাড়াও শরণার্থীদের জন্য ৬ মাসের অগ্রিম খাদ্য শস্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।[৫] এছাড়া অনেক ডাচ পর্তুগীজ সন্তান ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হয়েছে-এমন ঘটনা নিয়ে একটি গল্প ডাচ ইতিহাসে পাওয়া যায়। Hall, D.G.E. এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন,

> *This prohibition often constituted a sereious hardship in individual cases and we find Europeans resorting to all sorts of expendients to smuggle their families out of the country. There werer cases of wives being hidden in large*

৫. *Chittagong District Records*, Vol. 484, pp. 153-159, 243-245, National Archibes of Bangladesh, Dhaka, Agargaon.

martban jars and smuggled on board ship. The Pious Dutchcalvinists were also not a little worried because their children left in Arakan were brought up to be Muslims. (Hall, 1960)

১৮০১ সালে জানুয়ারী মাসে পূর্ণিমা দিনের (বুধবার) নব্বই হাজারাধিক রাখাইনকে নিয়ে রাখাইন বিপ্লবী নেতা বোশাং ব্যাইং (কিং বেরিং) চট্টগ্রাম অঞ্চলে চলে আসেন। ১৮১৩ সালে রামু শহরে ব্রিটিশ কোম্পনী সরকারের অধিকর্তা ক্যাপ্টেন ফুগো তাঁর প্রতিবেদনে রামুর পার্শ্ববর্তী ১২ মাইলের ভিতরে লক্ষাধিক রাখাইন উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। ১৮২০ সালে (রাখাইন ১১৯২ অব্দ) ডিসেম্বর মাসে ৭৪টি পরিবারের ৫০০ শতাধিক সদস্য বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে *"বালিয়া তলী"* দ্বীপে চলে আসে। ১৮২২ সালে আরও ৬০টি পরিবারের ৩০০ শতাধিক সদস্য আরাকান ধন্যাবতী হতে বাকেরগঞ্জ এলাকায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। ১৭৯৪ সালের মধ্যেই আরাকানের দুই তৃতীয়াংশ নাগরিক তথা রাখাইন জনগোষ্ঠী স্বদেশের মায়া ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে চলে যায়। শুধু ঐ বছরেই ১০,০০০ হাজার এরও বেশী সংখ্যক রাখাইন জনগোষ্ঠী চট্টগ্রাম অঞ্চলে চলে আসে। ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স কর্তৃক লিখিত ডায়েরিতে "ক্ষুধা ও অসুখে দৈনিক ২০ জন করে রাখাইন শিশু মৃত্যুবরণ, নাফ নদীতে ভেসে থাকা অসংখ্য রাখাইন মৃত দেহ, আরাকান-চট্টগ্রাম সড়কে অসংখ্য লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং মৃত মাতার বুক থেকে দুধ পানরত অসহায় শিশুদের" করুণ কাহিনী বিবৃত করেন (মং বা অং (মং বা), ২০০৩)।

কেবলমাত্র সেনাবাহিনীতে চাকরি করার কারণে নয় বরং প্রশাসনিক পদ অধিকার করেও মুসলিমরা বর্মী রাজদরবারে প্রাধান্য অর্জন করে। রাজা পাগান-মিন (১৮৪৬-১৮৫৩) এর শাসনামলে রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী অমরাপুরার গভর্নর নিযুক্ত করা হয় একজন মুসলিমকে। তাঁকে ব্যাপক ক্ষমতায় ভূষিত করা হয়। এজন্য তাঁকে প্রচুর অর্থ প্রদান করতে হয় (Yule, 1885)। রাজার সফর সঙ্গীদের অংশ হিসেবে দেহরক্ষীদের সাথে মুসলিম খোজারাও থাকত। তারা রাজকীয় বার্তাবাহক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করত (Desai, 1961)। বিদেশের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বর্মী রাজারা ফার্সী ভাষা ব্যবহার করতেন। এ উদ্দেশ্যে তারা মুসলিম দোভাষীদের, যারা ফার্সী ভাষায় উত্তমরূপে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ছিল তাদের রাজধানীতে এবং প্রধান প্রধান শহরগুলোতে রেখে দিতেন (Symes, 1802)। প্রথম অ্যাংলো-বার্মীজ যুদ্ধের সময় (১৮২৪-১৮২৬) ব্রিটিশ এবং বর্মীদের মধ্যে একই ভাবে পারস্য ভাষায় চিঠি আদান প্রদান করা হয় (Desai, 1961)। দ্বিতীয় অ্যাংলো বার্মীজ যুদ্ধে (১৮৫২) বর্মী মুসলিমরাও অংশগ্রহণ করে (Gaffari, 1960)। সর্বশেষ রাজার পূর্ববর্তী বর্মীরাজা মিন ডং (১৮৫৩-১৮৮৭)-এর শাসনামলে রাজার সেনাবাহিনীতে তখনও হাজার হাজার মুসলিম অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তারা বিভিন্ন প্রকার প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত ছিল। মুসলিম পদাতিক এবং গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যরা মিনহলা যুদ্ধে (১৮৮৫) ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে শৌর্য্যের পরিচয় দেয়। এরপর পরই বৌদ্ধ মান্দালয়ের পতন ঘটে ("U Ba U, 1959)। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে বর্মী রাজারা শৈবো জেলায় মায়ুউ-এর সন্নিকটে উঁচু বার্মায় মুসলিমদের আবাসিত করতে শুরু করেন। অদ্যাবধি এ গ্রামগুলোর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

অধিবাসীরা ছিল অধিকাংশ মুসলিম বন্দি, যাদেরকে বিভিন্ন সময়ে সেখানে আনা হয়। পর্তুগীজ ও মুসলিম সৈন্যগণ এবং নাবিকগণ যাদের অধিকাংশ ছিল মুসলিম এবং যারা ডি-ব্রিটো-এর সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিল তাদের সবাইকে বন্দি করা হয় এবং পরবর্তীতে এর বিভিন্ন স্থানে আবাসিত করা হয়। রাজার প্রতি সেবা প্রদানের পারিশ্রমিক স্বরূপ রাজার নিকট হতে তারা ভূমিপ্রাপ্ত হয়। তাদেরকে নিয়মিত প্রাসাদরক্ষী দলের জন্য ১৫০ জন করে গাাদা বন্দুক সজ্জিত সৈন্য সরবরাহ করতে হতো এবং তাদের উত্তরসূরিরাও এ নিয়ম অব্যাহত রেখেছিল (khan, 1936)।

৫.১.১.৭ ব্রিটিশদের আরাকান দখল ও মুসলিম সংগঠন

১৭৮৫ সালে বর্মীরাজ বোধপায়া কর্তৃক আরাকান দখলের মধ্য দিয়ে আরাকানীজ মুসলিমদের নির্যাতিত জীবনের সূত্রপাত ঘটে এবং দীর্ঘ ৪০ বছর ১৮২৫ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের কারণে সতের শতকের আশির দশকে বার্মা তার প্রতিবেশী স্বাধীন রাজ্য আরাকান দখল করলে বিপুল সংখ্যক (মগ-মুসলিম) আরাকানীজ নাগরিক বাংলা ভূখণ্ডে অভিবাসী হয়। এই অভিবাসন আঠারো শতকের আশির দশক থেকে (১৭৮৫ খ্রি.) অব্যাহত থাকে। ব্রিটিশ শাসনামলের কিছুটা সুষ্টু পরিবেশ ফিরে এলেও স্বাধীনতা উত্তর মিয়ানমারে এর বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। বর্মী শাসক গোষ্ঠী ও স্থানীয় মগ'রা মুসলিমদের কল্লা বা ভিনদেশী বলে চিহ্নিত করে নির্যাতনের মাধ্যমে বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করলেও আরাকানীজ মুসলিমরা মূলত আরাকানেরই স্থায়ী নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত। ব্রিটিশ বাহিনী দক্ষিণ দিকে স্যাভুয়ে এবং চেদুবা দখলের জন্য অগ্রসর হয় এবং কিছু নতুন সৈন্য আরাকানে আগমন ঘটলে ও পুনরায় অস্ত্র-সস্ত্র, রসদ আসলে জেনারেল মরিসন বিনা বাধায় দ্রুত সমস্ত আরাকান দখল করেন। ১৮২৬ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই সমগ্র আরাকান ব্রিটিশ দখলাধীনে আসে (Desai, 1961)। ব্রিটিশ কর্তৃক আরাকান জয়ের পর বাংলায় আশ্রয় নেয়া আরাকানীজ উদ্বাস্তুদের ভাগ্যের কিছুটা পরিবর্তন হয়। ব্রিটিশরা আরাকানের পতিত জমির ব্যবহারের প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে ১৮৩৯ সালে আরাকান 'পতিত জমি অধ্যাদেশ আইন ১৮৩৯' এর মাধ্যমে সেখানে আবাদ ও বসতি স্থাপনে আগ্রহী হয়। ব্রিটিশদের কঠোর খাজনা নীতি কিছুটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও ১৭৮৫ সালের পর হতে আরাকান থেকে বিতাড়িত মুসলিম ও মগ'রা সেখানে ফিরে গিয়ে দেশ প্রেমের টানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং অনাহার-অর্ধহারে থেকে পাহাড়ী রোগ ও হিংস্র জানোয়ারদের সাথে যুদ্ধ করে অমানবিক পরিশ্রমের মাধ্যমে শ্রম বিনিয়োগ করে আরাকারেন গভীর অরণ্য পতিত অঞ্চলসমূহ বসবাসযোগ্য করে তোলে (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। তারপরেও সকল মুসলিম ও আরাকানী মগ সেখানে ফিরে যায়নি। কারণ এসময় ভারত উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা একই শ্রেণীর হাতে ন্যাস্ত থাকায় বাংলা ও আরাকানের মধ্যকার যাতায়াত-ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্যাগুলো দূরীভূত হয় এবং কোনো কোনো আরাকানীজ ব্রিটিশ ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এদিকে ব্রিটিশ শাসনামলেও বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আরাকানসহ বার্মায় মুসলিমদের আগমন ঘটে। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বহিরাগত ও স্থানীয় মুসলিমদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য

দেখা যায়। বিশেষ করে আগত মুসলিমরা বাংলা, তেলেগু ও উর্দুসহ নিজ নিজ এলাকার স্থানীয় ভাষায় কথা বলে; পক্ষান্তরে স্থানীয় মুসলিমরা বর্মী ভাষা ব্যবহার করে। এ অবস্থায় স্বকীয়তা বজায় রাখার মানসে অনেকেই সহযোগীতার মনোভাব নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনে অনীহা প্রকাশ করে। অন্যদিকে মগরা অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সুসংবদ্ধ হয় এবং গোপনে মুসলিম বিদ্বেষী কার্যকলাপ শুরু করে (Hall, 1960)। এ অবস্থায় বার্মায় বসবাসরত সকল মুসলিমকে স্থানীয় পরিবেশে অভিন্ন আর্থ- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে সহায়তার লক্ষ্যে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর উ বা আ (U Bah oh) নামক রেঙ্গুনের জনৈক ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্যে 'বার্মা মুসলিম সোসাইটি' গঠিত হয় (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গঠিত তথ্যানুসন্ধান কমিটিসমূহের নিকট এ সংগঠনটি বার্মার মুসলিমদের একক প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন দাবী দাওয়া পেশ করে। বিশেষ করে ১৯১৬ এবং ১৯১৭ সালের শেষভাগে লর্ড চেমস ফোর্ড ভারত শাসন আইন সংস্কারের লক্ষ্যে তথ্যানুসন্ধানের জন্য বার্মায় গমন করেন। তখন এ সোসাইটির পক্ষ থেকে মুসলিমদের বিভিন্ন দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করে আইন পরিষদে (Legislative Council) মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বার্মার গ্রামীণ জীবনে দুর্দিন নেমে আসে। কৃষকরা ধান-চালসহ কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। এ সময়ে ভারতীয় হিন্দু সুদখোর মহাজনরা সেখানকার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে বন্ধকী ব্যবসা শুরু করে। ফলে হাজার হাজার কৃষক সর্বস্ব হারিয়ে ভারতীয় মহাজনদের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্ধ হয়ে শহরে পাড়ি জমায়। কিন্তু শহরের শ্রমিকদের অধিকাংশ ভারতীয় বিধায় তারা বাংলা ও ভারত থেকে আগত মুসলিমসহ সবার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করে (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। বার্মাকে ভারত শাসন আইন থেকে পৃথক করে দেশ শাসনের ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমন্বয়ে (Our Burman Association) একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনের কর্মীরা নিজেদের প্রথমে থাকিন (THAKIN) বলে পরিচয় দেয়। পরবর্তীতে এ সংগঠনটি মুসলিম বিদ্বেষী কর্মকান্ডে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে (Yunus, 1994)। সেখানকার মগ সম্প্রদায়ের সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক এতটা গভীর ছিল যে, স্থানীয় মগ'রা ইয়োমা পাহাড়ের উচ্চ শৃংঙ্গের অপর পাড়ের বৌদ্ধদের চেয়ে প্রতিবেশী আরাকানী মুসলিমদের বেশি আপন মনে করত (খান, ১৯৮৩)। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে গোটা উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সুবাদে বার্মায় থাকিন পার্টির (Thakin Party) নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলে পার্টির নেতৃবৃন্দ আরাকানের মগ নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক গড়ে মুসলিম-মগদের মাঝে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাধীনতা উত্তর আরাকানকে বর্মীভুক্ত রাখার পরিকল্পনা করে। তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মগদের মাঝে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে (চৌধুরী, ১৯৯৪)। ভারতীয় মুসলিমদের প্রথম সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করে ১৯০৮ সালে যা *'The Rander Sunni Bohras Soorti Mohamedan Association'* নামে পরিচিত।

ভারতীয় মুসলিমদের দেখাদেখি আরাকানীজ মুসলিমগণও বার্মায় বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। তবে বর্মী মুসলিমগণ তাদের সংগঠনে ভারতীয় মুসলিমদেরও স্থান দেয়া হয়। যেমন ১৯০৯ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা করা হয় 'দি বার্মা মুসলিম সোসাইটি' (The Burma Muslim Society)। এ সংগঠনটি বহু বৎসর যাবৎ বর্মী মুসলিমদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের একটি স্বীকৃত সংগঠন হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় *'Young Men's Persian Association'* এতে নিখিল বার্মা মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে বার্মার ভারতীয় ও বর্মী মুসলিমরা অংশগ্রহণ করতেন। এরমধ্যে অর্থ-সম্পদ ও কর্মতৎপরতার প্রেক্ষিতে ভারতীয় মুসলিমগণ একটি প্রভাবশালী অংশে পরিণত হয়। তারা সকল মুসলিম স্কুলে শিক্ষাদানের বাহন হিসেবে উর্দুকে আবশ্যকীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা দানের আকাঙ্খা ব্যক্ত করেন। ১৯১৫ সালের প্রথমদিকে এ বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় ও আরাকানীজ মুসলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য শুরু হয়। ঐ বছরই প্রথম আরাকানীজ মুসলিমগণ স্কুলগুলোতে বর্মী ভাষাকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার দাবী জানান এবং তারা এ দাবী অব্যাহত রাখেন (রায়, ২০০৩)। বার্মার ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ছাত্র সমাজের করণীয় নিয়েও চিন্তাভাবনা করেছিলেন। ১৯২১ সালে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রগণ 'রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম ছাত্রসংঘ' প্রতিষ্ঠা করে (Yegar, 1972)। আরাকানীজ মুসলিমগণ প্রায় ১৪ বৎসর যাবৎ তাদের দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নি। ১৯২৯ সালের দিকে মুসলিমদের দু'গোষ্ঠীর মধ্যে ভাঙ্গন ঠেকানোর চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৩১ সালে আরাকানীজ মুসলিম সম্প্রদায় বা জার্বাদী শ্রেণি আলাদা হয়ে নিজস্ব নিখিল বার্মা মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করে। তারা তাদের নিজস্ব ধর্ম বজায় রেখে বর্মী জনসাধারণের সাথে একাত্ম হওয়ার উপর জোর দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই আলাদা সম্মেলন ডাকার সিদ্ধান্ত নেয় (Yegar, 1972)।

৫.১.১.৮ বার্মা প্রদেশ গঠন ও জাপানী শাসন

১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ-ভারত থেকে ব্রিটিশ বার্মা আলাদা হবার পর ব্রিটিশ প্রশাসন Home rule (Local self Government of ১৯৩৭) জারি করে বার্মায় অভ্যন্তরীণ স্থানীয় সরকার গঠনের বিষয় অনুমোদনের মাধ্যমে বর্মী নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানী দিয়ে বর্মীরা ১৯৩৮ সালে রেঙ্গুনসহ নিচু অংশে (Lower Burma) (পারভেজ, ২০১৯) নিধনযজ্ঞ চালিয়ে ৩০,০০০ আরাকানী মুসলিমকে হত্যা করে (খান, ১৯৩৬)। ১৯৪০ সালে মুসলিমদের উপর বৌদ্ধ ধর্ম ও এর প্রচারক গৌতম বুদ্ধের অবমাননার অভিযোগ এনে থাকিন পার্টি নামে বর্মী জাতীয়তাবাদী চরমপন্থী দল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও (১৯৩৯-১৯৪৫ সাল) সময় বার্মার ৩০ সদস্যে নের্তৃবৃন্দ জাপানে গোপনে পালিয়ে গেলে জাপান সরকার এদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয় এবং জাপানের অর্থ, প্রশিক্ষণ ও নিজস্ব তত্ত্বধানে BIA (Burma Independent Army) গঠিত হয় (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। ১৯৪১ সালে জাপানী বাহিনীর সাথে BIA বার্মায় প্রবেশ করে এবং জাপানীরা পরিপূর্ণভাবে বার্মা দখলের পর তাদের ফ্যাসিবাদী রূপ ক্রমশ জনসাধারণের সামনে

প্রকাশ পায়। এ সময় BIAএর কিছু সদস্য জাপানী সেনাবাহিনীর সাথে আরাকানে এলে স্থানীয় মগ'রা আরাকানী মুসলিমদের উপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায় যা '৪২ এর কুখ্যাত ম্যাসাকার হিসেবে পরিচিত (চৌধুরী, ১৯৯৪)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীরা বার্মা ও আরাকান দখল করলেও তাদের আধিপত্য বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ব্রিটিশরা আরাকানে তাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে 'ভাগ কর শাসন কর নীতি' গ্রহণ করে আরাকানী মুসলিম নেতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। আরাকানী মুসলানদের সমর্থন লাভের জন্য বার্মা হতে ক্ষমতাচ্যুত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে আরাকানের মুসলিমদেরকে সম্প্রদায়গত মর্যাদা দানের প্রতিশ্রুতিও প্রদান করে যা প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক বাসস্থানের ইঙ্গিত বহন করে (Yegar, 1972)।

ব্রিটিশদের প্রতিশ্রুতিতে আশান্বিত হয়ে মুসলিমরা ব্রিটিশদের সমর্থন করে এবং গোপনে বিভিন্ন তৎপরতা অব্যাহত রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বার্মা ফ্রন্টের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর 'ভি ফোর্স' (V Force) এর অন্যতম কমাণ্ডার মেজর এ্যান্থনী আরউইন (Anthony Irwin) রচিত '*Burmese Outpost*' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, জাপানী বাহিনীর নিকট থেকে আরাকান পুনর্দখলের জন্য ব্রিটিশদের সার্বিক সহযোগিতায় আরাকানী মুসলিম নেতা আব্দুস সালামের নের্তৃত্বে একটি সশস্ত্র গ্রুপ গঠিত হয় এবং বৌদ্ধ মগ ও তাদের জাপানী দোসরদের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানতে শুরু করায় জাপানী বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের আরাকান পুনর্দখলকে ত্বরান্বিত করে (Irwin, 1946)। ১৯৪৫ সালের জুন মাসে সমগ্র বার্মা ব্রিটিশ দখলে আসে এবং রেঙ্গুণে ব্রিটিশ বাহিনীর বিজয়ী প্যারেডে জেনারেল অং সান এর BNA (Burma National Army) অংশ গ্রহণ করে (Yunus, 1994)। তিনি BNA থেকে পদত্যাগ করে সরাসরি রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে Anti Facist Organization (AFO) প্রতিষ্ঠা করেন। এসময় জেনারেল অং সানকে রেঙ্গুনস্থ ব্রিটিশ গভর্ণর জেনারেলের অধীনে গঠিত অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। সর্ববার্মা ভিত্তিক মুসলিম সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে সিয়াজী উ আব্দুর রাজ্জাক Burma Muslim congress (BMC) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনিই এর সভাপতি নির্বাচিত হন। অত:পর একে Anti Facist peoples Freedom League (AFPFL) এর অংঙ্গ সংগঠনরুপে ঘোষণা দেওয়া হয় (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। তিনি General Council of Burma Muslim Association (GCBMA) কর্তৃক বার্মা সংবিধানে মুসলিমানদের জন্য স্বতন্ত্র অধিকার ঘোষণার দাবীকে অযৌক্তিক বলে অভিহিত করেন এবং এর মাধ্যমে মুসলিমরা স্থায়ীভাবে বার্মার মূলধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে GCBMA-কে BMC-এর পদাংক অনুসরণ করে AFPFL-এ যোগদানের পরামর্শ দান করে (Yegar, 1972)।

৫.১.১.৯ ব্রিটিশ নীতি ও মুসলিমদের সমস্যার সূত্রপাত

বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শ্লোগান ছিল "বার্মা বর্মীদের জন্য"। কিন্তু ব্রিটিশরা প্রচার করে "বার্মা বৌদ্ধ ধর্মালম্বী বর্মীদের জন্য"। একই সাথে ব্রিটিশ সরকার প্রচার করে, "বার্মার মুসলিমরা

হলো বহিরাগত”। ব্রিটিশ সরকারের এ নীতি মুসলিমদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তুলল, যা অতীতে কখনো ছিল না। এন.এম. হাবিবউল্লাহর মতে, প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সরকারই মুসলিম বিরোধী এই সাম্প্রদায়িক চেতনা বার্মার জাতীয়তাবদী আন্দোলনে প্রবেশ করিয়ে দেয় (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। ১৯৪৬ সালের ১৪ জানুয়ারী GCBMA নের্তৃবৃন্দ ব্রিটিশ গভর্ণর সমীপে বার্মা ইউনিয়নের স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়ায় মুসলিমদের অধিকার বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধিকারনামা ঘোষণার দাবি জানিয়ে স্বারকলিপি পেশ করে ব্যর্থ হয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯৪৬ সালের সংবিধানে বার্মায় বসবাসকারী মুসলিমদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে রেঙ্গুনস্থ ব্রিটিশ গভর্ণর জেনারেলের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এতে কর্ণপাত করেন নি। এমন কি মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে স্বাক্ষাৎকার পর্যন্ত দেন নি (Yegar, 1972)।

৫.১.১.১০ প্যানলং সম্মেলন ও আরাকানীজ মুসলিম

ব্রিটিশ প্রদত্ত শর্ত পূরণের জন্য জেনারেল অং সান সারা দেশ ব্যাপী সফর করেন। সীমান্ত ও পাহাড়ী জাতিসমূহ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে বর্মী জাতির সাথে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেও অং সান অবশেষে তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, বার্মার স্বাধীনতার জন্যই প্রাথমিকভাবে সবাইকে ইউনিয়নে থাকতে হবে। অন্যদিকে আরাকানে এসে মগ নেতাদের বুঝাতে সক্ষম হন যে, এ মুহূর্তে স্বায়ত্ত্বশাসনের চিন্তা বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকলেই স্বার্বিক স্বার্থ রক্ষা করা হবে। আরাকানের মুসলিমরা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দুর্বল ও শক্তিহীন হলেই সীমান্ত ও পাহাড়ী জাতিসমূহের শায়ত্ত্বশাসন ন্যাস্ত করা হবে (চৌধুরী, ১৯৯৪)। বার্মার সকল জাতিগোষ্ঠিকে ঐক্যমত্যে আনা এবং স্বাধীনতা উত্তর ভবিষ্যৎ জাতীয় নীতিনির্ধারণ প্রশ্নে আলোচনার্থে জেনারেল অং সান ১৯৪৭ সালের ২-১২ ফেব্রুয়ারী বার্মার সান রাজ্যের অন্তর্গত ‘প্যানলং’ নামক পার্বত্য শহরে প্রথম ‘প্যানলং জাতীয় সম্মেলনে’র আহ্বান করে। সম্মেলনে সীমান্তবর্তী ও পাহাড়ি জাতিসমূহকে আমন্ত্রণ জানালেও আরাকানের মুসলিম জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের কোন প্রতিনিধিকে ‘জাতিসত্তা ও জনগোষ্ঠীর’ প্রতিনিধি হিসেবে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ইতোপূর্বে বার্মাতে এথনিক আইডেনন্টিটি বা নৃতাত্ত্বিক প্রশ্ন প্রয়োজন ছিল না কিন্তু এ সময়ে এর প্রয়োজন দেখা দেয়ায় আরাকানের বুথিডং থেকে নির্বাচিত বার্মা পার্লামেন্টের সদস্য আব্দুল গফ্ফার ১৯৫১ সালে ২০ আগষ্ট *The Guardian Daily* তে একটি প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি আরাকানের মুসলিম অধিবাসীদের ‘প্রথম রোহিঙ্গা’ নামে সম্বোধন করেন (উদ্দিন, ১৯৯৮)।
General Council of Burma Muslim Association (GCBMA) (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫) কর্তৃক বার্মা সংবিধানে মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র অধিকার ঘোষণার দাবীকে অযৌক্তিক বলে অভিহিত করেন এবং এর মাধ্যমে মুসলিমরা স্থায়ীভাবে বার্মার মূলধারা হতে বিছিন্ন হয়ে পড়বে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে উক্ত GCBMA-কে BMC এর পদাংক অনুসরণ করে AFPFL-এ যোগদানের পরামর্শ দান করেন (Yegar, 1972)। আরাকানে ইসলাম প্রচার ও প্রসার এবং মুসলিমদের স্থায়ী বসতি স্থাপনের ইতিহাসের সাথে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে রোহিঙ্গাদের পরিচিতির গভীরতম

সম্পর্ক রয়েছে। আরাকানে আগত প্রথম মুসলিমরা কেউ ছিল আরব অথবা পারসিক বণিক, ভ্রমণবিদ, ধর্মপ্রচারক ও সমরবিদ বা সৈনিক কিন্তু কেউই 'রোহিঙ্গা' ছিল না। তবে খুব সঙ্গত কারণেই দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বাঙালিদের সাথে আরাকানের মুসলিমদের নানা ধরনের সংযোগ এবং অন্তরঙ্গ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটেছিল। ১৯৪৭ সালের 'প্যানলং জাতীয় সম্মেলনে' আরাকানীজ মুসলিমদের কোন প্রতিনিধিকে 'জাতিসত্তা ও জনগোষ্ঠীর' প্রতিনিধি হিসেবে অংশ গ্রহনের আমন্ত্রণ না জানানোর কারণে রোহিঙ্গাদের এতো কালের 'আরাকানীজ মুসলিম' পরিচিতির পরিবর্তে স্বতন্ত্র ও নতুন পরিচয় বিনির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়। ঐতিহাসিক চার্নি মনে করেন, রাখাইন ও মুসলিম উভয়ই আরাকানের অভিবাসী এবং নিঃসন্দেহে তারা বামারদের (বর্মী) আগে এসেছে (Charney, 2005)। তবে আব্দুল গফ্ফার বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে শুরুতে প্রথম 'রোহিঙ্গা' নামে সম্বোধন করলেও ১৯৬২ সালে বার্মার সামরিক জান্তা ক্ষমতা গ্রহণের পর রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর ব্যপক নির্যাতন শুরু করলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো 'রোহিঙ্গা' শব্দটি বিশ্বের দরবারে পরিচিতি পায় (উদ্দিন, ২০১৮)। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো ১৯৮২ সালে এসে বার্মা 'নাগরিকত্ব আইন' করে সেখানে শর্ত দেয়া হয় যে, ১৮২৪ সালের পূর্বে থেকে (ব্রিটিশদের বার্মা দখলের ১৫৮ বছর পর) যারা বার্মায় বসবাস করতেন না, তাঁরা বার্মার নাগরিক নয়বলে একটি আবেশ (ক্ষেত্র) তৈরী করা হলো। তবে ১৯৬২ সালের সামরিক সরকারের সময় থেকেই 'রোহিঙ্গা' বিতর্ক জোরালোভাবে শুরু হয়। ১৯৮২ সালে বার্মা যখন 'নাগরিকত্ব আইন' করে এবং ১৮২৪ সালের আগে থেকে যারা বার্মায় বসবাস করত না, তাদের নাগরিকত্বকে অস্বীকার করে রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত করে। জাতিসংঘের আদিবাসী জাতিসমূহের স্ব-সংজ্ঞায়ন-কে মানদণ্ড ধরে উদ্দিষ্ট আদিবাসীর হাতে আদিবাসী সংজ্ঞা ছেড়ে দিলেও কিছু বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে মতৈক্য হয়েছে যে, সাধারনত কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অনুপ্রবেশ কারী বা দখলদার জনগোষ্ঠীর আগমনের পূর্বে যারা বসবাস করতো (এটা ঔপনিবেশিকতার অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত এবং আমেরিকা, কানাডা, অস্টেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) এবং এখনো করে; যাদের নিজস্ব ও আলাদা সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ রয়েছে; যারা নিজেদের আলাদা সামষ্টিক সমাজ-সংস্কৃতির অংশ হিসেবে পরিগণিত, তারাই আদিবাসী (উদ্দিন, ২০১৮)। এ বিবেচনায় মিয়ানমারে বসবাসকারী বামার ছাড়াও কাচিন, শান, চিন, কারেন, রাখাইন, মন, কাকন ও রোহিঙ্গা ইত্যাদি জনগোষ্ঠী প্রত্যেকে স্বতন্ত্র আদিবাসী হওয়ার দাবী রাখে।

১৯৮২ সালে বার্মা যখন 'নাগরিকত্ব আইন' অনুযায়ী যদি ১৮২৪ সালের পূর্বে বার্মায় বসবাসকারী ব্যক্তি মিয়ানমারের আদিবাসী হয় তাহলেও রোহিঙ্গারা এ সংজ্ঞায় মিয়ানমারের আদিবাসী। কারণ ঐতিহাসিক প্রমাণে দেখা যায় ১৮২৫ সালের ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং তারও পূর্বে ১৭৮৫ সালে বর্মীদের আরাকান দখলের অনেক আগে থেকে সেখানে মুসলিমদের বসবাস রয়েছে। প্যানলং সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, ব্রিটিশদের কাছ থেকে Union of Burma-এর স্বাধীনতা আদায়ের মাধ্যমেই সকল জাতিসত্ত্বার স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত হবে। সর্ব বার্মার সকল জাতির প্রতিনিধিদের

নিয়ে Union of Burma-এর ফেডারেল সরকার গঠিত হবে। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়, স্বাধীনতার দশ বছর পর সান ও কায়া জাতি ইচ্ছা করলে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সুযোগ পাবে। সকল জাতির স্বকীয় অধিকার ঐতিহ্য, ভাষা-ধর্ম প্রভৃতি সুনিশ্চিত করার জন্য ফেডারেল সরকার ওয়াদাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু এক সময়ের স্বাধীন স্বার্বভৌম ঐতিহ্য মন্ডিত রাজ্য আরাকানের মগ প্রতিনিধি সম্মেলনে আরাকানের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে কোন প্রস্তাব কিংবা কোন প্রশ্নই উত্থাপন করেননি; যা অং সান ও মগদের গোপন আতাঁতের রাজনৈতিক কৌশলের ফলশ্রুতি বলেই তৎকালীন নের্তৃবৃন্দসহ অনেকে মনে করেন (Razzaq and Haque, 1995)। প্যানলং সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্বাধীন বার্মা ইউনিয়নের লক্ষ্যে উ চান টুনকে উপদেষ্টা মনোনয়ন করে একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৯ জুলাই মুসলিম নের্তৃবৃন্দের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা চলাকালে জেনারেল অং সান, উ আব্দুর রাজ্জাকসহ সাতজন শীর্ষস্থানীয় নেতা আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে উ নু বার্মার অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হন। ১৯৪৭ সালের ৪ আগষ্ট পুনরায় প্রস্তাবিত সংবিধানে একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসেবে বার্মার মুসলিমদের স্বীকৃতি প্রদানের দাবী জানিয়ে GCBMA বার্মার অন্তবর্তীকালীন সরকারের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী উ নু'র কাছে চিঠি প্রেরণ করেন। অক্টোবরে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির উপদেষ্টা উ চান টুন GCBMA এর সভাপতি বরাবর এ স্বীকৃতির প্রশ্নে প্রেরিত চিঠির উত্তরে উল্লেখ করেন 'বার্মা ইউনিয়নের সংবিধান অনুসারে যে সমস্ত মুসলিম বার্মায় জন্ম গ্রহণ করেছে, বার্মায় লালিত-পালিত হয়েছে, বার্মায় শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং যাদের পিতা-মাতা অথবা পিতা-মাতার যে কোন একজন বার্মার নাগরিক হতে হবে (Yegar, 1972)। সংখ্যলঘু হবার কারণে মুসলিমরা তাদের যে কোন আইন পরিষদে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হবার সুযোগ লাভ করবে না। তাই সংস্থার পক্ষ থেকে সংবিধানের ৮৭নং অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘুদের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থার মত মুসলিমদের জন্যও সংখ্যালঘু হিসেবে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেবার জন্য অনুরোধ জানানো হলেও সরকারীভাবে তা প্রত্যাখ্যান করা হয় (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বার্মায় ভারতীয় ও চীনাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া ১৯৬৩ সালে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প জাতীয়করণ করার সময়েও বিদেশীদের সংখ্যা হ্রাস পায়। সর্ববার্মা ভিত্তিক মুসলিম সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে সিয়াজী উ আব্দুর রাজ্জাক Burma Muslim congress (BMC) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন। অত:পর একে Anti Facist peoples Freedom League (AFPFL) এর অংঙ্গ সংগঠনরুপে ঘোষণা দেওয়া হয় (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)।

৫.১.২ রোহিঙ্গা শব্দের উৎপত্তি, নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও জীবনধারা

রোয়াং তিব্বতি শব্দ যার অর্থ আরাকান, অদ্যাবধি চট্টগ্রাম জেলায় রোয়াং এবং রোয়াইঙ্গা বা রোহিঙ্গা দ্বারা যথাক্রমে আরাকান ও আরাকানের অধিবাসীদের বুঝায় (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৯)। 'রোহিঙ্গা' নামটির উৎপত্তিও রাখাইং শব্দ থেকে হয়েছে। ভাষাবিদগণ দেখিয়েছেন যে, রাখাইং থেকে হয়েছে রোয়াং এবং রোয়াং আরো বিকৃত হয়ে হয়েছে রোহিঙ্গা। রাহমান নাসির উদ্দিন তাঁর-*রোহিঙ্গা নয়*

রোয়াইঙ্গা-অস্তিত্বের সংকটে রাষ্ট্রহীন মানুষ নামক গ্রন্থের ভূমিকায় রোহিঙ্গাদেরকে 'রোয়াইঙ্গা' বলে দাবী করেছেন (উদ্দিন, ২০১৮)। আরাকানের পূর্বতন রাজধানী ম্রোহং শব্দটি বিকৃত হয়ে যদি রোয়াং>রোহাংগ>রোসাংগ শব্দের উৎপত্তি হতে পারে তাহলে 'রোয়াইঙ্গা' শব্দটি বিকৃত হয়ে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। রোহিঙ্গা শব্দের উৎস নিরুপণ করা খুবই কঠিন। প্রায় কাছাকাছি শব্দের যে রেকর্ড পাওয়া যায় তা হলো স্কটিশ ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকানন এর মতে 'বার্মা রাজত্ব' বইটিতে আরাকান মুসলিম বাসিন্দাদের বোঝার জন্য কাছাকাছি একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। তিনি লেখেন যে, বার্মা রাজত্বে কথিত তিনটি ভাষা প্রচলিত ছিল যা হিন্দু জাতির ভাষা থেকে উদ্ভূত। প্রথমটি হলো মুসলিমদের ভাষা যারা দীর্ঘ দিন ধরে আরাকানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে এবং তারা নিজেদের রোহিঙ্গা বা আরাকানবাসী নামে ডাকে (Buchanan, 1799)। যুক্তি দেখানো হয় যে, 'রোহিঙ্গা' শব্দটি রোহাং থেকে এসেছে যা বাংলায় আরাকানকে বোঝায় এবং অন্যভাবে তাদের আরাকানীজ বলা হয়। মাইকেল চার্নি বলেন যে, ১৬শ শতক থেকে আরাকানে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলিম বাঙালিদেরকে বোঝানোর জন্য রোহিঙ্গা শব্দটির ব্যবহার হতো। কিন্তু সতর্কতার সাথে তিনি নির্দেশ করেন যে, রোহিঙ্গা ও রাখাইন পারস্পরিকভাবে একই আদিবাসী গোত্রভূক্ত নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কারণে স্থানীয় এলাকায় তাদের নিবিড়ভাবে জড়িত করে (Charney, 2005)।

রাহমান নাসির উদ্দিন ১৭৯৯ সালে ফ্রান্সিস বুকাননের ব্যবহৃত '*The Classical Journal of 1811*', জার্নাল এ রোহিঙ্গাদেরকে *Rooainga* (Buchanan, 1799) বা 'রোয়াইঙ্গা' বলে ব্যবহার করলেও সরাসরি রোহিঙ্গা বংশদ্ভূত (ইতিহাস ও সংস্কৃতি) লেখকগণ যেমন ডা. মুহাম্মদ ইউনুস, মোহাম্মদ আশরাফ আলম ও আরাকানের সাবেক এমপি এ এফ কে জিলানী এবং রোহিঙ্গা ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষক ড. আবদুল করিম রোহিঙ্গা বিষয়ক লেখনী বা গ্রন্থের মধ্যে নিজেদের লেখনীতে ইংরেজী ভাষায় '*Rohingya*' ও বাংলা ভাষায় 'রোহিঙ্গা' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। সুতরাং বর্তমান পৃথিবী জুড়ে বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত 'রোয়াইঙ্গা'দের প্রচলিত অর্থে 'রোহিঙ্গা' বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। ২০১৭ সালের ২৫ আগষ্টের পর আগত কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প ও আশ পাশে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের সংগঠন 'রোহিঙ্গা অধিকার প্রতিষ্ঠা কমিটি' বাংলাদেশ সরকারসহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট যে ২১ দফা ও সর্বশেষ ৫ (পাঁচ) দফা দাবী (ইসলাম, ২০১৮) উত্থাপন করেছে তাতেও বাংলায় '*রোহিঙ্গা*' এবং ইংরেজিতে '*Rohingya*' শব্দের ব্যবহার করেছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে রোহিঙ্গারা নিজেরাও কিন্তু ১৭৯৯ সালে ফ্রান্সিস বুকাননেরব্যবহৃত '*Rooainga*' বা 'রোয়াইঙ্গা' শব্দ ব্যবহার করেনি। রোঁয়াই, রোহিঙ্গা এবং রোসাঙ্গ শব্দগুলো পরিমার্জিত হয়ে বাঙালি কবিদের কাছে রোসাঙ্গ হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং স্থানীয় জনগণের কাছে রোয়াং হিসেবে পরিচিত হয়েছে। রোয়াং কিংবা রোসাঙ্গ শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ নানামত পোষণ করে থাকেন। রোহিঙ্গা সম্পর্কে Dr. Michael W. Charney গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেন-

"*The earliest recorded use of an ethnonym immediately recognizeable as Rohingyrea is an objervation by Francis Buchanan in 1799. As he explains, a dialect that was derived from Hindi æis that spoken by the Mohammedans, who have been settled in Arakan, and who themselvs Rohingya, or natives of Arakan*"(Charney, 2005)

ড. সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও ড. আহমদ শরীফ প্রমূখ মনে করেন-আরাকানের পূর্বতন রাজধানী ম্রোহং শব্দটি বিকৃত হয়ে রোয়াং>রোহাংগ>রোসাংগ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। চট্টগ্রাম বাসীদের নিকট এমনকি আরাকানের রোহিঙ্গাদের নিকট ম্রোহাং পাথুরী কিল্লা বলে পরিচিত (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। বস্তুত রোমান সাম্রাজ্য, দিল্লি সাম্রাজ্য প্রভৃতির মতো রাজধানী রোসাঙ্গের নামে গোটা আরাকান রাজ্যকে "রোসাঙ্গ রাজ্য" এবং রাজাকে "রোসাঙ্গ রাজ" নামে অভিহিত করা অমূলক নয়। আজও সঙ্খ নদ থেকে টেকনাফ অবধি দক্ষিণ চট্টগ্রাম লোক মুখে 'রোসাঙ্গ' 'রোয়াঙ' এলাকা নামে অভিহিত এবং ঐ এলাকার অধিবাসীরা সামাজিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে উত্তর চট্টগ্রাম বাসীর কাছে রোসাঙ্গী বা রোঁয়াই বলে অবজ্ঞাত (শরীফ, ১৯৮৩)। উল্লেখ্য যে, 'রোহিঙ্গা' নামটির উৎপত্তিও রাখাইং শব্দ থেকে হয়েছে। ভাষাবিদগণ দেখিয়েছেন যে, রাখাইং থেকে হয়েছে রোয়াং এবং রোয়াং আরো বিকৃত হয়ে হয়েছে রোহিঙ্গা। আরাকানের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ ইসলাম ধর্মের অনুসারী; এদের মধ্যে থাম্ভইক্য, জেরবাদী, কামানচি, রোহিঙ্গা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস থাকলেও রোহিঙ্গারা তাদের মধ্যে বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী (চৌধুরী, ১৯৯৪)। এ থেকে বুঝা যায় রোহিঙ্গা মুসলিম নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শেকড় ঐতিহাসিকভাবে আরাকান অঞ্চলে দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে।

৫.১.২.১ বার্মায় রোহিঙ্গা ও জাতীয় পরিচয়

সামরিক জান্তা সরকার দাবী করেছিল যে, তারা এটি করতে বাধ্য হয়েছিল মূলত রাখাইন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের চাপে পড়ে। এর ফলে আরাকানের প্রায় এক মিলিয়নের বেশী মানুষ শুমারীর বাইরে পড়ে যায়। সরকার তাদের অধিকার অস্বীকার করে বাঙালি অভিধায় চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়। এটি ছিল সর্বশেষ অধ্যায় যা বার্মীজ সরকার ও রাখাইন জাতীয়তাবাদী কর্তৃক দশকের পর দশক রোহিঙ্গা নির্যাতনের স্বাক্ষী। সরকার প্রচার করে যে, রোহিঙ্গা হলো মূলত বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ অভিবাসী যারা আরাকান দখল করতে চায়। সাবেক ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ডেরেক টনকিন ব্যাতীত খুব কম লোকই রোহিঙ্গা আদিবাসীর অধিকারকে স্বীকার করতে চেয়েছে। উপনিবেশ ব্রিটিশ আর্কাইবস ঘেঁটে তিনি কোথাও রোহিঙ্গা শব্দটির সন্ধান পাননি (Tonkin, 2014)। প্রথম এ্যাংলো-বার্মীজ যুদ্ধের (১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দ) পূর্বে যখন ব্রিটিশরা বার্মা রাজত্বে আরাকান, টেনাসেরিম, আসাম এবং মনিপুরকে ভারতের নতুন রাজ্য হিসেবে যোগ করে। এটি একটি মৌলিক ধারণাগত কাঠামো যা টনকিন পরিচালনা করেন এবং একই ধারণা নিয়ে রোহিঙ্গা, বার্মীজ ও রাখাইন ইতিহাসবেত্তাগণ বিতর্ক করে চলেছেন। রোহিঙ্গাদের দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি হলো- জাতীয় পরিচিতির ধারণাটি

মৌলিকভাবে ভুল এবং এটি বর্তমান বার্মার সামাজিক বাস্তবতা ও ইতিহাস বুঝতে সহায়তা করে না। রোহিঙ্গা জাতীয়তার বিতর্ক তিনটি ভিন্ন ঐতিহাসিক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। একদিকে রাখাইন ইতিহাস ও বার্মীজ ইতিহাস; অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে অবস্থান করছে রোহিঙ্গা ইতিহাস। আপাত দৃষ্টিতে সকল আদিবাসী এবং জাতীয় জাতিস্বত্তা ইতিহাস বিনির্মাণ করে থাকে তাদের জাতীয়তাবাদী দাবীসমূহকে এগিয়ে নিতে পারে (Hobsbawm, 1990)।

এ ইতিহাস অনেক সময় বাস্তবতার চেয়ে মিথ দ্বারা পূর্ণ করে থাকে। এতে যাকে এক যুগের ঘটনার সাথে অন্য যুগের ঘটনার মিলিয়ে ফেলা ও রহস্যবাদের একযুগের সাথে অন্য যুগের ঘটনার ছোঁয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে অতীতকে ব্যাখ্যা করা হয়, অতীতকে নির্মাণ করা হয় এবং বর্তমান রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য অতীতকে আবিস্কারও করা হয়। বার্মীজ ও রাখাইন জাতীয়তাবাদীরা রোহিঙ্গা বিষয়ে দাবী করেছে যে, তারা ইতিহাসের মিথ্যাচার করেছে নিজেদের দাবী দাওয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এটা সত্য যে, রোহিঙ্গা ইতিহাসবিদগণ বাংলা থেকে আরাকানে শ্রমিক অভিবাসনের বিষয়টি উপনিবেশ আমল থেকেই উপেক্ষা করে আসছে। কারণ ঐতিহাসিক দিক থেকে তাঁরা ভিন্ন দাবী করে আসছে। তারা বলেছে যে, পঞ্চদশ শতকে বেশ কিছু মুসলিম রাজা আরাকান শাসন করেছে। যা ছিল আরাকান ইতিহাসের স্বর্ণালী যুগ। অথবা যারা বর্তমানে রোহিঙ্গা নামে পরিচিত তাদের পূর্বপুরুষরা প্রায় এক হাজার বছর আগে আরাকানে এসেছিল (Razzaq & Haque, 1995)। প্রায় সকল বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আরাকানে রোহিঙ্গা উৎসটি খুব বেশি সাম্প্রতিক। রাখাইন ও বার্মীজ ইতিহাসবিদদের দাবী অনুসারে মুসলিম রাজাদের ধারণাটি একটি ভুল ধারণা কিংবা সত্যকে বিকৃত করা। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে কিছু বৌদ্ধ রাজা আপত: মুসলিম উপাধি ধারণ করেন, কারণ তারা বাঙলা রাজের মডেলকে অনুসরণ করতে চেয়েছেন। যেমনটা হয়েছিল কেন্দ্রীয় বার্মার রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে (Charney, 2000)। ইতোমধ্যে রোহিঙ্গা ইতিহাসকে বিকৃত করে রাখাইন ইতিহাসবিদগণ উপনিবেশ যুগের আগেই যে আরাকানে মুসলিম বাস করত তা তারা খাটো করে দেখেছেন বা একেবারেই অস্বীকার করেছেন এবং তারা গুরুত্ব দিয়েছেন বাঙালি শ্রমিক অভিবাসনের উপর (Chan, 2005)। রাখাইন নের্তৃবৃন্দ বলতে চাচ্ছেন যে, অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীগণ বার্মায় এসেছে এবং এই ধারা অব্যাহত থেকেছে ২০১২ সালে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের আগ পর্যন্ত। তাদের এই অভিযোগটি সন্দেহজনক ও ভিত্তিহীন যার বাস্তববিক প্রমাণ নেই। অথচ আমরা ইতিহাসের ঐক্য ও চলমানতা দেখতে পাই হাজার বছর ধরে যা শুধু বিঘ্নিত হয়েছিল দ্বন্দ্বাত্বক উপনিবেশ আমলে।

২০০২ সালে সামরিক প্রধান থান শোয়ে দাবী করেন যে, “আমাদের পূর্ব পুরুষদের ঐক্য ও দূরদর্শীতাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যার কারণে আমরা একটি একক ও ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে ২০০০ বছর ধরে টিকে আছি” (SPDC, 2002)। ইতিহাসের এই বিভ্রাট শুধু রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি নয় বরং বার্মায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বিকৃত ইতিহাস পাঠদান চলছে। মাধ্যমিকের বইগুলোও এই মিথ্যাচারে পূর্ণ। আদিবাসী ও জাতীয় জাতিসমূহ পিউয়ুস, মন, পালাউ, কারেন, থেট, শান,

আরাকান, কামান, শান সংহতির সাথে মিয়ানমার জাতি নির্মাণ করে (Myanmar Ministry of Education, 2006)। এই অস্বাভাবিক জোড়ালো দাবীর কারণে রাষ্ট্র বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সকল আদিবাসী গোষ্ঠী বামার নিয়ন্ত্রণে ১৯৬২ সালে নে উইন এর সামরিক অভ্যুত্থানের বার্মীজ সেনাবাহিনীর অভিবাবকত্ত্ব মেনে নেয়। এই প্রেক্ষাপটে সামরিক জান্তাগণ নিজেদেরকে বার্মীজ রাজাগনের উত্তরাধিকারী দাবি করে আসছে এবং ব্রিটিশ কর্তৃক বিচ্ছিন্ন বার্মাকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই যে, বার্মায় ব্রিটিশ উপনিবেশ একটি বড় রকমের ধাক্কা দিয়েছিল সামাজিক শৃংঙ্খলার প্রতিটি ক্ষেত্রে যা তারা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ব্রিটিশরা প্রতিটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে গুড়িয়ে দিয়েছিল যা কেন্দ্রীয় বার্মার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল (Myint, 2001)। সেখানে এমন কিছু চাপিয়ে দিয়েছিল যা বার্মীজরা বুঝতে চাইত না বা মেনে নিতে অস্বীকার করত। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে বার্মায় কোন ভাবেই একক রাজনৈতিক শৃংঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা ছিল না। এমন কি কেন্দ্রীয় বার্মাও একক রাজনৈতিক নের্তৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হতো না (Lieberman, 2003)। ২০১৪ সালের শুরুতে মিয়ানমার সরকার জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল হতে প্রথমবারের মত সহায়তা নিয়ে আদমশুমারী শুরু করে। শুরু থেকেই এই শুমারী অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল কারণ কতগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রথম দিকেই সতর্ক করেছিল আদিবাসী জনসংখ্যার ইস্যুটি দ্বন্দ্বসৃষ্টি করতে পারে (Ethnicity without Meaning, 2014)। কিন্তু মিয়ানমার সরকার নিশ্চিত করেছিল যে, প্রত্যেককে তাদের আদিবাসী জাতিসত্ত্বার আলোকে চিহ্নিত করা হবে। কিন্তু জরিপ শুরু হলে তারা (মিয়ানমার সরকার) তাদের কথা রাখেনি। বরং ঘোষণা করেছিল যে, আরাকানের মুসলিমদের ‘রোহিঙ্গা’ নামে চিহ্নিত করা যাবে না।

৫.১.২.২ বার্মার মুসলিম জাতি গঠন:

‘মিয়ানমারের নাগরিকরা’সেখানে বসবাসরত মানুষ হিসেবে, সংকীর্ণ অর্থে ‘জাতিগত বার্মীজ’ নামে পরিচিত। বামার শব্দটি অন্তর্ভুক্ত ‘বামার’ জাতি এবং ধর্ম উভয়ই বোঝায়। সেই হিসেবে বামার মুসলিম একটি স্ব-সংজ্ঞায়িত শব্দ এবং এটিও নির্দেশ করে আদিবাসীরা যারা মিয়ানমারের ঐতিহ্য ও রীতিনীতিকে সম্মান করে ইসলাম অনুশীলন করে। তারা শেষ ঔপনিবেশিক আমলে বামার মুসলিম হিসাবে চিহ্নিত করতে শুরু করে। দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৮৯% বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সমস্ত জাতিগত বর্মিদের ৯৮% (Immigration and Manpower Department, 1986) কেবল বার্মীজ জাতিগত গ্রুপ এবং যেখানে এটি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশ্বাসেরও পরিচায়ক জাতিগত গোষ্ঠী। একইভাবে, মিয়ানমারের সংস্কৃতি যা বামার মুসলিমরা সম্মান করে, তার উপর ভিত্তি করে বৌদ্ধ এবং জাতিগত বার্মীজ সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে আছে। মিয়ানমারের অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন যে মুসলিমরা তাদের ধর্ম এবং জাতিগত উৎসের কারণে বিদেশী রীতিনীতি অনুশীলন করে। ১৯৮৩ সালের আদমশুমারি অনুসারে, দেশের ৩.৯% (আনুমানিক ১,৩০০,০০০ মানুষ) জনসংখ্যা সে সময় মুসলিমান ছিল (Immigration and Manpower Department, 1986)।

১৯৯৩ সালে একটি পৃথক সরকারী প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়েছিল সংখ্যা ছিল ৩.৭৯% (১,৬২০,২৩৩ জন) হিসাবে একই চিত্র ছিল (Kakweyei Wungyihtana, 1997)। তবে, মুসলিম সম্পর্কে কথা বলার সময় মিয়ানমারে জনসংখ্যা, সরকারী পরিসংখ্যান এবং প্রকৃত কিনা তা বলা কঠিন। সংখ্যা অনুসারে যখন মুসলিমদের সাথে সাক্ষাৎকারগুলো বিবেচনা করছিলেন এবং যারা আগে থাকতেন মিয়ানমারের জান্তার সাথে সংযুক্ত এবং এর দ্বারা প্রকাশিত মুসলিম জাতীয় পঞ্জিকায় হলো *Regional Islamic Da'wah Council of Southeast Asia & the Pacific (RISEAP)* (Berita Publishing Sdn. Bhd., 1996), দেশের মুসলিম জনসংখ্যা খুব কম সময়ে ১০% হয়। সর্বশেষ আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মার্চ, ২০১৪ সালে। অনেক মুসলিম ভারতীয় অভিবাসীদের মধ্য থেকে আগত যারা এ বার্মায় এসেছিল ঔপনিবেশিক আমলে। আবার মুসলিম এবং বর্মী বৌদ্ধ (বা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর বৌদ্ধ) এর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে জন্মগ্রহণকারী লোকও ছিল। কেউ কেউ মুসলিমদের কাছ থেকে যারা দেশে বণিক হিসেবে বসতি স্থাপন করেছিলেন বা বার্মীজ রাজবংশের যুগে বন্দী হিসাবে নেওয়া হয়েছিল। একটি ইসলামী সংস্থা অনুসারে (Islamic Religious Affairs Council HQ, 2003), মিয়ানমারে মোটামুটি চারটি গ্রুপে মুসলিম রয়েছে-

(১) প্রথমটি হচ্ছে রোহিঙ্গা এবং কামানরা। যদিও রোহিঙ্গারা দাবি করেছেন যে তারা হচ্ছেন দেশের অন্যতম আদিবাসী গোষ্ঠী। যদিও মিয়ানমার সরকার তাদের 'রোহিঙ্গা' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। তবে 'বাঙালি' শব্দটি ব্যবহার করে এবং উল্লেখ করে যে অনেক বাঙালি অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে আসা অভিবাসী। কামানদের সরকারীভাবে স্বীকৃত অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৩৫ টি আদিবাসী দলে। তাদের ধর্মের কারণে, যা তারা রোহিঙ্গাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছে, ২০১২ সালের জুনে রাখাইন রাজ্যে দাঙ্গার পর থেকে তারাও অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। (২) দ্বিতীয় দলটি হলো পান্থেয় মুসলিম, যারা চীন থেকে এসেছিল। (৩) তৃতীয় দলটি হলেন পাশু, যারা মালয়েশিয়ার মুসলিমদের মধ্য থেকে আগত। (৪) চতুর্থ দলটি হলো 'অন্যান্য' মুসলিম, যাদের অনেকেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত; তারা সারা মিয়ানমারে সমস্ত মুসলিমদের অর্ধেকেরও সংখ্যায় বেশি বাস করে। এরমধ্যে বেশিরভাগ রোহিঙ্গা এবং কামান রাখাইন রাজ্যে বাস করে। সময়ের সাথে প্রথম এবং শেষ গ্রুপ মিয়ানমারে সমস্ত মুসলিমের ৯০% এরও বেশি প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে। পান্থেয় এবং পাশু বেশ ছোট সংখ্যালঘু মিয়ানমারের বেশিরভাগ মুসলিম ইসলামের সুন্নি শাখা অনুসরণ করে এবং বিশ্বাসে দুটি প্রধান সম্প্রদায় (সুন্নি এবং শিয়া) এর মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ়। বামার মুসলিমরা স্বীয় পরিচয় দেয়, মিয়ানমার বা বামার সংস্কৃতি গ্রহণ করে এবং ধর্ম ছাড়া বার্মিজের সাথে বৈশিষ্ট্যসমূহ মিলে যায়। ঔপনিবেশিক আমলে যারা বার্মায় এসে পৌঁছেছিল এবং ভারতীয় রক্ষণাবেক্ষণকে 'ভারতীয় মুসলিম' বলা হয় ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি এবং রীতিনীতির কারণে। মুসলিমরা বামারদের চেয়েও বেশি প্রভাবশালী হয় এবং যারা বার্মীজ রাজবংশের সময় থেকে এই দেশে বসবাস করেছিল তাঁরা আদিবাসী হয়ে ওঠে। বামার মুসলিমদের উপর ঐতিহাসিক উপকরণে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক সময়কালে নিম্নলিখিত দুটি বই অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটি HboChey নামের একজন লেখক ১৯৩৯ সালে "*Old*

Biography of the Bamar Muslims," বা 'বামার মুসলিমদের পুরাতন জীবনী কাহিনী লিখেছিলেন (HboChey, 1939)। দ্বিতীয়টি হলো Mya কর্তৃক লিখিত "*Summary of the History of the Bamar Muslims,"* বা 'বামার মুসলিমানদের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ', (Mya (1), Asoya Sheinei U, 1939); যা HboChey তাঁর বইয়ের উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা হয় মায়া (Mya) ১৯৩০-এর দশকে উল্লিখিত দ্বিতীয় বইটি লিখেছিলেন। এ উভয় বইয়ের মধ্যে যুক্তি রয়েছে কেন বামার মুসলিমরা তাদেরকে এ জাতীয় হিসেবে উল্লেখ করেছে। মায়া ব্যাখ্যা করেছেন যে, বামার মুসলিমরা বার্মীজ হিসেবে চিহ্নিত, কারণ তাদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বর্মি বৌদ্ধরা বাস করেছে এবং বার্মীজ রাজাদের ধারাবাহিক প্রজন্ম বামার মুসলিমদের অধিকার প্রদান করেছে; যা বার্মীজদের দেওয়া সমান সম্মান দিয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা (Mya (1), 1939)। মায়া এবং এইচবিও চে উভয়ের সাথে কথোপকথনের অনুরূপ প্রতিকৃতি আঁকেন বার্মীজ রাজা। উভয় লেখকই বার্মীজ রাজবংশের মতো অন্যান্য উৎস থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন বার্মার অ-বার্মিজের ইতিহাস এবং বিবরণ (বেশিরভাগ ইউরোপীয়ান দ্বারা), যা মুসলিম এবং বিভিন্ন বার্মীজ রাজবংশের মধ্যে যোগাযোগ প্রদর্শন করে এবং কীভাবে মুসলিমরা বার্মীজ সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল তা দেখান। মায়া এবং এইচবো চে দুজনেই তা বোঝাতে চেয়েছেন মুসলিম ও বার্মার রাজাদের মধ্যে সম্পর্ক কেবল বানোয়াট গল্প নয়। এছাড়াও, মায়া ব্যাখ্যা করেছেন: [ঔপনিবেশিক সরকার] একতরফা ধারণাটি ছড়িয়ে দিয়েছিল যে কেবল বৌদ্ধ বার্মীজ জাতিগত গোষ্ঠীগুলো বার্মীজ হিসেবে বিবেচিত হতো। বামার মুসলিম নির্বিশেষে চিহ্নিত হতো-

> যারা বার্মায় জন্মগ্রহণ করে, বার্মায় বাস করে, বার্মীজ ফ্যাশনে পোশাক পরে, বার্মীজ ভাষায় কথা বলে এবং বার্মায় তাদের পুরো জীবন ব্যয় ও বার্মীজ বলে দাবিকরে, তারা হয় পাদি, কালার, জেই (জেরবাদী) এবং [মিশ্রিত রক্তের লোক] নামে পরিচিত। কিন্তু এই সমস্ত লেবেলসম্পূর্ণ ভুল ছিল (Mya (1), 1939)।

এইচবিও চে তাঁর গ্রন্থে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন বামার মুসলিমরা কেন তাদেরকে অনুসরণ করেন যেমন: "আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ধর্ম এবং জাতিগত বিষয়পৃথক। [অংশসমূহ অনুচ্ছেদটি বাদ দেওয়া হয়েছে] আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা বিভিন্ন ধর্মের হলেও বর্মার জন্মভূমিতে সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য আমাদের অবশ্যই একটি জাতিগত গোষ্ঠী হিসাবে একত্রিত হওয়া এবং একটি জাতি হিসাবে একক ঐক্যফ্রন্ট গঠন করতে হবে (Mya (1), 1939)।"

৫.১.২.১ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিকাশ

৫.১.২.১.১ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও ঐতিহাসিক উপাদান

আরাকানের অধিকাংশ মুসলিমরা তাদের মাতৃভূমিকে আরাকান নামে অভিহিত করে; তবে কিছু সংখ্যক মুসলিম তাদেরকে 'রোয়াইগ্যা' নামে পরিচয় দেয়। কেননা তারা দাবী করে যে, 'রাখাইন' সম্প্রদায় থেকে তারা সম্পূর্ণ পৃথক এবং তাদের কৃষ্টি সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে আলাদা। একথা তাদের নিকট পরিস্কারভাবে জানা নেই যে 'রাখাইন' কোন সম্প্রদায় বা ধর্মবলম্বী বিশেষের নাম নয়, একটি

দেশের নাম (Sharif, 1996)। সংবিধান প্রণয়ন কমিটির উপদেষ্টা উ চান টুন GCBMA এর সভাপতি বরাবর এ নিজেদের স্বীকৃতির প্রশ্নে ব্যার্থ হয়ে নিজেদের '*Rooainga*' বা রোয়াইঙ্গা বলে পরিচয় দেয়'। এই বার্মীজ মুসলিম বা আরাকানীজ মুসলিম জনগোষ্ঠী বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে আত্মপরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং বুচিডং থেকে নির্বাচিত বার্মার পার্লামেন্ট সদস্য রোহিঙ্গা নেতা উ আবদুল গাফফার রোহিঙ্গা পরিচয়ে এই প্রথম **১৯৫১** সালে লিখিত নিবন্ধে নিজেদের দাবী উত্থাপন করে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে বর্তমানে বহুল প্রচলিত এই রোহিঙ্গা তাহলে কারা? সুতরাং এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অবস্থান পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে রোহিঙ্গা সংকটের উৎস কি, কোন ঐতিহাসিক দাবীর প্রেক্ষিতে তাঁরা আজ রোহিঙ্গা হলো? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে রোহিঙ্গাদের নৃ-গোষ্ঠীগত ও ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এই রোহিঙ্গা পরিচিতিকে স্পষ্ট করা হবে যুক্তিযুক্ত। আরাকানের ইতিহাস বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. জ্যাকস পি লেইডার দুই দশক ধরে ঐ অঞ্চলের ওপর গবেষণা করে আসছেন। এক সময় তিনি রেঙ্গুনে অবস্থিত *'রিজিওনাল সেন্টার ফর হিস্ট্রি এ্যাণ্ড ট্রাডিশন'* এ কর্মরত ছিলেন। তিনি থাইল্যাণ্ড ও মিয়ানমারে বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক ইরাবতী ম্যাগাজিনে ২০১২ সালে এক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তাঁর মতে, রোহিঙ্গা শব্দটি প্রথম দেখা যায় আঠারো শতকের শেষভাগে এক ইংরেজ প্রণীত মেডিকেল রিপোর্টে। মোশে ইয়েগারে প্রত্যক্ষ বিবরণ থেকে পাওয়া যায় যে, গ্রামাঞ্চলে এবং রাজধানীতে মুসলিমদের খুব অল্প দেখতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে তাদের দীনহীন মসজিদগুলোর সন্ধান পাওয়া যায় যে গুলোর আশেপাশে দেখা যায় পাঁচ কি ছয়টি করে পরিবার বসবাস করে। রাজধানীতে তাদের মসজিদগুলোর সংখ্যা সম্পর্কে আমাকে ভিন্ন ভিন্ন পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনা মতে এগুলোর সংখ্যা চল্লিশ আবার ভিন্ন বর্ণনামতে এগুলোর সংখ্যা একশত বিশ। আমার মনে হয় প্রথমোক্ত বর্ণনাটাই সত্যের কাছাকাছি (Yegar, Moshe, 1072)।

বর্তমানের রোহিঙ্গা সমস্যা প্রকৃতপক্ষে বর্মীদের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত সমস্যা। বিভিন্ন প্রামাণ্য ধারণা থেকে জানা যায়- **এক.** নৃতাত্ত্বিক ধারণা অনুযায়ী, যদি একদল জনগোষ্ঠীর সদস্য ঐ বিশেষ জাতির পূর্বপূরুষদের উত্তর পুরুষ, ঐ বিশেষ জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তাঁরা ধারণ-বহন-পালন করে এবং তারা একই চেতনায় ঐ বিশেষ জাতির সাথে নিজেদের সংযুক্ত এবং সম্পৃক্ত বোধ করে, তখন তাদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে শনাক্ত করা যায়। স্বনামধন্য নৃবিজ্ঞানী ফ্রেডরিক বার্থ এর মতে, যখন একদল জনগোষ্ঠী মনে করে তারা একটি আলাদা ও স্বতন্ত্র নৃগোষ্ঠী, যাদের একটা নিজস্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার আছে এবং তারা সকলে নিজেরা একটি নির্দিষ্ট নৃগোষ্ঠীর সদস্য বলে আত্মীকভাবে অনুভব করে এবং অন্য নৃগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের তাই মনে করে, তখন তাদের এটিই নৃতাত্ত্বিক পরিচয়। **দুই.** একটি রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে বসবাসকারী একদল জনগোষ্ঠী যারা সাংস্কৃতিকভাবে সংখ্যালঘু, যাদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে যা জনতাত্ত্বিক সংখ্যাগুরুদের সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র এবং যাদের একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে এবং যারা রাষ্ট্রের কাঠামোয় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক

প্রান্তিক তারাই আদিবাসী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে। এ বিবেচনার মিয়ানমারে বসবাসকারী বামার ছাড়া কাচিন, শান, চিন, রাখাইন, মন, কাকন, রোহিঙ্গা প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী এক একটি স্বতন্ত্র জাতি হওয়ার দাবী রাখে। **তিন.** ভূমিলোকের ধারণা দিতে গিয়ে ডাচ নৃবিজ্ঞানী নেল ভান্দাকেরখোবে উত্তর-পূর্ব ভারতের আসামের উপজাতি এবং আদিবাসীদের ভূমিলোক হিসেবে প্রমাণ করতে গিয়ে ভূমিলোকের তত্ত্বায়ন করেছেন। যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই ভূমিতে জন্ম এবং মৃত্যুবরণ করে, সেই সে ভূমির সত্যিকার ভূমিলোক। তার কাছে সে ভূমির আইনগত মালিকানা আছে কি নেই তা তখন বিবেচ্য বিষয় নয়। কেননা কয়েক প্রজন্মের বসত ভিটার ওপর তার এমনিই অধিকার জন্ম নেয় (উদ্দিন, ২০১৮)। রাহমান নাসির উদ্দিন এর মতে, যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে রোহিঙ্গারাই হচ্ছে আরাকানের সত্যিকার ভূমিলোক। কেননা, তারা সেখানে শত শত বছর ধরে বসবাস করছে, তাদের উত্তর-প্রজন্মও শত শত বছর ধরে বসবাস করছে এবং তাদের উত্তর প্রজন্মও সে ভূমিতে জন্ম নিয়েছে এবং লালিত-পালিত হচ্ছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে রোহিঙ্গারা আরাকানের ভূমিলোক। ব্রিটিশ আমলে বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রভূমি ছিল রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৬ সালে 'অল বার্মা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন' এর সহ-সভাপতি ছিলেন এম এ রশিদ এবং এই কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন (বর্তমান অং সান সু চি'র পিতা) অং সান। বার্মার সংবিধানের অন্যতম খসড়াকারী ছিলেন এম এ রশিদ। পরবর্তীকালে তিনি দেশটির শ্রমমন্ত্রী হন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রোহিঙ্গারা যদি বার্মার ভূমিলোক না- হন, অবৈধ অভিবাসী হন, তাহলে একজন রোহিঙ্গা কিভাবে জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন এবং একটি দেশের শ্রমমন্ত্রী হন। এম এ রশিদের মতোই অং সানের আরেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন আবদুল রাজ্জাক। যিনি অং সানের সাথে ১৯৪৭ সালে ১৯ জুলাই আততায়ীর গুলিতে মারা যান। এই আবদুল রাজ্জাক ছিলেন বার্মা মুসলিম কগ্রেসের সভাপতি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি রোহিঙ্গারা বার্মার নাগরিক না হন এবং বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অভিবাসী হন, তাহলে আবদুল রাজ্জাক এর মতো একজন মানুষ কিভাবে বার্মা মুসলিম কংগ্রেসের সভাপতি হন। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম এসোসিয়েশন গঠন করা হয়েছিল। শুধু পড়াশুনা নয়, রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে পড়াশুনা ও মুসলিম এসোসিয়েশনের মতো সংগঠন করার অধিকার পায় এবং তার নেতৃত্ব দেয়। এছাড়া ১৯৪৮ সালে বার্মার স্বাধীনতার ঠিক পূর্বমুহূর্তে ১৯৪৭ সালের নির্বাচনে এম এ গাফ্‌ফার এবং সুলতান আহমেদ পার্লামেন্টের মেম্বার নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫১ সালে সাধারণ নির্বাচনে পাঁচ জন রোহিঙ্গা তৎকালীন বার্মার পার্লামেন্টের মেম্বার নির্বাচিত হয়েছিলেন। তদের মধ্যে একজন ছিলেন জুরা বেগম। তৎকালীন বার্মার নির্বাচিত প্রথম দু'জন নারীর মধ্যে একজন ছিলেন এ জুরা বেগম। ছয়জন এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৫৬ সালের সাধারণ নির্বাচন ও পরবর্তী যেসব উপনির্বাচন হয়েছিল। তখন দেশটিতে ১৯৯০ সালে যে সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল, তাতে রোহিঙ্গাদের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমক্রেটিক পার্টি ফর হিউম্যান রাইটস চারটি আসনে জয়ী হয়। সুলতান মাহমুদ একজন রোহিঙ্গা রাজনীতিবিদ। তিনি বার্মা সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অথচ মিয়ানমার

বলছে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক নয়। এটা ইতিহাসের এক চরম মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয় (উদ্দিন, ২০১৮)। রোহিঙ্গাদের সাথে ভৌগোলিক, ধর্মীয়, গোষ্ঠীগতভাবে এবং ভাষার দিক দিয়ে এশিয়ার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় যা তাদের বর্ণ সংঙ্কর পরিচয়কে স্পষ্ট করেছে।

৫.১.২.১.২ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বর্ণ সংঙ্কর ধারা

১. জাহাজ ডুবি থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত 'রহম' শব্দ উক্তিকারী আরব নাবিকদের বংশধরেরাই আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্র। পরবর্তীকালে 'রহম' শব্দ বিকৃত বা বিবর্তিত হয়ে রোমাই-রোঁয়াই-রোয়াইঙ্গা নামের উৎপত্তি (চৌধুরী, ১৯৯৪)।

২. আরাকানে বসতি স্থাপনকারী 'রোহা'র (Roha) অধিবাসীদের বংশধরগণই আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্র। তবে জহির উদ্দিন আহমদ ও নজির আহমদ রোয়াইঙ্গা গোত্রের উদ্ভব সম্পর্কে বলেন, বখতিয়ার খলজীসহ বাংলার মুসলিম বিজেতাগণ, বাংলা থেকে যে সমস্ত মুসলিমকে আরাকানে পাঠিয়েছিলেন, তারা ছিলেন মূলত আফগানিস্তানের 'ঘোর' প্রদেশের রোহা (Roha) জিলার অধিবাসী। উক্ত রোহার মুসলিমরা আরাকানের রোহাং নামকরণ করেছিলেন। আরাকান ও চট্টগ্রামে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষায় সাধু ভাষার শ-ষ-স মৌখিক উচ্চারণে 'হ' হয়। হাত-সাত-হালা-শালা, হিয়ঁর-শিয়র (মূল), হিল-শিল (পাথর) হাই-সাই (মঘী), হেত-শেত (মঘী)। সুতরাং রোহাং, রোসাং অভিন্ন শব্দের ভিন্ন উচ্চারণ। উক্ত মুসলমানেরা নিজেদের রোহাইন নামে পরিচয় দেন, যার অর্থ হলো রোহা'র অধিবাসীদের বংশধর বা উত্তর পুরুষ (চৌধুরী, ১৯৯৪)।

৩. দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গের বাঙালি ক্রীতদাসদের বংশধরগণই আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্র। সন্দ্বীপের ইতিহাস গ্রন্থে শ্রী রাজকুমার চক্রবর্তী প্রাচীন তথ্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করেন,'আরাকান হইতে মগ ও ফিরিংঙ্গিগণ প্রতি বৎসর জলপথে বাংলায় ডাকাতি করিতে আসিত, হিন্দু, মুসলিম, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী দরিদ্র যাহাকেই পাইত বন্দী করিত এবং তাহাদের হাতের পাতা ফুটা করিয়া তাহার মধ্যে পাতলা বেত চালাইয়া তাহাদিগকে নৌকার ডেকের নীচে বাঁধিয়া লইয়া যাইত। এত কষ্ট ও অত্যাচারে অনেকে মরিয়া যাইত। যে কয়টা 'শক্ত প্রাণ' লোক বাঁচিয়া থাকিত তাহাদিগকে চাষবাস ও অন্যান্য পরিশ্রমের কাজের জন্য দাসভাবে রাখা হইত অথবা ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদিগের নিকট দাক্ষিণাত্যের বন্দরে বিক্রি করা হইত। শুধু ফিরিংঙ্গিরা এইরুপে বন্দী বিক্রি করিত। মগেরা তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখিত (চৌধুরী, ১৯৯৪)।' ১৩৩৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ইংরেজ আমলের ১৯৩০ সাল অবধি আরাকানে হাজার হাজার চট্টগ্রামী বসতি স্থাপনকারীদের ঔরসজাত বর্ণসংকর জনগোষ্ঠীই আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্র।

৪. আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের অভিমত হল, প্রধানত আরাকানের বসতি স্থাপনকারী চট্টগ্রামী পিতার ঔরসে, মঘ মাতার গর্ভজাত আরাকানী ও চট্টগ্রামী উপভাষা-ভাষী মুসলিম বর্ণসংকর জনগোষ্ঠীই হলো আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্র। কালক্রমে আরাকানে রোয়াইঙ্গা গোত্রের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নূতন চট্টগ্রামী বসতি স্থাপনকারীদের আগমনের ফলে গোত্রের

মধ্যে মূখ্যত বিয়ে শাদী সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তাই আরাকানের রোয়াইঙ্গা গোত্রের পারিবারিক ভাষা চট্টগ্রামী উপভাষা রাখতে সক্ষম হয়েছে। ১৬৬০ খ্রিঃ মোগল শাহ্জাদা সুজা আরাকানে পলায়ন ও নিধন হওয়ার পর থেকে আরাকানের রোয়াইঙ্গা মুসলিমগণ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শিকার হয়। তখন থেকে বিভিন্ন সময়ে নির্যাতিত ও বিতাড়িত হতে বাধ্য হয়ে পার্শ্ববর্তী পিতৃপুরুষের দেশ চট্টগ্রামে আশ্রয় নেওয়ার ফলে এখানেও রোয়াইঙ্গা গোত্রের বিস্তার লাভ করে (চৌধুরী, ১৯৯৪)।

বংশগতভাবে রোহিঙ্গারা ইন্দো-এ্যারিয়ান বংশ থেকে উদ্ভূত। রোহিঙ্গারা সেখানকার মোঙ্গল, ভেট চীনা ও মুরং, খুমী, চাক, সিন, সেন্দুজ, ম্রো,খ্যাং, ডইনাক, মারু, পিউ ও কিরাত প্রভৃতি উপজাতির জনগোষ্ঠীর নারীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে তাদের ঔরস ও গর্ভজাত আরাকানী মুসলিম বর্ণসংকর জনগোষ্ঠীর আকার-আকৃতি এবং দৈহিক গঠনে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। আকার ও আকৃতিতে আরাকানী মুসলিমদের কিছু অংশ বেটে-খাটো, আর কিছু অংশ মধ্যমাকৃতি নাক চেপ্টা, চক্ষু আয়াত ও ক্ষুদ্র। তাদের দাঁড়ি বিরল, চুল তামাটে ও সজারু কাটার মত খাঁড়া। রোহিঙ্গারা এখনও আরব নাম, বিশ্বাস, পোশাক, গান ও রীতি-নীতিকে ধারণ করে। এটি রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী হিসেবে পৃথক করে রেখেছে (চৌধুরী, ১৯৯৪)। এছাড়াও তাঁরা বাঙালি, ভারতীয়, মুঘল, পাঠান, আরব, পারস্য, তুর্কী, ম্যুর এবং মধ্য-এশিয়ার মিশ্র জাতিভূক্ত। এ ব্যাপারে Dr. Habib Siddiqui বলেন,

> *The Rohingya reflect this geograpic reality and are anethnic mix of Bengalis, Persians, Moghuls, Turks and Pathan and "have developed a culture and language which is absolutely unique to the region." Thus they have evolved with distinct ethnic charecteristics in Arakan as peopels of different ethnical background from the majority over the past several countries. "Their settlements in Arakan date back to 7th century C.E."*(Siddiqui, 2005)

দক্ষিণ এশিয়ার থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৈসাদৃশ্য তাঁদের চেহারায় স্পষ্ট এবং এরা আলাদা সংস্কৃতি ও মিশ্র ভাষার উৎপন্ন করেছে। অন্যান্য সকল জাতিসত্তার মতো রোহিঙ্গারাও নানান জাতিগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে এবং সম্মিলনে ভাষা-সামাজিক আচার-সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ভেতর দিয়ে একটি শংকর কিন্তু স্বতন্ত্র জাতি হয়ে উঠেছে (উদ্দিন, ২০১৮)। রাহমান নাসির উদ্দিন এর মতে, মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে রোয়াইঙ্গা মূলত ত্রৈত (তিনভাবে) সংখ্যালঘু: সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু (এথনিক মাইনোরিটি), ধর্মীয় সংখ্যালঘু (রিলিজিয়ার্স মাইনোরিটি) এবং ভাষাতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু (লিঙ্গুইস্টিক মাইনোরিটি) (উদ্দিন, ২০১৮)। আধুনিক ইতিহাসবিদগণ তিনজন লেখকের তথ্যকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। প্রথমত; ফ্রান্সিস বুকানন, দ্বিতীয়ত; এ পি ফেইরি এবং তৃতীয়ত; ই জি হার্ভে। এর বাইরে অপর একজন লেখকের তথ্য-উপাত্তকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। তিনি হচ্ছেন, মোশে ইয়েগার নামের একজন ইসরাইলি

গবেষক ও লেখক। উপরের সকল গবেষক ও লেখকই আরাকানে মুসলিমদের হাজার বছরের ইতিহাস ও অবস্থানকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এসকল মুসলিমকে রোহিঙ্গা বলে ডাকা হতো কিনা সেটি স্পষ্ট নয়। কেবল ফ্রান্সিস বুকানন এটিকে সমর্থন করেছেন। আজিম ইব্রাহিম এর (*The Rohingyas: Inside myanmar's Hidden Genocide*) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, জার্মান ভাষাবিদ এবং ধর্ম তাত্ত্বিক 'Johann Severin Vater' তাঁর ১৮১৫ সালে তৈরী করা একটি নৃগোষ্ঠীর তালিকায় আরাকানে বসবাসকারী রোইঙ্গা (*Ruinga*) বলে একটি জনগোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করেন যারা একটি স্বতন্ত্র ভাষায় কথা বলত (Ibrahim, 2016)।ফ্রান্সিস বুকাননের '*Rooainga*' ব্যবহার, '*The Classical Journal of 1811*' এ রোইঙ্গা (*Ruinga*) ভাষার ব্যবহার এবং 'Johann Severin Vater' এর নৃতাত্ত্বিক তালিকাই প্রমাণ করে নৃতাত্ত্বিকভাবে রোহিঙ্গারা একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বার পরিচয় নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে আরাকানে বসবাস করে আসছে। রোহিঙ্গারা যে আরাকানের আদি বাসিন্দা বিশেষ করে রোহিঙ্গা মুসলিম ঐতিহাসিক ও বাংলাদেশী ঐতিহাসিকরা রোহিঙ্গাদের 'আদিবাসী' প্রমাণের জোরালো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে আরেক দল ঐতিহাসিক বলার চেষ্টা করছেন, 'রোহিঙ্গা' শব্দটি অতি সম্প্রতিই আবিষ্কার হয়েছে। প্যানলং সম্মেলনের পর বিশেষ করে ১৯৪৮ সালের পরে স্বাধীন বার্মায় নিজেদের একটি স্বতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণের সূত্র ধরে 'রোহিঙ্গা' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন (Aye Chan) 'আই চ্যান' নামক একজন বৌদ্ধ জাপানী অধ্যাপক।[৬] এছাড়া পশ্চিমা ইতিহাসবিদ লেইডার (Leider) রোহিঙ্গা বিরোধী ধারার পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। মূলত তিনি প্রমাণের চেষ্টা করেছেন, 'রোহিঙ্গা' ধারণাটির বয়স হচ্ছে বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে এবং এর আগে 'রোহিঙ্গা' বলে কিছু ছিল না। অথচ লেইডার (Leider) নিজেই তাঁর একটি লেখায় লিখেছেন যে, ১৯৩৬ সালে আরাকানে *Rohingya Jam'iyyat al Ulama* নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে যারা প্রথম 'রোহিঙ্গা' শব্দটি ব্যবহার করেন। এরপর থেকেই আরাকানের মুসলিম স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো এ সংগঠনের মাধ্যমে নানাভাবে সামনে আনা হয়। কিন্তু এর আগে রোহিঙ্গা শব্দটি আরাকানের ইতিহাসে ছিল না (Leider, 2015)। ব্রিটিশ আমলে ১৮৭১-১৯১১ সাল পর্যন্ত এভাবে তাঁদের নৃতাত্ত্বিক গ্রুপ ও আরাকানীজ জনগোষ্ঠীর পরিচয় তুলে ধরা হয়।

সারণী-৫.১ঃ নৃতাত্ত্বিক গ্রুপ ও আরাকানের জনগোষ্ঠী (১৮৭১-১৯১১)

নৃতাত্ত্বিক গ্রুপ ('বর্ণ')	**আদমশুমারি- ১৮৭১**	**আদমশুমারি-১৯০১**	**আদমশুমারি-১৯১১**
মহামেডান (মুসলিম)	৫৮,২৫৫	১৫৪,৮৮৭	১৭৮,৬৭৪
বার্মীজ	৪,৬৩২	৩৫,৭৫১	৯২,১৫৮
আরাকানীজ	১৭১,৬১২	২৩০,৬৪৯	২০৯,৪৩২

৬. আই চ্যান এমন একজন জাপানী অধ্যাপক যিনি মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা বিরোধী যে উগ্র বৌদ্ধ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী মনোভাব তৈরী হয়েছে, তাঁর অন্যতম একাডেমিক প্রণোদনা গুরু। তাঁর লিখিত রোহিঙ্গা সংক্রান্ত *Virus Influx* বৌদ্ধ দুনিয়াতে রোহিঙ্গা বিরোধী বিদ্বেষ ছাড়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।

শান	৩৩৪	৮০	৫৯
'হিল ট্রাইবস'	৩৮,৫৭৭	৩৫,৪৮৯	৩৪,০২০
অন্যান্য	৬০৬	১,৩৫৫	১,১৪৬
মোট	২৭৬,৬৭১	৪৮১,৬৬৬	৫২৯,৯৪৩

Source: Aye Chan

উক্ত টেবিলে দেখা যাচ্ছে, নৃতাত্ত্বিক গ্রুপগুলোর মধ্যে মহামেডান বা (মুসলিম) দেখানো হয়েছে আবার জনসংখ্যায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুষ দেখানো হয়েছে আরাকানের বাসিন্দাদের 'আরাকানীজ' বলে। এখন কথা হচ্ছে এই আরাকানীজ কারা? তবে, সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রাখলে বুঝতে বেশি কষ্ট হবার কথা নয়, তা হচ্ছে আরাকানীজ বলতে এখানে একত্রে রাখাইন ও মুসলিমদের নির্দেশ করা হয়েছে। তাই যদি না হয়, তাহলে এখানে রাখাইন বলেও কারো থাকার কথা নয়। এখানে ঐতিহাসিকভাবে রোহিঙ্গা নেই ধরে নিলে রাখাইনরাও নেই। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় আদমশুমারির তথ্যে আরাকানীজ কারা? ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট এই আরাকানীজরা হলো 'রাখাইন বৌদ্ধ' ও 'আরাকানী মুসলিম'। আরাকানের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী, যাদের রোহিঙ্গা বলা হয় (উদ্দিন, ২০১৮)।

৫.১.২.১.৩ রাখাইন-রোহিঙ্গা সম্পর্ক

রোহিঙ্গা শব্দটি কোন সুনির্দিষ্ট আদিবাসী জাতিস্বত্তাকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় নি। বার্মায় বার্মা জাতি আবির্ভাবের আগে ও আদিবাসী জাতীয়তাবাদের আগে তাদেরকে রোহিঙ্গা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়নি। উপনিবেশ আমলে হিন্দু ও মুসলিম জাতিসমূহ ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিরাগ ছিল। এখানে ভারত বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগানো হয় অগ্রাধিকার আচরণের ভিত্তিতে, কারণ ব্রিটিশরা ভারতীয়দেরকে সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রে নিয়োগ দিতে পছন্দ করত। শুরুতে বার্মীজ জাতীয়তাবাদী অন্দোলন ছিল মূলত বৌদ্ধদের অন্দোলন এবং প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আন্দোলন (Maung, 1980)। শুরুতেই এ আন্দোলনে ধর্মীয় রং ছিল। কিন্তু তারা ভারত বিরোধী মনোভাবকে ভুলে গিয়েছিল। অনেক বার্মীজ জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ইউ উত্তামা (১৮৭৯-১৯০৯) "রাজনৈতিক সন্ন্যাসী" যিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধদের ঐক্যের উপর গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলতেন, ভারতীয় ও বার্মীজরা হল বন্ধু এবং খোলামেলাভাবে মুসলিমদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সমর্থন দিতেন (Smith, 1965)। এছাড়াও বৌদ্ধবাদ, বার্মার ও রাখাইন জাতীয়তাবাদ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উ নু স্বাধীন বার্মার প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি নিবেদিত প্রাণ বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করার ঘোষণা দিয়ে তিনি নির্বাচিত হন। অন্য ধর্মের অনুসারীরা এই সিদ্ধান্তকে ভালোভাবে নেয়নি। এর ফলে ১৯৬১ সালে কাচিন স্বাধীনতা আর্মি (কেআইএ) তৈরী হয়। এতে তিনি সংবিধান সংশোধন করে অন্যান্য ধর্মের সুরক্ষা দিতে বাধ্য হন। অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এতে ক্ষুব্ধ হন এবং রেঙ্গুনে একটি মসজিদে আগুন দেয় ও দু'জন মুসলিমকে

পুড়িয়ে মারে (Smith, 1965)। এছাড়া সাধারণ বার্মীজ বৌদ্ধ জনগণ মুসলিম ও ভারতীয় মুসলিমদের সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করে। কারণ তারা বার্মীজ মুসলিম ও ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারতো না। তাই বার্মীজ মুসলিমগণ অনুভব করল যে, ভারতীয় মুসলিমদের থেকে তাদেরকে পৃথক হতে হবে (Yegar, Moshe, 1072)। আরাকানে বৌদ্ধ ও মুসলিম বিরোধীতা চরম আকারে পৌঁছাল তখন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয়।

রাখাইনে ব্রিটিশরা যখন পিছু হটছিল এবং জাপানিরা অগ্রসর হচ্ছিল, রাখাইন বৌদ্ধরা তখন জাপানিদের পক্ষাবলম্বন করল। অং সাং এর স্বাধীন সেনাবাহিনীও জাপানিদের পক্ষ নিল। শুরুতে জাপানি অধিকৃত দক্ষিণ আরাকান থেকে অনেক মুসলিমকে বের করে দেওয়া হয় এবং অনেককে হত্যা করা হল। মুসলিমরা ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় আশ্রয় নিয়ে ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগ দেয়। সংক্ষেপে ২য় বিশ্বযুদ্ধ ছিল মুসলিম ও বৌদ্ধদের গৃহযুদ্ধ। যুদ্ধ শেষ হলে মুসলিমরা উত্তরে এবং বৌদ্ধরা দক্ষিণে অবস্থান নিল। সাম্প্রদায়িক বিভ্রান্তি নো রিটার্ন অবস্থায় ফিরল (Yegar, 1972)। যেমনটা ডেভিড কিন বলেন, দ্বন্দ্ব আদিবাসীদের উস্কে দিল (Keen, 2000)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আরাকানের স্বাধীনতার পরে আরাকানে তিনটি অস্থিরতা বা আন্দোলন দেখা দেয়। দক্ষিণে রাখাইন বিদ্রোহ, আরাকান পাহাড়ে কমিউনিস্ট আশ্রয় এবং উত্তরে মুসলিম মুজাহিদ আন্দোলন (Smith, 1999)। বার্মীজ ও রাখাইনরা প্রায়ই মনে করে যে, মুজাহিদ বিদ্রোহ রোহিঙ্গাদের সাহস যোগায়। যেহেতু এই অন্দোলনগুলোর লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সাথে একত্রিত হওয়া, রোহিঙ্গারা বর্মীর রাজ্যের প্রতি অনুগত ছিল না। কিন্তু এ বিদ্রোহে রোহিঙ্গাদের তেমন কোন সমর্থন ছিল না এবং এর শিকার যারা হয়েছিল তারা ছিল মূলত রোহিঙ্গা। মূলত কিছু রোহিঙ্গা চেয়েছিল যে উ নু যেন তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে যা উ নু কখনো করে নি (Smith, 1999)।

ইতোমধ্যে রেঙ্গুনে রাখাইন জাতীয়তাবাদীরা আলাদা আরাকান রাজ্যের দাবী করেছিল। অন্যদিকে রোহিঙ্গারা উত্তরাংশে নিজেদের জন্য আলাদা রাজ্যের দাবী জানিয়ে আসছিল যা রেঙ্গুন কর্তৃক শাসিত হবে (Smith, 1999)। এটি স্মরণ রাখা দরকার যে, ১৯৪৮-১৯৬২ সালে সংসদীয় আমলে এবং নে উইনের শাসনের প্রথম দিকে আরাকানে ও রেঙ্গুনে শুধু অনেকগুলো রোহিঙ্গা সংগঠনই ছিল না বরং বার্মা সরকার রোহিঙ্গাদের বার্মীজ আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। যার প্রমাণ দেন ড. জামি সোউ (http://www.rohingyablogger.com)।[৭] ক্ষমতায় এসে নে উইন এবং তার মিলিটারী অনুসারীগণ রোহিঙ্গাদের অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদেরকে তাড়াতে লাগলো। মধ্য সত্তরের দশক থেকে আজোবধি প্রান্তিকীকরণের মুখোমুখি তাঁরা। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হলো, তারা স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ থেকে আগত ‘অবৈধ অভিবাসী’। কিন্তু ১৯৫১ সালে নিউয়র্ক টাইমসের রিপোর্ট অনুসারে ২,৫০০০০ রোহিঙ্গা আরাকান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করে (Pakistan Warns Burma, 1951)। বাংলাদেশ যখন ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন

৭. http://www.rohingyablogger.com/2013/05/the-official-evidence-of-rohingya.html

হওয়ার জন্য যুদ্ধ করছিল অসংখ্য মানুষ তখন সীমানা অতিক্রম করে বার্মায় যায়। পরে ১৭০০০ হাজার মানুষ দেশে ফিরে আসে কিন্তু কত সংখ্যক সেখানে থেকে যায় তা জানা যায় নি (Yegar, 1972)। তারপর ১৯৭৮ সালে নে উইন সরকার অপারেশন ড্রাগন কিং শুরু করলে ২,৫০০০০ মুসলিম সীমানা অতিক্রম করে বাংলাদেশে চলে আসে। অধিকাংশ ফিরে যায় বাংলাদেশ সরকারের চাপের কারণে (Yegar, 1972)। তারপর থেকে বার্মীজ সরকার সীমান্তে প্রহারা জোরদার করে এবং ইচ্ছে থাকলেও আরাকান রাজ্য থেকে অবৈধ অভিবাসীদের ফিরে আসা সম্ভব নয়। অনেক রোহিঙ্গা অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসী কিন্তু তাদের কোন পরিচয়পত্র নেই। অবৈধ বার্মীজ উপজাতি যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে তাদেরও পরিচয়পত্র নেই। কিন্তু রোহিঙ্গারা যুক্তি দেখায় যে, ১৯৬২ সালে বার্মীজ সরকার আইডি কার্ড প্রচলন করলেও তাদেরকে জাতীয় পরিচয় পত্র না দিয়ে বিদেশী রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছিল যা অনেকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। যারা এটি গ্রহণ করেছিল তাদেরকে বল প্রয়োগ করে এটিও ফেরত নেওয়া হয়েছিল। বর্মীদের আরেকটি যুক্তি হলো, তাদের অনেকেই বার্মীজ ভাষা বলতে পারে না। এটা অশ্চর্যজনক কিছু নয়। চার দশক ধরে রোহিঙ্গাদের শিক্ষা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। এমন এলাকায় তাদের আটকে রাখা হয়েছে যেখানে তারা স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে না। এই যুক্তি বার্মীজ সুপ্রিম কোর্টেও বাতিল হয়ে যায়। একটি মামলায় বলা হয় যে, বার্মায় যেখানে এতোগুলো আদিবাসী আছে সেখানে সকলের পক্ষে বার্মীজ ভাষা বলাটা সম্ভবপর নয় এবং তাদের আচার প্রথাও অন্যদের থেকে ভিন্ন (*The Guardian*, 1960)। আরাকান সম্পর্কে যে অল্প কিছু তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত মুসলিম জনসংখ্যা সেখানে বৃদ্ধি পায় নি। আরাকান বাংলাদেশের তুলনায় কম উন্নত এবং এটি বোধগম্য নয় কেন অনুন্নত আরাকানে বাংলাদেশীরা অভিবাসন করবে (David & Nguyen, 2013)। অন্যদিকে সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস ও তথ্যে দেখা যায়, বিগত চার দশকে ১০ (দশ) লক্ষাধিক রোহিঙ্গারা বাংলাদেশসহ ও অন্যান্য দেশে আভিবাসন গড়েছে।

উ খিন মং শো-এর মতে, আমি মুসলিমসহ বিভিন্ন পণ্ডিত ও বিদগ্ধজনের সাথে কথা বলে দেখেছি যে, তারা কেউই রোহিঙ্গা শব্দের অর্থ জানে না। এমন কি এর উৎসও জানে না। তাঁরা শুধু বলে যে, ১৯৪৯ সালে বার্মায় বিদ্রোহী ছিল। তন্মধ্যে একটি চরমপন্থী ইসলামী দল ছিল যার নেতৃত্বে ছিলেন মীর কাশিম। তারা নিজেদেরকে মুজাহিদ বলে ডাকত। মুজাহিদ বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ছিল ইউনিয়ন অফ বার্মার আরাকান জেলায় অবৈধভাবে বসবাসকারী অভিবাসী যারা উত্তর আরাকানকে “আরাকানীস্তান” নামক স্বতন্ত্র মুসলিম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাথে যোগ দিতে চেয়েছিল। জামিয়াতুল ওলামার কিছু প্রতিনিধি করাচী গিয়েছিল যাতে বুথিডং, মংডু এবং রাথিডংকে পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভূক্ত করা হয় (Khin, 1959-60)। তৎকালীন উ নু সরকার মীর কাশিমকে জীবিত কিংবা মৃত ধরে দেওয়ার জন্য ২০০০০ কিয়াতের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। যাই হোক মীর কাশিমের মত অশিক্ষিত লোকের এটি অলিক স্বপ্ন ছিল যে, ঐতিহ্যগতভাবে একটি বৌদ্ধ রাষ্ট্রকে মুসলিম রাজ্যে পরিণত করা (Khan, 1984)। ফলে

১৯৫০ সালে বার্মীজ বাহিনী কর্তৃক এই সকল মুজাহিদদেরকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হয়েছিল। কাশিম পূর্ব পাকিস্তানে পালিয়ে গেল এবং ১৯৬৬ সালে কক্সবাজারে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান।[৮] এ সকল আত্ম-সমর্পণকৃত মুজাহিদগণ নিজেদেরকে 'রোহিঙ্গা' নামে পরিচয় দিতে থাকে। ১৯৬০ সালের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে উ নু আরাকানীজ ও রাখাইনদের জন্য আলাদা রাজ্য গঠনের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তিনি নির্বাচনে জয়ী হলে প্রধানমন্ত্রী হয়ে আরাকান ও মন রাজ্যের আন্দেলনের ইস্যু সামনে চলে এলো। ইতোমধ্যে বাঙালি মুসলিম নেতারা আরাকান রাজ্য বিরোধী অন্দোলন শুরু করেন এবং আরাকানীজদের মত সম-মর্যাদার দাবী তোলেন। তখন তাদের দাবী এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা হয় যে, তারা আদিবাসী নয়, তখন বাঙালি মুসলিমরা ঐতিহাসিক মনগড়া গল্প তৈরী করে প্রমাণ করতে চাইল যে, তারা আদিবাসী আরাকানীজ মুসলিম (Tha, 1991)। তারা বলতে থাকে যে, অষ্টম শতকে তাঁদের আরব পূর্ব-পুরুষেরা জাহাজ ডুবির পর আরাকান উপকূলে স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছিল (Lwin, 1960)। Maurice Collis তাঁর বইয়ে লিখেছেন যে, উপসাগরীয় সভ্যতায় আরাকানীদের স্থান হয় ১২০৩ সালে কিন্তু সেটি একেবারে পূর্ব প্রান্তে। এটি ভারত-চীন অঞ্চলে পৌছাঁয় নি। ১২০৩ সাল থেকে ১৪৩০ সাল পর্যন্ত আরাকানের উপর এর কোন ব্যাপক প্রভাব ছিল না (Collis, 1995)। লেখক এখানে ১২০৩ সালে আরাকানীদের কথা উল্লেখ করলেও ষাট এর দশকে মিয়ানমারে সামরিক শাসনের পর থেকে সরকার 'আরাকান' নামের অস্তিত্ব অস্বীকার করে আসছে।

৫.১.২.১.৪ পরিচয় সংকটে রোহিঙ্গা মুসলিম

ঔপনিবেশিক শাসনের পর এবং সফল স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণে নতুন নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটছে এবং পুরানো রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটেছে। এ জাতীয় পরিবর্তন যে বিশ্ব আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে তা আধুনিক রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজ বিজ্ঞানীদের চিন্তারও বাইরে। এই পরিবর্তনের ফলে তা বিশ্লেষণের জন্য পুরাতন পদ্ধতিসমূহও পরিবর্তিত হচ্ছে। উপনিবেশবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পর পরই নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো যে সব সমস্যার সম্মুখিন হয় তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ। বিভিন্নমুখী গোষ্ঠীগুলোকে একটি জাতীয় ব্যবস্থার অধীনে সংঘবদ্ধ করা (Jahan, 1972)। একটি জাতিগঠন তার অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও অগ্রগতির প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে জাতিস্বত্তার উপলোব্ধি ও অভেদ জাতীয়তার ভিত্তি নির্মাণ (Pye, 1972)। সঠিক জাতীয় সংহতি অর্জনের অন্যতম দিক হচ্ছে জাতিসত্তা নির্ধারণ ও জাতি পরিচিতি সংকটের সমাধান (Pye, 1966)। উন্নয়নশীল বিশ্বের জাতিগঠন ও সংহতি অর্জনের সবচেয়ে মৌলিক ও প্রথমিক শর্ত হচ্ছে, জাতিসত্তার প্রশ্নটির সুষ্ঠু মিমাংসা (Welch, (ed.), 1971)। এই মিমাংসার উদ্যোগ হিসেবে ১৯৪৮ সালের ৯ জুন আরাকানের মংডু উপ-বিভাগের

৮. The real name of the border town "Cox's Bazar" was "Phalaung Zay" meaning Portuguese Market. When thetown was occupied by the British they changed the name into Cox's Bazar to honour the British envoy Captain Cox.

একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে মুজাহিদ পার্টি উর্দূতে লেখা বিভিন্ন দাবী সম্বলিত একটি চিঠি বার্মা সরকারের নিকট প্রেরণ করে।

এ ধরনের রাষ্ট্রসমূহ একদিকে তাদের নৃতত্ত্বগত, ধর্মীয়, ভাষাগত অথবা আদিবাসী সংক্রান্ত সংযোগে দীর্ঘকালীন যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার সমস্যা মোকাবেলা করছে এবং অপরদিকে নতুন রাষ্ট্র সমূহের প্রতি বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের মধ্যে কিভাবে আনুগত্যবোধ সৃষ্টি করা যায় তার চেষ্টা করা। এ সমস্ত নতুন রাষ্ট্র সমূহে এটি একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য যা তাদেরকে দিয়েছে খণ্ডিত পরিচয়। এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ নতুন রাষ্টসমূহের কর্তৃত্বকারী এলিট শ্রেণী এ সমস্ত সমস্যা মোকাবিলা করছে। সেজন্য কিভাবে মৌলিক অনুভূতিকে নাগরিক অনুভূতিতে রূপান্তরিত করা যায় (Geertz, 1963); কিভাবে জাতীয় পরিচয়কে সংকীর্ণ পরিচয় থেকে আরও উচ্চতর ও উন্নত করা যায় এবং শেষতঃ বহু খণ্ডিত নতুন পরিচয় থেকে কিভাবে একটি জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করা যায় তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। জাতীয় রাষ্ট্র শুধু একটি আন্তর্জাতিক সৌজন্য (Islam, 1988) নয় বরং এটি একাধারে সরকারী বাস্তবতা (Jahan, 1972)। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশেই জাতীয় সংহতির সংকটে নিপতিত। উদাহরণ স্বরূপ নাইজেরিয়ার কথা বলা যায়। সেখানে একদিকে রয়েছে আদিবাসী, জাতিগত, ভাষাগত বিভিন্নতা এবং অপরদিকে ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭ সালে সংঘটিত রক্তাক্ত অভূত্থানের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি বিনষ্টের জন্য সেনাবাহিনীর দায়ভার গ্রহণ (Islam, 1988)। জাতির পরিচয়ে একটি সম্প্রদায়ের একাধিক প্রতীক যেমন বর্ণ, ভাষা, ধর্ম ও ভূখণ্ড প্রয়োজন হয় (Paul, 1980)। 'জাতীয়তা' অর্জন করা যায় না বা পরিবর্তন করাও যায় না। নাগরিকত্ব অর্জন করা যায় এবং পরিবর্তন করাও যায়। জাতীয়তার জন্ম বংশ এবং আবহমান ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা ও ঐতিহ্য সূত্রে গ্রথিত। নাগরিকত্ব ব্যক্তি বিশেষের গ্রহণ বর্জনের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। একজন ইচ্ছা করলেই ইংরেজ, আইরিশ অথবা স্কটিশ জাতীয়তা গ্রহণ করতে পারে না; নিজেকে ইংরেজ বা আইরিশ বলে পরিচয় দিতে পারে না। কিন্তু তিনি এই তিনটি দেশ মিলে যে ব্রিটেন বা ইউনাইটেড কিংডম তার নাগরিকত্ব গ্রহণ করে ব্রিটিশ বলে পরিচয় দিতে পারে (Govt. of Bangladesh, 1979)। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত লোক গণনা প্রতিবেদন থেকে প্রকাশ পায় যে, মালয়েশিয়ার জনসমষ্টি তিনটি প্রধান গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত যথা-মালয়া, চীনা ও ভারতীয়। মালয়েশিয়ার জনসংখ্যার এই গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য নানাবিধ কারণে সংহতির জন্য বিপুল সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। ১৮৮০ সাল থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে মালয়েশিয়া জনসংখ্যা এক মিলিয়ন থেকে ৭.৭৫ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়। ১৮৮০ সালে দেশীয় মালয়গণ ছিল জনসংখ্যার ৯০%। ১৮৯০ সালে ছিল তিন ভাগের দুই ভাগ। আবার ১৯১১ সালে যখন প্রথম আদমশুমারী হয় তখন এই সংখ্যা ছিল ৫১%। ১৯৩১ সালে মালয়গণ ছিল মাত্র ৪৯.২% এবং ১৯৫৭ সালে মালায়ার স্বাধীনতা লাভের সময় দেশীয় মালয়গণ ছিল মোট জনসংখ্যার ৪৯.৮%। এই অবশিষ্ট জনসংখ্যার মধ্যে উক্ত এলাকার জন্মগ্রহণকারী (উপসাগরীয় চীনাসহ) ছিল ৩৭.২%, সিংহলীসহ (শ্রীলংকান) ভারতীয় ও পাকিস্তানী ছিল ১১.৩ ভাগ এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয়গণসহ অন্যান্যরা ছিল ১.৮% (ইসলাম,

২০০৭)। একইভাবে আরাকানের বাস্তবতায় বিভিন্ন আদমশুমারীতে আরাকানী মুসলিম ও পরবর্তীতে রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিভিন্ন পরিসংখ্যান দেখতে পাওয়া যায়। তাই জাতীয় পরিচিতির দাবী হিসেবে তাঁরা রোহিঙ্গা হিসেবে পরিচয় প্রদান করে।

৫.১.২.১.৬ পরিচয় বিতর্ক: 'রোহিঙ্গা' বনাম 'বাঙালি'

অং সানের কন্যা বার্মাতে মুসলিমান রোহিঙ্গাদের অস্তিত্বই অস্বীকার করছেন। সেনাবাহিনীও বলছে, রোহিঙ্গা বলে বর্মায় কোনো বৈধ জাতিসত্তাই নেই এবং ছিলোও না। বার্মা সরকার এবং সে দেশের সেনাবাহিনী বর্তমানে বেশ জোরলোভাবেই বলে থাকে। আরাকানের রোহিঙ্গারা সে দেশের নাগরিক নয় বাংলাদেশ থেকে যাওয়া মানুষ। এই দাবি যে কত স্ববিরোধী তা বহুভাবেই প্রমাণযোগ্য। মিয়ানমার সরকার ও রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্র, বেসরকারী মিডিয়া ও সেনাবাহিনী সকলে মিলে নিয়মিতভাবে রোহিঙ্গাদের 'বাঙালি' হিসেবে প্রচার করছে। রোহিঙ্গাদের কাছে বার্মার নাগরিকত্বের সনদসহ যাবতীয় কাগজপত্র সবই ছিলো এবং বাংলাদেশে পালিয়ে আসা কারো কারো নিকাট দেখা যায়। তাদের নাগরিকত্বকে অস্বীকার করে মিয়ানমারে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত স্কট মার্সিয়েলের সাথে ১২ অক্টোবর ২০১৭ সালে এক বৈঠকে মিয়ানমারের সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইয়াং "রোহিঙ্গাদের 'বাঙালি' বলে মন্তব্য করেছেন রোহিঙ্গা মুসলিমরা মিয়ানমারের জনগোষ্ঠী নয়। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সংখ্যা গণমাধ্যমে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর মতে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের জন্য ক্ষতিকর। নথিপত্র প্রমাণ করে তারা কখনও রোহিঙ্গা নামেও পরিচিত ছিল না। মিয়ানমার তাদের এদেশে নিয়ে আসেনি। ঔপনিবেশিক শাসনামলে তারা এদেশে এসেছিল। আর সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশই এর জন্য দায়ী (*দৈনিক সমকাল পত্রিকা*, ২০১৭)।" মিয়ানমারের আরাকান (রাখাইন) অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের দেশান্তরে পাঠাতে বার্মীজ প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন'র বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে জাতিসংঘ। সর্বশেষ এ সহিংসতার সমাধান বাতলে দিয়ে সামরিক শাসক থেন সেইন বলেন, 'দেশান্তর করা বা জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়াই ছিল' একমাত্র সমাধান। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক বিশেষ দূত এর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "আমরা মনে করি নাগরিক হিসেবে রোহিঙ্গাদের স্বীকৃতি দেয়াই মিয়ানমারের সামনে একমাত্র সমাধান (www.coxsbazarnews.com)।"[৯] সুতরাং রোহিঙ্গাদের গণহারে বাঙালি না-বলে মিয়ানমারের রাষ্ট্রের কাঠামোর ভেতরে তাদের নিজস্ব জাতিগত পরিচয় দিয়ে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা পদ্ধতিগত দিক দিয়ে বিবেচনায় অধিক তাৎপর্যপূর্ণ।

নির্বিচারে রোহিঙ্গদের বাঙালি বলা যাবে না, কেননা 'রোয়াইঙ্গারা বাঙালি' এটা কোন সিরিয়াস নৃবৈজ্ঞানিক একাডেমিক প্রমাণ্য গবেষণা দ্বারা এখনো পর্যন্ত স্বীকৃত নয় (উদ্দিন, ২০১৮)। বরং রোহিঙ্গাদের পরিচয় নিয়ে নৃবৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত প্রমাণ করে যে তারা সেখানকার ভূমিলোক। এমনকি ১৯৯০-এ যখন সামরিক বাহিনীর অধীনেই বার্মায় বহুদিন পর প্রথমবারের

৯. www.coxsbazarnews.com ১৩ জুলাই, ২০১২

মতো বহুদলীয় নির্বাচন হলো (নির্বাচনে অং সান সু চির দল নির্বাচিত হয়েও সরকার গঠন করতে পারেনি), তখন খ মিং (মুসলিম নাম; শামসুল আনোয়ার, বুথিডং-১), মো. নুর আহমেদ (বুথিডং-২), উ চিট লুইঙ (ইব্রাহিম, মংডু-১), ফজল আহমেদ (মংডু-২) প্রমুখ রোহিঙ্গারা কীভাবে উত্তর আরাকান থেকে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হতে পারলেন? কীভাবে তখন আরাকানের রোহিঙ্গারা (আটটি আসনে) নিজস্ব রাজনৈতিক দল (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস পার্টি) থেকেই প্রার্থী হতে অনুমতি পেয়েছিল? আইন অনুযায়ী ওই নির্বাচনে 'বিদেশি' ছাড়া সবাইকেই ভোট দিতে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে বুথিডং ও মংডুর এই রোহিঙ্গারা কাদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন? সু চির মুক্তির দাবিতে আরাকানের রোহিঙ্গাদের মোমবাতি প্রজ্বলন কর্মসূচিতে এ পর্যায়ে উল্লেখ করতে হয়। বার্মা ১৯৯০-এর নির্বাচনে বিজয়ী চারজন রোহিঙ্গা এমপির মধ্য থেকে শামসুল আনোয়ারকে অং সান সু চি ১৯৯৮ সালে রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধি হিসেবে 'পিপলস পার্লামেন্ট'-এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান এবং শুধু এই ডাকে সাড়া দেওয়ার কারণে তাঁর ৪৭ বছরের জেল হয়েছিল। এমনকি শামসুল আনোয়ারের পুত্র-কন্যাদেরও ১৭ বছর করে সাজা দেওয়া হয়। অথচ সু চি উত্তর আরাকানে রোহিঙ্গাদের কোনো রূপ উপস্থিতির কথা অস্বীকার করে যাচ্ছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, ১৯৯০-এর নির্বাচনে বুথিডং-১ থেকে নির্বাচিত এমপি মাস্টার শামসুল আলম রেঙ্গুনের ইনস্টিটিউট অব ইকোনমিকস থেকেই তাঁর ব্যাচেলর ডিগ্রি নিয়েছিলেন এবং ১৯৮৫ পর্যন্ত তিনি সরকারি মাধ্যমিক একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। নাগরিক না হলে তাঁর পক্ষে কীভাবে দীর্ঘ শিক্ষা ও কর্মজীবন পরিচালনা করা সম্ভব হলো? বস্তুতপক্ষে এটা বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়, বার্মার শাসকেরা শামসুল আলমের মতো নিয়মতান্ত্রিক পথে রাজনীতিতে সক্রিয় রোহিঙ্গাদের পুরো নাগরিক পরিমণ্ডল থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করছে।

সুচির আইনী উপদেষ্টা উ কো নি মিয়ানমারের সংবিধানের ওপর এনএলডি দলের এক সভায় আলোচনা করছেন। বার্মার মুসলিম নেতৃত্বকে মুছে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় ২৯ জানুয়ারি, ২০১৭ সালে হত্যা করা হয় ব্যারিস্টার উ কো নিকে। সু চির আজকের অবস্থানের পেছনে তাঁর অবদান অস্বীকারের উপায় নেই। যখন সন্তানদের বিদেশি নাগরিকত্ব থাকার অজুহাতে সামরিক জান্তা অং সান সু চির সাংবিধানিক পদ গ্রহণে বাধা তৈরি করে, তখন একটা উপায় বের করেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ কো নি। সামরিক জান্তার সংবিধানের ভেতরই তিনি বিকল্প সরকার প্রধান হিসেবে সু চির জন্য স্টেট কাউন্সেলর পদ সৃষ্টির পথ দেখিয়ে দেন। দীর্ঘদিন সু চির আইনি উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের পর ২০১৩ সালে সরকারি দল এনএলডিতে যোগ দেন। সামরিক বাহিনীর সমালোচনা এবং রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া ১৯৮২ সালের আইনের সমালোচনা করাই হয়তো ছিল তাঁর অপরাধ। সাবেক এক সেনা গোয়েন্দা কর্মকর্তার নির্দেশে গুলি করে তাঁকে হত্যার মধ্যে দিয়ে বার্মার জাতীয় রাজনীতিতে মুসলিমদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ইতিহাসও আপাতত শেষ হয়। ঘটনার এক মাস পর অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় সু চি এ হত্যাকাণ্ডকে সন্ত্রাসী কাজ বলে কো নি-কে শহীদ বলে আখ্যায়িত করেন (দৈনিক প্রথম আলো, ২০১৭)।

৫.১.২.১.৭ ভাষা বিতর্ক: প্রসঙ্গ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী

মিয়ানমারের আরাকান (রাখাইন) রাজ্যের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর লিখিত ভাষা 'রোহিঙ্গা ভাষা'। এটি ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত যার সাথে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার কিছুটা সাযুজ্য রয়েছে। রোহিঙ্গা ভাষার গবেষকগণ আরবি, মালয়, ফার্সি, হানিফি, উর্দু, রোমান এবং বার্মীজ স্ক্রীপ্ট ব্যবহার করে রোহিঙ্গা ভাষায় লিখতে সক্ষম হয়েছেন। তবে, রোহিঙ্গাদের বহুল ব্যবহৃত হানিফি হচ্ছে নতুন স্ক্রীপ্ট যা আরবি এবং তার সাথে চারটি বর্ণ (ল্যাটিন ও বার্মীজ) সংযোগে সৃষ্ট। সম্প্রতি একটি ল্যাটিন স্ক্রীপ্টের উদ্ভাবন হয়েছে যা ২৬টি ইংরেজি বর্ণ এবং অতিরিক্ত ২টি ল্যাটিন বর্ণ, (তাড়নজাত R-এর জন্য) এবং Ñ (নাসিকা ধ্বনি'র জন্য) সংযোগে ২৮টি বর্ণ দ্বারা সৃষ্ট। আবার আরবী ২৯টি বর্ণমালার সাথে অতিরিক্ত ৭টি বর্ণমালা সংযোগ করে ৩৬টি বর্ণ দ্বারা সৃষ্ট নতুন একটি ধারা তৈরী করে লিখিত রূপ দেয়া হয়েছে, যা শরণার্থী শিবিরগুলোতে রোহিঙ্গাদের দ্বারা পরিচালিত মাদ্রাসায় পড়াতে দেখা যায় (*কুতুপালং অনিবন্ধিত শরণার্থী শিবির*, ২০১৫)। মিয়ানমার বলার চেষ্টা করছে 'রোহিঙ্গারা বাঙালি কারণ তাদের ভাষা বাঙলা'। নৃবিজ্ঞানের শিক্ষক ও গবেষক রাহমান নাসির উদ্দিনের মতে, "এটা একেবারেই খোঁড়া যুক্তি, কেননা ভাষা এক হলেই জাতি হয় না। এটা সত্য যে, ভাষা একটি জাতিসত্তার অন্যতম উপাদান কিন্তু একমাত্র উপাদান নয়। ভাষার সাযুজ্য দিয়ে রোয়াইঙ্গাদের বাঙালি বানিয়ে দেওয়ার জন্য খুব বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশেই তার অসংখ্য উদাহারণ আছে। যেমন, চাকমা আর তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষার মধ্যে প্রচুর মিল আছে, তার অর্থ এই নয় যে, তঞ্চঙ্গ্যারা চাকমা জাতি। আবার চাকমা ভাষার সাথে চাটগাঁইয়া বা চিটাগনিয়ান ভাষার প্রচুর মিল আছে। তার অর্থ এ নয় যে, চাকমারা চাটগাঁইয়া বাঙালি। তাই ভাষা জাতিগত পরিচয় (ethnic identity) নিধারণের একটি অন্যতম নির্ধারক (ethnic marker) (উদ্দিন, ২০১৮) হলেও কেবল ভাষার মিল-অমিল দিয়েই জাত-বিচারে একাডেমিক বিবেচনায় অগ্রহণযোগ্য। তাই, রোয়াইঙ্গারা যে একটি স্বতন্ত্র জাতি তা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের মানুষের উপ-ভাষার (dialectics) সাথে তুলনা না করে, রোয়াইঙ্গাদের মিয়ানমার রাষ্ট্রের কাঠামোর আওতায় নিয়ে জাত-বিচার করা ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিকভাবে বেশ ফলদায়ক এবং পদ্ধতিগতভাবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য (উদ্দিন, ২০১৮)।"

মিয়ানমারের সামরিক সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী গণতন্ত্রের মোড়কে সামরিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে রোহিঙ্গাদের বাঙালি হিসেবে আখ্যায়িত করছে এবং তাঁদের ভাষা বাঙলা বলে প্রচার করছে সরকার ও স্থানীয় মিডিয়া। রোহিঙ্গারা আরাকানের বাসিন্দা হিসেবে রোহিঙ্গা ভাষাভাষী না বাঙালি ভাষাভাষী সে বিষয়টি বুঝতে নয়াপাড়া নিবন্ধিত শরণার্থী ক্যাম্পে 'মিয়ানমার ল্যংগুয়েজ ক্লাবে'র শিক্ষক মোঃ কামাল হোসেনের সাথে কথা হয়। তার মতে, "আমরা যারা দীর্ঘ দিন যাবৎ শরণার্থী ক্যাম্পে বসবাস করছি তারা বাঙলায় কথা বলতে পারলেও বাঙলা ভাষার সাথে আমাদের শব্দের প্রায় ৩০ ভাগই মিল নেই। তবে এক্ষেত্রে যে সকল রোহিঙ্গারা নতুন আরাকান থেকে নির্যাতিত হয়ে এসেছে তারা আবার আমাদের কথা বুঝতে পারে না। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ দ্রুত এদেশের ভাষা আত্মস্থ করতে

পারলেও অন্যদের একটু (মাস ছয়েক) সময় লাগে। আমরাই তাদের কথা ভালোভাবে বুঝতে পারি না আর আপনারা তো আরো পারবেন না।" সর্বশেষ ২০১৭ সালে বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের জেলা কক্সবাজার জেলার রয়েছে একটি নিজস্ব কথ্য বা আঞ্চলিক ভাষা। এই ভাষার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। কক্সবাজার বৃহত্তর চট্টগ্রামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের কথ্য ভাষা প্রায় একই মনে হলেও উভয় অঞ্চলের ভাষার মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট পার্থক্য। তাই চট্টগ্রামের উপ-ভাষাকে বলা হয় চাঁড়ি বা চাঁটি ভাষা আর কক্সবাজার অঞ্চলের উপ-ভাষাকে বলা হয় রোঁয়াই আঞ্চলিক ভাষা। কক্সবাজার তথা বৃহত্তর চট্টগ্রামের নিজস্ব কথ্য ভাষা রয়েছে কিন্তু নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই (Coxsbazarnews.com)।[১০] রোহিঙ্গা ভাষা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় এরূপ-

> *Rohinhya speak a Bengali dialect similar to what is spoken in Chittagong reagion of Bangladesh, mixed primarily with words from the Urdu, Hindi, and Arabic languages, but also from the Burmese and English languages.*(Amnesty International, 2004)

স্থানীয় জনসাধারণের থেকে রোহিঙ্গাদের ভাষার ব্যবহারে ভিন্নতা রয়েছে যেমন-

'মুই দে আছে কালুঘাডর পুলত ঘলঅমরগাই (রোহিঙ্গা ভাষা)

'আআঁই কালুঘাডর পুলত ঘলিরগাই (চট্টগ্রামী ভাষা)

'আমি কালুঘাটের ব্রিজের মধ্যে ঢুকতেছি (মান ভাষা বা শুদ্ধ বাঙলা ভাষা) (ইসলাম, ২০১৮)

অনুরূপভাবে দেখা যায়-

হুকুমতে মরে দে আছে লঅরাইয়ে (রোহিঙ্গা ভাষা)

সরকারে আআঁরারে দুরাই দিয়ে (চট্টগ্রামী ভাষা)

সরকার আমাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছে (মান ভাষা বা শুদ্ধ বাঙলা ভাষা) (ইসলাম, ২০১৮)

---

১০. কক্সবাজার জেলাসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য এতই বিচিত্র যে, সমগ্র এলাকার প্রায় বিশমাইল অন্তর এই ভাষার অভ্যন্তরীণ একাধিক উপা-ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। কর্ণফুলী নদীর দুই পাশের জনগোষ্ঠীর ভাষার স্বতন্ত্র উচ্চারণরীতি ও অর্থগত তারতম্য এই উপ-ভাষাসমূহের স্বাতন্ত্র নির্দেশ করে। কর্ণফুলী নদীর উত্তর পাশের মীরসরাই-সীতাকুণ্ড এলাকার ভাষার স্বাতন্ত্র লক্ষ্যণীয়। আবার পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালি ও সাতকানিয়া-লোহাগড়া এলাকার সঙ্গে মিরসরাই-সীতাকুণ্ড ও হাটহাজারী-রাউজান-রাঙ্গুনিয়া এলাকার ভাষার তফাৎ রয়েছে। একইভাবে কক্সবাজার এরাকার ভাষা উপরোক্ত ভাষা থেকে অনেকটাই আলাদা। শুধু কি তাই, কক্সবাজার জেলার অভ্যন্তরে মহেশখালী দ্বীপ ও সীমান্ত শহর টেকনাফ উপজেলার ভাষা ও উচ্চারণেও নিজেস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় দেখা যায় যে, মরিসরাই-সীতাকুণ্ড এলাকার ভাষা নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষা দ্বারা প্রভাবিত। তদ্রুপ কক্সবাজার এলাকার ভাষা রোসাঙ্গ বা রোহিঙ্গাদের উচ্চারনরীতি দ্বারা প্রভাবিত। ফলে কক্সবাজার এরাকা বৃহত্তর চট্টগ্রামের অন্তর্গত হয়েও আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণরীতি ও অর্থগত তারতম্যের ফলে চট্টগ্রামের অন্য এলাকা থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র; ইসলাম, মুহাম্মদ নূরুল, *বাংলা বর্ণমালায় কক্স্রাজারের আঞ্চলিক ভাষা* Coxsbazarnews.com

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মিশ্র ভাষায় বেশী সংখ্যক রোহিঙ্গা কথা বললেও এরপরই রোহিঙ্গা ভাষায় কথা বলে থাকে। এর দ্বারা এটিই প্রমাণ হয় যে, রোহিঙ্গাদের নিজস্ব একটি ভাষা রয়েছে। যে ভাষায় তারা নিজস্ব ভাব প্রকাশ করে থাকে। অধ্যাপক ড. রাহমান নাসির উদ্দিন এর মতে, শুধু ধর্ম এবং ভাষার মিল নিয়েই আপনি একটা জাতিসত্তাকে আরেকটা জাতিসত্তার অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন না। তাঁর মতে, সত্যিকার অর্থে গভীরভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে, চিটাগনিয়ান ও আর রোয়াইঙ্গা ভাষার মধ্যে, শব্দ চয়নের মধ্যে অনেক পার্থক্যও রয়েছে। যেমন, 'আমি আরাকান থেকে পালিয়ে এসেছি' বা 'আমি রাখাইন থেকে পালিয়ে এসেছি'-এটাকে চিটাগনিয়ান ভাষায় বলা হয় 'অ্যাই রাখাইনত্তুন ফালাই আইচচি'। কিন্তু এটাকে রোয়াইঙ্গারা বলা হয় 'মুই বার্মার হেনথি ধাই আইচ্চুম'। তাহলে 'ফালায়' আর 'ধায়' কিন্তু এক না। 'অ্যায়' আর 'মুই' কিন্তু এক না। 'আইচচি' আর 'আইচ্চুম' কিন্তু এক না (ইসলাম, ২০১৮)।

৫.১.২.১.৮ স্বাধীনতা উত্তর বার্মায় আরাকান (রাখাইন)

৪ জানুয়ারী, ১৯৪৮ সালে ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু আরাকান ব্রহ্মদেশের অধীনে একটি প্রদেশ হিসেবে থেকে যায়। ১৯৪৮-৭৮ সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ৩০ বছর বর্মী শাসক শ্রেণী এই দেশটির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেনি। শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরাকান এখনও মধ্যযুগীয় অবস্থায় রয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রায় চল্লিশ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত আরাকানে মাত্র সতেরটি হাই স্কুল ও একটি মাত্র ইন্টারমিডিয়েট কলেজ রয়েছে (খান, ১৯৭৮)। আরাকানের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও মধ্যযুগীয় অবস্থায় বিদ্যমান। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মাইল পাকা রাস্তা রয়েছে (খান, ১৩৮৬)।[১১] ১৯৪৮ সালে 'ইউনিয়ন সিটিজেনশীপ আইন' পাশ হয় (www.burmalibrary.org/docs)।[১২] বৌদ্ধ ইনস্টিটিউটের পরিচালক থিন বলেন, সেনাবাহিনী, অং সাং সুচি, '৮৮ প্রজন্মের শিক্ষার্থী এবং রাজনীতিক-আমরা সকলে জাতীয় পরিচয় এর ক্ষেত্রে একমত পোষণ করি" (Carlos, 2012)।

নে উইনের রাজত্বকালে অনেকের নাগরিকত্ব খর্ব করা হয় এবং তাদের আদিবাসী পরিচিতিকে অস্বীকার করা হলো। একটি নতুন আইন করা হয়নি যেখানে ভালোভাবে আইনটিকে পরীক্ষা করা। আদিবাসী জাতীয়তা যা তুলে ধরা হয়েছে তা নকল বা আবিষ্কৃত কোন তথ্য নয় এবং সংকীর্ণ জাতীয় শ্রেণির জন্য এটি প্রযোজ্য নয়। আদিবাসী ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল উপনিবেশ আমলে এবং তারও

১১. এই সড়কটি রাথিডং থেকে বুথিডং পর্যন্ত প্রসারিত। সপ্তাহে মাত্র একবার একটি স্টীমার আকিয়াব থেকে রেঙ্গুন এবং রেঙ্গুন থেকে আকিয়াব যাতায়াত করে। স্থ পথে মূল ভূখণ্ডের সাথে আরাকানের যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই, কেবল দু'টি গিরি পথ রয়েছে, তা শুধু সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।; খান, আব্দুল মাবুদ, "*আরাকানের মুক্তি সংগ্রাম ও তার উৎস*", ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৩ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৮৬, পৃ. ১০০

১২. Available online here: http://www.burmalibrary.org/docs/UNION_CITIZENSHIP_ACT-1948. htm

আগে। অন্যরা যেমন কাচিন বা চিনরাও এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে। কারণ এই পরীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছে একটি আদিবাসী ভুল বুঝাবুঝি এবং দল নির্মাণ থেকে। কিন্তু এটি ছিল একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, যেখানে একমাত্র মুসলিমদের অস্তিত্ব ঝুকির মুখে পড়ে। সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য জাতি বিনির্মাণের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তাদেরকে বলির পাঠা বানানো হয়েছে। কোন সূত্রই তাদেরকে একত্রিত করতে পারছে না বরং প্রতিনিয়ত তারা হুমকির মুখে। রাখাইন ও বর্মীরা মুসলিমদেরকে তাদের সাধারণ শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উ নু বিদ্যমান সম্প্রদায়গত বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে একটি ফেডারেল সম্মেলন আহ্বান করেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল নে উইন বর্মী জাতিগত অভিযানের প্রশ্নে কোন ছাড় দিতে রাজী ছিলেন না। এ মুহূর্তে বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বীকৃতি প্রদান উ নু শাসনের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়েছে। ১৯৬২ সালে মিয়ানমারের সামরিক শাসক নে উইন একদলীয় স্বৈরশাসন এবং একদলীয় রাজনীতি এবং নিয়ন্ত্রণবাদী অর্থনীতি চালু করে। ১৯৮৮ সালে এই শাসনের অবসান ঘটাতে ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু হয়। ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে নে উইন ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। এ সময় ছাত্র জনতার একটিই শ্লোগান ছিল-'We want nothing but democracy, we will fight to the last drop of blood (*Asia week*, vol-14, 1988).[১৩] নে উইনের অনুসারী ও সহযোগী সেইন লুইন এর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে পর্দার অন্তরালে চলে যান নে উইন। ১৯৮৮ সালে ছাত্র জনতার আন্দোলনে এগিয়ে আসেন জেনারেল অং সানের কন্যা অং সান সুচি গঠন করেন ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমক্রেসি বা (NLD)।

৫.১.২.১.৯ স্বাধীনতা উত্তর বার্মায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী ব্রিটিশদের নিকট থেকে বার্মা স্বাধীনতা লাভের পর বড় ধরনের রোহিঙ্গা সমস্যা দেখা যায় ১৯৭৮, ১৯৯১-৯২, ২০১২, ২০১৬ এবং সর্বশেষ ২০১৭ সালে। মূলত: ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষই সাম্প্রদায়িক বিভেদের সূচনা করেছিল। আরাকানীজ মুসলিমদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের বিরুদ্ধে মগ সম্প্রদায় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্রিটিশদের প্রচারনাকে তুঙ্গে তুলতে থাকলে বর্মী সরকার পরিকল্পিতভাবে উচ্ছেদ অভিযানে নামে। স্বাধিকার আন্দোলনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আরাকানীজ মুসলিমদের স্বতন্ত্র কোন নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে না পারায় অপপ্রচার সত্যায়নের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে আরাকানীজ মুসলিমরা আরাকানের বৈধ নাগরিক হয়েও বার্মার সংবিধানে নৃতাত্ত্বিক বা বুনিয়াদী জাতি হিসেবে তালিকাভুক্তির দাবী আদায়ে ব্যর্থ হয় (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। মুসলিম নের্তৃবৃন্দ বর্মী সরকারের কাছে '৪২ এর গণহত্যার উপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে বিতাড়িত আরাকানীজ মুসলিমদের স্বীয় বসতবাড়িতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেবার আবেদন জানালে AFPFL সরকার এ সকল দাবী প্রত্যাখ্যান করে এবং সরকারী চাকরী হতে আরাকানীজ মুসলিমদের

---

১৩. *Asia week*, vol-14, 2 September, (1988); ও চৌধুরী, সুরমা জাকারিয়া, *মিয়ানমার: গণতন্ত্রের পথে*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনবিংশ খণ্ড, হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, গ্রীষ্ম-শীত ১৪১৮/২০১১, পৃ.৩৫৫

অপসারণ করে তদস্থলে মগদের নিয়োগ শুরু করে। ফলে আরাকানীজ মুসলিমরা ক্রমশ: আন্দোলনমুখী ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। বার্মার স্বাধীনতার এক দশকেরও বেশী সময় অতিবাহিত হবার পরও অ-বর্মী সম্প্রদায়গুলো লক্ষ্য করল অধিকাংশ বর্মী শাসক তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের সাথে সাথে সাংঘাতিকভাবে অবহেলা ও বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এই বঞ্চনা ও আধিপত্যবাদী শাসন-শোষণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর মাঝে বিদ্রোহের জন্ম দেয়। অত:পর বার্মার অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়য়ের মত মুসলিমদের নিরাপত্তা ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের দাবী জানিয়ে GCBMA এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্থানে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। প্যানলং সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শান, কাচিন, কায়া, কারেন, ও চিন রাজ্যগুলো অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। এ রাজ্যগুলোর মতোই আরাকান পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তা অধ্যুষিত রাজ্য হয়েও বোধপায়া কর্তৃক দখলীভূক্ত আরাকানের এক ইঞ্চিও শৃঙ্খল মুক্ত হয়নি। যে স্বপ্ন আর প্রত্যাশায় মুসলিমরা অং সানকে সমর্থন দিয়েছিল, শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ, মুসলিমদের ধর্মচ্যুতিকরণ ও সাংস্কৃতিক আত্মীকরণের নামে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিনাশ সাধন করে ব্যাপকভাবে বর্মীকরণ প্রক্রিয়ায় তাদের সে প্রত্যাশা গভীর হতাশায় রুপান্তরিত হয় (হাবিবউল্লাহ, ১৯৯৫)। বার্মা কর্তৃপক্ষ ১৯৪৭ সালে নতুন শাসনতান্ত্রিক পরিষদ নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রণীত ভোটার তালিকায় ‘সন্দেহজনক নাগরিক’ অজুহাতে আরাকানের মুসলিম অধ্যুষিত জনপদগুলোকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়। বার্মার প্রথম প্রধানমন্ত্রী উ নু’র মত ব্যক্তিত্ব আরাকানে আরাকানীজ মুসলিমদের প্রতি সার্বজনীন সুনজর দিতে পারেন নি; বরং ন্যূনতম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন। উ নু’র শাসনকালে স্বাধীনতার পরপরই ১৯৪৮ সালে আরাকান থেকে মুসলিমদের বিতাড়ন ও তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি সৃষ্টির পদক্ষেপ হিসেবে আকিয়াবের মগ ডেপুটি কমিশনার ক্যাইউ (Kyawu) এর নেতৃত্বে ৯৯% মগদের নিয়ে ইমিগ্রেশন অ্যাক্টের অধীনে তদন্তের নামে Buma Teitoial Foce (BTF) গঠিত হয়। BTF উত্তর আরাকানের বুদ্ধিজীবি, গ্রাম্য প্রধান, উলামা এবং হাজার হাজার সাধারন মানুষকে হত্যা করে এবং মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামের বাড়িঘর জালিয়ে পুড়িয়ে দেয় (Yusuf, 1992)। Muhammed Yunus এর বলেন-

> “*The BTF under the diection of tte Deputy Commissioner of Akyab district, kyaw U, a Magh, unleashed a reign of teror in the whole north Aakan. Muslim men-women and children were moved down by machingan fire. Hundreds of intellectuals, vellage elders and Ulema were killed like dogs and rats. Almost all- Muslim villages were azed to the ground. The BTF massacare triggered refugee exodus into the then East Pakistan numbering more than 50,000 peopel.”*(Yunus, 1994)

বার্মার স্বাধীনতার এক দশকেরও বেশী সময় অতিবাহিত হবার পরও অ-বর্মী সম্প্রদায়গুলো লক্ষ্য করল অধিকাংশ বর্মী শাসক তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের সাথে সাথে সাংঘাতিকভাবে অবহেলা ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক ব্যবহার করেছে। বঞ্চনা ও আধিপত্যবাদী শাসন-শোষণ

সম্প্রদায়গুলোর মাঝে বিদ্রোহের জন্ম দেয়। বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উ নু বিদ্যমান সম্প্রদায়গত বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে একটি ফেডারেল সম্মেলন আহ্বান করেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল নে উইন বর্মী জাতিগত অভিযানের প্রশ্নে কোন ছাড় দিতে রাজী ছিলেন না। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, এ মুহূর্তে বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বীকৃতি প্রদান উ নু শাসনের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়েছে। ১৯৬০ সালে ক্ষমতা গ্রহন করে উ নু রেঙ্গুন বেতার কেন্দ্র হতে রোহিঙ্গাদের জন্য রোহিঙ্গা ভাষায় একটি অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বার্মার বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের বার্মার একটি বুনিয়াদী জাতি হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী উ নু রোহিঙ্গাদের একটি শান্তি প্রিয় জাতি হিসেবে উল্লেখ করে বিদ্রোহী সশস্ত্র মুজাহিদদের আত্মসমর্পনের অনুরোধ জানায়। ১৯৬১ সালে তাঁর এ আহ্বানে রোহিঙ্গা মুজাহিদগণ সাড়া দিয়ে অস্ত্র সমর্পন করে। এই অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে বার্মার ভাইস চীফ অফ ষ্টাফ ব্রিগেডিয়ার অংজী যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন তা 'মেয়ু শিরে' শিরোনামে বার্মা সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করে প্রচার করা হয়। এতে ব্রিগেডিয়ার অংজী উল্লেখ করেন, পৃথিবীর সব সীমান্তে একই জাতি সীমান্তের দুই পারে বসবাস করে। এজন্য কোন নাগরিকের জাতীয়তা প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া উচিত নয় (The Daily Gurdian, Rangoon, 1960)।

৫.১.২.১.১০ সামরিক শাসনামলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী (১৯৬২-২০১১)

১৯৬২ সালের ২ মার্চ ফেডারেল সম্মেলন শেষ হবার পূর্ব মুহূর্তে একটি রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উ নু কে হটিয়ে ক্ষমতা দখল পূর্বক বার্মাকে নিষিদ্ধ গণতন্ত্রের দেশে পরিণত করে রোহিঙ্গাসহ বার্মার সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সকল প্রকার সংবিধানিক অধিকার বাতিল করা হয় (Yunus, 1994)। জেনারেল নে উইন ক্ষমতায় এসে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিধ ঘোষণা করে এবং ৯৫% সামরিক অফিসার ও সামান্য সংখ্যক বর্মী সাধারণ নাগরিক নিয়ে Burma Socialist Program Party (BSPP) গঠন করে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে শাখা প্রতিষ্ঠা করে। রোহিঙ্গারা নবগঠিত BSPP-তে যোগ না দিলেও আরাকানের মগরা ব্যাপকভাবে যোগদান করে (Yunus, 1994, p. 148)। রোহিঙ্গারা প্রধানত: কৃষিজীবী হলেও আকিয়াবসহ আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবন যাপন করত। নে উইন ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশের ব্যাংক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রীয়করণ করলে রোহিঙ্গা ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষত: বিভিন্ন ইস্যুতে মগদের অত্যাচার ও লুটপাটের কারণে আতংকিত ব্যবসায়ীরা জীবিকা নির্বাহের অন্য পন্থা অবলম্বন শুরু করে। জেনারেল নে উইন Burmese way to Socialism কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে মূলত বৌদ্ধধর্ম, বর্মী-জাতীয়তাবাদ ও মার্কসবাদের একটি অদ্ভুত মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করে দেশের অর্থনীতিকেও মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে তোলেন (Yunus, 1994)। জেনারেল নে উইন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই রোহিঙ্গা নির্মূলের জন্য আরাকানী মগদের উস্কিয়ে দেন। যদিও ১৯৬৫ সালের অক্টোবর থেকে Burma Broad casting Service (BBS) থেকে নিয়মিতভাবে রোহিঙ্গা ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে দেন (Yunus, 1994)। অথচ উ নু

এর শাসনামলেও বার্মার ক্যাবিনেটে মুসলিম সদস্য ছিল। আরাকানের আকিয়াব অঞ্চলের অধিবাসী সুলতান মাহমুদ ছিলেন মুসলিমমন্ত্রী এছাড়াও খনিজ ও শ্রমমন্ত্রী ছিলেন উ খিন মং লাট, শিল্পমন্ত্রী ছিলেন উ রশীদ এবং মালয় ফেডারেশন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে বার্মার রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ ও স্বাস্থ্য বিভাগেরও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বার্মার মুসলিম কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব পালনের সুবাদে তিনি সে সময় মধ্যপ্রচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে স্বার্থকভাবে মিশন পরিচালনা করেন এবং সে সময় বহু খ্যাতিমান ও উচ্চপদস্থ মুসলিম বার্মায় আগমন করেন। কিন্তু নে উইন ক্ষমতা গ্রহণের পর আর কোন মুসলিমকে মন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়নি বরং তিনি আরাকানের প্রশাসনকে বৌদ্ধকরণ করে অনেক মুসলিম পুলিশকে বার্মার দূর্গম এলাকায় বদলী করেন এবং অনেককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। উচ্চপদস্থ মুসলিম কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ অথবা উত্তর আরাকান হতে অন্যত্র বদলী করা হয়। পক্ষান্তরে মগদের চাকরি ও ব্যবসার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দানের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মুসলিমদের চাকরি রক্ষা কিংবা পদোন্নতির জন্য স্বধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল (দৈনিক আজাদ, ১৯৯১)।

নে উইনের শাসনামলে কয়েকবার মুদ্রা অচল ঘোষণার ফলে মুসলিমদের জন্য এক শাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। আরাকানী মগরা নিজেদের মধ্যকার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও স্থানীয় BSPP এর সদস্য থাকার সুবাদে জমাকৃত অর্থের মূল্যমান নতুন টাকা ফেরৎ পেলেও রোহিঙ্গারা তাদের জমাকৃত টাকা ফেরত পায়নি। এ মুদ্রা বাতিল বিষয়ে এ.এফ.কে জিলানী বলেন -

> *On May 1964 the BSPP government demonetised currency notes of kyats 50 and 100. Under the initial term of swap sums, up to value of 500 were to be exchanged. Above that sum only 50% refund was allowed while the saver's source of finance were investegated, taxed and in some cases confiscated. Later the regime changed the terms of the currency swap limiting refund to 25%.*(Jilani, 2001)

পক্ষান্তরে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও রেশন বিতরণে সার্বিক তদারকি মগদের হাতে থাকায় মুসলিমদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে (Yunus, 1994)। সরকারীভাবে রোহিঙ্গাদের মজুদকৃত খাদ্য-শস্য জোপূর্বক আদায় এবং সামরিক-আধাসামরিক বাহিনীর লুটপাটের মাধ্যমে তাদের গোলাশূন্য করা হয়। এদিকে তাদের অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, খাদ্য-শস্য লুট, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ এবং মুদ্রা অচল ঘোষণায় অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে যাত্রা করে। অন্যদিকে সাংগঠনিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে তাদের প্রতিবাদের ভাষা কেড়ে নিয়ে সরকারীভাবে নির্যাতন চালানো হয়। এমতাবস্থায় রোহিঙ্গাদের মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ছাড়া আরা কোন গত্যান্তর ছিল না (Yunus, 1994। Muhammed Yunus এর ভাষায়–

> *“After the nationalization of the shops, emonelisation and imposition of restriction on movement, the backbone of economy of the Rohingyas*

crumbled...The military quelled the riots with iron hand killing many persons. During 1967 crisis many Muslims died of Starvation.” (Yunus, 1994)

উ নু’র শাসনামলে বর্মি জাতীয়তাবাদ বৌদ্ধ ধর্মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু সামরিক জান্তা নে উইন এই জাতীয়তাবাদকে সমাজতন্ত্রের কঠোর নীতিগুলোর সাথে মিশ্রিত করেছিল। বার্মানাইজেশন প্রক্রিয়াটিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে অব্যাহত ও পরিপূরক করে তুলেছিল। নে উইনের প্রশাসনের মূল বিষয়টি বার্মীজ আদলে সমাজতন্ত্র দ্বিগুণ রাজনৈতিক কৌশল নিয়েছিল-(১) রাষ্ট্রের কেন্দ্রীকরণ ও সামরিকীকরণ; (২) সামরিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে অ-বার্মান নৃগোষ্ঠীর সংখ্যালঘু অবসান ঘটানো হয় (Smith, 1999, p. 199)। নে উইন-উ নু একক রাষ্ট্রের ধারণাকে মনে করেছিলেন ফেডারেলিজম অসম্ভব তাই এটি ইউনিয়নকে ধ্বংস করবে (Smith, 2007, p. 31)। এ জাতীয় অবস্থানকে ন্যায়সঙ্গত ও বৈধতা দেওয়ার জন্য নে উইন কৌশলগতভাবে অং সানের বক্তৃতাগুলোর একটি অংশের কথা উল্লেখ করেন। যেখানে অং সান নির্দেশ করেছিলেন যে কোনও জাতির ঐক্য তার অংশগ্রহনের উপর বিরাজ করে। যদিও জাতি, ধর্ম এবং ভাষা এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, কেবলমাত্র তাদের ঐতিহ্যবাহী আকাঙ্ক্ষা এবং সুস্থতার জন্য ঐক্যের মধ্যে বেঁচে থাকার ইচ্ছাই জনগণকে একত্রে আবদ্ধ করে এবং তাদেরকে একটি জাতিতে রূপান্তরিত করে তোলে” (Silverstein, 1980, p. 231)। জাতীয় ঐক্যের সন্ধানে বার্মার সরকারী ভাষা হিসেবে বার্মীজকে গ্রহণ করা বিশেষভাবে বিতর্কিত হিসেবে দাঁড়ায়। রোহিঙ্গা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ১৯৫৬ সালে ইউনাইটেড রোহিঙ্গা সংস্থা ও ১৯৬০ সালে রোহিঙ্গা যুব সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় রোহিঙ্গা ছাত্র সমিতি, রোহিঙ্গা জামিয়াতুল উলামা, আরাকান জাতীয় মুসলিম সংস্থা এবং আরাকানীজ মুসলিম যুব সংস্থা-১৯৬৪ সালে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। রোহিঙ্গা ভাষা প্রোগ্রামটি বার্মা ব্রডকাস্টিং সার্ভিস (বিবিএস) রেঙ্গুন থেকে সম্প্রচারিত ১৯৬৫ সালের ৩ অক্টোবর বাতিল করা হয়েছিল। মুদ্রা জাতীয়করণ এবং আরোপিত চলাচলে সীমাবদ্ধতার কারণে রোহিঙ্গাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। আরাকানীজ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকেরা মুসলিমদের থেকে ভোগ্যপণ্য সস্তা দামে লাভ করে তা কালো বাজারে বিক্রি করে। মুসলিমদের পূর্বে পরিচালিত আন্ত:বাণিজ্য প্রধানত এখন বৌদ্ধদের হাতে চলে যায়। ব্যতিক্রম কিছু বাদে চাকরিপ্রাপ্তরা কোনও মুসলিমকে সরকারের সুবিধার অধিকারী ছিল না; রেশন বিতরণ ব্যবস্থায় যেখানে সমস্ত বৌদ্ধরা এটি থেকে উপকৃত হয়েছিল। সীমান্ত বাণিজ্য পুরোপুরি আরাকানীজ বৌদ্ধ এবং সরকারী সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে সমস্ত মুসলিমরা ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ছিল; তাদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, তাদের বেশিরভাগ অংশটিকে ব্যবসা ত্যাগ করতে হয়েছিল। সামরিক শাসন সর্বাত্মকভাবে উপস্থাপন করেছিল আরাকান শুধু বৌদ্ধদের উপার্জনের সুযোগ সুবিধা হিসেবে।

১৯৬৭ সালে সংকট চলাকালীন বহু মুসলিম অনাহারে মারা যায়। এদিকে সামরিক শাসন দ্বারা আরাকান মুসলিমদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন চলে অবিরাম। সেনাবাহিনী কর্তৃক গভীর রাত্রে

বিশিষ্ট মুসলিমদের গ্রেপ্তার করা, ওয়ারেন্ট ছাড়াই তাদের নির্যাতন এবং চাঁদাবাজির পরে তাদের ছেড়ে দেয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিচারকরা মুসলিমদের হয়রানি এবং তাদের ন্যায়বিচার অস্বীকার করার নির্দেশ স্পষ্ট ছিল। উৎসাহিত বৌদ্ধ মগরা সর্বত্র মুসলিমনকে তাদের মারধর এবং আক্রমণ করে তাদের জিনিসপত্র লুট শুরু করে। মুসলিমরা যখন পুলিশ স্টেশনে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে মুসলিমরা বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। পুলিশ কর্তৃক এই ধরণের আচরণ মুসলিমদের ভীত করেছিল; সামরিক শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এটি অব্যাহত রাখে। শারীরিক নির্যাতন ছাড়াও নারী নির্যাতন, শ্লীলতাহানি, অর্থ চাঁদাবাজি এবং অনেক নিরীহ রোহিঙ্গা অবৈধ অভিবাসী হওয়ার মিথ্যা অভিযোগে কারাদণ্ডের শিকার হয়। এই লোকদের মধ্যে অনেকেই বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) পাড়ি জমায়। সুতরাং ২০০৮ সালে জনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে গণতন্ত্রের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মূল চাবিকাঠি সংবিধান অবশেষে বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং ২০১০ সালের নির্বাচনের পূর্বাভাস দিয়েছিল, তারপরে সেনাবাহিনী থেকে বেসামরিক শাসনে রূপান্তর হয়। সরকার নতুন সংবিধান এবং ২০১০ সালের নির্বাচনের জন্য গণভোট ঘোষণা করে (Booth, J. 2007)।

বার্মীজ বাহিনী আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে আক্রমণ করে পুলিশ ফাঁড়ি, কিছু সেনা হত্যা এবং অস্ত্র এবং গোলাবারুদ বহন করে। রোহিঙ্গা মুসলিমদের বাড়িঘর উপড়ে ফেলে সমতলকরণ, বর্বর অত্যাচার মসজিদ ও মাদ্রাসা ধ্বংস, গণ-গ্রেপ্তার, মারধর, নির্যাতন, হত্যা, গণধর্ষণ, শ্রমদাস, চলাচলের সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধতা এবং জোর উচ্ছেদ করে হাজার হাজার শরণার্থীদের বাংলাদেশে ঠেলা শুরু করে। নতুন করে গত জুন ২০১২ সালে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মারা গেছে অসংখ্য রোহিঙ্গা এবং উদ্বাস্তু হয়েছে প্রায় এক লাখ। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার সাম্প্রতিক হিসাব মতে, মিয়ানমারের সহিংসতায় এ পর্যন্ত ২৮ হাজার রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত ও প্রাণ বাচাঁতে পালিয়ে গেছে (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২০১২)। জাতিসংঘের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূত টমাস ওজেয়া কুইনটানা এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক তদন্তকারী দলের পক্ষ থেকে দেয়া এক যৌথ বিবৃতিতে মিয়ানমার সরকারের প্রতি আহ্বান জানান যে, মিয়ানমারের চলমান সহিংস পরিস্থিতিকে যেন রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা না হয়। একই সাথে অবিলম্বে সহিংসতা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করে মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য মিয়ানমার সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় (*দৈনিক আমার দেশ*, ২০১২)। এছাড়া জাতিসংঘ রোহিঙ্গাদেরকে বিশ্বের অত্যন্ত নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের অন্যতম হিসেবে তালিকাভূক্ত করেছে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-এর মহাসচিব একমেলুদ্দিন ইহসানগলু অব্যাহত রোহিঙ্গা গণহত্যা ও নির্যাতনে উদ্বেগ প্রকাশ করে অং সান সু চি'র কাছে লিখিত এক পত্রে বলেন,

> *Ekmeleddin Ihsanoglu said, the pan-Muslim body was confident Suu Kyi "would play a positive role in bringing an end to the violence that has*

afflicted Arakan (Rakhine) state...expressing hisædeep concern about the unabated and continuous violation of Rohingya rights in Myanmar.(www.dailytimes.com, 2012)[১৪]

জেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে মিয়ানমারের গনতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী নোবেল বিজয়ী অং সান সুকি বলেন, "আরাকান রাজ্যের রোহিঙ্গা মুসলিমদের স্ট্যাটাস (সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা) সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নয়। সমস্যাসমাধানে বার্মা সরকারের উচিত নাগরিকত্ব আইনের ব্যাখ্যা করা (http://www.irrawaddy.org/archives, 2012)।"[১৫] তিনি আরও বলেন, আপনি যখন রোহিঙ্গাদের কথা বলেন, আমরা তখন নিশ্চিত নই, কাদের সম্পর্কে আপনি কথা বলছেন। যদিও পরে অবশ্য অং সান সুকি মুসলিমদেরকে মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে সরকার যে গণহত্যা শুরু করেছিল তাতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রত্যেক দেশেই নাগরিকত্ব দেয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে এবং এ আইন অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানের ভিত্তিতে হতে হবে। জাতিসংঘের ১৯৩ সদস্য দেশের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ সভায় মিয়ানমারে চলমান জাতিগত সংকট নিরসনে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে রোহিঙ্গা মুসলিমদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব দেওয়াসহ সব ধরনের মানবাধিকার রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মিয়ানমার সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয় (আহম্মেদ, ২০১২)। হাজার বছরের বেশী সময় ধরে মিয়ানমারে বসবাস করে আসা রোহিঙ্গা মুসলিমদের নাগরিক বলে স্বীকার করেনা দেশটির সরকার। কখনো বা তাদের বাংলাদেশী বলা হয়। ফলে রোহিঙ্গারা সেদেশের যাবতীয় নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাঁদের স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে কোন দায়িত্ব নেই সরকারের। সরকারের এ অবস্থানের কারণে রোহিঙ্গারা সেদেশে বসবাস করছে 'রাষ্ট্রহীন' হয়ে। মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন দাবী করেছেন, রাখাইন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার জন্য জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা দায়ী। তিনি আরও বলেছেন, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেয়া হবে না। তাঁদের জন্য শরণার্থী ক্যাম্প বা নির্বাসনই সাম্প্রদয়িক অস্থিরতা বন্ধের একমাত্র সমাধান। প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা মিয়ানমারের জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে বলেও তিনি দাবী করেন। জাতিসংঘের শরনার্থী বিষয়ক সংস্থার প্রতিনিধিদের মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট উ থেইন সেইন একই কথা বলেন। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক দূত অ্যান্টনিও গুতেরেস বলেছেন, রোহিঙ্গাদের অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার কাজ নয়। বরং জাতিসংঘ চায় রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হোক (*দৈনিক দিনকাল*, ১৪ জুলাই, ২০১২)।

---

১৪. www.dailytimes.com.pk/default.asp? Page =2012\07\06\story_6-7-2012_pg14_2.: http://www.mizzima.com/news/inside-burma/7472-muslim-states-ask-suu-kyi-to-help-end-muslim-violence.html; Accessed on 19.11.2012

১৫. http://www.irrawaddy.org/archives/7183, (Accessed on 19.06.2012)

মিয়ামারের সামরিক জান্তা জানতে চায় না, অন্যদেরও জানতে দিতে চায় না-সে দেশের রোহিঙ্গাদের রয়েছে নিজস্ব সুদীর্ঘ ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতি। সাম্প্রতিক সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরুর পর থেকে নির্যাতনের শিকার হয়ে হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলিম জীবন বাঁচাতে নৌকাযোগে নাফ নদী পার হয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড ও কোষ্ট গার্ড সরকারের সিদ্ধান্তে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশে বাধা প্রদান করে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, মধ্য জুন ২০১২ থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আশ্রয় নিতে আসা অন্তত এক হাজার ৩শ' রোহিঙ্গাকে জোর করে মিয়ামারে ফেরত পাঠিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আল জাজিরা টেলিভিশনকে বলেন, বাংলাদেশ আর রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বোঝা বহন করতে পারবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অধিকসংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দায়ভার নেয়া সম্ভব নয়। এটি মিয়ানমারের আভ্যন্তরীণ বিষয় (*দৈনিক যায়যায়দিন ও দৈনিক আমাদের সময়*, ২০১২)। রোহিঙ্গা সমস্যা মূলত: মানবসৃষ্ট একটি রাজনৈতিক যন্ত্রণা যার সাথে আছে ধর্মীয় এবং জাতিগত বিদ্বেষ। এসব কিছুর পরও দীর্ঘদিন থেকে বসবাস করা আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিতাড়িত করতে রাখাইন বৌদ্ধরা মরিয়া হয়ে উঠে। সে তৎপরতা যে শুধু জাতিগত নয়, রাজনৈতিকও বটে। এ দেশটির নেতৃত্ব সে বিষয়ে একটি বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে পরোক্ষভাবে বিষয়টি বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করল। 'গণতন্ত্রের মানস কন্যা' বলে পরচিত অং সান সুকি'ও রোহিঙ্গা মুসলিমদের 'বাংলাদেশী' বলছেন। অথচ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব মাত্র ৪৭ (সাতল্লিশ) বছর। অন্যদিকে রোহিঙ্গা মুসলিমরা রাখাইন (পূর্বে আরাকান নাম ছিল) রাজ্যে বসতি স্থাপন করে প্রায় ১২ শত বছর পূর্বে। তখন সেটা আজকের মিয়ানমারও নয়। এই হিসাবেও কোন সম্প্রদায়কে কেউ যদি পূর্ব পুরুষদের দেশই মূল দেশ বলে গায়ের জোর খাটাতে চান, তাহলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এমন বহু জনগোষ্ঠী রয়েছে, যারা সেখানে টিকে থাকতে পারবে না। মিয়ানমারেও এধরনের বহু জনগোষ্ঠীর বাস রয়েছে। ঘটনা যাই হোক, এভাবে যদি হাজার বছরের একটি প্রতিষ্ঠিত আদি জনগোষ্ঠীকে সহিংস নির্যাতনের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয় তবে তা পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হিসেবেই বিবেচিত হবে। বর্মী সেনাদের অত্যাচার, নির্যাতন ছাড়াও বিভিন্ন কারণে বিপুল সংখ্যক আরাকানী শরণার্থী নিজেদের বাস্তভিটা ত্যাগ করে দক্ষিণ চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে আশ্রয় গ্রহণের কিছু কারণ বিদ্যমান ছিল তা হলো-

এক. বোধপায়ার আরাকান দখলের ১০০ (একশত) বছর পর ব্রিটিশ শক্তি তিনধাপে সমগ্র বার্মা দখলে নিলে চট্টগ্রামও সেই ব্রিটিশ শক্তির অধীনে থাকায় আরাকান-চট্টগ্রামের মধ্যে সীমান্ত পারাপারে কোন সমস্যা ছিল না। **দুই.** ভৌগোলিকভাবে বার্মা আরাকান থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। **তিন.** চট্টগ্রামের সাথে আরাকানীদের ঐতিহ্যগত, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। **চার.** আরাকানে মুসলিম বান্ধব পরিবেশ নষ্ট হওয়ায় বৌদ্ধদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, এতে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তাহীন পরিবেশ তৈরী হলে আরাকানীরা নিরাপত্তার সন্ধানে চট্টগ্রামে আশ্রয় নেয়। এছাড়া জনৈক ইংরেজ ক্যাপ্টেনের

ডায়েরী থেকে জানা যায়, ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার মঘ শরণার্থী চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল (চৌধুরী, ১৯৯৪, পৃ.১৪৫)। বার্মীজ জাতীয়তাবাদের ইতিহাস বিবেচনা করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বার্মানাইজেশন এর টেকসই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংযুক্ত একটি বর্ণ, ভাষা এবং ধর্মের মডেলটির বিভিন্ন স্তরের ক্ষেত্রে কঠোর প্রয়োগ সময়ের তীব্রতার সাথে সাথে বহু-অ-বর্মান জাতিগত সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করা। বর্তমানে রোহিঙ্গা একটি বিশেষ বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং রোহিঙ্গাদের জন্য বার্মীজ জাতীয়তাবাদের প্রভাবগুলো মূল্যায়নের জন্য বর্মি জাতীয়তাবাদের সাধারণ দিক থেকে সরে যাওয়াই উপযুক্ত। ২০০৮ সালে একটি নতুন সংবিধান বাস্তবায়ন, তারপরে সংসদীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে ২০১০ সালের নির্বাচন এবং ২০১১ সালের জানুয়ারিতে সংসদ খোলার বিষয়টি সামরিক জান্তা থেকে রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সাথে মিয়ানমারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলে যায়। বহুদলীয় নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের অংশ হিসেবে ও পরে তাতমাদো আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব স্থানান্তরিত করে অনুসরণ করে নামমাত্র বেসামরিক সরকারকে ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সরাসরি শাসন করে। যদিও ১৯৯০ এর পরে ২০১১ সালে মিয়ানমারের প্রথম বহু-দলীয় নির্বাচন হয় (Macdonald, 2013)। নির্বাচনী কারসাজি এবং অন্যান্য সাংবিধানিক শর্তাদি মূলত প্রাক্তন সামরিক নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত, যারা নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন তাতমাদোর সাথে। এভাবেই সামরিক বাহিনী থেকে একটি নির্বাচনী কর্তৃত্ববাদী রূপে ক্ষমতাসীন সরকারকে স্থানান্তরিত করা এবং পুরাতন আদেশের একটি নির্দিষ্ট সমাপ্তি নশ্চিত করা হয়। আরও স্পষ্টভাবে তাতমাদো সরকারী তদারকির বাইরেও রয়েছে এবং এর একটি ক্ষমতাসীন ইউনিয়ন সংহতির মাধ্যমে সংসদে লক্ষণীয় প্রতিনিধি সংস্থা রয়েছে ডেভলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি) যা মূলত প্রাক্তন সামরিক জান্তার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল (Guilloux, 2010)।

৫.১.২.১.১১ ‘নাগরিকত্ব আইন’ এর খড়গ ১৯৮২

মিয়ানমারে নাগরিকত্ব নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় কেবল ১৯৮২ সালের ‘বার্মীজ সিটিজেনশীপ আইন’ দ্বারা। ১৯৮২ সালে ‘নাগরিকত্ব আইন’ এর মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাতিল এবং এই আইনের কারণে রোহিঙ্গারা ‘শরণার্থী’ পরিচয়ের চেয়েও মর্যাদার নিম্নধাপ অর্থাৎ ‘রাষ্ট্রহীন’ জনগোষ্ঠীর পরিচিতি পায়। এই আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে সামরিক জান্তা সরকার রোহিঙ্গাদেরকে তাদের নিজ দেশে পরবাসী করে। নাগরিকত্ব সম্পার্কিত এ আইন স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে তিন ধরণের নাগরিকত্বের মর্যাদা প্রদান করে- এক. সাধারণ নাগরিক, দুই. সহযোগী নাগরিক ও তিন. প্রাকৃতিকরণ নাগরিক। সামরিক জান্তা সরকার ১৩৫ (একশত পয়ত্রিশটি) ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও রোহিঙ্গাদেরকে নাগরিকের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তারা এখানকার নৃতাত্বিক কোন জনগোষ্ঠী নয় বরং; ব্রিটিশ শাসনামলে এই অঞ্চলে তারা অবৈধ অভিবাসন গড়ে তোলে। নাগরিক অধিকার থেকে রোহিঙ্গাদের বঞ্চিত করার এই ধারা শুরু হয় সামরিকজান্তা নে উইন (১৯৬২-১৯৮৮) এর শাসনামল থেকে। যদিও উ

নু এর নেতৃত্বাধীন সরকার (১৯৪৮-১৯৫২, ৬০-৬২) রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয় (Jilani, 1999)। বার্মা 'আবাসিক রেজিষ্ট্রেশন আইন ১৯৫১' এর অনুচ্ছেদ ৩৩ (বি) অনুযায়ী ১৯৫৪ সালে প্রথম মংডু'তে 'ন্যাশনাল রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট' (এনআরসি) প্রদান করে। পরবর্তীতে নে উইন সরকার ১৯৭৪ সালের 'ইমারজেন্সি ইমিগ্রেশন এ্যাক্ট ১৯৭৪' (জরুরী অভিবাসী আইন) এর মাধ্যমে আবার তা কেড়ে নেয়। নাগরিকত্ব সম্পার্কিত এ আইনে তিন ধরনের কোনটিতেই রোহিঙ্গাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রথম দিকে আলোচিত তিন ধরনের নাগরিকদেরকে যেখানে 'ন্যাশনাল রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট' (এনআরসি) প্রদান করা হয়েছে, সেখানে রোহিঙ্গাদেরকে প্রদান করা হয়েছে 'ফরেন রেজিস্ট্রশন সার্টিফিকেট' (এফআরসি)।[১৬]

৫.১.৩ মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং জাতিগত নির্মূলের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী

মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে নির্দিষ্ট করা হয়েছে অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ 'যা কারও বিরুদ্ধে নির্দেশিত বিস্তৃত বা নিয়মিত আক্রমণাত্মক অংশ হিসেবে বেসামরিক জনসংখ্যার ওপর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আক্রমণ' [Rome Statute (ICC Statute), 2187 U.N.T.S. 3]।[১৭] মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ হচ্ছে ক) জোরপূর্বক জনসংখ্যা স্থানান্তর ও নির্বাসন, খ) হত্যা, গ) ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন সহিংসতা অন্তর্ভুক্ত ঘ) আন্তর্জাতিক আদালত (আইসিসি) অপরাধের রোম সংবিধির দ্বারা সংজ্ঞায়িত অত্যাচার এবং অপরাধ। আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের (আইসিসি) রোম সংবিধি অনুসারে, অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপে কোনো বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত বিস্তৃত বা নিয়মতান্ত্রিক সচেতন হামলার অংশ হিসেবে পরিচালিত হওয়া আক্রমণ (Rome Statute, 2187 U.N.T.S. 3, 2002)।[১৮] আন্তর্জাতিক আইনশাস্ত্র সংজ্ঞায়িত করে যে, আক্রমণটি অবশ্যই বিস্তৃত বা নিয়মতান্ত্রিক হয়, তবে উভয়ই নাও হতে পারে

১৬. বার্মাতে নাগরিকদের জন্য এনআরসি কার্ড খুবই জরুরী। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী এই পরিচয়পত্র প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলে সে সন্দেহভাজন বলে বিবেচিত হবে অথবা তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা হতে পারে। এমকি তাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য এই কার্ড খুবই জরুরী। যেমন ট্রেন বা সিনেমা হলে টিকিট সংগ্রহের জন্য এই কার্ড প্রদর্শন অত্যাবশক।

১৭. Rome Statute of the International Criminal Court (ICC Statute), (2002), 2187 U.N.T.S. 3, entered into force July 1, art. 7, http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Rome_Statute_ICC/romestatute.html (accessed November 8, 2017). The Rome Statute entered into force on April 11, 2002 and the ICC has the authority to prosecute the most serious international crimes since July 1, 2002. Burma is not a party to the Rome Statute.

১৮. Rome Statute of the International Criminal Court, (2002), 2187 U.N.T.S. 3, entered into force July 1, art. 7, http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Rome_Statute_ICC/romestatute.html (accessed April 10, 2013)

(Art. 7(1)) ।[১৯] এতে ক্ষতিগ্রস্থদের সংখ্যা এবং একটি 'নিয়মতান্ত্রিক' আক্রমণ নির্দেশ করে- যা একটি পদ্ধতিগত পরিকল্পনা (Prosecutor v. Akayesu, ICTR, Case No. ICTR-96-4-T, Judgement (Trial Chamber I), September 2, 1998) ।[২০] আক্রমণটি অবশ্যই একটি রাষ্ট্রের বা সাংগঠনিক নীতির অংশ হিসেবে হয় (ICC Statute, art. 7(2) (a)) ।[২১] আরাকান রাজ্যে আরএনডিপি এবং বৌদ্ধ সংঘ (সন্ন্যাসীদের আদেশে) প্রদর্শিত মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দায়ী হতে পারে। এই ইস্যুতে আজ পর্যন্ত শীর্ষস্থানীয় রায়টিতে আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালতের বিচারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি প্রদত্ত গোষ্ঠী [আইসিসির রোমে] সংবিধি'র অধীনে একটি সংস্থা হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করতে কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়-(i) গোষ্ঠীটি কোনো দায়িত্বশীল কমান্ডারের অনুক্রমের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা; (ii) বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যাপক নিয়মতান্ত্রিক আক্রমণ বাস্তবায়নের উপায় গোষ্ঠীর মালিকানাধীন কিনা; (iii) একটি রাজ্যের অঞ্চলগুলোর কিছু অংশের উপর গোষ্ঠীটির নিয়ন্ত্রণ রয়েছে কিনা; (iv) প্রাথমিক হিসেবে বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এই গোষ্ঠীর অপরাধমূলক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা; (v) গোষ্ঠীটি স্পষ্টতই একটি বেসামরিক জনসংখ্যার আক্রমণ বা উদ্দেশ্য হিসেবে যুক্ত হয়েছে কিনা; (vi) গ্রুপটি বৃহত্তর গ্রুপের অংশ কিনা, যা উপরোক্ত কিছু মানদণ্ডকে পূরণ করে (ICC Statute, Case No. ICC-01/09, para. 93) ।[২২] জোরপূর্বক জনসংখ্যা স্থানান্তর, জোরপূর্বক নির্বাসন এবং নিপীড়ন নির্দিষ্ট অপরাধ রোমের সংবিধি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আদালত যে মানবতাবিরোধী তা নির্ধারণ করেছে বিশেষত আরাকান রাজ্যের পরিস্থিতির সাথে মিলে যায়।

---

১৯. Art. 7(1) (1997), Prosecutor v. Dusko Tadic, ICTY, Case No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment (Trial Chamber), May 7, para. 646, http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf (accessed April 10, 2013)

২০. Prosecutor v. Akayesu, ICTR, Case No. ICTR-96-4-T, Judgement (1998) (Trial Chamber I), September 2, , para. 579. In Akayesu the Trial Chamber defined widespread as "massive, frequent, large scale action, carried out collectively with considerable seriousness and directed against a multiplicity of victims.";http://www1.umn.edu/humanrts/instree/ICTR/AKAYESU_ICTR-96-4/Judgment_ICTR-96-4-T.html (accessed April 10, 2013); Prosecutor v. Kordic and Cerkez, ICTY, Case No. IT-92-14/2, Judgement (Trial Chamber III), February 26, 2001, para. 179; Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana, ICTR, Case No. ICTR-95-1-T, Judgement (Trial Chamber II), May 21, 1999, para. 123; Prosecutor v. Dusko Tadic, ICTY, Case No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment (Trial Chamber), May 7, 1997, para. 648. See also Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vokovic, ICTY, Case No. IT-96-23 and IT-96-23-1A, Judgement (Appeals Chamber), June 12, 2002, para. 94. In Kunarac the Appeals Chamber stated that "patterns of crimes–that is the non-accidental repetition of similar criminal conduct on a regular basis–are a common expression of [a] systematic occurrence."

২১. ICC Statute, art. 7(2) (a), (2013), http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/99_corr/cstatute.htm (accessed April 10, 2013)

২২. The Situation in the Republic of Kenya, (2010), Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, March 31, Case No. ICC-01/09, para. 93, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc854287.pdf (accessed September 13, 2012)

৫.১.৩.১ রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও জাতিগত সংঘাত

রোহিঙ্গা মুসলিমরা রাষ্ট্র কর্তৃক বিতাড়িত ও গণহত্যার শিকার একটি জনগোষ্ঠী। তাই বার্মার এক রোহিঙ্গা মুসলিম এর আকুতি ছিল নিম্নোরূপ -

> অর্থাৎ 'এই জীবদ্দশায় হয়ত আমাকে আর বলতে শুনবেন না, যে কোনো সময় আমার মৃত্যু হতে পারে'। এই আহাজারিটি বার্মা টাস্ক ফোর্সের এক স্বেচ্ছাসেবীকে টেলিফোনে জানিয়েছেন [২৮ অক্টোবর] বার্মার এক রোহিঙ্গা মুসলিম। তার আকুতি বলে দেয় সে কতটা হতোদ্যম ও আশাহীন। কয়েক সপ্তাহে বার্মার রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর উপর্যুপরি হামলায় পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। তবু এ অব্যাহত গণহত্যার শিকার রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি বিশ্ব নির্লিপ্ত (*দৈনিক আমাদের সময়*, ৩১ অক্টোবর, ১২)।

২৯ অক্টোবর, ২০১২ সালে বিশ্ব মিডিয়ায় প্রকাশ, বহু রোহিঙ্গা মুসলিম নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে নৌকায় পালিয়েছে প্রতিবেশী বাংলাদেশ কিংবা থাইল্যান্ডে। সদ্য প্রসূত ও ছয় মাসের শিশু সন্তানসহ আবাল বৃদ্ধদের প্রাণের আকুতি নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগরের চতুর্দিকে করুণ হয়ে আছড়ে পড়েছে। পাঁচ দশকের ওপর সামরিক জান্তা শাসিত এ মিয়ানমার তথা বার্মায় রোহিঙ্গা জাতিসত্তা নিধন কতটা বীভৎস, তা এখন সারাবিশ্ব নিউ ইয়র্কভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচের স্যাটেলাইট চিত্রে বিবিসি, সিএনএন ও আল-জাজিরা থেকে জানতে পেরেছে। সেখানে মাত্র ২৪-২৫ অক্টোবর রাখাইন অঙ্গরাজ্যের মুসলিম অধ্যুষিত কায়োকপিউ এলাকার সাড়ে ১৪ হেক্টর ভূমিতে অগ্নিদগ্ধে বিলীন হয়েছে ৬৩৩টি দালানসহ মানুষ বসবাসযোগ্য ১৭৮টি নৌযান ও ভাসমান বার্জ।

বার্মার রাষ্ট্র পরিচালিত টেলিভিশনে প্রাদেশিক সরকারের মুখপাত্র উইন মেয়াইং জানিয়েছেন, জাতিসত্তার পরিচিতি নির্ধারণ হয়নি এমন ১১২ জন নিহত ও ২৮১৮ টি ঘর-বাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাখাইন অঙ্গরাজ্যে গত জুন মাসে বৌদ্ধ ও মুসলিম জাতিগত দাঙ্গায় কমপক্ষে ৯০ জন নিহত এবং ৩ হাজার বাড়ি-ঘর অগ্নিকাণ্ডে বিলীন হয়েছে। সেই থেকে ৭৫ হাজার রোহিঙ্গা মুসলিম বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন করে রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার পর মিয়ানমার রাষ্ট্রের পলিসি হিসেবেই রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় নির্বিচারে, নির্মমভাবে হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ চালানো হয়েছে। যেখানে রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় পলিসি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি নির্দেশে একটি জনগোষ্ঠীর ওপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায় তখন তাকে কোনভাবেই জাতিগত সংঘাত বলার যৌক্তিক কোন কারণ নেই। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 'এখানে কোনো সংঘাত হয়নি, কেবল আঘাত হয়েছে। একপক্ষ পাইকারী হারে আঘাত করেছে, আরেক পক্ষ কেবলই বিনা প্রতিরোধে সে আঘাত সহ্য করেছে (উদ্দিন, ২০১৮, পৃ. ৯৭)। যখন দুই বা ততোধিক জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো সংঘাত হয় এবং পরস্পর পরস্পরকে আঘাতের কারণে হতাহতের ঘটনা ঘটে, তখন তাকে জাতিগত সংঘাত বা এথনিক কনফ্লিক্ট বলে। সে সংঘাতের

কারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক হতে পারে। তবে সাধারণত তাকেই জাতিগত সংঘাত বলে যেখানে দু'টি সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের মধ্যে সংঘাত সংঘঠিত হয়। কিন্তু রোহিঙ্গাদের ওপর যে একতরফা নির্যাতন হচ্ছে সেটা কোনোভাবেই দু'টি সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যকার পারস্পারিক সংঘাত নয়। অথচ রোহিঙ্গাদের ওপর দশকের পর দশক ধরে নির্মম নির্যাতনের ঘটনাকে সবসময় একটি 'জাতিগত সংঘাত; হিসেবে উপস্থাপন করে রাখাইন বনাম রোয়াহিঙ্গার মধ্যে সংঘাত হিসেবে বিষয়টা জায়েজ করে নেওয়ার একটা রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে মিয়ানমারের তরফ থেকে (উদ্দিন, ২০১৮, পৃ. ৯৬-৯৭)।

৫.১.৩.২ আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা গণহত্যা

জুন এবং অক্টোবর, ২০১২ বৌদ্ধ রাখাইন জনগোষ্ঠী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় বাড়িঘরে আগুন দিয়ে অনেক মুসলিমকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। কর্তৃপক্ষ এটি সুপারিশ করে যে রোহিঙ্গা এবং কামান মুসলিমদের বিরুদ্ধে মারাত্মক শক্তি ব্যবহার এবং জোরপূর্বক স্থানান্তর এর চেষ্টা করা হয়। এক কামান মুসলিম (৩১) হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন যে, তিনি ২৩ শে অক্টোবর কায়াক পিউতে একদল মুসলিমকে লক্ষ্য করে পুলিশকে গুলি চালাতে দেখেছেন। আমি পুলিশের পক্ষ থেকে গুলিবিদ্ধ তিনজনকে দেখেছি। তারা গুরুতর আহত ছিল এবং অবশেষে মারা যায়। ...তারা ঠিক আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, কাছে পানির বালতি ছিল আগুন থামানোর চেষ্টা করছি। আমি যখন জল আগুনে ঢালার চেষ্টা করছিলাম, আমার পাশের একজনকে মাথার পিছনে গুলি করা হয়েছিল (HRW, Arakan State, 2012)। নিহত ব্যক্তিরা হলেন-মুহাম্মদ রফি (২১), আলী খান (১৬) এবং ইব্রাহিম (১৭)। কিয়াকপইউ'র ৫২ বছর বয়সী কামান মুসলিম দোকানিও গুলি চালানোর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তিনি বলেন; আমার সামনে তিনটি ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। তারা মারা গেল এবং আমরা লাশগুলো মসজিদে নিয়ে গেলাম। পুলিশই তাদের গুলি করেছিল। তাদের মাথা, বুক, কানের পিছনে গুলি করা হয়েছিল (HRW, 2012)। কিয়াকপিউয়ে'র বাইক সিক গ্রামের ৪৯ বছরের একজন কামান মুসলিম হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেন; রাস্তার একপাশে ছিল রাখাইন এবং অপরপাশে মুসলিম। রাখাইন বৌদ্ধরা এসে মুসলিমদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমরা ঘরবাড়ির আগুন নিভিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিলাম। তারা মসজিদে পেট্রোল ভর্তি বোতল ফেলে দিয়েছিল। মসজিদে প্রায় ৫০/৬০টি বোতল নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ...এছাড়াও মসজিদের আশেপাশে কয়েকটি বাড়ি পুড়ে যায়। স্বাধীন আরাকান রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ম্রাউক-উ-তে চলছে বৌদ্ধ রাখাইনদের মিছিল। মিছিল চলছে মোটরসাইকেল, জীপগাড়ি, রিক্সা, টুক-টুক কিংবা সাইকেলে চড়ে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী লোক চলছে পায়ে হেঁটেই। তাদের সাথে আছে বর্শা, তরবারী, ধামা, বাঁশ, গুলতি, তীর-ধনুক এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে পেট্রোল বোমাও। তাদের লক্ষ্য নিরস্ত্র রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠী। ঐ মিছিলেই জনৈক বৌদ্ধ সন্ত্রাসীকে গলা-কাটার মতো ভয়াবহ ইশারা-ইঙ্গিত করতে দেখা যায় (দি ইকনমিস্ট, ২০১২)। দুঃখের বিষয় এই যে ম্রাউক-উ'ই একমাত্র শহর নয় যেখানে রোহিঙ্গা মুসলিমরা পরিকল্পিত গণহত্যার মুখোমুখি। মিয়ানমার থেকে জানা যাচ্ছে

যে স্থানীয় সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, পুলিশ ও নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনীর মদদে রাখাইন বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা পরিকল্পিতভাবে প্রতিটি রোহিঙ্গাকে বার্মা (মিয়ানমার) থেকে বের করে দেয়ার অভিপ্রায়ে গণহত্যার উন্মাদনায় মেতে উঠেছে। এই নির্মূলাভিযান এমনই ভয়াবহ ও নৃশংস যে, পরিকল্পিত হিংস্রতা লুকিয়ে রাখার স্বভাবগত প্রবণতা থাকা বর্মী রাষ্ট্রপতিও শুক্রবার, ২৬ অক্টোবর, স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে ৮টি মসজিদসহ ২০০০ রোহিঙ্গার ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

রাষ্ট্রের নির্দেশিকা ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকা রাষ্ট্রীয় অঙ্গের দ্বারা বা অ-রাষ্ট্রীয় অভিনেতাদের দ্বারা দণ্ডনীয় কোনও কাজের জন্যও একটি রাষ্ট্র দায়ী হতে পারে। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী, মিয়ানমার পুলিশ ফোর্স এবং নাসাকাসহ নিরাপত্তা বাহিনী রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে কৃতকর্মের জন্য দায়ী হতে পারে। উপরন্তু, মিয়ানমারের রাষ্ট্রটি সীমান্তের মধ্যে গণহত্যা প্রতিরোধে ব্যর্থ হওয়ার জন্য কনভেনশন এর অধীনে দায়ী হতে পারে। কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১ অনুসারে রাষ্ট্রে গণহত্যা প্রতিরোধ করা এবং যদি রাষ্ট্র এটি করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে পৃথক অপরাধীদের শাস্তি দিতে। আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক (আইসিজে) বলেছে যে গণহত্যা কার্যক্রম প্রতিরোধে তার ক্ষমতার মধ্যে সব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে (Judgment, 2007 I.C.J. 43)।[২৩] অতএব, যদি রাষ্ট্র গণহত্যার জন্য সরাসরি দায়বদ্ধ না হয় তবে গণহত্যা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যও দায়ী হতে পারে। কারণ এ সহিংসতার পেছনে চরমপন্থি বৌদ্ধদেরও অংশগ্রহণ ছিলো (দৈনিক আমাদের সময়, ২০১৩)। "রাখাইন প্রদেশে পুরো গ্রাম কিংবা আংশিক নগর পুড়ে ভস্মীভুত হবার মতো ঘটনা ঘটেছে।" বলার অপেক্ষা রাখেনা যে আসল সংখ্যা ও বাস্তবতা আরো অনেক ভয়াবহ (*The New Light of Myanmar*, 2012)। ড. শুয়ে লু মং বলেন, লন্ডনের ৩০ মাইল উত্তরের লুটন শহরে অনুষ্ঠিত এক সভায় (যেখানে আমাকে রোহিঙ্গা সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল) জনৈক ব্রিটিশ এমপি রোহিঙ্গাদের বর্তমান অবস্থাকে ৯০ দশকে বসনীয় মুসলিমদের ভাগ্যে যা ঘটেছিল তার সাথে তুলনা করেছিলেন। ড. শুয়ে লু মং ওরফে শাহনেওয়াজ খান তার লেখা *The Price of Silence: Muslim-Buddhist War of Bangladesh and Myanmar–a Social Darwinist's Analysis*- বইতে লিখেছেন, আরাকান রাজ্যের চারটি জেলায় রোহিঙ্গা মুসলিম ও রাখাইন বৌদ্ধদের অনুপাত প্রায় সমান ছিল। কিন্তু ১৭ জুন, ২০১২ থেকে শুরু হওয়া রাখাইন বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের নির্মূলাভিযানের সেসব মুসলিম জনবসতি এখন প্রায় জনশূণ্য। তাদের গোত্র ও ধর্মের জন্যে তারা মিয়ানমারের সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ সম্প্রদায় দ্বারা গণহত্যার বলি হচ্ছেন (Maung, 2005)।

ড. ড্যানিয়েল জোনাহ গোল্ডহ্যাগেন তার লেখা Worse than War বইতে পাঁচ ধরণের উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন, সেগুলো হচ্ছে-পরিবর্তন, নিবর্তন, বিতাড়ন, জন্মনিরোধ ও সর্বাংশে নির্মূল

২৩. Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, (2007), (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), *Judgment, I.C.J.* 43, paras. 165, 431 (Feb. 26) [Bosnia v. Serbia]

(Goldhagen, 2009)। এখানে ‘পরিবর্তন’ বলতে বোঝানো হয়েছে- কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতিসহ সকল মৌলিক পরিচিতিগুলোকে ধীরে ধীরে পাল্টে দেয়া। যদিও আরাকানে রোহিঙ্গাদের ইতিহাস স্মরণাতীত কালেই পৌঁছে, তবুও তাদেরকে বাংলাদেশ থেকে আসা নব্য বসবাসকারী গোষ্ঠী হিসেবে নতুন মিথ এ পরিচিতি দেয়া হচ্ছে। ‘নিবর্তন’ হচ্ছে- সেই পদ্ধতি যার মাধ্যমে ঘৃণিত, অনুমোদিত ও ভয়ঙ্কর মানুষদের নিজেদের কব্জায় রেখে তাদের উপর সহিংস দমননীতি চালানো হয়; যাতে সেই ভয়ানক জনগোষ্ঠী আসল কিংবা কল্পিত কোনও রকমের ক্ষতিই আর করতে না পারে। নিবর্তন মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের জীবনের প্রাত্যহিক বৈশিষ্ট্য। ‘বিতাড়ন’ কিংবা ‘নির্বাসন’ হচ্ছে তৃতীয় উচ্ছেদের উপায়। বিতাড়নের মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীকে হয় দেশের সীমানার বাইরে কিংবা দেশের মধ্যেই এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বিতাড়নের আরেকটি উপায় হচ্ছে জনগোষ্ঠীকে স্ব-দলবলে ক্যাম্পের জীবন বেছে নিতে বাধ্য করা। আর নে উইনের আমল থেকেই মিয়ানমার সরকার এই দোষে দুষ্ট। উচ্ছেদের চতুর্থ উপায় হচ্ছে ‘জন্ম নিরোধ’-যা মিয়ানমার সরকার অন্যান্য উপায়গুলোর সাথে ব্যবহার করে।

এই পদ্ধতিতে রোহিঙ্গা মেয়েদের বিয়েতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ছাড়াও ব্যবহার করা হয় জোরপূর্বক বন্ধ্যাকরণ, গর্ভপাত ও ধর্ষণ। নিবর্তনে মুসলিমদের ঘরবাড়ি, শহর ও লোকালয় আক্রমণের সময় অনেক মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া নৈমিত্তিক ঘটনাতে পরিণত হয়েছে। সর্বাংশে নির্মূল হচ্ছে উচ্ছেদের পঞ্চম উপায় যেখানে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে মেরেই ফেলা হয়। সর্বাংশে নির্মূলের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে এমন কারণও দেয়া হয় যে উল্লেখ্য গোষ্ঠীর সামান্য উপস্থিতিই যেন অন্যদের জন্য ভয়ানক হুমকির ব্যাপার। এই পদ্ধতিতে সাময়িক, খণ্ডকালীন কিংবা সম্ভাব্য সমাধানের বদলে দেয়া হয় স্থায়ী সমাধান। ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের The UN Genocide Convention 1948 এবং The Rome Statute 1998 (The Rome Statute, 1998) -এ জেনোসাইড কথাটির (Genocide) উল্লেখ আছে। এতে বলা হয়েছে-‘কোনো জনগোষ্ঠীর লোকজনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা, চূড়ান্ত শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতিসাধন, শারীরিকভাবে নির্মূল করার জন্য একটা ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করা। ঐ জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করা এবং কোনো জাতি বা তার অংশ বিশেষকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য নতুন প্রজন্মের সন্তানদের জাতিগত, ধর্মগত এবং বর্ণগত রূপান্তরে বাধ্য করা।’ ফিয়ারস্টাইন তার ফ্রেমওয়ার্কে বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় অপরাধগুলো রাষ্ট্রের এজেন্টদের দ্বারা সাংগঠনিক লক্ষ্যসমূহ মানবাধিকার লঙ্ঘনকে জড়িত করে (Green and Ward, 2004)। গণহত্যায় জড়িত রাষ্ট্রীয় অপরাধের একটি বিশেষ ফর্ম; যেমন ফিয়ারস্টাইন ব্যাখ্যা করেন, সামাজিক অনুশীলন যা লক্ষ্য করে ১. জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ধ্বংস করে স্বায়ত্তশাসন ও সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে সামাজিক সম্পর্কগুলো ধ্বংস করতে এবং ২. জীবিতদের মধ্যে পরিচয় ও সামাজিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ধ্বংসাবশেষে সন্ত্রাস ব্যবহার

করতে গুরুত্বপূর্ণভাবে নতুন মডেল স্থাপন। এই কাঠামোর মধ্যে গণহত্যা একটি প্রক্রিয়া যা বছর এবং এমনকি দশক ধরেও হতে পারে (Lemkin, 1944)।

চিত্র-৫.২ঃ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে রাখাইন সন্ত্রাসীদের আগুনে ভস্মীভুত হওয়ার চিত্র

পোলিশ আন্তর্জাতিক বিচারক রাফায়েল লেমকিন এর তৈরি সূত্র-

> *গণহত্যার অর্থ একটি জাতি অবিলম্বে ধ্বংস নয়, মানে একটি জাতির সব সদস্যদের হত্যাকান্ড সম্পন্ন হওয়া। এটা বরং উদ্দেশ্যে করে অপরিহার্য ভিত্তিতে ধ্বংস করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মের একটি সমন্বয় পরিকল্পনা সংকেত জাতীয় গোষ্ঠীর জীবন ধ্বংস করার লক্ষ্যে হয়। উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি, ভাষা, জাতীয় অনুভূতি, ধর্ম, এবং জাতীয় দলের অর্থনৈতিক অস্তিত্ব ধ্বংস এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য, মর্যাদা, এমনকি এই গ্রুপে ব্যক্তির জীবন (*Lemkin, 1944*)।*

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন জাতিসংঘের আসন্ন সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে 'রোহিঙ্গা গণহত্যা'র কথা ঘোষণা দিচ্ছে, তখন মিয়ানমারের সেনাবাহিনী দেশে-বিদেশে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী '*আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি*'র বা এআরএসএ (আরসা) হামলার আশঙ্কার তথ্য প্রচার করছে (উদ্দিন, ২০১৮)। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোর তথ্য অনুযায়ী, আরসা'র সদস্যসংখ্যা মাত্র ৫০০ জন। এ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযানের নামে দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে দেড় লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে ভিটেমাটিছাড়া করে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে মিয়ানমার। এদিকে বাংলাদেশ তখন চতুর্থবারের মতো ঢাকায় মিয়ানমারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতকে তলব করে রাখাইন পরিস্থিতির ও রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। মিয়ানমারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত অং মিন্টের হাতে দেওয়া এই পত্রে অত্যন্ত কড়া ভাষায় প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রশ্ন তুলেছে মিয়ানমারের সামরিক অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অনুবিভাগের মহাপরিচালক মঞ্জুরুল করিম খান চৌধুরী মিয়ানমারের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স অং মিন্টকে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবাদপত্র হস্তান্তর করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২৫ আগস্ট, ২০১৭ থেকে মিয়ানমারের বাসিন্দাদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা।

রাখাইন রাজ্যে সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি এবং প্রাণরক্ষায় বিপুলসংখ্যক বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে প্রবেশের বিষয়েও উদ্বেগ জানানো হয়েছে। সামরিক অভিযানের সময় মিয়ানমার তার বেসামরিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় যথার্থ ব্যবস্থা না নেওয়ায় বাংলাদেশ বলেছে, এর ফলেই বিপুলসংখ্যক মানুষ মরিয়া হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। IS GENOCIDE OC CURRING IN MYANMAR'S RAKHINE STATE- গ্রন্থে গণহত্যা কনভেনশন অনুযায়ী, ধারা ৩ এ বর্ণিত শাস্তিযোগ্য কোনও কাজ সম্পাদনের জন্য একটি রাষ্ট্র নিজেই দায়ী হতে পারে (Green and Ward, 2004)। এ প্রক্রিয়ায় মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমদের গণহত্যাকে পাঁচটি পর্যায়ে দেখানো হয়েছে। যা পরবর্তীতে পেনি গ্রিন এর গবেষণা থেকে দি ইকনোমিষ্ট পত্রিকায় তুলে ধরা হয়েছে (http://www.economist.com/news/asia)।[২৪] এ গণহত্যার পাঁচটি পর্যায়সমূহ এভাবে দেখানো হয়েছে-

চিত্র-৫.৩: গণহত্যার সংজ্ঞায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ

Five stages of genocide

Stage	Rohingyas in Myanmar
1 Stigmatisation	Denied citizenship and not acknowledged as one of Myanmar's official ethnic groups; labelled "Bengalis"
2 Harassment	Job discrimination; religious persecution; attacks by state security
3 Isolation	In 2012 herded into camps; villages cut off
4 Systematic weakening	Identity cards removed so cannot vote; barred from travelling, leading to loss of livelihood
5 Mass annihilation	Has not yet occurred, but no one has been prosecuted for a killing spree against Rohingyas in 2012

Source: Penny Green, International State Crime Initiative at Queen Mary University of London

Economist.com

http://www.economist.com/news/asia

তিনি লিখেন, ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘে গৃহীত 'জেনোসাইড কনভেনশন' এ পাঁচটি অপরাধের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এর যে কোনো একটি যখন 'কোনো জাতীয়, নৃতাত্ত্বিক, সম্প্রদায় বিশেষ বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে পুরোপুরি বা আংশিক ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে করা হয়, তখন তা গণহত্যা বলে বিবেচিত হবে। অং সান সু চি দেশটির সাম্প্রতিক রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণের পর রোহিঙ্গাদের ধ্বংস করার সুস্পষ্ট এবং প্রায়শ প্রকাশ্য উদ্দেশ্য নিয়েই পাঁচ অপরাধের অন্তত চারটি কমবেশি

২৪. http://www.economist.com/news/asia/21654124-myanmars-muslim-minority-have-been-attacked-impunity-stripped-vote-and-driven?zid=306&ah=1b164dbd43b0cb27ba0d4c3b12a5e227- (Accessed on, 25/7/15)

নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাচ্ছে মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী।' বিখ্যাত সংবাদ সাময়িকী নিউজ উইক 'ইজ জেনোসাইড অকারিং এগেইনস্ট দ্য রোহিঙ্গা ইন মিয়ানমার' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে (www.newsweek.com/)।[২৫] এতে লন্ডনের মিডলসেক্স ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক আইন বিভাগের অধ্যাপক উইলিয়াম স্কাবাস বলেন, রোহিঙ্গাদের প্রতি মিয়ানমারে যে আচরণ করা হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে মানবতাবিরোধী অপরাধের শামিল। সিমন-স্কট সেন্টার ফর প্রিভেনশন অব জেনোসাইড (যুক্তরাষ্ট্রের হলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়ামের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান) এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার আন্দ্রিয়া জিটলম্যান বলেন, তাদের প্রতিষ্ঠান ২০১৫ সালেই রোহিঙ্গাদের প্রতি মিয়ানমারের আচরণ গণহত্যার শামিল হয়ে থাকতে পারে বলে উদ্বেগ ব্যক্ত করে (Genocide traveled to Burma people, 2015)।[২৬] মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিশ্বটা আজ মোটেই এ রকম নয়। প্রভাবশালী ব্রিটিশ দৈনিক গার্ডিয়ানে কলামিস্ট জর্জ মনবিয়ট নিবন্ধ লিখেছেন যার শিরোনাম ছিল- 'অং সান সু চির নোবেল পদক ছিনিয়ে নাও, তিনি এর যোগ্য নন' (www.theguardian.com/commentisfree/2017)।[২৭]

মিয়ানমারের সঙ্গে সংঘাত এড়াতে ও রোহিঙ্গা সমস্যার টেকসই সমাধানে 'কৌশলী ভূমিকা' নিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ কূটনৈতিক তৎপরতার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান এবং দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে রোহিঙ্গাদের সাময়িকভাবে আশ্রয় দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে মিয়ানমারের ভেতর রোহিঙ্গাদের জন্য 'নিরাপদ অঞ্চল' গড়ার প্রস্তাব আসছে বৈশ্বিক বিভিন্ন মহল থেকে। এ বিষয়ে বাংলাদেশেরও জোরালো সমর্থন রয়েছে। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের জন্য 'নিরাপদ অঞ্চল' গড়া সম্ভব না হলে সেখানে অবস্থানরত সাড়ে তিন লাখ রোহিঙ্গার সবাই নিধনযজ্ঞের শিকার হতে বা প্রাণ বাঁচাতে দেশ ছাড়তে বাধ্য হতে পারে। স্থলপথ দিয়ে আসা হাজার হাজার রোহিঙ্গা এখনও নো ম্যানস ল্যান্ডে (দুই দেশের সীমান্ত রেখার মাঝামাঝি ৩০০ গজ) আশ্রয় নিয়েছে বলে বিজিবি জানিয়েছে। স্থানীয়রা ও বিভিন্ন এনজিওর কর্মীরা খাবার দিচ্ছে, যা পর্যাপ্ত নয়। কক্সবাজারে বিজিবির ৪৪ ব্যাটালিয়নের

---

২৫. JOHN HALTIWANGER, *IS GENOCIDE OCCURRING AGAINST THE ROHINGYA IN MYANMAR?* ON 9/5/17 AT 11:21 PM; https://www.newsweek.com/genocide-occurring-against-rohingya-myanmar-experts-weigh-659841

২৬. In March 2015, staff from the Museum's Simon-Skjodt Center for the Prevention of Genocide traveled to Burma to investigate threats facing the Rohingya people, a Muslim minority that has been the target of rampant hate speech, the denial of citizenship, and restrictions on the freedom of movement. These and a host of other human rights violations have put this population at grave risk for additional mass atrocities and even genocide; https://www.ushmm.org/genocide-prevention/countries/burma (Accessed on, 25/7/15)

২৭. Take away Aung San Suu Kyi's Nobel peace prize. She no longer deserves it Take away Aung San Suu Kyi's Nobel peace prize. She no longer deserves it; https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/sep/05/rohingya-aung-san-suu-kyi-nobel-peace-prize-rohingya-myanmar

অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মনজুর আহসান খান বলেন, ‘রোহিঙ্গারা যাতে দেশের ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যারা এসে পরে তাদের আমরা ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করি। এখন পর্যন্ত অনেককে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়েছে।’ রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মিয়ানমারের নির্মূল অভিযান থামার কোনো লক্ষণ নেই। উল্টো এ অভিযান বিষয়ে জাতিসংঘের ব্যবস্থা নেওয়া ঠেকাতে চীন ও রাশিয়ার মতো নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের দ্বারস্থ হচ্ছে মিয়ানমার। মিয়ানমারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা থাউং তুন বলেন, ‘নিরাপত্তা পরিষদে রোহিঙ্গা ইস্যু যাতে না ওঠে সে জন্য আমরা বন্ধুভাবাপন্ন কয়েকটি দেশের সঙ্গে আলোচনা করেছি। চীন আমাদের বন্ধু এবং রাশিয়ার সঙ্গেও আমাদের একই ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তাই ইসুটিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না (*দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭)। থাইল্যান্ডের ‘ফুকেতওয়ান’ পত্রিকায় ১৬ জানুয়ারি, ২০১৩ সালে ‘দ্যা হিডেন অ্যাগোনি অব এ টোয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরি শ্লেভ ট্রেড’ শিরোনামে একটি মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন ছাপা হয়। দাসপ্রথা আইনত নিষিদ্ধ হলেও আক্ষরিক অর্থেই থাইল্যান্ডে চলছে এ নির্মম দাস ব্যবসা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমৃদ্ধ ও আধুনিক এই দেশে দাস প্রথার শিকার মিয়ানমারের হতভাগ্য রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়। তাদের ওপর চালানো হচ্ছে নির্মম নির্যাতন। থাইল্যান্ডে দাসপ্রথা বেআইনি হলেও শত শত রোহিঙ্গা মুসলিমকে এখানে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়। তারা শরীরে পৈশাচিক বর্বরতার ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে। ২০১৩ সালের থাইল্যান্ডে তাদের বিধ্বস্ত শরীরে সাক্ষী দিচ্ছে যে, দুর্নীতি আর দাসপ্রথা থেকে এখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি থাইল্যান্ড। একটি সংগঠন ৪০ হাজার বাথ দিয়ে কিনে দাসত্ব থেকে একজনকে মুক্তি দেয়। কিন্তু দেশটিতে তার মতো আরও শত শত, সম্ভবত হাজার হাজার দাস নিগৃহীত হচ্ছে। সম্প্রতি থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়া সীমান্তে অভিযান চালিয়ে থাই কর্তৃপক্ষ নারী, পুরুষ ও শিশুদের উদ্ধার করে; যাদের টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছিল। (১৬ জানুয়ারি, ২০১৩ ‘ফুকেতওয়ান’ পত্রিকা, থাইল্যান্ড)। আরাকান রাজ্যের এমন জায়গায় জুন থেকে নভেম্বর, ২০১২ সহিংসতা এবং আপত্তিজনক ঘটনা ঘটেছে। ২৩ অক্টোবর এই ইয়ান থেই গ্রামে আরাকানীরা আক্রমণ করেছিল স্থানীয় গ্রাম-প্রধান রেকর্ড অনুসারে কমপক্ষে ৫২ জন রোহিঙ্গার মৃত্যু হয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এ প্রাপ্ত দুই সাক্ষী দাবি করেছেন যে কমপক্ষে ৭০০ রোহিঙ্গা মারা গিয়েছিল (HRW, 2012)।

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর চলমান পৈশাচিক অমানবিক নির্যাতন এবং প্রকাশ্য গণহত্যার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শক্তির তেমন কোনো প্রতিবাদ নেই। সেখানে এই জনগোষ্ঠীর ওপর বাস্তবে কী ঘটে যাচ্ছে, সে বিষয়েও কোনো খবরাখবর রাখার তেমন কেউ নেই। এমন পরিস্থিতিতে লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি এ বিষয়ে একটি তথ্যবহুল গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্টটি তৈরি করেছেন এ ইউনিভার্সিটির তিনজন গবেষক; প্রফেসর পেনি গ্রিন, ড. টমাস ম্যাকমানাস এবং এলসিয়া ডি লা কোর ভেনিং। গবেষকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত মিয়ানমার সরকার এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অকথ্য নির্যাতন

প্রকৃতপক্ষে জেনোসাইড বা গণহত্যার রূপ ধারণ করেছে। COUNTDOWN TO ANNIHILATION: GENOCIDE IN MAYANMAR-শীর্ষক ইংরেজি ভাষায় রচিত রিপোর্টটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৫ সালে (Green, Penny/MacManus, 2015)। এর ভূমিকা লিখেছেন, মিয়ানমারে মানবাধিকার অবস্থার ওপর জাতিসংঘের বিশেষ দূত (২০০৮-২০১৪) টমাস ওজি কুইনতানা। তাঁর মতে, মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। দশকের পর দশক ধরে তারা নিপীড়নের শিকার। সরকারিভাবে তারা এত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী সীমালঙ্ঘনের শিকার যে, পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করলে একটি হিমশীতল বিবর্ণ ফল প্রকাশিত হয়। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বৈষম্য ও নিষ্ঠুর নীতি দশকের পর দশক ধরে প্রকাশিত হয়েছে। এই যখন অবস্থায় লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল স্টেট ক্রাইম ইনিশিয়েটিভ এর নিপীড়নের তথ্যে (http://www.economist.com/news/asia)।[২৮]

চিত্র নং-৫.৪: ১৯৪৮ সালের স্বাধীনতা লাভের পর নিপীড়নের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী

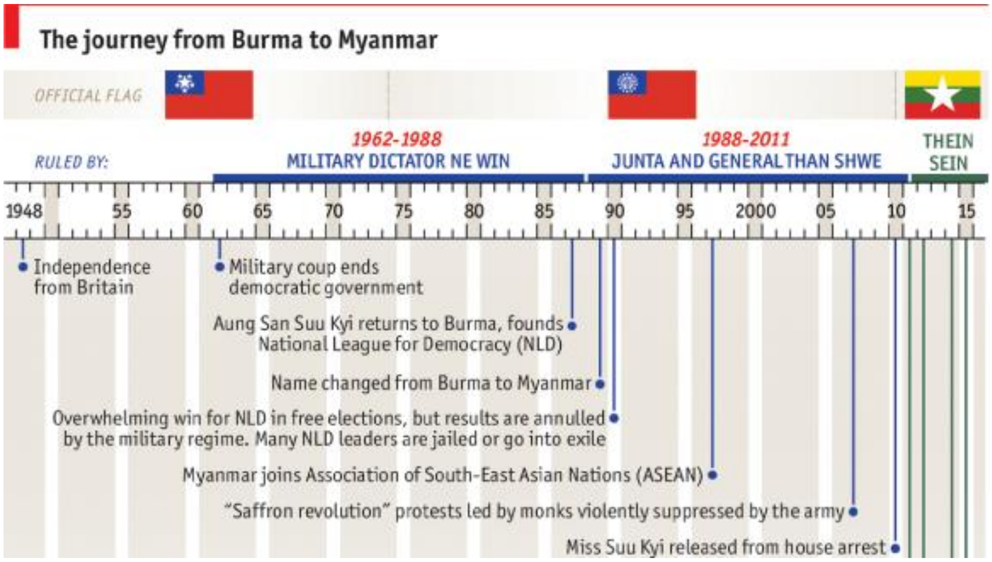

http://www.economist.com/news/asia

ড্যানিয়েল ফিয়ারস্টাইন এর বিশ্লেষণাত্মক ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে এই রিপোর্ট প্রমাণ করে রোহিঙ্গাদের নির্মূল করতে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপকে। তিনি একটি উপসংহারে পৌঁছেছেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চলছে একটি জেনোসাইড প্রক্রিয়া। কিন্তু ফ্যাক্ট হলো, অন্য খুব কম সংস্থাই সমান উপসংহার টানে। সন্দেহ নেই, এটা একটা সূক্ষ্ম বিষয় এবং এ ক্ষেত্রে যেহেতু মিয়ানমারের রাজনৈতিক রূপান্তর জড়িত, তাই জেনোসাইডের ব্যাপারটা প্রকাশ করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য একটি লজ্জাজনক বিষয়। তা সত্ত্বেও এ রকম অনুসন্ধান কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির এই

২৮. http://www.economist.com/news/asia/21654124-myanmars-muslim-minority-have-been attacked-impunity-stripped-vote-and-driven?zid=306&ah=1b164dbd43b0cb27ba0d4c3b12a5e227

রিপোর্টে আন্তর্জাতিক মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই অবস্থায় রোহিঙ্গাদের বর্তমান অবস্থাকে জেনোসাইড বিবেচনা করা ছাড়া উপায় নেই। রোহিঙ্গাদের দুর্ভাগ্যজনক সংকট দ্রুত বাড়ছেই। এই সম্প্রদায় এখন কোণঠাসা ও ভীতসন্ত্রস্ত, যা তাদেরকে চালিত করছে ভয়ংকর অবস্থা থেকে পালিয়ে খোলা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে, যেখানে অনেকেই মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্ব বিবেকও নামমাত্র প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। আমরা যদি একজন রোহিঙ্গা মহিলার একটি মুহূর্তের অনুভূতি কল্পনা করতে পারতাম, আমাদের সভ্যতার আসল চেহারা দেখতে পেতাম। অস্তিত্ব অস্বীকার, বঞ্চনা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য, কারারুদ্ধ অবস্থা, ধর্ষণের ভীতি, নিপীড়ন ও হিংস্রতার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ। এই গবেষণা বইয়ে আরাকানের ম্যাপ, রাখাইন সম্প্রদায়ের পরিচিতি ও বর্তমান গণহত্যার কিছু বীভৎস চিত্রের রূপায়ন রয়েছে। রাখাইনে নির্যাতন কবে থেকে কেন হচ্ছে তারও বিবরণী রয়েছে বইটিতে (Green, 2015)। সাদামাটা অর্থে যা হচ্ছে তা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ রাখাইনদের দ্বারা হত্যাসহ ভয় ভীতির উদ্রেক করে মুসলিম রোহিঙ্গাদের বার্মার আরাকান অঞ্চল থেকে উৎখাতের উদ্দেশ্যমূলক সরকারী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন; যা জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুসারে নৃতাত্ত্বিক বিনাশ বলা হয় (ethnic cleansing) (http://www.shodalap.org/snazrul-Accessed on 30/7/15)।[২৯]

চিত্র-৫.৫ঃ ঘরবাড়িসহ অসংখ্য নোঙ্গর করা বজরা আর নৌকার শহর ও অন্যান্য স্থাপনা

ইন্টারন্যাশনাল ল কমিশন (আইএলসি) অনুসারে রাষ্ট্রের অঙ্গগুলোর মধ্যে, কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইন অনুযায়ী স্থিতি পায় (U.N. Doc. A/56/10, art. IV 2001)।[৩০] জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহ জানিয়েছে যে, নাসাকা বাহিনী বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে

২৯. http://www.shodalap.org/snazrul/16869/- (Accessed on 30/7/15)

৩০. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, (2001), Report of the International Law Commission on the Work of its Fifty-Third Session, U.N. Doc. A/56/10, art. IV [Articles on State Responsibility]

অত্যাচার করেছে। জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক ৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে, তমাস ওজিয়া কুইন্টানা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন করার জন্য নাসাকা জবাবদিহিতা এবং আটক রাখার জন্য মিয়ানমারের জাতীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে "বিশেষ করে স্থানীয় রোহিঙ্গা জনসংখ্যার বিরুদ্ধে, বিশেষত স্থানীয় কারাগারসহ, মানবাধিকার লংঘনের সবচেয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন, নির্বিচারে গ্রেফতার ও আটক রাখা এবং নির্যাতনের অভিযোগ পেয়েছে (UNHC for Human Rights, 2013)।"

সাম্প্রতিক সহিংসতার সময় এই অভিযোগসমূহের চলমান গুরুতর, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, তিনি এই সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে মৌলিকভাবে সংস্কার করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এবং ইতিমধ্যেই রাখাইন স্টেটে ২০১৩ সালে নাসাকা পরিচালিত সকল কার্যক্রম স্থগিত করেন। গণহত্যার অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য গণহত্যা কনভেনশনের আর্টিকেল ১ এর অধীন রাষ্ট্র দায়ী থাকে। সুতরাং, মিয়ানমার সরাসরি নাসাকা পরিচালনার জন্য এবং নসাকা সদস্যদের যারা গণহত্যার কাজ করেছে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য সরাসরি দায়ী। রাষ্ট্র অ-রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা গণহত্যার ঘটনার জন্য দায়ী হতে পারে। আইএলসি অনুসারে, অ-রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষগুলোর আচরণে রাষ্ট্রকে দায়ী করা যেতে পারে, "যদি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রকৃতপক্ষে নির্দেশনা বা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশে কাজ করে, তবে রাষ্ট্র তা পরিচালনা করে (ILC, Articles on State Responsibility, 2007)।"[৩১] বসনিয়া বনাম সার্বিয়াতে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতি বলেন যে অ-রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই স্বায়ত্তশাসিত থাকতে হবে এবং রাষ্ট্রকে দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য রাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয় (Bosnia v. Serbia, note 374, para. 431)।[৩২] স্থানীয় রাখাইন এবং স্থানীয় ভিক্ষু হিসেবে অ-রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রিত হয়। তবুও মিয়ানমার রাষ্ট্রের গণহত্যা প্রতিহত করা এবং সকল অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে এবং অ-রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রাসঙ্গিক আচরণে যদিও সরাসরি রাষ্ট্রকে দায়ী করা যায় না, তবে গণহত্যা প্রতিরোধে ব্যর্থ হওয়ার জন্যও দায়ী হতে পারে।

৫.১.৩.৪ নারী নির্যতন ও গণধর্ষণ

মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলীয় রাখাইন প্রদেশে বিচ্ছিন্নতবাদ বিরোধী সাম্প্রতিক অভিযানকালে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক সংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠীর রোহিঙ্গা নারীকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ করেছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (২০১৭) এর মতে, আগস্ট, ২০১৭ সাল থেকে গণধর্ষণ এবং অন্যান্য ধরণের যৌন সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। রোহিঙ্গা মহিলা ও বালিকাদের বিরুদ্ধে বর্মি সামরিক বাহিনীর একটি বিস্তৃত এবং অনেক সময় নিয়মতান্ত্রিক অনুশীলন ছিল। উভয়ের বিরুদ্ধে প্রায়শই হত্যাকাণ্ড, মারধরের শিকার এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের

---

৩১. ILC, Articles on State Responsibility, *see* note 375, art. 8

৩২. Bosnia v. Serbia, (2017) *see* note 374, para. 431

সাথে অপব্যবহার ছিল। ২৫ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া জাতিগত নির্মূল অভিযানের সময় বর্মি সৈন্যরা ছিনতাই, ধর্ষণ এবং অন্যথায় যৌন নির্যাতন করেছিল (HRW, 2017)। ২০ বছর বয়সী রোহিঙ্গা নারী লীলা নূর বর্ণনা করেন, দু'বার ধর্ষণ করার পরে জেগে উঠতে পেরে যাওয়ার পরে তৃতীয় সৈন্য দ্বারা কেইন চৌংয়ের ২৮ বছর বয়সী আজারা ইউনুসকে ধর্ষণ করেছিল (HRW, 2017)। মংডু টাউনশিপের বলি বাজার নামে স্থানীয়ভাবে পরিচিত এই গ্রামের একটি স্কুলে তাকে টেনে নিয়ে যায়। সে বলেছিল, একদল সৈন্য তাকে মারধর করার পরে একজন সৈনিক তাকে এক টয়লেটে মেঝেতে থাকা নোংরা জলে ধর্ষণ করেছিল (HRW, 2017)। বেশ কয়েকটি মহিলা সাক্ষাৎকারের সময় মন্তব্য করেছিলেন যে ধর্ষণের সময় তারা ভয় পেয়েছিল যে তাদেরও হত্যা করা হবে বলেন সুমেরা ইশাক (৪০) (HRW, 2017)। ফাতামা বেগম (৩৩) বলেন, 'আমি ভেবেছিলাম আমাকে গুলি করা হবে', রাশেদা উং টাউনশিপের শোপপাড়া নামে স্থানীয়ভাবে পরিচিত ছুট পাইয়েন গ্রাম থেকে একদিন আগে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। তিনি বলেন, ছয় জন তাকে ধরে রেখেছিল এবং তাদের মধ্যে পাঁচজন তাকে ধর্ষণ করেছিল। প্রথমে, তারা আমার ভাইকে গুলি করে হত্যা করেছিল...তারপরে তারা আমাকে পাশের দিকে ছুঁড়ে মারল এবং একজন লোক আমার লুঙ্গি [সারং] ছিড়ে, আমাকে মুখে আটকে দেয়। সে আমার দিকে একটা ছুরি আটকেছিল এবং পুরুষরা আমাকে ধর্ষণ করার সময় তারা সেখানে রেখে দেয়, আমি তাদের সরানোর চেষ্টা করছিলাম এবং এতে আরও রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তারা আমাকে গুলি করার হুমকি দিচ্ছিল (HRW, 2017)। মিয়ানমারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে অভিযানকালে দেশটির সেনারা বেশ কিছু রোহিঙ্গা মুসলিম নারীকে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন অভিযোগে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই অভিযোগ করেন রাখাইন রাজ্যের ইউ শে ক্যা গ্রামের আট রোহিঙ্গা নারী। ওই নারীদের ভাষ্য, সেনারা তাঁদের বাড়িতে হানা দেয় ও লুটপাট চালায়। বন্দুকের মুখে তাঁদের ধর্ষণ করে। অভিযোগকারী তিন নারীর মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নিয়েছে রয়টার্স। বাকি পাঁচজনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে টেলিফোনে। এর পাশাপাশি মানবাধিকারকর্মী ও স্থানীয় নেতাদের সঙ্গেও কথা হয়েছে। মিয়ানমারে চলমান পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। ৪০ বছর বয়সী এক নারীর অভিযোগ, চারজন সেনা তাঁকে ধর্ষণ করেছে। ১৫ বছর বয়সী মেয়েকে তারা লাঞ্ছিত করে তাঁর গয়না ও নগদ অর্থ নিয়ে গেছে। এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মিয়ানমারের প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র জ হতে। অভিযোগের বিষয়ে জানতে রয়টার্সের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীর কাছে একটি মেইল করা হলেও তার জবাব মেলেনি (*দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৬)।

৫.১.৩.৫ গণধর্ষণে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততা

শতাধিক রোহিঙ্গা গ্রামে বর্মী নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা হত্যা, ধর্ষণ, নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং ব্যাপক অগ্নিসংযোগের কারণে ৬০০,০০০ এরও বেশি রোহিঙ্গা বাধ্য হয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। কখনও কখনও ধর্ষণ, গুলিতে জখম সঙ্গে করে রোহিঙ্গা মহিলা, পুরুষ এবং শিশুরা

বাংলাদেশে এসেছে হতাশা, ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত অবস্থায়। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বার্মার নৃশংসতার কারণে সৃষ্ট মানবিক সঙ্কট এর গতি স্তম্ভিত করেছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর মাঠপর্যায়ে তথ্য, গবেষণা এবং উপগ্রহের চিত্রের বিশ্লেষণ এটি গুরুতর বলে মনে করে। উত্তর রাখাইন রাজ্যে ২৫ আগস্ট, ২০১৭ সাল থেকে রোহিঙ্গা মুসলিমের জনসংখ্যার বিরুদ্ধে বার্মার সুরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা মানবতা বিরোধী অপরাধের ঘটনা ঘটেছে (HRW, 2017)। অন্তত কয়েক দশক ধরে মিয়ানমার সেনাবাহিনী নিজ দেশের বিভিন্ন সংখ্যালঘু নারীদের ওপর ধর্ষণকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। রিফিউজি ইন্টারন্যাশনালের ২০০৩ সালের *'নো সেফ প্লেস: বার্মাস আর্মি এন্ড দি রেপ অফ এথনিক ওমেন'* শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নারীদের সেনা ক্যাম্পে আটক রেখে মাসের পর মাস পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয় (Refugees International, 2007)। রোহিঙ্গা মুসলিম নারী ছাড়া আরো বেশ কিছু জাতিগত সংখ্যালঘু নারীদের ওপর চলে এ ধরনের ধর্ষণ। এ ধর্ষণ বন্ধ করতে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা এবং বিভিন্ন দেশের কাছে সুনির্দিষ্ট বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরে কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি।

২০১৪ সালে হার্ভার্ড ল' স্কুলের দি ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ক্লিনিকের প্রতিবেদনে বলা হয়, সংবিধান অনুযায়ী মিয়ামারের নির্বাচিত সরকার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের বিচার করার ক্ষমতাই যেন রাখেন না। আইনেই আছে মিয়ানমারের সরকারি কর্মকর্তা বা সামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এধরনের নির্যাতনের অভিযোগ থাকলেও তারা তা নিজ পদে বহাল তবিয়তে থেকেই মোকাবেলা করতে পারবেন (https://hls.harvard.edu/dept/clinical/clinics,2014)।[৩৩] মিয়ানমারের নির্বাচিত সরকার এধরনের নারী ধর্ষক বা নির্যাতনকারী কোনো সামরিক কর্মকর্তাকে বিচারের আওতায় এনেছে এমন কোনো নজির নেই। ভূ-কৌশলগত কারণে, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ও গণতন্ত্রের পথে যাত্রা করছে এ আশায় পশ্চিমা বিশ্ব মিয়ামারের সেনাবাহিনীর সংখ্যালঘু নারী ধর্ষণের ঘটনায় কোনো প্রতিক্রিয়া জানাতে চায় নি। ২০০৮ সালের সংবিধান সংশোধন আনার কথাও বলে ওমেন লিগ। তবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার মিয়ানমার সরকারকে দেশটির সেনাবাহিনীর ধর্ষণের মত ঘটনায় জড়িত থাকার বিষয়টি তদন্তের আহবান জানালে তা নাকচ হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যারি হার্ফ বলেন, গত তিন বছরে মিয়ানমার অনেক উন্নয়ন করতে সমর্থ হলেও দেশটির সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির আরো উন্নতি প্রয়োজন (*দৈনিক আমাদের সময়*, ২০১৬; *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২০১৬)। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলিম নাগরিক সেনাবাহিনীর হাতে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে দেশটির নেত্রী অং সাং সুচির নিকট এই অভিযোগ তদন্তের চাপ বাড়ছে। অভিযোগ উঠেছে এই অঞ্চলে রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর হত্যা, ধর্ষণ এবং বিভিন্ন নির্যাতন হচ্ছে। দেশটির সেনাবাহিনী চায় না এসব অভিযোগ অনুসন্ধান করে দেখা হোক। রাখাইন রাজ্যে সহিংসতার ব্যাপারে রাখাইন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান অং উইন এমপির নেতৃত্বে মিয়ানমারে

৩৩. https://hls.harvard.edu/dept/clinical/clinics/international-human-rights-clinic/,2014 (Accessed on 30/7/15)

চলছে তদন্ত। তিনি একজন বৌদ্ধ এবং জাতীয়তাবাদী। তিনি বলেন, রোহিঙ্গারা নিজেরাই নিজেদের বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। আর মিয়ানমারের সেনাবাহিনী দ্বারা রোহিঙ্গা মুসলিমদের ধর্ষণের কোনো প্রশ্নই আসে না। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা নারীরা খুবই নোংড়া। বাঙালি রোহিঙ্গা নারীদের জীবনমান অত্যন্ত নিম্নমানের এবং তারা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না। আর তারা আর্কষণীয় নয়। ফলে স্থানীয় বৌদ্ধ পুরুষ কিংবা সৈন্যদের তাদের ব্যাপারে আগ্রহ নেই (*দৈনিক* আমাদের সময়, ২০১৬)।

৫.১.৪ বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ থেকে উগ্র বৌদ্ধ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ

৫.১.৪.১ বর্মী জাতীয়তাবাদ

১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীনতা অর্জনের পর সারা দেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত ও অভ্যন্তরীণ গ্রুপগুলো একে অপরের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে (Callahan, 2007, p. 83)। অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণসমূহ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং পরবর্তীতে বার্মীজ রাষ্ট্রের জাতিগত রাজনৈতিক মেরুকরণের নীতিগুলোতে পাওয়া যায় (Smith, 2007, p. 1-11)। ঔপনিবেশিক শাসনকালে জাতিগত ধারণাটি 'রাজনীতির উপাদানে' পরিণত হয়। এরপর স্বাধীনতা পরবর্তী বার্মান নেতৃত্বাধীন বার্মীজ রাষ্ট্রে জাতিগত বৈষম্য চলমান থাকে। এতে বার্মার অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মনে অসন্তুষ্টি অব্যাহত থাকে। বার্মার স্বাধীনতা লাভের পরে, বার্মীজ নীতিনির্ধারকরা মূলত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কোন ধরণের জাতীয়তাবাদকে মেনে চলতে হবে; জাতীয়তাবাদ নাকি জাতিগত জাতীয়তাবাদ (Muller, 2008, p. 20)। জাতীয়তাবাদ যেহেতু ন্যায়বিচারের নীতির ভিত্তিতে একটি অন্তর্ভুক্ত রূপকে প্রচার করে; তাই জাস সাঙ্গুইনিসের ধারণার ভিত্তিতে জাতিগত জাতীয়তাবাদ একটি নির্দিষ্ট নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে মডেল উপস্থাপিত হয় (Lecours, 2000, p.154-155)। যে কোনও রাষ্ট্রে একটি প্রভাবশালী নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর পাশাপাশি কিছু দুর্বল জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর উপস্থিতিও থাকে (Henley, 2014)। বার্মার বিবেচনায় জনসংখ্যার পরিসংখ্যান যেখানে বর্মান নৃগোষ্ঠী জনসংখ্যার প্রায় ৬৬% প্রতিনিধিত্ব করে, বাকি ৩৩% বাসিন্দাকে জাতিগত সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেখানে জাতিগত জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে আধিপত্য অর্জনের ক্ষেত্রে স্বভাধীনতা লাভের পূর্বে বার্মীজ জাতীয়তাবাদকে তুলে ধরা হয়, এরপর স্বাধীনতা উত্তর বার্মায় জাতিগত জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে উপস্থাপনের জন্য বৌদ্ধ বার্মীজ জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করে এবং এর ভিত্তিতে উগ্র বৌদ্ধ বার্মীজ জাতীয়তাবাদকে বার্মার রাজনীতিতে স্থান পায় (Smith, 2007, p. 7-8)। বর্মান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করে বার্মা জাতিগত জাতীয়তাবাদের পথ অবলম্বন করেছিল এবং জাতিগতভাবে সংজ্ঞায়িত জাতীয় পরিচয় ব্যবহার করে সেই অনুযায়ী অ-বর্মান সংখ্যালঘুরা বাদ পড়েছে (Sakhong, 2012, p. 2)। সুতরাং স্মিথ যেটিকে "বৈচিত্র্যের দেশে জাতীয় ঐক্যের দ্বিধাদ্বন্দ্ব" বলেছিলেন; শুরু থেকেই বার্মা তার জাতীয় পরিচয় সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে জাতিগত জাতীয়বাদকে বেছে নেয় (Smith, 2007, p. 7)। Callahan এর মতে বার্মা বিশ্বের অন্যতম নৃ-তাত্ত্বিক তাৎপর্যপূর্ণ ও জটিল দেশ বলে অভিহিত করেছেন (Callahan,

2014a, p. 83)। এ অবস্থায় তাত্ত্বিকভাবে নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র বার্মা বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের ধারণাকে গ্রহণ করে ও অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীসমূহকে বার্মায় অনাহুত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। তবুও, হেনলি উল্লেখ করেছেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু ধারণার দরকষাকষি সামনে আসে এবং এর মধ্য দিয়ে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রাষ্ট্রের মূল অংশ থেকে ছিটকে পড়ে। এতে রাষ্ট্রীয় নীতি কৌশলের অংশ হিসেবে ছিটকে পড়া সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা ও উন্নয়নে সে রাষ্ট্রের ততোটা দায় থাকে না। এ অবস্থায় রোহিঙ্গা মুসলিম জাতিগোষ্ঠীকে আরাকান তথা রাখাইন প্রদেশে কৌশলে রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়েছে। রাষ্ট্রহীনতা রোহিঙ্গাদের বার্মীজ সমাজের একটি বিশেষত দুর্বল গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেছে, কারণ তারা কোনো অধিকার ভোগ করতে পারে না (Lewa, 2009, pp. 11-13)। রোহিঙ্গারা সংকরকরণের শিকার হয়েছে, এ বিবেচনায় রোহিঙ্গাদের অস্তিত্বও বিতর্কের মধ্যে পড়েছে (Chan, 2005, p. 397)। বার্মা ও বাংলাদেশের মধ্যবর্তী বার্মীজ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসরতদের নাগরিকত্ব দাবীর প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক প্রমাণ বা ঐতিহাসিক গুরুত্ব চিত্রিত করে রোহিঙ্গাদের বার্মা কর্তৃক 'বাংলাদেশী' এবং বাংলাদেশ কর্তৃক 'বার্মীজ শরণার্থী' হিসেবে বিবেচিত হতে হয় (Grundy-Warr and Elaine, 1997, p. 82)। তাই রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে তিনটি স্বতন্ত্র স্তরের বিশ্লেষণ ব্যবহার করে একটি সামগ্রিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমত, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত একটি তাত্ত্বিক কাঠামো প্রবর্তন, যেখানে জাতীয়তাবাদের ধারণাটি আরও অনুসন্ধান করা হবে, যাতে জাতীয়তাবাদের কোন দিকগুলো পরিচয়ের রাজনীতির কারণ ঘটায় তা নির্ধারণ করা যায়। দ্বিতীয়ত, বার্মীজ জাতীয়তাবাদের একটি সাধারণ ঐতহাসিক রূপরেখা দেওয়া, কীভাবে বার্মীজ জাতি-গঠন এবং রাষ্ট্র-তৈরী বাস্তবে রূপ নিয়েছিল? রোহিঙ্গারা বার্মীজ দেশ গঠনের ক্ষেত্রে যে প্রধান সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয়েছিল তা তুলে ধরা। পরিশেষে তাত্ত্বিক, সাধারণ এবং রোহিঙ্গা প্রশ্নের নির্দিষ্ট দিক বিবেচনা করা।

যদিও রাখাইন বৌদ্ধ এবং রোহিঙ্গা মুসলিমদের মধ্যে জাতিগত ও ধর্মীয় উত্তেজনা কয়েক দশক ধরে চলে আসছে। যার ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের জুনে এবং ২০১৬-১৭ সালে সহিংসতার তরঙ্গ নতুন মাত্রা নিয়েছিল। রাখাইন রাজ্যে যেখানে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, বেশিরভাগ মানুষ বার্মীজ ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারি। বাণিজ্যের কারণে রাখাইন রাজ্যে জনসংখ্যার চাপের ভিত্তিতে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে বঙ্গোপসাগরের বাণিজ্য প্রসঙ্গে প্রথম দিকের অনেক মুসলিম অভিবাসী আরব মুসলিমদের ন্যায় বঙ্গ থেকেও এই অঞ্চলে এসেছিলেন। অন্যদের মতো বাঙালি মুসলিমরা রাখাইন জনসংখ্যার একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতে শুরু করে, যা ব্রিটিশদের দখলের পরে আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ব্রিটিশ নীতি এই অঞ্চলে দক্ষিণ এশিয় অভিবাসনকে উৎসাহিত করেছিল। মিয়ানমার ভূখণ্ডে দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান সত্ত্বেও সরকার এবং জনসাধারণ এখনও রোহিঙ্গা এবং বার্মীজ অঞ্চলগুলোর মধ্যে যে কোনও বন্ধনকে খারিজ করেছে (Coclanis, 2013)। রোহিঙ্গারা রাখাইন রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারকে তাদের নির্মূলকরণের ইচ্ছাকৃত প্রয়াসের অভিযোগ করেছে এবং এ সহিংসতাটিকে রাষ্ট্র-উৎসাহিত জাতিগত নির্মূলকরণ হিসাবে

সংজ্ঞায়িত করেছে। এই বক্তব্যটি এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা সমর্থিত (HRW, 2013)।

৫.১.৪.২ বর্মী জাতীয়তাবাদ ও সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরোধ

মানবাধিকার কমিশন (২০১৪) অনুসারে জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংজ্ঞায় 'জাতীয়, জাতিগত, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং ভাষাগত পরিচয়' সার্বজনীনভাবে কোনও তালিকাভুক্তি নেই তা সত্ত্বেও কোন কোনো গ্রুপ সংখ্যালঘুদের গঠন করে (HRW, 2014)। এটি জোর দেওয়া হয় যে পরবর্তী যে কোনও সংজ্ঞায়- পরিচয়, ভাষা বা ধর্ম ও পাশাপাশি ব্যক্তিগত কারণগুলো যা ব্যক্তির অনুভূতিসমূহ গ্রহণ করে উক্ত গ্রুপের অন্তর্গত হয়। তা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘু সমস্যার মধ্যেও ব্যক্তি বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। বার্মার গণতন্ত্রে ফিরে আসার জন্য জাতীয় মূল্যায়ন সত্ত্বেও গণতন্ত্রকে বার্মার দীর্ঘায়িত জাতি-গঠনের সমস্যার নিরাময় হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে জোও উইন উল্লেখ করেছেন যে, সর্বাধিক জনপ্রিয় অনুমানের বিপরীতে একটি জাতি গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনকে সমর্থন করবে না (Zaw, 2010, p. 27)। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হল উ নু'র সময়কালে গণতন্ত্র এবং বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার সময় স্মিথ পর্যবেক্ষণ করেন-"গণতন্ত্রকে বৌদ্ধধর্মে যতটুকু সমর্থনই দেওয়া হোক না কেন, এটা স্পষ্ট যে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা উদ্দীপনা ও উৎসাহিত করে এবং রাজনৈতিক জীবনে ধর্মকে প্রকাশ্যে আনার প্রবণতা ছিল" (Smith, 1965, pp. 312-313)। রাজনৈতিকভাবে জড়িত বৌদ্ধ ধর্মের সূত্রটি বর্মার কেন্দ্রগুলোতে এ ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মনে করা হয় বৌদ্ধ ধর্ম বর্তমানে বার্মার জনসংখ্যার মাত্র ৪% মুসলিম বিশেষত ইসলামের হুমকির দ্বারা বিপদে রয়েছে। যদিও বার্মায় পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রগতিশীল রেখা রয়েছে। তবে বৌদ্ধ ধর্মের রক্ষণশীল রেখা, যা পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্রকে বার্মীজ সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে বিবেচনা করে। গণতন্ত্র কীভাবে কাজ করা উচিত সে সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী ধারণার ফলে বর্তমানের মধ্যে বর্মানাইজেশন প্রক্রিয়াটি প্রসারিত হয়ে আছে। তারপরও উর্ধ্বমুখী জাতীয়তাবাদী ৯৬৯ আন্দোলন, যা জনসম্মুখে বার্মার প্রেসিডেন্ট থেইন সেইনের দ্বারা প্রকাশিত মুসলিম বিরোধী প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বার্মার ওপর প্রচুর প্রভাবসহ তার একটি বার্তা ছিল যদি ইসলামের উত্থান অব্যাহত থাকে তবে একটি 'অন্ধকার যুগ' আগমনের জন্য উদ্বেগজনক (Ytzen, 2014, pp. 315-317)। বৌদ্ধ ধর্মকে রক্ষা ছাড়াও জাতীয়তাবাদী ৯৬৯ আন্দোলনের লক্ষ বর্মাণ জাতি এবং ভাষাকে 'মুসলিম বিজয়' থেকে রক্ষা করা। ধর্মের রাজনীতিকরণের প্রভাব হিসেবে ২০১২ ও ২০১৩ সালে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গায় যে অভিযোগটি জাতীয়তাবাদী ৯৬৯ আন্দোলনের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল, তা বার্মার বর্তমান রাজনৈতিক আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ওপরের দিকে লক্ষ রেখে প্রভাবিত করছে। সব মিলিয়ে আরাকান রাজ্যে বসবাসরত রোহিঙ্গারা একটি নির্যাতিত ও রাষ্ট্রহীন মুসলিম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী (Gravers, 2014. p. 314)।

৫.১.৪.২.১ ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ: বৌদ্ধ ভিক্ষু আন্দোলন

পৃথিবীর ধর্মের রাজনৈতিক ভাষা নেই। মিয়ানমারের ইতিহাসে বৌদ্ধ ধর্ম দেশটির ভাবমূর্তি যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটি বিশেষ ভুমিকা পালন করে আসছে। বার্মা দেশটিতে ভিক্ষু, সাধারণ জনগণ ও সরকার এই ত্রিমাত্রিক উপাদানের সমন্বয় দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে গবেষণাপত্র ও সংবাদপত্রগুলো মিয়ানমারের অং সান সুচির গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছে। জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ ধর্মের কাছে দেশটির নৃত্তাত্ত্বিক ও মানবিক ইস্যুসমূহ অতীতের সব আন্দোলনকে ছাপিয়ে গেছে। জাতীয়তাবাদের কথা চিন্তা করার সময় পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণত আধুনিকতার সাথে এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পৃথকীকরণের সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে আলোকিতকরণ এবং পরবর্তীকালে একটি জাতি-রাষ্ট্রের আদর্শ যৌক্তিকতা, বস্তুবাদ, সার্বজনীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা এর চারপাশে বিদ্যমান রয়েছে (Kinnvall, 2002)। শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নতি প্রভৃতির সাথে দেশটির পরিচয় হয়েছে। তবে, জনগনের মধ্যে ধর্মের বিচ্ছিন্নতা এবং বিভেদ বিবেচনা করা হয়েছিল রাষ্ট্র নির্মান এবং সংগঠনের আধুনিক উপায় হিসেবে (Friedland, 2001)। জাতি ও ধর্মের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজনের ভিত্তিতে ঘটনাক্রমে অনেক পণ্ডিতেরা যেমন বাস্তবতার উপর নির্ভর করেছেন; তেমনি মিয়ানমারের মতো অনেকে তাদের রাজনৈতিক দাবীতে ধর্মের গুরুত্ব বজায় রাখায় সচেষ্ট রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বের অনেক জায়গায় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের সাথে প্রতিযোগিতায় সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য প্রাক্তন মিত্র, নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের সাথে এবং জাতিরাষ্ট্রের সাথে উত্তরোত্তর সুস্পষ্ট কাঠামোর অবস্থান ধরে রেখেছে। বিপরীতে অন্য সংস্কৃতিগুলো এ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মকে সমাজ, রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং বাস্তব চিত্রসমূহের সংজ্ঞা সরবরাহকারী হিসেবে সামাজিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের আইনসমূহের থেকে অবিচ্ছেদ্য কারণ হিসেবে প্রশাসনিক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় (Friedland, 2001)। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ তখন আরও দৃঢ় এবং গভীরতর হয় কারণ উভয়ের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিষয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। অতএব, এটি আলাদা স্বীকৃতি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে পণ্ডিতদের ধারণা এবং বার্মীজ সমাজে বাস্তবতার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি, অনুশীলন না করে এই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মূলকে বিবেচনায় নেওয়ার চেষ্টা করে। ফলস্বরূপ, একবিংশ শতাব্দীর শুরুটি নতুন সম্ভাবনার জন্য উন্মুক্ত স্রোতের সংশ্লেষণকে বিবেচনায় রাখার আদেশটি কেবল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য মিত্র হয়ে উঠে (Jurgensmeyer, 2010)।

জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম উভয়ই ক্ষমতা নির্দেশ দেয় তাদের সাথে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত; সে সম্পর্কে বিবেচনা করেই তা বিকশিত হয় (Friedland, 2001)। একইভাবে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম, জাতির বোধ, আঞ্চলিকভাবে সীমাবদ্ধ যেমন এটি একটি জাতীয় অঞ্চল, গোষ্ঠীকরণ এবং সংস্থাসমূহের মতো একটি ধারাবাহিক কাঠামো এবং সংজ্ঞায়িত সংস্থার সাথে সম্পর্কিত যা ঐক্য, সম্পূর্ণতা এবং নিজস্বতা বোধের জন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে পরোক্ষভাবে উত্তর এবং সান্ত্বনা সরবরাহ

করে (Kinnvall, 2004)। যেহেতু সমস্ত ধর্মীয় উপাদানগুলো জাতীয় প্রতীক হিসেবে রূপান্তরিত হয় এবং জাতীয় ঘটনাবলীর অবস্থান ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলোতে একত্রিত করে একটি অভিন্ন পরিচয় তৈরি ও ব্যবহৃত হয় (Kinnvall, 2004; Jurgensmeyer, 2010, p. 268)। সমসাময়িক বিশ্বে ধর্মীয় দ্বন্দ্বের সর্বাধিক পরিচিত ঘটনাগুলো এমন অঞ্চলসমূহে সংঘটিত হয়েছে যেখানে জাতিরাষ্ট্রের কোনও নির্দিষ্ট ধারণা সংজ্ঞা দেওয়া বা গ্রহণ করা কঠিন; যার একটি উদাহরণ মিয়ানমার। বহু দশক ধরে এখানে অনিয়মিত চরমপন্থী রাজনীতির শিকার হয়েছে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। রাষ্ট্রটি কী রূপ নেবে এবং সমাজের কোন উপাদানগুলো নেতৃত্ব প্রদান করবে তার অনিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করে বিশেষত; বৌদ্ধধর্ম একটি নতুন জাতীয় ঐক্যমত এবং নতুন ধরণের নেতৃত্বের ভিত্তি সরবরাহ করেছে (Jurgensmeyer, 2010, p. 268; Kinnvall, 2004)। ব্যক্তির-পাশাপাশি যে গ্রুপে তারা অন্তর্ভুক্ত হয়, তারা আরও অস্তিত্বহীনভাবে অনিশ্চিত এবং অনিরাপদ হয়ে ওঠে। সামরিকতন্ত্রের কারণে অর্থনীতি, রাজনীতি এবং মানবিক বিষয়গুলোর বিশ্বায়ন, স্ব-পরিচয় পুনর্বিবেচনা, দলগুলোর সুরক্ষা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি জোরদার করে এমন সমষ্টিতে পৌঁছায়, যা প্রায়শই ধর্ম এবং জাতীয়তাবাদের সংমিশ্রণে পাওয়া যায়। যখন ভাষা, বর্ণ এবং অন্যান্য পরিচয়ের তুলনায় আশ্বাস এবং সুরক্ষা যখন ব্যক্তির উপর ক্রমবর্ধমান চাহিদা থাকে (Kinnvall, 2002)। ইতিহাসের সাথে যুক্ত বিভিন্ন প্রতীক, স্মৃতি বা পৌরাণিক কাহিনী সন্ধান করে নির্দিষ্ট পরিচয় গোষ্ঠী একটি সাধারণ, নির্দিষ্ট সময় ও জায়গায় ফিরে আসে যা ভবিষ্যতের কর্মকাণ্ডে গাইড হিসাবে ব্যবহার করে (Kinnvall, 2004)। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে প্রথমে শুরু হওয়া ধর্মীয় উত্তেজনা আরও ছড়িয়ে পড়ে; যার সাথে পুরো আঞ্চলিক সুরক্ষা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এতে প্রতিবেশী দেশগুলোতে আন্তঃ-ধর্মীয় সহিংসতা চলছে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস্তবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে উত্তেজনা উস্কে দিয়েছে।

মিয়ানমারের বাইরে মুসলিম এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এ উত্তেজনা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে প্রতিশোধ এবং পাল্টা-প্রতিশোধের এক বিরল চক্রের দিকে পরিচালিত হতে পারে। ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী ভিত্তির কারণে সংঘটিত সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে (Zappei, J. 2014)। মূলত বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীসমূহের সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে উগ্রবাদ বাড়ছে। বৌদ্ধ-মুসলিম দ্বন্দ্ব থেকে প্রাপ্ত আরও একটি বিস্তৃত ইস্যু হলো শরণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি। তীব্র ঘৃণা, উত্তেজনা এবং দ্বন্দ্ব বাড়ার সাথে সাথে সীমান্তবর্তী দেশসমূহে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গার সংখ্যা আরও বিস্ফোরিত হচ্ছে, যা রাষ্ট্র এবং অ-রাষ্ট্রীয় উভয় পক্ষ দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিকে নির্দেশ করে। রোহিঙ্গারা প্রয়োজনীয় সুরক্ষার পরিবর্তে গ্রেপ্তার, নির্বাসন বা শ্রম শোষণের শিকার হচ্ছে। আন্তর্জাতিক চাপ এবং নাগরিক সমাজের সমর্থন সত্ত্বেও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে আসিয়ানের দশ সদস্যের মধ্যে মাত্র দু'টি রাষ্ট্র ফিলিপাইন এবং কম্বোডিয়া ১৯৫১ সালের স্থিতির সাথে সম্পর্কিত জাতিসংঘের কনভেনশনকে অনুমোদন দিয়েছে এবং ১৯৬৭ সালের শরণার্থী প্রোটোকল এর সাথে স্বাক্ষর করেছে (Asia Pacific Refugees

Rights Network, 2013)। শরণার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য দেশ যেমন মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ বা থাইল্যান্ড সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত আইনী পদক্ষেপের পক্ষে রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং আশ্রয়প্রার্থীদের অনেক সহায়তা করেছে।

৫.১.৪.২.২ জাতীয় পরিচয়ের রাজনীতিকিকরণ

রাষ্ট্রে নাগরিকের পরিচয় ক্ষমতার প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে নির্ধারিত হয়। 'পরিচয়ের রাজনীতিকীকরণ' প্রত্যয়ের ধারণাটি স্যামুয়েলস ব্যবহার করেছেন (Samuels, 2013, p.148-149)। তিনি বলেছেন, মানুষের একাধিক পরিচয় রয়েছে; স্বতন্ত্র ও সামাজিক প্রসঙ্গের মাধ্যমে রাজনীতিতে পরিণত হওয়া (Samuels, 2013, p.147-72)। সাধারণভাবে এ পরিচয় বলতে আমরা 'কে' এবং আমরা 'কারা' বোঝায় (Massey, 2004, p. 5)। এতে পরিচয়-গঠনের প্রক্রিয়াগুলো সহজাতভাবে সম্পর্কিত হয়ে এর সীমাবদ্ধতা বোঝায় (Penrose, 2008, p. 276-277)। সামাজিক গোষ্ঠীর নিজেকে শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা থেকে উদ্ভূত হয়। যে পরিচয় গোষ্ঠীর মধ্যে মিল এবং পার্থক্য শেষ পর্যন্ত অর্থবহ করে তোলে (Hogg, Michael at Al., 1995, p. 260-261)। রাজনৈতিক পরিচয় উল্লেখ করে ব্যক্তি যে-যেভাবে নিজেকে এবং অন্যকে শ্রেণিবদ্ধ করে এবং গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে আধিপত্য ও নিপীড়নের সম্পর্ক রয়েছে সেগুলো বুঝায়। রাজনৈতিক পরিচয়ের 'রাজনৈতিক উপাদানটি' তার সদস্যদের রাজনৈতিক স্বার্থকে এগিয়ে নিতে বা রক্ষার জন্য কোনো গোষ্ঠীর দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহারকে বুঝায় (Samuels, 2013)। পৃথক গোষ্ঠীতে লোকদের একটি পরিচয় ভিত্তিক শ্রেণীবদ্ধকরণ কেবল সামাজিক বিষয় নয়; এর একটি রাজনৈতিক দিকও রয়েছে। সামাজিক দলসমূহ তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থ প্রচারের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করতে পারে। তাই জাতীয় পরিচয় রাজনৈতিক পরিচয়ের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গঠন (Samuels, 2013, p. 35)। সিলভারস্টাইন দাবি করেছেন যে, উ নু এর মতামত ছিল, 'বার্মার জনগণের মধ্যে জাতিগত, সাংস্কৃতিক এবং আঞ্চলিক বিভাগগুলো কৃত্রিম; মূলত ব্রিটিশ শাসন এবং ঔপনিবেশিক নীতির ফলস্বরূপ বাস্তবে সমস্ত মানুষই এক ছিল।' ১৯৪৭ সালের সংবিধানে 'ফেডারেলিজম' শব্দের স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি; তা বিবেচনা করে অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে, উ নু সমস্ত সংখ্যালঘুদের স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তির প্রত্যাশা উপেক্ষা করেন এবং সংকীর্ণ অর্থে 'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন (Silverstein, 1980, p. 186; Gravers, 2007, p. 21)। অং সান 'বৈচিত্র্যের ঐক্য' নীতিটি মেনে চলার জন্য বার্মার পক্ষে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছিলেন। সেখানে উ নু দ্বিমত পোষণ করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, 'সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান [সম্প্রসারণের পরিবর্তে] সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণগত বন্ধনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ভেঙ্গে ফেলা এবং পৃথক রাজ্য গঠন করা' (Silverstein, 1980, p. 150)। পুরাতন দৃষ্টিকোণ থেকে উ নু ধারাবাহিকভাবে জোর দিয়েছিলেন যে 'বার্মার নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্বাভাবিক ছিল', যেহেতু বার্মীজ নৃগোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যই বার্মার 'পুত্র-কন্যা' এবং একই বাড়িতে বাসকারী জন্মভূমির একই আত্মীয়"(Silverstein, 1980, pp. 149-150)।

সুতরাং উ নু সংখ্যালঘু অধিকারের ধারণাকে সমর্থন করেনি। সংখ্যালঘু অধিকারের ধারণাটি ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের বিভক্তি ও শাসন করতে সক্ষম করার জন্য একটি আবিষ্কার অর্থাৎ জাতীয় ঐক্যের প্রতিবন্ধকতা (Silverstein, 1980, p. 149-151)। জাতীয় ঐক্যের বিষয়ে অং সান এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উ নু-এর পার্থক্য ছাড়াও, অং সান এর ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গিকেও সমানভাবে উপেক্ষা করা হয়। অং সান জোর দিয়েছিলেন যে রাজনীতিতে ধর্মের কোনও অবকাশ নেই। যার মাধ্যমে বার্মাকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হতে হয়েছিল। ধর্ম এবং বহুসংখ্যক সামাজিক উত্তেজনা এড়াতে ধর্মীয় বহুত্ববাদ নিশ্চিত করতে হয় (Silverstein, 1980, pp. 143-144)। উ নু একজন ধার্মিক বৌদ্ধ ছিলেন, বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মীয় পুনর্জাগরণে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে প্ররোচিত করেছিলেন এবং সমস্ত পার্থিব সমস্যার জন্য বৌদ্ধ ধর্মকে 'হাতিয়ার' হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। যার ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রকে ধর্মের সাথে মিশ্রিত করা হয় (Smith, 1965, pp. 143-144)। এছাড়াও উ নু সীমান্ত অঞ্চলে অ-বৌদ্ধদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের জোর প্রচার চালিয়ে ছিলেন এবং বার্মীকরণ প্রক্রিয়াটিকে আরও এগিয়ে নিয়েছিলেন (Smith, 1965, p. 154)। এটি করার মাধ্যমে উ নু স্পষ্টভাবে ১৯৪৭ সালের বার্মার সংবিধানে বর্ণিত 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার' এর চেতনা ভুলুণ্ঠিত করেছিলেন (Gravers, 1999, p. 56)। তবুও সবচেয়ে বিতর্কিত এ লঙ্ঘনের পরেও উ নু ১৯৬১ সালে বৌদ্ধ ধর্মকে বার্মার রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করেছিলেন। এর সাথে সঙ্গতি রেখে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, 'বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছা' তথা ৮৯% বার্মার জনসংখ্যার ইচ্ছা মানতে হবে (Smith, 1965, p. 263)। যদিও উ নু বর্মার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের তাদের অধিকার ক্ষুন্ন করা হবে না বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিল। কারণ অ-বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পরিচয়কে রাজনৈতিকভাবে বর্জন করার কারণে পুরো বার্মায় সহিংসতা প্ররোচিত করেছিল (Sakhong, 2012, p. 5-6)।

৫.১.৪.৩ বৌদ্ধ ভিক্ষু আন্দোলন: উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী প্রচারণা

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যে অবস্থান গ্রহণ করেছে তার একটি হলো নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা সংহত করা; অন্যদিকে মুসলিম জনগোষ্ঠিকে কোনঠাসা করে রাখা। একই সাথে তারা নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যকে সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা ও মুসলিম মালিকানাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিহত করার প্রত্যয় ঘোষণা করেছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু আন্দোলনকে চাঙ্গা করার আরও একটি উপকরণ হলো তাদের সমন্বিত প্রতীকের ব্যবহার (Arai, 2013)। এই প্রতীকের মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যে সংহতির সৃষ্টি করে এবং তাদের ধর্মীয় ভিত্তিমূলে প্রাচীন রাজা অশোকের চেতনা তুলে ধরে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের মাঝে একটি জাতিয়তাবোধের সৃষ্টি করে। তারা আন্দোলনের দ্বারা অন্য ধর্মালম্বী জাতিগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তাদের ব্যবহৃত প্রতীকী সংখ্যা ৯৬৯ একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। এর ৯ অঙ্কটি দ্বারা গৌতম বুদ্ধের ৯টি বিশেষ সদগুণের কথা প্রচার করে; ৬ অঙ্কটি দ্বারা গৌতম বুদ্ধ যে দীক্ষা দিয়েছেন তারা এর সমষ্টিকে বুঝাতে এবং শেষ ৯ অঙ্কটি দ্বারা সংঘ বুঝাতে চেয়েছে (Bookbinder, 2013)। এরকম লগো বা চিহ্ন ব্যবহার করে তারা দেশটির দোকান, অফিস, বাজার, অন্যান্য কর্মস্থলে প্রচারণা করে থাকে। তবে অনেকে এই প্রতীকী আন্দোলনের

সমালোচনাও করে এবং মতামত দেয় এই সংখ্যার প্রচারণায় তারা মুসলিমদের সমকক্ষ হতে চায়। যেহেতু মুসলিমরা ৭৮৬ দ্বারা মহান আল্লাহ তায়ালার গুণকীর্তন করে, তাই এটি ৭৮৬ "বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম" এর সাংঘর্ষিক রূপের প্রকাশ। বৌদ্ধদের ৯৬৯ প্রতীকটিকে অনেকে মুসলিমদের ৭৮৬ প্রতীকটির সাথে তুলনা করেন। যা একবিংশ শতাব্দীতে আধিপত্যের ইঙ্গিত দেয় (Marshall & Rossman, 1999)। এর ব্যাখ্যা স্বরূপ তারা উপস্থাপন করেন যে ৭+৮+৬=২১ অর্থাৎ একুশ শতক। তবে বৌদ্ধরা মনে করে ৯৬৯ সংখ্যাটি ৭৮৬ সংখ্যাটির সম্পূর্ণ বিপরীত। বৈদেশিক মন্ত্রণালয় থেকে মূলত শব্দটির উৎপত্তি যা বৌদ্ধ প্ররোচনার জন্য ব্যবহার করা হয়। তাই ৯৬৯ সংখ্যার আন্দোলন স্পষ্ট করে যে কেন তারা এই তিন ডিজিট ব্যবহার করে। তারা মূলত তাদের সুদৃঢ় পরিচয়কে আরো সুদৃঢ় করার জন্য ব্যবহার করে। এছাড়াও নির্দষ্ট কিছু আদর্শ, ধ্যানধারণা ও আগামী দিনের কার্যক্রমকে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে এই মূল্যবান মানিকতুল্য তিনটি অঙ্ক ব্যহার করেন। মুসলিমদের রীতিনীতির প্রতি আচ্ছন্ন হওয়ার ভয়ে ৯৬৯ প্রতীক দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা (বৌদ্ধরা) মুসলিমদের ব্যবসা বাণিজ্য বয়কট করে উইরাথু এবং তার সমর্থকরা একটি পিটিশন দায়ের করেন; তারা এ পিটিশনের নাম দেয় জাতীয় পরিচয় রক্ষা পিটিশন (Coclanis, 2013)। এ পিটিশনের বিষয়বস্তু ছিল নিজ ধর্মের বাইরে কাউকে বিয়েতে অনুৎসাহিত করা। যেহেতু একজন বৌদ্ধ ধর্মালম্বীকে একজন মুসলিম ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হলে তাকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে হবে। এক্ষেত্রে যদি কোনো বৌদ্ধ নারী অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীকে বিয়ে করতে চায় তবে তাকে তার পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং স্থানীয় আইনী কর্তৃপক্ষের নিকট সমস্ত তথ্যাদি প্রদান করতে হবে। আর যদি এতে তারা ব্যর্থ হয় তাহলে সেই স্বামীকে ১০ বছর কারাগারে অবস্থান করতে হবে এবং তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে (HRW, 2014a)। এতে নানা বিতর্কের জন্ম দেয় এবং মানবাধিকার ও নারী সংগঠনগুলো এটিকে একটি পক্ষপাতিত্ব আচরণ বলে মনে করে। এছাড়া এই আইন দ্বারা শুধুমাত্র বৌদ্ধ নারীদের সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং সার্বজনীন মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়। বার্মায় দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে সেখানে বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটেছে। ঔপনিবেশিক, সামরিক ও এক নায়কতন্ত্রের ইতিহাসে জাতিগত ভিন্নতা অর্থাৎ ধর্মীয় ভিন্নতাও দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে মিয়ানমারের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে রাখাইন প্রদেশে জুড়ে জাতিগত দাঙ্গা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। বিগত কয়েক বছরে বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী ও সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে জাতিগত দাঙ্গা বেড়েই চলেছে যা বর্তমানে চরম অবস্থা ধারণ করে জাতিগত অসহিষ্ণুতা ও দাঙ্গার আকার ধারণ করে। ২০০৮ সালের সংবিধানেও যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। সংবিধানে থেরাভাদা বৌদ্ধ ধর্মকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে কারণ দেশটির শতকরা ৮৯ শতাংশ নাগরিক এই ধর্মমতের বিশ্বাসী; এতে এই জাতিগোষ্ঠী একটি নৈতিক শক্তি ধারণ করে। তবে মিয়ানমারে সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের মুখে একটি ধর্মীয় সীমাবদ্ধতাও ব্যাখ্যা করা হয় যা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। প্রকৃত পক্ষে যে নির্যাতন সামরিক জান্তারা দেশটিতে শুরু করেছিল তা এখন উচ্চ শ্রেণির বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শুরু করেছে; যা জাতিগত ও

ধর্মীয় পবিত্রতা নষ্ট করে চলেছে (Zarni, 2013)। দেশটির সামরিক প্রধান থেইন সেইন কর্তৃক ঘোষিত আদেশে বলা হয়, দেশ হবে রোহিঙ্গা মুক্ত যা দেশটির উচ্চ শ্রেণির বৌদ্ধরা বাস্তবায়ন করছে। এই উঁচু শ্রেণির বৌদ্ধ দ্বারা ঘোষিত বৈরিতা জাতিগত দাঙ্গা, জনসংখ্যার বাস্তুহারা ও অপ্রত্যাশিত হত্যাকাণ্ডের দিকে ঠেলে দিচ্ছে (Human Rights Watch, 2013)। শুধু এ সহিংসতা পরিচালিত করা হয়নি; একই সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতনও করা হচ্ছে। তাদের একটি হচ্ছে ৯৬৯ নামের মুসলিম বিরোধী আন্দোলন; যেখানে মুসলিম পরিচালিত ব্যবসা বাণিজ্যসহ সকল ধরণের সংমিশ্রণ থেকে বৌদ্ধদের বিরত রাখা হচ্ছে। এই আন্দোলন ও উস্কানীমূলক মতবাদ প্রচার করে বুদ্ধিষ্ট মৌলবাদী ভিক্ষুরা সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারা মনে করে মুসলিমরা সে দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির জন্য হুমকী। এই পরিস্থিতি বিশ্বের কাছে জনপ্রিয় বৌদ্ধ মতবাদের (শান্তি, মানবিকতা, অনাক্রমন্যতা ও অহিংস) ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। একই সাথে প্রথাগত মুসলিম দ্বান্দ্বিকতা ও বৌদ্ধদের শান্তি বিনষ্ঠকারী হিসেবেও তুলে ধরে (Malik, K. 2013)। ধর্মীয় চরমপন্থার বিচারে বৌদ্ধ মতবাদকে একপাশে রাখা হয়; কারণ যে মতবাদ গৌতমবুদ্ধ প্রচার করে গেছেন তা অহিংস ও শান্তিপ্রিয় হিসেবে বিবেচিত। প্রাচীন ভারতের সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য হতে শুরু হয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের আগ পর্যন্ত (শ্রিলংকা বা খেমার রাজ্য) বৌদ্ধদের ইতিহাস হচ্ছে যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস (Zarni, 2013)।

৫.১.৪.৪ বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষার স্ববিরোধীতা: গণহত্যায় প্ররোচনা

উইরাথু যুক্তি দিয়েছিলেন যে মুসলিম-বিরোধী সহিংসতার সাথে বৌদ্ধধর্ম শান্তিপূর্ণ সূত্রে পুনর্মিলন করতে সক্ষম। তিনি প্রচার করেন কেবল তার সম্প্রদায়কে রক্ষা করছেন দৃঢ়তার দ্বারা। বৌদ্ধ শিক্ষার সাথে বর্তমান জাতীয়তাবাদী আখ্যান এবং জাতিগত সংঘাতের দুটি পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি ৯৬৯ আন্দোলনের রয়েছে। এর সমর্থকদের দ্বারা আন্তবিবাহ আইন যুক্তি দিয়েছিল, যদিও উদ্দেশ্যগুলো বৌদ্ধদের উদ্দীপিত করে এবং সামাজিক ক্রিয়া প্রকৃত পথ দেখায় এবং বৌদ্ধ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তবে তারা তা অনিবার্যভাবে সামাজিক প্রভাব তৈরি করবে; যা ক্ষতিগ্রস্থ সকলের পক্ষে উপকারী হবে। এ ৯৬৯ আন্দোলনের এক জাতীয় নেতারা দাবি করেছেন "বৌদ্ধধর্মের অধীনে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সকলের পক্ষে। বৌদ্ধ আইন ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পাদন করা হলে রেলপথে ট্রেন চলার মতো। "যদি একটি কুকুর রেলপথ অতিক্রম করে এবং ট্রেন পথ দিয়ে চালিত হয় এটি ট্রেনের দোষ নয়; এটা কুকুরের দোষ"(Arai, 2013, p. 15)। এটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ, যারা সেখানে যুক্তি দেয় অন্যের কষ্ট দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি সামাজিক দায়িত্ব ঘটনাসমূহের কার্যকারণ শৃঙ্খলার সাথে সম্পর্কিত তাদের উদ্দেশ্যের সাথে বিষয়টি দুর্ভোগ উৎপন্ন করেছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বুদ্ধ শিখিয়েছেন যে বৌদ্ধ চেতনা অবশ্যই পরিবার, বন্ধু, জাতিসমূহের প্রতি গভীর বন্ধন দেখাতে সক্ষম হতে হবে" (Arai, 2013, p. 16)। তাছাড়া ভিক্ষু সংঘ তাদের ভিক্ষার বাটি নিয়ে অগ্রসর হয় এবং ইঙ্গিত দেয় যে সরকার এবং সেনাবাহিনীর নিকট থেকে যে কোনো ভিক্ষাকে অস্বীকার করা হবে (Long, 2013)। বৌদ্ধ বার্মীজ একাডেমির পরিচালক মং জার্নি ব্যাখ্যা করেছে যে, বৌদ্ধ ধর্ম ও অন্য ধর্মের লোকদের সম্পর্ক এমন নয়; যা অন্য ধর্মীয়

সম্প্রদায়ে সাথে সম্পর্কের উপর একটি জাতীয় কল্পনা করে এবং নিজস্ব ব্যবহার সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয় (Zarni, 2013)। মিয়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাসের সাথে অনুগত্যের দাবী করে তাদের মধ্যে এমন অনেক জাতীয়তাবাদী প্রবক্তা রয়েছেন। অনেক বার্মীজ নিজেকে বৌদ্ধ ধর্মের অভিভাবক মনে করেন, ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুষ্ঠান অনুশীলন এবং বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মং জার্নি (২০১৩) আরও দাবি করেছেন, পরবর্তীকালে সহনশীলতা ও বৈষম্যহীনতা বৌদ্ধ ধর্মের নীতিগুলোর সাথে পুনর্মিলন এবং অন্তর্ভুক্তি স্পষ্টভাবে সুরক্ষা এবং বিশুদ্ধতার বিপরীতে অবস্থান করে (Zarni, 2013)।

এটি সত্য যে রোহিঙ্গা বিরোধী অবস্থান একটি আন্ত-ধর্মীয় সংঘাত হিসেবে ধর্মের পরিচয় হিসেবে রাজনৈতিক এবং সামাজিক উদ্দেশ্যে শোষণ করে (Malik, 2013)। গ্রেভারস (২০১৩) দাবি করে, পরবর্তীকালের বৌদ্ধ ধর্ম নিজেই বার্মায় সহিংস লড়াইয়ের উৎস নয় বরং রাজনীতির একটি মাধ্যম হয়েছে। এটি দমনকারী সরকারের বিরুদ্ধে তার ভিত্তি হিসেবে জাতীয়তাবাদী স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা এমনকি সহিংস জেনোফোবিক (বিদেশাতঙ্ক) সংগ্রামের অংশ হিসাবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে (Gravers, 2013)। অক্টোবরে ২০১২ সালে, রাখাইন রাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার পরেও এই উত্তেজনা দ্বিতীয় হিংস্র প্রকোপের দিকে পরিচালিত করে, যার ফলে ২০০ জন মারা যায় ও আহত হয়ে প্রায় ১০০,০০০ রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয় (Walton, 2013)। অধিকন্তু, প্রায় ৩০০০টি বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়েছিল এবং ১৪টি ধর্মীয় স্থাপনায় আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল (Kipgen 2013)। শীঘ্রই সহিংসতা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, এতে কেবল রোহিঙ্গা নয় সাধারণভাবে অন্য মুসলিমরাও ঘটনার শিকার হয়। বিশেষত, দক্ষিণ রাখাইন থেকে কামান মুসলিমরা বৌদ্ধ হামলার শিকার হয়েছিল, যদিও তারা পূর্ণ নাগরিকত্ব অধিকারসহ ১৩৫টি স্বীকৃত জাতিগোষ্ঠীর অংশ। উদাহরণস্বরূপ, মার্চ ২০১৩-এ মিখতিলা শহরের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা মুসলিমদের ঘরবাড়ি, স্কুল ও মসজিদ জ্বালিয়ে দেওয়ার ফলে কয়েক শত মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে এমন দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত ন্যূনতম পদক্ষেপ সত্ত্বেও, এই ধরণের হিংসাত্মক ঘটনা অব্যাহত রয়েছে, যেহেতু দুটি দলের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব রয়েছে (HRW, 2013)। সরকার এ জাতীয় অভিযোগকে খণ্ডন করে, তবে তা সত্ত্বেও স্থায়ী সমাধানে আসতে ব্যর্থ হয় (Kipgen, 2013)। একজন নারীর কথিত ধর্ষণ ও হত্যার পর ২০১২ সালের জুনের উত্তেজনা প্রকৃত সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয় এবং রাখাইন রাজ্যে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর সদস্যরা। রাখাইন বৌদ্ধদের প্রতিহিংসায় দশজন মুসলিম পুরুষকে একটি বাসে হত্যা করা হয়েছিল এবং উভয় পক্ষের প্রাণহানির সাথে সংঘর্ষটি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল-যদিও পর্যবেক্ষকরা একমত হয়েছেন যে রোহিঙ্গাদের দুর্বল প্রস্তুতির কারণে রোহিঙ্গাদের বৃহত্তর জান-মালের ক্ষতি হয়েছে। সংঘাত নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় মিয়ানমার সরকারের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন অধিকার গোষ্ঠীর সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া হিসেবে থেইন সেইন তদন্তের জন্য একটি ১(এক)-সদস্যের কমিটি গঠন করেছিলেন। কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সহিংসতা

পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং ধর্মীয় পার্থক্যের ফল, যা বৌদ্ধ এবং মুসলিমদের মধ্যে ঘৃণা ও প্রতিহিংসা তৈরি করেছিল। এই প্রতিবেদনের পরে রোহিঙ্গা এবং রাখাইন উভয়কে আন্তর্জাতিক সহায়তায় তহবিল থেকে ত্রাণ শিবির স্থাপন করা হয়েছিল (Kipgen, 2013)।

প্রকৃতপক্ষে উইরাথু যুক্তি দেখায় যে, বৌদ্ধ ধর্মের শান্তিপূর্ণ গুণাবলী ও মুসলিম বিরোধী শক্তির একটি সমঝোতা করতে তিনি সক্ষম হবেন। সে এই বলে প্রচারণা চালায়; তারা হিংস্র না হয়ে বরং রক্ষণাত্মক হওয়া। আরো কিছু বিষয়ে প্রচারণা চালে তা হলো–চলমান জাতীয়তাবাদী বক্তব্য ও নৃতাত্ত্বিক সংঘর্ষের পেছনে দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমত ৯৬৯ আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দ্বিতীয়ত আন্তবিবাহের আইন যুক্তি। শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি হুমকি স্বরূপ কোন ঘটনা ঘটলে সংঘই যৌথভাবে ব্যবস্থা নিতে ও সমাধান করতে পারবে। ২০০৭ সালে ২০ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুর ১ লাখ বিপথগামী সদস্যের সমর্থন পেয়ে একটি বিদ্রোহ হয়; যা জাফরান বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এতে সংঘ তাদের ভিক্ষার বাটি উল্টে রেখে প্রতিবাদ জানায় যে তারা সরকার, সামরিক বাহিনী ও এমনটি সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট কারও কাছে কোন সাহায্য গ্রহণ করবে না (Long, 2013)। নিউইয়র্ক টাইমসের বৈশ্বিক সংস্করণ ও ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের এক প্রতিবেদনে মিয়ানমারের সহিংসতায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৩ সালের জুন মাসে নিউইয়র্ক টাইমসের অনলাইন সংস্করণে বলা হয় 'মিয়ানমারের বৌদ্ধদের মধ্যে চরমপন্থা বাড়ছে' (www.nytimes.com/2013/06/21)।[৩৪] ২০১৩ সালের একই মাসে হেরাল্ড ট্রিবিউন 'মিয়ানমারে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর উত্তেজিত হওয়ার ডাক' শিরোনামে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে (www.questia.com/newspaper)।[৩৫]

চিত্র-৫.৬ঃ মিয়ানমারের সহিংসতার নেপথ্যে চরমপন্থি বৌদ্ধভিক্ষুরা

৩৪.https://www.nytimes.com/2013/06/21/world/asia/extremism-rises-among-myanmar- buddhists-wary-of-muslim-minority.html (Accessed on- June 22, 2013)

৩৫.https://www.questia.com/newspaper/1P2-36303782/radical-monk-calls-for-anger-in- myanmar-extreme (Accessed on- June 22, 2013)

এ সহিংসতাকে জোরদার করতে কমিউনিটি সেন্টার খোলা হয় এবং দেশব্যাপী ৬০ হাজারের বেশি বৌদ্ধ শিশুকে নিয়ে রোববারের স্কুল কর্মসূচি চালু করা হয়। 'সানডে ধাম্মা স্কুল' নামের কর্মসূচিতে শিশুদের মনে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে মুসলিম বিদ্বেষী ধারণা। বার্মা সামরিক রাষ্ট্র থেকে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রবেশ করলেও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণে বিশ্বব্যাপী মিয়ানমারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন এবং এশীয় অঞ্চলে প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মিয়ানমার বিরোধী মনোভাব তৈরি হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। সামরিক সরকার পরিচালিত মত প্রকাশের স্বাধীনতার সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছেন আশিন উইরাথু। এর আগে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার কারণে আট বছর জেল খাটতে হয়েছে আশিনকে। নতুন সরকারের সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে সম্প্রতি তিনি মুক্তি পান। সম্প্রতি আশিন এক ধর্মোপদেশে মেইকতিলা শহরে স্কুল শিশু ও অন্যান্য মুসলিম বসতিতে গণহত্যাকে 'শক্তির প্রদর্শন' হিসেবে উল্লেখ করেন। আশিন বলেন, *"If we are weak," he said, "our land will become Muslim."* 'যদি আমরা দুর্বল হই, আমাদের ভূমি মুসলিমদের হবে।' দেশটির প্রায় সাড়ে ৫ কোটি জনসংখ্যার মাত্র ৪ শতাংশ মুসলিম। অন্যরা হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী।

কিন্তু আশিন বলেন, 'মিয়ানমারের বৌদ্ধরা মুসলিমদের অধীন হয়ে যাচ্ছে।' তিনি দাবি করেন, মুসলিমরা বৌদ্ধদের থেকে বেশি সন্তান নিচ্ছে এবং বৌদ্ধদের সম্পত্তি কিনে নিচ্ছে। মুসলিম বিরোধী আন্দোলনের একটি 'থিম সং' তৈরি করেছেন তিনি। গানের সারাংশ হচ্ছে, যারা আমাদের দেশে বাস করে, আমাদের পানি পান করে এবং তারা আমাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ। গানটিতে সরাসরি মুসলিমদের নাম উল্লেখ করা না হলেও আশিন উইরাথু জানান, মুসলিমদের উদ্দেশ্য করেই গানটি তৈরি করা হয়েছে। বুদ্ধের গুণাবলীকে প্রতীকায়িত করে বলে বিশ্বাস বৌদ্ধ ভিক্ষুদের। মিয়ানমারের চরমপন্থি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কর্মকাণ্ড অন্যান্য দেশের বৌদ্ধরা ভালো চোখে দেখছেন না। মিয়ানমারের সহিংসতাকে 'অচিন্তনীয়' হিসেবে উল্লেখ করেছেন দালাইলামা। মিয়ানমারের বৌদ্ধদের বুদ্ধের নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি। থাইল্যান্ডের বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ভিক্ষু ফরা পাইসাল ভিসালো বলেন-

> *A Buddhist scholar and prominent monk in neighboring Thailand, says the notion of "us and them" promoted by Myanmar's radical monks is anathema to Buddhism. But he lamented that his criticism and that of other leading Buddhists outside the country have had "very little impact."* (www.nytimes.com/2013/06/21/)[৩৬]

'মিয়ানমারের চরমপন্থি ভিক্ষুদের উদ্ভাবিত 'আমরা ও তারা' ধারণা বৌদ্ধ ধর্মে গর্হিত কাজ।' বিশ্বের অন্যান্য দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষু থেকে মিয়ানমারের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিচ্ছিন্ন বলে মন্তব্য করেন তিনি

৩৬.https://www.nytimes.com/2013/06/21/world/asia/extremism-rises-among-myanmar- buddhists-wary-of-muslim-minority.html Accessed on- June 22, 2013

(*দৈনিক আমাদের সময়*, ২২ জুন, ২০১৩)। ১ জুলাই, ২০১৩ সালে টাইম ম্যাগাজিনটির একটি সংখ্যার প্রচ্ছদে আশিন উইরাথুর একটি ছবি ছাপিয়ে তাতে লেখা হয়: 'এক বৌদ্ধ সন্ত্রাসীর মুখ'। দ্যা ডিপ্লোম্যাটও এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে বলেছেন, "*You can be full of kindness and love, but you cannot sleep next to a mad dog.*" মসজিদকে তিনি বর্ণনা করেন 'শত্রুর ঘাঁটি' হিসেবে। তার কাছে মুসলিমরা হচ্ছে পাগলা কুকুর, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ-তারা চুরি করে, মিয়ানমারের মহিলাদের ধর্ষণ করে এবং গণহারে জন্ম দিয়ে তারা খুব দ্রুত নিজেদের বিস্তার ঘটাচ্ছে।

চিত্র-৫.৭ঃ ২০১৩ সালের টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ

https://www.patheos.com/blogs/dannyfisher/2013/06/this-is-time-magazines-cover

তার কথার প্রতিটি বাক্যে ছড়িয়ে থাকে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা। মিয়ানমারের বিদ্যমান মুসলিম বিদ্বেষে তার এসব বক্তব্য আরো উস্কানি জোগাতে সাহায্য করে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে এক পর্যায়ে আশিন উইরাথু সোশাল মিডিয়াও ব্যবহার করতে শুরু করেন। এরই এক পর্যায়ে ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ তাকে নিষিদ্ধ করে। মিয়ানমারের সংখ্যালঘু মুসলিমদের দুঃখ দুর্দশা অনুসন্ধান করতে জাতিসংঘের বিশেষ দূত ইয়াং লীকে ২০১৫ সালে সে দেশে পাঠানো হয়েছিল। উইরাথু তখন তাকে একজন 'দুশ্চরিত্রা' ও 'বেশ্যা' হিসেবে গালি দিয়েছিলেন। রাখাইনের গণহত্যায় সামরিক বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় জেনারেলদের ভূমিকা কী ছিল সেটা খতিয়ে দেখতে গত বছরেই আহবান জানানো হয়েছিল জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে। আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত বা আইসিসির পক্ষ থেকে প্রাথমিক এক তদন্তের সূচনা হওয়ার পরই এই আহবান জানানো হয়েছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু মিয়ানমারের আশিন উইরাথুর বিরুদ্ধে অবশেষে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে দেশটির সরকার। তবে, সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের গণহত্যায় উস্কানি দেয়ার অভিযোগে নয়, মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চিকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেয়ায় সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে (*দৈনিক যুগান্তর*, ০৮ জুন, ২০১৯)।

৫.১.৫ উপসংহার

এ অধ্যায়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। উপরোক্ত ঐতিহাসিক বাস্তবতায় প্রমাণিত যে, বণিক, সৈনিক ও নাবিক হিসেবে মূলত আরব মুসলিমগণ আরাকানের গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। আবহাওয়া, সমুদ্র ও জলবায়ুর কারণে অনেক জাহাজ বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ, জাহাজগুলোর টাটকা খাবার এবং পানীয় জল অথবা মেরামতের কাজের জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে এ সব বন্দরে প্রবেশ করত এবং এ প্রক্রিয়ায় অনেক মুসলিম নাবিক এ সকল বন্দরে বসতি স্থাপন করে থেকে যায়। তাছাড়া দূরবর্তী বাণিজ্য মিশনে তারা স্ত্রীদের সাথে আনতেন না এবং ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে অবৈধভাবে যৌন প্রয়োজন মিটানোও সম্ভব ছিল না; ফলে তারা স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করত। আরাকানের স্থানীয় আইন অনুযায়ী স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল বলে স্বদেশে ফিরে যাবার সময় মুসলিম বণিকগণ আরাকানে দ্বিতীয় স্থায়ী আবাস হিসেবে বসতি স্থাপন করত। বছরের পর বছর ধরে এভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য অবস্থানের কারণে সেখানে মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এসব আরব, পারস্যদেশীয় এবং ভারতীয় মুসলিম বণিকদের বংশধরগণ "বার্মান মুসলিম" সম্প্রদায়ের আদি নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং বর্মী রাজাদের আমলে এরা পাথি বা কালা নামে পরিচিতি পায়।

আলোচ্য "রোহিঙ্গা" শব্দের উৎপত্তি, নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও জীবনধারা, বার্মায় মুসলিম জাতিগঠন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিকাশ, ব্রিটিশ শক্তির বার্মা দখল ও ব্রিটিশ শাসনামলে আরাকানের রোহিঙ্গা, রোহিঙ্গা সংকটের সূত্রপাত, স্বাধীনতা উত্তর বার্মায় সামরিক শাসনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, আরাকানে রোহিঙ্গা নির্যাতন ও মানবাধিকার প্রসঙ্গ, বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ থেকে উগ্র বৌদ্ধ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু আন্দোলন থেকে উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী প্রচারণা বিষয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ স্থানীয় বর্মীদের থেকে কিছুটা আলাদা করেছে। আরাকানে শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা মুসলিম বসতি ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কয়েক শতাব্দীব্যাপী এ অঞ্চলে বসবাসের পরেও এক এক শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা এক এক ধরণের পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। তাদের জন্য ব্রিটিশদের আশ্বাস ও উ নু এর সময়ে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা তাদের জীবনে স্বস্তি দিলেও ১৯৬২ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে শাসকগোষ্ঠীর সহায়তায় একের পর এক সমস্যা সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়। এ অবস্থায় রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গাদের দুর্দশা সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে একটি চরম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এর কারণ ছিল যতটা না জাতিগত ততটাই ছিল ধর্মের সংমিশ্রণে রাজনৈতিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। সর্বশেষ ২০১৭ সালে 'এথনিক ক্লিনজিং' বা জাতিগত নিধনযজ্ঞ এর প্রমাণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমনের ক্রমধারা ও শিবিরে অবস্থান

৬.১ ভূমিকা

বিশ্বের অন্যান্য এলাকার শরণার্থী অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়-যে কোনো ধরণের জাতিগত সংঘাত, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতে মানুষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় জীবন বাঁচাতে সীমান্ত পার হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ বা এলাকায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে অবস্থান গ্রহণ করে। এ অবস্থান গ্রহণ করা শিবিরগুলোতে সাধারণত তাদের সব প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা থাকে না এবং সেখানে জীবনও উদ্বেগমুক্ত হয় না। অনিশ্চিত ভবিষ্যত, ফেলে আসা ভিটামাটি ও সম্পদের স্মৃতি, টেকসই উপার্জনের অভাব, মৌলিক সুরক্ষার ঘাটতি ও আত্মমর্যাদা সংরক্ষণের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সেখানে তারা উদ্বেগপূর্ণ জীবন-যাপন করে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কতিপয় সামঞ্জস্য রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় নাফ নদীর উভয় পারের মানুষের সাথে ক্ষেত্র বিশেষ মিল থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। যার কারণে নাফ নদীর উভয় পাড়ের মানুষের মধ্যে আসা-যাওয়া, আত্মীয়তা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যেহেতু উভয় পাড়ের মানুষের মধ্যে একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। সেহেতু রাখাইনে আক্রান্ত হওয়ার ফলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষ জীবন বাঁচাতে নিরাপদ মনে করে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহন করেছে। এই আক্রমণ কখনও মিয়ানমারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, কখনও সামরিক বাহিনী, কখনও বৌদ্ধ মিলিশিয়া এবং কখনও রাখাইন বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী আবার কখনও দ্বিমুখি বা ত্রিমুখি হামলার কারণে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে এসেছে। এই আগমনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন রকম হলেও সর্বশেষ ২০১৬-১৭ সালের আগমনে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। যা স্পষ্ট করতে এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী মিয়ানমারের উ নু সরকারের (১৯৪৮-১৯৫৮ ও ১৯৫৮-১৯৬২) সময়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পৃথক জাতিগত পরিচয়ের দাবি করলে গণতান্ত্রিক সরকার দ্বারা কিছু নাগরিক সুবিধা পেয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে সামরিক সরকারের সময়ে তারা সে সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হয় এবং ১৯৭৮ সালে রোহিঙ্গা বিতাড়ন অভিযান শুরু হলে রোহিঙ্গারা মূলত বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমাতে থাকে। ইমতিয়াজ আহাম্মেদ উল্লেখ করেছেন, ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনের অধীনে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান অস্বীকার করা হয়ে এবং মিয়ানমারের সামরিক জান্তা কর্তৃক রাষ্ট্রহীন প্রতিপন্ন করা হয়েছিল (Ahmed, 2010)। দেশটির সামরিক জান্তা এই বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মানুষকে বাংলাদেশ থেকে ব্রিটিশ আমলে অভিবাসী হিসেবে বিবেচনা করে। ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে রোহিঙ্গা শরণার্থী সঙ্কট মিয়ানমার ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করে। মিয়ানমারে সামরিক জান্তা কর্তৃক এই মুসলিম (রোহিঙ্গা) সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মানবাধিকারের

ব্যাপক লঙ্ঘন থেকে সমস্যাটি উদ্ভূত এবং এর ফলে তাদের বাংলাদেশে ব্যাপক আগমন ঘটে। আরাকানের মুসলিম রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সামরিক জান্তার নৃশংসতা; যা বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে বিরোধ এবং সীমান্ত অঞ্চলে অপ্রচলিত সুরক্ষা সংকট সৃষ্টি করে। মিয়ানমারে গণতন্ত্রায়নের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য মিথস্ক্রিয়ার নিবিড় বহুপাক্ষিক আলোচনার ক্ষেত্রে বিস্তৃত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মিয়ানমারের সবচেয়ে অবহেলিত মুসলিম সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে বৈশ্বিক নীতি নির্ধারকদের খুব কমই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এছাড়া 'রোহিঙ্গা ইস্যু' নিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বিতর্ক ওঠে। বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমারের সাথে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে উদ্যোগী হয় এবং প্রতিবেশি সুলভ সম্পর্ক বজায় রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

৬.১.১ আশ্রয়ের সন্ধানে বাংলাদেশে 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী

মিয়ানমার ৭টি প্রদেশে ভিভক্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠ বার্মীজ জনগোষ্ঠীর বাইরেও অন্তত এ প্রদেশেসমূহে ৭টি পৃথক পৃথক নৃগোষ্ঠীর আধিপত্য রয়েছে যেমন: কাচিন, কায়াহ, কায়িন, চিন, মন, রাখাইন ও শান। ৭টি প্রধান নৃগোষ্ঠী আবার ১৩৫টি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত রয়েছে। রাখাইন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদে তুলনামূলকভাবে সু-সমৃদ্ধ এবং কৌশলগত ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান রয়েছে। তবুও, এর অর্থনৈতিক স্থবিরতা, স্বল্প বিনিয়োগের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অনুন্নত রয়েছে। মিয়ানমারের জাতীয় দারিদ্র্যের হার ৩৭.৫৪% হলেও রাখাইন রাজ্যে দারিদ্র্য প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ ৭৮% (World Bank, 2015)। দারিদ্র্য, সামাজিক পরিষেবা এবং জীবিকার সুযোগের সংকট রাখাইনে সমস্ত সম্প্রদায়কে ভোগাচ্ছে। রাখাইন অর্থনীতির বেশিরভাগ অংশ কৃষি, ব্যবসা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ প্রভৃতি। রাখাইনে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি দারিদ্র্য দেখা যায়-বিশেষতঃ রাজ্যের উত্তর অংশে ৬০% পরিবার গৃহহীন ও ভূমিহীন (World Food Program: WFP, February 2011)। এই মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে মুসলিম বিরোধী বৌদ্ধ নেতা-Ashin Wirathu মুসলিম সম্প্রদায়কে বয়কট করার পাশাপাশি মিয়ানমারে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি '৯৬৯' আন্দোলন শুরু করেন। বৌদ্ধ নেতারা এই ধারণাটি গ্রহণ করে-মুসলিমদের সাথে ব্যবসা করা, তাদের অর্থ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং রোহিঙ্গাদের পক্ষে ব্যবহার করা হবে (Kinnvall, 2004)। এ আন্দোলনের কারণে সৃষ্ট বিরূপ মনোভাবের ফলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বার বার বাংলাদেশেসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটি ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ উপনিবেশের অংশ ছিল। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের পরাধীনতা মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ ভারত এবং পাকিস্তান (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) নামক দু'টি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশরা এ অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং বার্মাও স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে একটি স্বাধীন দেশে পরিণত হয়।

মিয়ানমারে বসবাসরত ইসলামের অনুসারী রোহিঙ্গাদের সাথে স্থানীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 'রাখাইন' সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্যভাব বেশ পুরানো। কিন্তু এ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনে (১৯৩৭ সালে) বার্মা আলাদা প্রদেশ হবার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীতে তা বিবাদ এবং সংঘর্ষে রূপ নেয়; দেখা দেয় মারাত্মক সংকট। 'রাখাইন' সম্প্রদায়ের মানুষ রোহিঙ্গাদের উপর প্রভাব বিস্তার শুরু করলে এ সংকটের সৃষ্টি হয়। রোহিঙ্গাদের উপর নেমে আসে নির্যাতনের খড়্গ। মিয়ানমার সেনাবাহিনী এবং রাখাইন সম্প্রদায়ের নির্যাতনের ফলে হাজার হাজার রোহিঙ্গা ভিটেমাটি ত্যাগ করে পাশ্ববর্তী দেশসমূহে শরণার্থী অথবা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে অবস্থান নেয়। এরমধ্যে কেউ স্থানীয় সমাজের সাথে মিশে গেছে আবার কেউ কেউ যুগের পর যুগ নিবন্ধিত শরণার্থী ক্যাম্প অথবা মেকশিফ্‌ট ক্যাম্পের নতুন জনগোষ্ঠী হিসেবে রয়ে গেছে। বাংলাদেশ সরকার কয়েকবার ইউএনএইচসিআর (UNHCR)-এর মাধ্যমে তাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নিলেও সেখানে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার অভাবে তারা আবার বাংলাদেশে ফিরে এসেছে। রোহিঙ্গা দমনের পূর্বে তাদের জাতীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। যেখানে বার্মীজ জাতীয়তাবাদ গ্রহণকেই মূখ্য হিসেবে ধরা হয়। যার ভিত্তি ছিল বৌদ্ধ ধর্ম মতে বিশ্বাস করা। এ ব্যাপারে গবেষক নাসির উদ্দিন এর দাবী, "তাঁরা মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং নির্বিচার গণহত্যা থেকে বাঁচতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসে নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। ফলে, তাদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে উপস্থাপন করা একটা বড় ধরনের প্রত্যয়গত ভুল।" তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার একটি কৌশলগত কারণে এসব সদ্য আগত রোয়াইঙ্গাদের শরণার্থী হিসেবে চিহ্নিত করছে না। কারণ (২০১৭ সাল) এবারে আসা রোহিঙ্গাদের সবচেয়ে বড় সাহায্য এবং সহযোগিতা দিচ্ছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) যারা কেবল অভিবাসন নিয়ে কাজ করে।...কিন্তু কোনোভাবেই এসব রোয়াইঙ্গাদের 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' বলা যাবে না (উদ্দিন, রাহমান নাসির, ২০১৮)। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে এ পর্যন্ত কয়েক ধাপে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

রোহিঙ্গারা বিভিন্ন উপায়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, স্থানীয় জনসাধারণ এবং বাংলাদেশের প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বললে এমন তথ্যই জানা যায়। প্রথমত; রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশে টাকা লাগে এবং দালালদের মাধ্যমে এর ব্যবস্থা হয়ে থাকে। তবে, তারা কিভাবে এই টাকা জোগাড় করেছে জানতে চাইলে পুরাতন রোহিঙ্গা (আগে আসা শরণার্থীদের) কাছ থেকে জানা যায়, তারা আগে থেকেই সেখানে (আরাকানে) সম্পদশালী ছিলেন। দ্বিতীয়ত; তাদের কারো কারো পরিবারের সদস্যরা মালয়েশিয়া এবং সৌদি আরবসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছে। আবার অনেকের আত্মীয় স্বজন শরণার্থী মর্যাদা নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছে। আরাকানের রোহিঙ্গা অধ্যুষিত বিভিন্ন জেলার জন্মভিটায় নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক আগুন দেওয়া, নির্যাতন এবং দমন-পীড়নের খবর পেয়ে সেই সকল স্বজনরা নানাভাবে তাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন এবং বিদেশ থেকে বৈধ-অবৈধভাবে টাকা

পাঠাচ্ছে। তৃতীয়ত; জানা যায়, টেকনাফ ও উখিয়ার স্থানীয় সামান্য কিছু বাসিন্দা যারা আগে আরাকান থেকে বাংলাদেশে এসে (বিশেষ করে ২০07 সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক এনআইডি প্রস্তুতের পূর্বে) বসবাস করছে (পরে গোপনে বৈধতা পেয়েছে)। তারা নির্যাতিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষগুলোকে বাঁচানো নিজেদের দায়িত্ব মনে করছে। এই কারণে এক ধরনের মানবিক জায়গা থেকে তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। চতুর্থত; অল্প কিছু আত্মীয়তার সূত্রগুলোও প্রবলভাবে কাজ করেছে। তা হলো, বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গারা তাদের জন্মভিটায় রোহিঙ্গাদের দমন-পীড়নের খবর পেয়ে তাদের জীবন বাঁচাতে এই দেশে আসার খবর দিচ্ছে এবং বাংলাদেশে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে; প্রয়োজনে এখানে এনে আশ্রয়ও দিচ্ছে। পঞ্চমত; আশ্রয় পাওয়ার আর একটি ছোট্ট কারণ রয়েছে; তা হলো ধর্মীয় পরিচয়। এ বিষয়ে নয়াপাড়া নিজ বাড়িতে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে শওকত আলী নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি এর উত্তরে বলেন,

> *"তাঁরা মুসলিম আমরাও মুসলিম, নির্যাতিত ও রক্তাক্ত হয়ে ঈদের দিন এপারে এসেছে। কষ্ট হলেও আমি তাদের আমার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু আর পারছিনা। তারা আমার রান্না ঘর ব্যবহার করেছে, টয়লেট ব্যবহার করছে। রান্না ঘরের চুলা ভেঙ্গে ফেলেছে এবং অধিক মানুষ টয়লেট ব্যবহার করায় সেটিও ভরে গেছে।"* (নয়াপাড়া গ্রাম, টেকনাফ, ২০২০)
>
> টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, মানবিক কারণ এবং আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে চার দশক ধরে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে। এখনো এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য মানুষ। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রশাসনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরও বিভিন্নভাবে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে। অনুপ্রবেশকারীদের অনেককে ফেরত পাঠানো হয়েছে কিংবা নদী থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া অসম্ভব। অতীতে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে।" যদিও সর্বশেষ রোহিঙ্গা আগমনে বাংলাদেশ সরকার মানবিক দিক বিবেচনা করে তাদের আশ্রয় প্রদান করেছে (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, টেকনাফ, ২০২০)।

টেকনাফের লেদা মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প ও উখিয়ার কুতুপালং এলাকায় আগত নতুন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এ পর্যন্ত যেসব ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে তাদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এই তালিকা তৈরির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন লেদা অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সাবেক মাঝি বা চেয়ারম্যান ডা. দুদু মিয়া। তিনি বলেন, এই ক্যাম্পে মোট ছয়টি ব্লক আছে। এর মধ্যে কয়েকটি ব্লকের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ওই তালিকায় এ ব্লকে ১৯২ জন, বি ব্লকে ২৪৫ জন, ডি ব্লকে ১৪৫, ই ব্লকে ১০০ জনের নাম মিলেছে। বাকি দুই ব্লকের তালিকা শীঘ্রই শেষ হতে পারে। তাঁর মতে, ধারণা করা হচ্ছে শুধু এই ক্যাম্পে হাজার খানেক রোহিঙ্গা নতুন করে আশ্রয় নিয়েছে।

তিনি বলেন, অন্য ক্যাম্পগুলোতেও নতুরা আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে কিছু এনজিও সংস্থা কাজ করছে। কয়েক দিনের মধ্যে তালিকা চূড়ান্ত হতে পারে (*দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২৫ নভেম্বর, ২০১৬)। এছাড়া নতুন আসা এসকল রোহিঙ্গারা লেদা গ্রামের আশ-পাশের বিভিন্ন বাসা-বাড়ি ভাড়া নিয়েও থাকছে বলে স্থানীয় লেদা বাজারের একজন ঔষুধ ব্যবসায়ী জানান। আবার বেশ কিছু রোহিঙ্গা রাতে টং দোকানগুলো ভাড়া নিয়ে বসবাস করে থাকে বলে জানায় লেদা মেকশিফট শিবিরের একজন রোহিঙ্গা চা দোকানদার। এতে করে রাতের বেলা নতুন আগত রোহিঙ্গাদের দেখা না গেলেও দিনের বেলা ঠিকই তাদের ক্যাম্পে অবস্থান করতে দেখা যায় (লেদা মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প সংলগ্ন বাজার, ২০১৬)। দীর্ঘ সময় ধরে শরণার্থী জীবন অতিবাহিত হলেও মিয়ানমারের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভাগ্যে খুব বড় কোনো পরির্বতন আসেনি। সেখানে ভালোভাবে থাকার জন্য তেমন কোনো সুযোগও তৈরি হয়নি। তাদেরকে পাশ কাটিয়েই দেশটির রাজনীতিতে এসেছে নাটকীয় পরিবর্তন। ২০১৫ সালে মিয়ানমারের ক্ষমতায় এসেছে গণতান্ত্রিক সরকার। মিয়ানমারে গণতন্ত্রের সুবাতাস বইলেও ‘রাষ্ট্রহীন’ রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে ঠিকই। তবে অনেক না পাওয়ার মাঝেও আশার আলো জাগায় রোহিঙ্গাদের জন্য তৈরি হওয়া *‘অ্যাডভাইজরি কমিশন অন রাখাইন স্টেট’*। এই প্রথম মিয়ানমার সরকার বহু দিনের রাখাইন ও রোহিঙ্গা সংকট সমাধান করতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্য চেয়েছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ-কারণ বিশ্ব সম্প্রদায় যখনই রোহিঙ্গা ইস্যুতে কথা বলতে চেয়েছে তখনই মিয়ানমার সরকার ভাষ্য ছিল, ‘কোনো বিদেশিদের পক্ষেই রাখাইন রাজ্যের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়।’ অবেশেষ তারা আগের অবস্থান থেকে সরে এসে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করে। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বাধীন ৯ সদস্যের একটি টিমকে কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই কমিশনের দেওয়া প্রতিবেদনের ওপর কিছুটা হলেও নির্ভর করে রাখাইন ও রোহিঙ্গা সংকটের ইতি টানার প্রথম পদক্ষেপ। তবে এ সমস্যার সমাধান অনেকটাই নির্ভর করে মিয়ানমার ও অং সান সু চির ওপর। তিনি ও তাঁর দেশ কী ধরনের পদক্ষেপ নেয় সেটাও দেখার বিষয়। শান্তিতে নোবেল জয়ী সু চি কেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ৮ লাখ বা তার কিছু বেশি জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের জন্য কিছু করেননি এ নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। এই সমালোচনার জন্যই হয়তো এই কমিশন গঠন করা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের জন্য গঠন করা কমিশন এটাই প্রমাণ করছে যে, মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ কিংবা সু চির এ ইস্যুতে এতদিনে টনক নড়েছে। সমস্যা সমাধান করতে তারাও আগ্রহী বলে মনে হয়। এ বিষয়ে অনেক প্রশ্ন আছে; তবে এখনই সব কিছুর উত্তর মেলা সম্ভব নয়। অনেকে মনে করতে পারেন ৭৮ বছর বয়সী কফি আনানের পক্ষে এ নিয়ে কী কিছু করার সুযোগ হবে। ২০১৬ সালে আগস্টের মধ্যে রোহিঙ্গা ইস্যুতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়। আশা করা হয় রোহিঙ্গাদের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং তাদেরকে মিয়ানমারের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দেবে এই কমিশন। তবে মিয়ানমারের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এসব বিষেয় উত্থাপন করা সু চির

জন্য কঠিন। কারণ রোহিঙ্গা ইস্যুতে শুধু কট্টরপন্থী বৌদ্ধরাই কেবল বাধ সাধেনি অন্যান্য রাজৈনৈতিক দলও বিরোধিতা করে। কাজেই কফি আনানের প্রতিবেদন মিয়ানমারে বিতর্কের জন্মও দেওয়াটাই স্বভাবিক।

রাখাইন রাজ্যের বৌদ্ধ ধর্মালম্বী ও মুসলিম রোহিঙ্গাদের সমস্যা এতোটাই গভীরে যে রাতারাতি সমাধান সম্ভব হবে না। মিয়ানমারের দাবি, সীমান্ত পার হয়ে রোহিঙ্গা মুসলিমরা প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশ থেকে তাদের দেশে প্রবেশ করেছে। এজন্যই তাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব দিতে চায় না দেশটির সরকার। তবে বাংলাদেশও রোহিঙ্গাদের নিজেদের নাগরিক বলে স্বীকার করে না। ২০১২ সালের সহিংসতার পর এক লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে রাখাইন রাজ্য থেকে জোর করে অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর চার বছর পার হয়ে গেলেও তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়িতে ফিরিয়ে আনার কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি। রাখাইন রাজ্যের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন প্রকাশ্যেই রোহিঙ্গাদের বিরোধিতা করে চলেছে। রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ত্রাণ সাহায্য দিতে যাওয়া আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ও জাতিসংঘের বিরোধিতা করেছে তারা। সেখানে কফি আনানকে যে তারা স্বাগত জানাবে না এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কমিশন যে সুপারিশই করুক না সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া কিংবা তা বাস্তবায়ন করা বেশি কঠিন। তারপরও রোহিঙ্গাদের জন্য এমন একটি কমিশন গঠন করাটা মানে নতুন কিছু করা। এটা আশার কথা ছোট পদক্ষেপ হলেও দীর্ঘ দিনের সমস্যা সমাধানে একটা পদেক্ষেপ নেওয়া হয়েছে (*দৈনিক আমাদের সময়*, ২৯ আগষ্ট, ২০১৬)।

৬.১.৩ রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে অবস্থান (উখিয়া-টেকনাফ)

কক্সবাজার জেলার অর্ন্তভুক্ত উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় শরণার্থী ক্যাম্প বা শিবিরসমূহ অবস্থিত। এই শরণার্থী ক্যাম্পসমূহে জিওবি'র (বাংলাদেশ সরকারের) প্রতিনিধি এবং শরণার্থী বিষয়ে সরকারি নীতি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তি হচ্ছেন ক্যাম্প-ইন-চার্জ (সিআইসি)। বাংলাদেশের শিবির এ সকল শরণার্থী শিবিরসমূহ বেশ ঘনবসতিপূর্ণ। প্রায় ৬০০০ একর জমির ওপর প্রায় ১৭ মিলিয়ন মানুষ (১২.২ মিলিয়ন রোহিঙ্গা ও ৪.৫ মিলিয়ন স্থানীয় জনগোষ্ঠী) বাস করে। উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় প্রতি এক কিলোমিটারে গড়ে ৬৫০০০ মানুষ বাস করে (Aid and International Development Forum, 2018)। দু'টি নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের সামগ্রিক কার্যক্রম ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, কক্সবাজার সদর অফিস থেকে সমন্বয় করা হয়। শিবিরের নির্বাচিত শরণার্থী অধিবাসীদের মধ্য থেকে একটি ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং ব্লক কমিটির কার্যক্রম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে (*দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২৪ নভেম্বর, ২০১৬)।

ক্যাম্পের নিয়ম অনুসারে, উদ্বাস্তুদের সাধারণত ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না। তবে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে, উদাহরণস্বরূপ আদালতের মামলা থাকলে এক

দিন পূর্বে আনুমতি নিতে হয় এবং হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন হলে ইউএনএইচসিআরের ডাক্তারের সুপারিশের ভিত্তিতে শিবিরে বসবারত উক্ত ক্যাম্প-ইন-চার্জ (সিআইসি) এর অনুমতি প্রয়োজন হয়। সরকারী নীতি যা আত্মনির্ভরশীল কার্যক্রমে শরণার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, যেমন সেলাই প্রশিক্ষণ, কাঠের তৈরী আসবাব পত্রের কাজ, ইলেকট্রিক কাজ, মাশরুম চাষ, সাবান তৈরি ইত্যাদি। কুতুপালং শরণার্থী (রিফিউজি) ক্যাম্পে ভূগর্ভস্থ পানির জলাধার থাকলেও নয়াপাড়া শরণার্থী (রিফিউজি) ক্যাম্পে কোনো ভূগর্ভস্থ পানির জলাধার নেই। তবে, ভূগর্ভস্থ পানির জলাধারের পরিবর্তে একটি জলাশয় আছে সেখান থেকে প্রতিদিন দুই বার পানি বিতরণ করা হয়। এজন্য কুতুপালং নিবন্ধিত শরণার্থী শিবিরে নয়াপাড়া শরণার্থী শিবিরের ন্যায় পানির সংকট খুব একটা দেখা যায় না। শরণার্থী শিশুদের জন্য এনজিও কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য সেবার জন্য অস্থায়ী হাসপাতাল পরিচালিত হয়। দু'টি শরণার্থী ক্যাম্পে প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের জন্য মোট ২১টি স্কুল রয়েছে। এছাড়া প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য একটি স্কুল রয়েছে, তাতে শিক্ষণ শেখানো হয় বাংলায় এবং বাংলাদেশ জাতীয় প্রাঠ্যক্রম অনুসরণ করে। তবে, উভয় শরণার্থী শিবিরেই মিয়ানমার ল্যাংগুয়েজ ল্যাব রয়েছে, যেখানে মিয়ানমারের বার্মীজ ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইউএনএইচসিআর (বাংলাদেশ) এর সহায়তায় ও বাংলাদেশ সরকারের সরাসরি সহযোগিতায় এই ক্যাম্পগুলো পরিচালিত হয়। প্রতিটি শিবিরে একটি আবাসিক ক্যাম্প-ইন-চার্জ কক্সবাজারে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) অধীনে কাজ করেন। এই আরআরআরসি কমিশনার আবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে রিপোর্ট করেন। ইউএনএইচসিআর এর পক্ষ থেকে নিবন্ধিত ক্যাম্পের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্যাম্পের বিদ্যুতের কাঠামো এক সময় (রোহিঙ্গা নেতা) বা মাঝিদের হাতে ছিল যারা শিবির পরিচালনা করতে সাহায্য করেন।

২০০৭ সালে জিওবি (বাংলাদেশ সরকার) এবং ইউএনএইচসিআর দ্বারা শরণার্থীরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল যদিও সেই সকল মাঝিরা এখনও ক্যাম্প-ইন-চার্জ এর অধীনে কাজ করেন এবং তারা সাধারণ রোহিঙ্গাদের চেয়ে মোটামুটি অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল বা লেখা-পড়ায় এগিয়ে আছে। 'জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক' রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সবার জন্য বিশেষত নারী শিক্ষা নিশ্চিত করাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। একইভাবে রোহিঙ্গা শিবিরে শিশুদের জন্যও শিক্ষার সুযোগ অবারিত রেখেছে। স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকদের সম্পৃক্ততা গতিশীল করে এবং রোহিঙ্গাদের দক্ষতা বৃদ্ধির নীতি গ্রহণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মিয়ানমার কারিকুলামের আওতায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করছে। আরও জানা যায়, বাংলাদের সরকার শরণার্থী শিবিরগুলোতে পাঁচ হাজার ৬১৭টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে রোহিঙ্গা শিশুর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে (শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন কার্যালয়, কক্সবাজার, ২০১৮)। বাংলাদেশ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের দ্রুত, টেকসই ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশকে সহযোগিতার জন্য আন্তর্জাতিক

সম্প্রদায় প্রশংসা করেছে। এছাড়াও শরণার্থী শিবির পরিচালনায় বিভিন্ন এনজিও অফিস রয়েছে যারা ইউএনএইচসিআর, আইওএম অথবা ডব্লিউএফপি-এর সহায়ক হিসেবে এ ক্যাম্প দু'টিতে কাজ করে। এ বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা ১৯৭৮, ১৯৯১-১৯৯২, ২০১২ ও ২০১৬-২০১৭ সালে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। তবে, ২০১৭ সালে বিপুল পরিমাণে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আগমনের ফলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে উঠেছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমনের ঘটনাপঞ্জি আলোচনা করা হলো-

৬.২ বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনের ঘটনাপঞ্জি

জেনারেল নে উইনের (১৯৬২) সামরিক শাসনের পর রোহিঙ্গাদের অবৈধ অভিবাসী বলে ঘোষণা করা হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে নির্যাতনের একপর্যায়ে রোহিঙ্গা মুজাহিদরা Rohingya Patriotic Font (RPF) নামে নতুন করে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। Rohingya Patriotic Front এর প্রদত্ত তথ্যানুসারে ১৯৫৫-৭৮ সাল পর্যন্ত তেইশ বছরের মধ্যে প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয় এবং প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বর্মীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাংলাদেশের ভূ-খন্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় (*Genociede in Burma, 1978*)। ১৯৭৩ সালে উত্তর আরাকানে Major Aung Than Operation এবং ১৯৭৪ সালে Sabe Operation এর নামে সমগ্র আরাকানে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়। শুধু অপারেশন বা দাঙ্গা বাঁধানোই নয়, বর্মী কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গা নির্মূলে আরো বহুমুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গাদের কৃষি জমিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর ব্যাপকভাবে উচ্চহারে করারোপ করে এবং আরোপিত কর পরিশোধ করতে না পারলে তাদের বাড়ীঘর ঘেরাও করে জীবীকার জন্য মজুদকৃত খাদ্য-শস্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিভিন্ন সময় নানা অজুহাতে অনেক অস্থাবর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই সাথে বর্মী সরকার ওয়াকফ্‌কৃত জমি ও সম্পত্তি বেআইনীভাবে ভিত্তিহীন অজুহাতে ছিনিয়ে নেয়। আরাকানে জনসংখ্যাগত অবস্থান পরিবর্তন এবং রোহিঙ্গাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য তাদের বাজেয়াপ্তকৃত ভূমিতে নতুন নতুন মগ বসতি স্থাপন করা হয় (ইউনুছ, ১৯৭৮)। রোহিঙ্গাদের জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের ক্ষেত্রে কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। সরকারী অনুমতি ব্যাতীত তারা এক থানা থেকে অন্য থানায় যেতে পারে না (*New Straits Times,* 11 November, 1992)। অপরদিকে বিনা মুজুরীতে জবরদস্তিমূলক শ্রমের মাধ্যমে প্রতিদিন শত শত রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ ও যুবকদেরকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর কাজে দিনের পর দিন খাটানো হয়। শ্রমের মূল্য দাবী করলে কিংবা শ্রমদানে অস্বীকৃতি জানালে অমানবিক নির্যাতন অথবা মৃত্যুকেই সহজে মেনে নিতে হয়। রোহিঙ্গাদের উপর সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য নিয়মিত খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করা ছিল অনেকটা বাধ্যতামূলক (মাহমুদ, ১৯৭৮)। শুধু রোহিঙ্গাদের জীবন ও সম্পদই নয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহও বর্মী সরকারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ধর্মীয় উৎসব কোরবানীর ঈদের ক্ষেত্রে নানা রকম বাধা নিষেধ

আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে দুই থেকে পাঁচ হাজার লোক অধ্যুষিত গ্রামে দু'টি খাসি অথবা ১টি বা দু'টি গরু কোরবানীর অনুমতি দেয়া হয় (মাহমুদ, ১৯৭৮)। বর্মী বাহিনী কর্তৃক আরাকানে সামরিক অভিযান ও রোহিঙ্গাদের প্রতি নির্যাতন অব্যাহত থাকে। এই সময়ের মধ্যে ৪ হাজারেরও অধিক রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশের কক্সবাজারের টেকনাফ ও বালুখালিতে এবং সহস্রাধিক শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে (Archival Papers, File no.900)। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবাদ মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা ও আগত শরণার্থীদের অনতিবিলম্বে স্বদেশে ফেরত নেবার জন্য বর্মী সরকারের প্রতি এক প্রকার চরমপত্র প্রদান করলে বর্মী কর্তৃপক্ষ বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের পুনরায় তাদের বসতবাড়িতে পুনর্বাসন করতে বাধ্য হয় (*The Bangladesh Observer*, 1978)। ১৯৭৩ সালে ১২ সেপ্টেম্বর জাফর হাবিবের নের্তৃত্বে কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য Rohingya Patriotic Front (RPF) নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলে বিভিন্ন স্তরের নির্যাতিত রোহিঙ্গারা এই সংগঠনে যোগদান করে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে ক্রমান্বয়ে জোরদার করে তোলে। এ অবস্থায় রোহিঙ্গারা বার্মায় শত শত বছর ধরে বংশ পরম্পরায় সেখানে বসবাস করলেও সরকারি নির্যাতনের মুখে পৈত্রিক বসতবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে শরণার্থী হিসেবে বারবার পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। রোহিঙ্গারা আরাকানের নাগরিক হিসেবে দীর্ঘ সময় বছর ধরে বসবাস করে আসলেও বার্মা সরকার ১৯৭৪ সালে BSPP (Burma Socialist Programme Party) এর সংবিধান প্রণয়নের জন্য First People Congress (Pyethu Hlutn Taw) আহবান করে আরাকানকে শুধুমাত্র 'বৌদ্ধশাসিত স্টেট' ঘোষণা করলে সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় মগরা আরো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে এবং আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে রোহিঙ্গা বিরোধী দাঙ্গা বাঁধিয়ে মুসলিম নিধন শুরু করে (Yunus, 1994)।

ব্রিটিশ আমল থেকে তৎকালীন বাংলা, স্বাধীনতার পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনা থেকে কক্সবাজার ও বান্দরবানের স্থানীয় জনগণ এবং সরকারীভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে এ সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে। সরকার বিরোধী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার কৌশল হিসেবে নে উইন ব্রিটিশদের ন্যায় Divided and Rule Policy গ্রহণ করে রোহিঙ্গা সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলে। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে আরাকানের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় এবং একে একটি বৌদ্ধ শাসিত অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশের মর্যাদা প্রদান করেন। ফলে রোহিঙ্গারাও তাদের নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে পূর্ববর্তী দাবীর পরিবর্তে তাদের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সাপেক্ষে অন্যান্য আরাকানীদের সাথে যৌথভাবে আরাকানের সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানাতে থাকে। কিন্তু নে উইন সরকার কর্তৃক এসব দাবী প্রত্যাখ্যাত হলে রোহিঙ্গাদের ক্ষোভ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় আরাকানে সামরিক মোড়কে বার্মীজ ধাঁচের সমাজতন্ত্র কায়েমের চেষ্টা করা হলে স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী রোহিঙ্গাসহ

দেশ প্রেমিক আরাকানিরা আরাকানকে প্রকৃত অর্থে একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যে পরিণত করার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আরাকানের কোনো মুসলমানকেই হজ্জে গমনের অনুমতি দেয়া হয়নি। এছাড়া স্কুল-কলেজে ধর্মীয় শিক্ষার কোন সুযোগ নেই (*দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৩)। ১৯৭৮ সালে ২০০,০০০ এরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী মিয়ানমার থেকে পালিয়ে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। রেড ক্রিসেন্ট সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকার তৎক্ষণাৎ জরুরি ত্রাণ সরবরাহ শুরু করে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের সহায়তা চেয়েছিল এবং সংঘের সহায়তায় সরকার বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের কাছে শিবির স্থাপন করেছিল। বাংলাদেশ সরকার তাৎক্ষণিকভাবে মিয়ানমারের সাথে প্রত্যাবাসন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে এবং শরণার্থীদের উপস্থিতির কারণে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বোঝা সহ্য করতে হয়েছিল তা নিয়ে অভিযোগ করেছিল। বাংলাদেশ সরকার আরও জোর দিয়েছিল যে তারা শরণার্থীদের স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সংহত করতে দেবে না। সুতরাং, বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালের পূর্বের মতো মিয়ানমারের তৎকালীন শাসকদের সাথে একই ধরনের চুক্তি চেয়েছিল। বার্মার (মিয়ানমার) সামরিক শাসক ১৯৮২ সালে ‘বার্মা সিটিজেনশিপ ল’ ঘোষণার মাধ্যমে বার্মার (মিয়ানমার) জনগণ তিন স্তরের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পায়। উল্লেখ্য এই আইনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত বেশ কিছু মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হতো, সাথে ছিল হত্যা, নির্যাতন আর ধর্ষণ। সেনাবহিনী তাদের দিয়ে বিনা মজুরিতে অর্থনৈতিক এবং অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজ করিয়ে নেয়। নির্যাতনের মুখে ১৯৯১-১৯৯২ সালে নতুন করে প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে।

বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের থাকার জন্য কক্সবাজার এলাকায় ২০ টি শিবির স্থাপন করেছিল। এই ক্যাম্পগুলো ইউএনএইচসিআর দ্বারা অর্থায়িত হয়েছিল এবং বাংলাদেশ সরকার এর তত্ত্বাবধানে ছিল (Parnini and Amer, 2013, p. 137) বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের যে কোন আইনি মর্যাদা প্রদানের বিরুদ্ধে তার অবস্থান ঘোষণা করেছিল যে, শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন করতে হবে। তবে মিয়ানমারে শরণার্থীদের ফেরত পাঠানোর জন্য বল প্রয়োগের কারণে এই প্রত্যাবাসন নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ প্রশ্ন করেছিল (Human Rights Watch, 2000)। ১৯৯১-৯২ সাল থেকে অদ্যাবধি এই ক্যাম্পগুলোতে ২৮,০০০ নথিভুক্ত নিবন্ধিত কুতুপালং ও নয়াপাড়ায় দুটি শরণার্থী শিবির এখনও রয়েছে। এ সময় বাংলাদেশে আনুমানিক নতুন শরণার্থী ছিল ২২০,০০০ থেকে ৩৩০,০০০ (Parnini and Amer, 2013, p.137)। জুলাই, ২০১১ সালে সিত্তুওয়ে শহরে দাঙ্গায় অং সাং সুকির দলের একজন এমপি নের্তৃত্ব দিলেও এবার নের্তৃত্ব দিয়েছে গেরুয়া বিপ্লবের নেতারা। এর অন্যতম নেতা হলেন সন্ন্যাসী উইরাথু, যিনি ২০০৩ সালে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা উসকানোর অভিযোগে ২৫ বছর কারাদন্ড হলে পরে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি প্রক্রিয়ায় ছাড়া পান। নতুন করে জুন, ২০১২ সালে মিয়ানমারের

রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মারা যায় অসংখ্য রোহিঙ্গা। এ সময় চলতে থাকা সহিংসতায় ঘরবাড়ি হারা রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশের তামব্রু বাজার এলাকা বরাবর মিয়ানমারের বলিবাজারের পশ্চিমে 'তুরাইন' নামক পাহাড়ি এলাকায় নিয়ে আসা হয়। মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে সেখানে জঙ্গল পরিস্কার করার কাজে স্থানীয় রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ফেরা রোহিঙ্গাদের ধরে এনে বাধ্যতামূলভাবে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশ সরকার শিবিরের অবস্থা অবনতি ঘটার মাধ্যমে দ্রুত প্রত্যাবাসনকে সহায়তা করেছিল (Human Rights Watch, 2000)। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার হিসাব মতে, মিয়ানমারের সহিংসতায় এ পর্যন্ত ২৮ হাজার রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত ও প্রাণ বাচাঁতে পালিয়ে গেছে (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৮ নভেম্বর, ২০১২)।

জাতিসংঘের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূত টমাস ওজেয়া কুইনটানা এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক তদন্তকারী দলের পক্ষ থেকে দেয়া এক যৌথ বিবৃতিতে মিয়ানমার সরকারকে বলেন যে, মিয়ানমারের চলমান সহিংস পরিস্থিতিকে যেন রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা না হয়। একই সাথে অবিলম্বে সহিংসতা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করে মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য মিয়ানমার সরকারের প্রতিও আহ্বান জানান তিনি (*দৈনিক আমার দেশ*, ২ নভেম্বর, ২০১২)। রুয়ান্ডার হুতু এবং তুতসিসের কথাও উল্লেখ করা যায় এবং বুরুন্ডি ও কঙ্গোকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তারা রুয়ান্ডার সংঘাতকে সেই স্থানীয় দেশগুলিতেও ছড়িয়ে দিয়েছিল। পাকিস্তান থেকে আসা আফগান শরণার্থীরা তাদের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল Byman, and David Brannan, 2001)। ২০১২ সালে আবারও সংঘাত ও সহিংসতার সূত্রপাত ঘটে যখন কথিত এক রোহিঙ্গা বৌদ্ধ মহিলাকে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিশোধ হিসাবে ১০ জন রোহিঙ্গাকে রাখাইন জনতার দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল। এই সহিংসতায় আবারও কয়েক'শো মানুষকে হত্যা, ঘরবাড়ি ধ্বংস এবং হাজার হাজার মানুষকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করতে বাধ্য করেছিল, (Kipgen, 2014 p. 235-236)। দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানরা বিভিন্নভাবে উচ্ছেদের শিকার ও নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া ও সৌদিআরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘ সামরিক শাসনের পর ২০১৫ সালে মিয়ানমারে প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে দেড় লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা ভোট দিতে পারেনি। ২০১৬ সালের অক্টোবরে মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম প্রচার করে রাখাইন রাজ্যে সীমান্ত পুলিশকে আক্রমণ করে ৯ জন পুলিশ অফিসারকে হত্যা করা হয়। জবাবে, সামরিক বাহিনী একটি কঠোর অভিযান শুরু করে যার ফলে আবারও ৮৭,০০০ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী নিজেদের আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (এআরএসএ) হিসেবে আক্রমণের দায় স্বীকার করে (Dussich 2018, p. 11)। ফলে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার তার সীমানা খুলে

দেয় এবং মানবিক প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দেশে গমনের রুট-

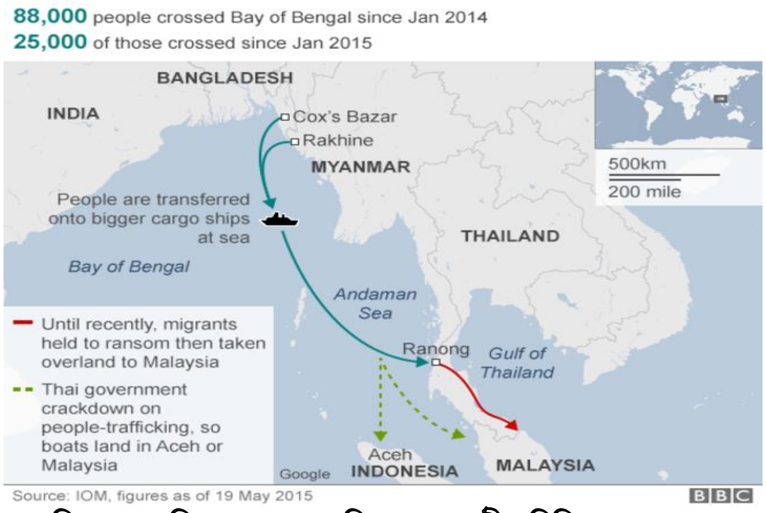

মানচিত্র-৬.১ঃ মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দেশে আগমন

মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুসারে রাখাইনে সীমান্ত পোস্টে হামলায় এআরএসএ'র ১২ সীমান্ত কর্মকর্তা নিহত হওয়ার পর সর্বশেষ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল। তবে, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান কর্তৃক "আনান কমিশনে"র রোহিঙ্গা বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের পর দিনই মিয়ানমারের সেনাবাহিনী প্রতিক্রিয়া জানায়। ২০১৬ সালে স্থানীয় সম্প্রদায় দ্বারা ৫৬০০০ হাজার এর বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আবাসন সহায়তা দেওয়া হয় এবং অনেক শিবির আশেপাশের গ্রামগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে (UNHCR, 2018b, p. 7-9)। সেনাবাহিনী ২৫ আগস্ট, ২০১৭ সাল থেকে তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়ায় তারা রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর জ্বালিয়েছে ও অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছিল। এ অভিযান 'ছাড়পত্র অপারেশন' বলে অভিহিত করেছিল যার ফলে বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা কক্সবাজারে প্রায় এক মিলিয়ন রোহিঙ্গা একটি গণ-যাত্রা করে আশ্রয় গ্রহণ করে (Dussich 2018, p.11-12)। এই নির্বাসনকে বিশ্বের দ্রুত বর্ধমান শরণার্থী সঙ্কট হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার তার সীমানা খুলে দেয় এবং এরপর মানবিক প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছে। বিদ্যমান শিবিরসমূহ সম্প্রসারণের পাশাপাশি ৩৩টি নতুন শিবির স্থাপিত হয় এবং স্থানীয় সম্প্রদায় তাদের আবাসন সুবিধাও ভাগ করে নিয়েছে। বাংলাদেশে শরণার্থীদের সর্বশেষ আগমন আগস্ট, ২০১৭ সালে শুরু হয়েছিল, চরম নির্যাতনের ফলে ৭০০,০০০ এরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আগমন করে। এ শরণার্থীদের বেশিরভাগই ছিল নারী ও শিশু। মিয়ানমার সুরক্ষা বাহিনী এবং বৌদ্ধ মিলিশিয়াদের এই পদক্ষেপকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে *'টার্গেট সহিংসতা'* বলে বর্ণনা করা হয়েছে (UNHCR, 2018b, p. 7-9)।

৬.২.১ বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আগমন ১৯৭৮

১৯৭৮ সালে মিয়ানমার থেকে নির্যাতিত হয়ে আগত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ শুরু করে। তবে এর পূর্বেও ১৯৭৪ সালে বসতবাড়ি ছেড়ে ১০ হাজার রোহিঙ্গা আত্মরক্ষার্থে স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলাদেশের কক্সবাজার অঞ্চলের বিভিন্ন উপজেলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। সম্পূর্ণ মানবিক কারণে আন্তর্জাতিক বিধি মোতাবেক তাদেরকে এদেশে আশ্রয় দেয়া হয় (*দৈনিক বাংলা*, ১৪ মার্চ, ১৯৯২)। বাংলাদেশ সরকারের চরমপত্রের সুবাদে সে সময় বর্মী সামরিক জান্তা ১৯৭৪ সালে আগত রোহিঙ্গাদের পুনরায় তাদের বসত বাড়িতে পুর্নবাসন করতে বাধ্য হয় (*The Bangladesh Observer*, 14 May, 1978)। ১৯৭৮ সালে, প্রথমত মিয়ানমারের ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের সাথে সামরিক বাহিনী ছোট অপারেশন শুরু হয়েছিল। যার নাম দেয়া হয় অপারেশন ড্রাগন কিং বা অপারেশন নাগামিন। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর রাখাইনে (আরাকান) ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে লড়াই করা মুজাহিদ বিদ্রোহীদের ধ্বংস করা (Parnini and Ghazali, 2013, p. 135)। এই অপারেশনটি রোহিঙ্গা জনগণকে জাতীয়তা আইন লঙ্ঘন করার কথা বলে ধরে নেওয়া এবং তাদের নিবন্ধকরণ করার চেষ্টা ছিল, যদিও তারা সেখানে বহু প্রজন্ম ধরে সেখানে বসবাস করে আসছিল। এই অভিযানের ফলে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল এবং দুই লক্ষেরও বেশি মানুষ বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল, (Parnini and Ghazali, 2013, p. 137; Ullah, 2016: 287; Howe, 2018, p. 247; Dussich, 2018, p. 10; Kipgen, 2014, p. 236)।

৭ মে, ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এক সংবাদ সম্মেলনে বার্মা সরকারের রোহিঙ্গা নির্যাতন ও দেশ থেকে বিতাড়নকে অমানবিক আখ্যা দিয়ে তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ৮ কোটি লোকের একটি জাতি হিসেবে আমাদের বিচলিত না হয়ে সুষ্ঠুভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। রোহিঙ্গাদের অবশ্যই তাদের ফিরিয়ে নিতে হবে (দৈনিক আজাদ, ৮ মে, ১৯৭৮)। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের এ ঘোষণা রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে একটি মাইল ফলক হিসেবে কাজ করে। ১৯৭৮ সালের King Dragon অপারেশনে বাংলাদেশে আশ্রিত শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ২ লাখ হলেও মূলত: এর সংখ্যা আরও বেশী ছিল। বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির পরিসংখ্যান মতে বাংলাদেশের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রিত শরণার্থী সংখ্যা ২,২২,৫৩৫ জন (Kamaluddin, 1983)। জেনারেল নে উইনের সামরিক শাসনামলে রোহিঙ্গাদের ঘোষণা করা হয় অবৈধ অভিবাসী বলে। বলা হয়, এরা ব্রিটিশ শাসনামলে আরাকানে অবৈধ অভিবাসন করে, যা ইতিহাসের চরম এক বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর চার বছর অতিবাহিত না হতেই ১৯৭৮ সালে নে উইনের নির্দেশে বর্মী সামরিক বাহিনী ও ইমিগ্রেশন পুলিশ সমগ্র আরাকানে, বিশেষ করে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 'কিং ড্রাগন' (King Dragon) বা 'নাগা মিন' (Naga Min) অপারেশন নামে এক ভয়াবহ সামরিক অভিযান চালায়। বিশ বছরের রোহিঙ্গা নির্মূলকরণ

পরিকল্পনা অনুসরণে আরাকান রাজ্য কর্তৃপক্ষ কাউন্সিল অফ স্টেটের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে-এর সর্বোচ্চ নির্বাহী সংস্থা রাজ্য-মুসলিম নৃতাত্ত্বিক নির্মূল অপারেশন কোডটি 'কিং ড্রাগন অপারেশন' বা নাগা মিন দ্বারা হয়। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল রোহিঙ্গাদের ভয় দেখানো এবং তাদের আরাকান ছেড়ে চলে যেতে বলে।

আকিয়াবের বৃহত্তম মুসলিম গ্রাম থেকে ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে অপারেশন শুরু হয়েছিল। মুসলিম পুরুষ ও মহিলাগণ গ্রেপ্তারের খবর ছাড়াও তরুণ ও বৃদ্ধ নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ফলে অন্যান্য শহরগুলোর মুসলিমরা উত্তর আরাকানে হতাশ হয়ে পড়ে। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং ইমিগ্রেশন দ্বারা গঠিত নাগামিন কর্মীরা বুথিডং এলাকায় পৌঁছেছিল। এখানে তারা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। শত শত মুসলিম পুরুষ ও মহিলাদের অনেককে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল এবং নির্যাতন ও হত্যা করা হয়েছিল। আটক করা শতকরা ৮৮ ভাগ মুসলিম মহিলাদের অবাধে ধর্ষণ করা হয়েছিল।[১] অপারেশনের নির্মমতায় আতঙ্কিত এবং তাদের জীবন, সম্পত্তি, সম্মান এবং মর্যাদার বিশাল সুরক্ষার অনিশ্চয়তায় মুসলিমরা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পার্বত্য অঞ্চল, নদী এবং নদীর খাঁড়ি জুড়ে পায়ে হেঁটে বাংলাদেশের সীমান্তের দিকে চলে আসতে শুরু করে। তাদের চলার পথে তারা নিয়মিতভাবে ছিনতাই এর শিকার হয়। ধর্ষণকারী বৌদ্ধ মগ এবং সুরক্ষা কর্মীদের দ্বারা তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র এবং অর্থ খোয়া যায়। বন্দুকের গুলিতে অনেকে মারা গিয়েছিল এবং আরও অনেকে নাফ নদীতে ডুবে বা নৌকা দিয়ে ভারী বোঝাসহ পার হয়। রোহিঙ্গারা তাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার সাথে সাথে স্থানীয় মগরা তাদের ঘরগুলোতে আগুন জ্বালানো এবং তাদের আসবাব নিয়ে যাওয়া শুরু করে। কয়েক মাসের মধ্যে শরণার্থীর সংখ্যা ৩০০,০০০ ছাড়িয়ে যায়। তারা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্মিত অস্থায়ী শিবিরগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল। বাংলাদেশ এই অপারেশন বন্ধ করতে বার্মীজ সরকারকে রাজি করানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। বার্মীজ সরকার বলেছে যে "কিছু বাঙালি অবৈধ আদমশুমারি পরীক্ষা চলছে বলে অভিযুক্তরা ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের হাই কমিশনার (ইউএনএইচসিআর) প্রথমে অনিশ্চিত ছিল; যারা পালাচ্ছেন তাদের শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত কিনা। শরণার্থীদের বার্মীজ সামরিক বাহিনীর বন্দুকের ভয়ে তাদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল বলে ইউএনএইচসিআর শেষ পর্যন্ত তাদেরকে শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ত্রাণ অপারেশন শুরু করে। বিশেষত মুসলিম দেশগুলো বিপুল সংখ্যক মুসলিম শরণার্থীর উপস্থিতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

প্রথমদিকে, যদিও বার্মা তার লোকদের মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষর হয়েছিল। শরণার্থীদের ফিরে আসার পথ সুগম করার ৯ মাসের বেশি সময় পরেও তারা বাংলাদেশের মাটিতে অবস্থান করে। ইউএনএইচসিআর

---

১. Genocide in Burma against the Muslims of Arakan, 1978, published by Rohingya Patriotic Front,

এর বক্তব্য অনুসারে ২০০,০০০ মানুষ ফিরে এসেছিল, আশ্রয় শিবিরগুলোতে ৪০,০০০ মানুষ মারা গিয়েছিল এবং বাকী সবাই বাংলাদেশের সমাজে ছড়িয়ে পড়ে (Yunus, 1994)। এ অভিযান আরাকান বিদ্রোহীদের দমন ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের নামে পরিচালিত হলেও এতে রোহিঙ্গারাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিপুল সংখ্যক সেনাসদস্য মিন গং (Min Gaung) নামক জনৈক দুর্ধর্ষ সেনাপতির নের্তৃত্বে স্থানীয় ইমিগ্রেশন পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সহায়তায় আকিয়াবসহ সমগ্র আরাকানে বিশেষ করে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের জাতীয়তা National Registration Card (NRC) যাচাই করার নামে তল্লাশী অভিযান শুরু করে (মাহমুদ, ১৯৭৮)। এই NRC তল্লাশী অভিযান কালে প্রায় ৪০০ জন রোহিঙ্গা মহিলাকে ধরে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালালে রোহিঙ্গারা একত্রিত হয়ে এর প্রতিবাদ জানাতে থাকলে বর্মী সামরিক বাহিনী আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এমনকি ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ সালে আরাকান ষ্টেট হলে ভাষণ দিতে গিয়ে বর্মী সেনাপতি কর্ণেল মিন গং ড্রাগন অপারেশনের বিরোধীতা করলে রোহিঙ্গাসহ অন্যান্য বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার হুমকিও প্রদান করেন (মাহমুদ, ১৯৭৮)। সমগ্র আরাকানে বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বর্মী বাহিনীর অভিযানের নির্মমতার দিকে দৃষ্টি দিলে রোহিঙ্গা নির্যাতন ও নিষ্পেষণের এক মর্মস্পর্শী অধ্যায় লক্ষ্য করা যায়। যা তাদেরকে ‘অনিশ্চিত শরণার্থী’ জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বার্মার নাগরিক ও লেখক সুই লু মং তার লিখিত “বার্মা ন্যাশনালিজম ও আইডিওলজি” গ্রন্থে ১৯৭৮-১৯৮৩ সাল পর্যন্ত আরাকানের নৃশংসতার চিত্র নিম্নে তুলে ধরেছেন (Lu Maung, 1989) বর্মী বাহিনীর অভিযানকালে ১৯৭৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ১২ হাজার রোহিঙ্গা গ্রেফতার হয় এবং ৭-৮ হাজার মহিলা পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়; প্রায় ৪ শতাধিক নর-নারী প্রাণ হারায়। বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বর্মী বাহিনীর এই নৃশংসতা ও হত্যাযজ্ঞের বিবরণ তুলে ধরা হয়। এসময় নির্যাতনের মুখে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশ ভূখণ্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ১৯৭৮ সালে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত অঞ্চলে ‘কিং ড্রাগন’ (King Dragon) অপারেশনের ফলে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ১৩টি ক্যাম্পে শরণার্থী হিসেবে আগত রোহিঙ্গাদের একটি তালিকা নিম্ন সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো (আখন্দ, ২০০৫)-

সারণী-৬.১ঃ বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী জুলাই, ১৯৭৮

ক্রমিক নং	ক্যাম্পের নাম	রেজিষ্টার্ড	অপেক্ষমান	জন্ম	মৃত্যু
১.	ধেচুয়াপালং (১)	২৩,২০২	-	৫৩	-
২.	ধেচুয়াপালং (২)	২৭,১৯৯	-	৮৭	-
৩.	ধুয়াপালং	২০,৭৫৩	-	৪৮	৭৭
৪.	কুতুপালং (১)	১০,০৩০	১৬	৫৭	১৬২
৫.	কুতুপালং (২)	১৫,১৫০	-	২০	১২৪

৬.	অঞ্জুমানপাড়া	১৩,০১১	৬৩	৩৭	১০২
৭.	হোয়াইক্যাং	১৪,৫১৬	-	৪৭	৮৪
৮.	হীলা	২৬,২৩৬		১১৮	২০৫
৯.	লেদা	২০,১৮৯		১১৭	৫৫৩
১০.	ঘুনধুম	৭,৩১২		৪৫	৭১
১১.	নাইক্ষ্যাংছড়ি	২১,৬৯০		৬২	১১৪
১২.	খুনিয়াপালং	-		২	২
১৩.	মরিচ্যা পালং	-		২	-
মোট=		১৯৯,২৮৮	৫,৮৭৫	৬৯৫	১,৪৯৪

তথ্যসূত্রঃ রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ সরকার, ২০০৫

এছাড়া বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিসংখ্যান মতে বাংলাদেশের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থী সংখ্যা ২,২২,৫৩৫ জন বলে জানা যায় (Kamal, 1983)। তবে তালিকাভূক্ত রোহিঙ্গা ছাড়াও অনেকেই যত্রতত্র শিবিরের বাইরে ছিল এবং তারা পরবর্তীতে এদেশেই রয়ে গেছে। সব মিলিয়ে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থী সংখ্যা ৩ লাখেরও বেশী (*দৈনিক আজাদ ও দৈনিক কিষাণ*, সম্পাদকীয় ৩০ এপ্রিল, ১৯৮১)। ব্যাপক হারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী অনুপ্রবেশের শুরুতেই বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ৪ এপ্রিল, ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ লিপির মাধ্যমে বর্মী সরকারকে বিষয়টি অবহিত করে বাংলাদেশে আগত শরণার্থীদের শীঘ্রই নিজেদের বাড়ি-ঘরে পুনর্বাসিত করার পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এই আহ্বানের প্রেক্ষিতে ১৩-১৬ এপ্রিল, ১৯৭৮ সালে ঢাকায় বাংলাদেশ-বার্মা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বর্মী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো উত্থাপন করা হয় (Archival Papers, File no. 900 1(4)[2] -

১. National Regestrition Card (NTRC) তল্লাশীর নামে আরাকানে রোহিঙ্গাদের প্রতি নির্যাতন শীঘ্র বন্ধ করতে হবে।

২. তাড়াতাড়ি স্থানীয়, বেসামরিক ও সামরিক অফিসিয়াল পর্যায়ে দু'দেশের মধ্যে বৈঠক করতে হবে এবং শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করে তাদের নিজেস্ব বসতবাড়িতে পুনর্বাসিত করতে হবে।

২. Archival Papers, File no. 900 1(4), vol.1, PP. 15-16, N.A.B.

৩. ‘বর্ডার গ্রাউণ্ড রুলস’ (Border ground Rules) দু’দেশকে মেনে চলতে হবে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় সীমান্তে শুধু সীমান্তরক্ষী বাহিনী ছাড়া সেনাবাহিনী মোতায়েন করা যাবে না।

৪. এ সকল বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণে জন্য বাংলাদেশ সরকার অচিরেই একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল বার্মায় প্রেরণ করবে।

রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ-বার্মা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও বিরাজমান সমস্যা সমাধানের তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি বরং কিং ড্রাগন অপারেশনের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতিতে রোহিঙ্গারা অধিকহারে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের সাথে “শরণার্থী প্রত্যাবাসন চুক্তি” মোতাবেক শরণার্থীদের প্রথম দলটি প্রত্যাবাসনের পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে সকল শরণার্থী বার্মায় প্রত্যাবাসনের কথা বলা হয়। শরণার্থী প্রত্যাবাসন ছাড়াও সীমান্ত নীতি মেনে চলার ব্যাপারে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দুই দেশ নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয় (Agreed Minutes Signed Between the Govt. of Burma)। বর্তমান সহিংসতার আগে কয়েক হাজার মানুষকে তাদের আশ্রয়স্থল থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। এক মিলিয়নের আরও বেশি কিছু রোহিঙ্গা মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যের বেশিরভাগ শহরে বাস করত (Ministry of Immigration and Population, 2015)। ১৯৮২ সালে মিয়ানমারে সামরিক শাসকরা নাগরিকত্ব আইন গ্রহণ করে কার্যকরভাবে রোহিঙ্গা নাগরিকত্বের বিষয়টি অস্বীকার করে। রোহিঙ্গাদের জাতীয়তার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া এবং সর্বাধিক রাষ্ট্রহীন নাগরিকে পরিণত করে (A/HRC/34/67, United Nations, March 1, 2017)।[৩] মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের জাতীয়তার প্রশ্নকে কাজে লাগিয়েছে অন্যান্য মৌলিক বিষয়; অধিকার এবং স্বাধীনতা, চলাচল, বিবাহের উপর বিধিনিষেধ আরোপ এবং ধর্মীয় অধিকারের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, জীবিকা এবং শিক্ষায় প্রবেশে অস্বীকার করেছে। উত্তর রাখাইনে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বৈষম্যমূলক স্থানীয় আদেশ রোহিঙ্গাদের জন্য প্রাত্যহিক জীবনের দিকগুলো আরও সীমাবদ্ধ করেছে (Fortify Rights, 2014)। মিয়ানমারে অধিকার ও স্বাধীনতার অভাবের কারণে বেশিরভাগ রোহিঙ্গা গ্রাম এবং শহরে সীমাবদ্ধ রাখাইন রাজ্যে সংরক্ষিত ক্যাম্পে অবস্থান করে। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ-বার্মা শরণার্থী প্রত্যাবাসন সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের মাধ্যমে ১৯৭৯ সাল থেকে রোহিঙ্গাদেরকে তাদের নিজস্ব বসত বাড়িতে নির্বিঘ্নে বসবাসের অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করে ২ লাখ শরণার্থীকে স্বদেশে ফেরত নিলেও বর্মী সামরিক জান্তা তাদের অঙ্গীকারের উপর বেশী দিন টিকে থাকেনি।

---

৩. *The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Rakhine State* (Naypyidaw: Ministry of Immigration and Population, May 2015), 8, http://myanmar.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Rakhine%20State%20Census%20 Report%20-%20ENGLISH.pdf

১৯৯০ সালের বহুদলীয় নির্বাচনে গৃহবন্দী থাকা অবস্থায় অং সান সুকির নের্তৃত্বে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্র্যাসি (এনডিএল) নির্বাচনের অংশ গ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সে নির্বাচনে তাঁর দল আইন পরিষদে ৮০ ভাগের বেশী আসন পায় এবং প্রায় ৬০ ভাগ ভোট পায়। কিন্তু সামরিক বাহিনী ক্ষমতা ছাড়েনি। বরং পার্লামেন্টে সামরিক বাহিনীর জন্য ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রয়েছে। ১৯৯০ সালে রোহিঙ্গারা ভোট প্রদানের করে এবং নির্বাচনে প্রার্থীও হয়েছিল। রোহিঙ্গা মুসলিম প্রার্থীরা নির্বাচনের সময় গ্রেফতার হয়েছিল পরে তাদের জেল দেয়া হয়েছিল। এরইমধ্যে ২৭ মে, ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে অং সান সু চি'র নের্তৃত্বে National League for Democracy (NLD) বার্মার ৪৮৫টি আসনের মধ্যে ৩৯২টি আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আরাকানের মোট ২৬টি নির্বাচনী আসনের মধ্যে উত্তর আরাকানের ৫টি আসনে মুসলিম নাম পরিবর্তন করে রোহিঙ্গা প্রার্থীরা জয় লাভ করে এবং ২১টিতে রোহিঙ্গা মুসলিমরা NLD প্রার্থীদের সমর্থন করে। উক্ত নির্বাচনে আরাকান হতে বিজয়ী রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের তালিকা নিম্নরূপ (চক্রবর্তী, ১৯৮৪) -

সারণী-৬.২ঃ ১৯৯০ এর নির্বাচনে বিজয়ী রোহিঙ্গা প্রার্থীদেরা নাম ও নির্বাচনী এলাকা

প্রদেশ	নির্বাচনী এলাকা ও আসন নং	বিজয়ী প্রার্থীর মুসলিম নাম	ধারণকৃত বর্মী নাম
আরাকান	আকিয়াব-১	মোহাম্মদ শফি	শোয়েও
	বুথিডং-১	মোঃ আনোয়ার হোসেন (শিক্ষক)	চিও মং
	বুথিডং-২	নুর আহমদ (ডাক্তার)	তিং মং
	মংডু-১	মোঃ ইব্রাহীম	চিং মং
	মংডু-২	মোঃ ফজল	মাইথা অং

তথ্যসূত্রঃ *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক*, ১৯৮৪

৬.২.২ বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমন ১৯৯১-৯২

১৯৮০ সালে প্রত্যাবাসনের পর ২ বছর যেতে না যেতেই পুনরায় রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন শুরু হয় (*দৈনিক আজাদ*, ৩০ এপ্রিল, ১৯৮১)। বিদ্রোহীদের গ্রেফতারের নামে ১৯৯১-৯২ সালে সমগ্র আরাকানে বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে 'অপারেশন মিংনং' ও 'অপারেশন পিথায়া' নামক ভয়াবহ সামরিক অভিযান প্রেরণ করে। দীর্ঘ নির্যাতন ও নাগরিকত্ব বাতিলের এক পর্যায়ে নির্যাতনের মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। এ অবস্থায় পরবর্তীতে ১৯৮৮-৯০ সালের মধ্যে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা টেকনাফ দিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় আশ্রয় নেয় এবং স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলে বসবাস করতে থাকে (*দৈনিক ইনকিলাব*, ১৩ নভেম্বর, ১৯৯১)। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে সেনাবাহিনী উত্তর রাখাইনে পাই থায়া নামে আরও একটি কঠোর অভিযান শুরু করার ফলে আনুমানিক আড়াই লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর দ্বিতীয় তরঙ্গ (আগমন) বাংলাদেশে এসেছিল। এর

ফলে গণহত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, জোরপূর্বক শ্রম ও উচ্ছেদ সংগঠিত হয় (Parnini and Ghazali 2013, p. 137; Dussich 2018, p. 11)। ১৯৯১ সালে উত্তরাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যের আগত ২৫০,০০০ শরণার্থীর অবশিষ্ট জনসংখ্যার ২৯,০০০ মুসলিম শরণার্থী প্রতিনিধিত্ব করে যাদের অধিকাংশই পরবর্তীতে প্রত্যাবর্তিত হয়। বাংলাদেশ সরকার অনুমান করে যে বার্মা থেকে আগত ২,০০,০০০ নতুন রোহিঙ্গা কোনও আইনি অনুমতি ছাড়াই বাংলাদেশে বসবাস করছে। অনেকেই শিবিরের বাইরের গ্রামে বসবাস করে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান খুবই খারাপ ছিল (UNHCR Country operations profile, 2011)। অত্র জেলায় দারিদ্র্যসীমা, উচ্চতর নিরক্ষরতা ও বেকারত্বের হারও বৃদ্ধিতে তারা অবদান রাখে। আশ্রয় শিবিরের বাইরেও ৩৯,২৮৭ জন শরণার্থী এলোমেলোভাবে বিভিন্ন স্থানে আত্মীয়তার পরিচয়ে স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলে (*দৈনিক মিল্লাত*, ২০ জুলাই, ১৯৯২)। তবে ক্যাম্পে আশ্রিত শরণার্থীদেরকেই ভরণ-পোষণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। ১৯৯২ সালে রোহিঙ্গা শরণার্থী আগমনের পরই তাঁদের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হয় এবং ভরন-পোষণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে উক্ত (সাত কোটি দশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা মাত্র) ৭,১০,৭২,০০০/ অর্থ ব্যয় করে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিশ্বের নিকট সাহায্যের আবেদন জানালে ১৯৯২ সালের মার্চ মাস থেকে আন্তর্জাতিক বিশ্ব সহায্য-সহযোগিতায় এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। এসব কাজে ১৬০৭ জন অফিসার ও কর্মচারী ডেপুটেশনে নিয়োজিত হয়। প্রতিরক্ষার জন্য ক্যাম্প প্রতি ১৯১ জন পুলিশ, ৬৮০ জন আনসার, খাদ্য বন্টনের জন্য বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ১০৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ৪১০ জন সেচ্ছাসেবী কাজ করে। এছাড়া ৩১টি এনজিও ও সেচ্ছাসেবী সংগঠন অর্থনৈতিক সহযোগিতাসহ শরণার্থী ক্যাম্পে বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে (*Ministry of Foreign affairs*, SEA, M. Sec., File No. 119)। ১৯৯১-১৯৯২ সালে বাংলাদেশে ২০টি ক্যাম্পে শরণার্থী হিসেবে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের একটি খতিয়ান নিম্ন সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো (RRRC, 2016)-

সারণী-৬.৩ঃ ১৯৯১-১৯৯২ সালে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ক্যাম্প ভিত্তিক হিসাব

ক্রমিক নং	জেলার নাম	থানা	ক্যাম্পের নাম	ক্যাম্পে অবস্থানরত শরণার্থী	মন্তব্য
১.	কক্সবাজার	রামু	ধুয়াপালং	১৬,৯৫৭	
২.			ধেচুয়াপালং (১)	৪,৭৯০	
৩.			ধেচুয়াপালং (২)	২২,৬৫৯	
৪.		উখিয়া	মরিচ্যাপালং	১০,৮৪৫	
৫.			হলুদিয়াপালং	৭,৫১৪	
৬.			জুমাপাড়া	৩৯৪	নির্মানাধীন
৭.			কুতুপালং	১২,৪৮৪	
৮.			বালুখালি (১)	১৮,৮৪১	

৯.			বালুখালি (২)	৯,৭২০	
১০.		টেকনাফ	শৈলার চেবা	৯,৭৮৯	
১১.			হরিখোলা	২,৩৭১	
১২.			নয়াপাড়া (১)	১৬,৪৭০	
১৩.			নয়াপাড়া (২)		নির্মানাধীন
১৪.			দমদমিয়া (১)	২১,৩৩৮	
১৫.			দমদমিয়া (২)	৩১,৭১৫	
১৬.	বান্দরবান	নাইক্ষ্যাংছড়ি	ঘুনধুম- (১)	২৪,১২৯	
১৭.			ঘুনধুম- (২)	১৬,৮৬৫	
১৮.			ঘুনধুম- (৩)	৮,৮১৪	
১৯.			অদর্শ গ্রাম	১৫,০৩১	
২০.			রংগীখালি	১০০	নির্মানাধীন
সর্বমোট				২,৫০,৮৭৭ জন	
তথ্যসূত্রঃ RRRC (*Refugee Repatriation and Rehabilitation Commission*), Cox's Bazar					

৬.২.৩ বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমন ২০১২

২০১০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে অর্ধশতাব্দীর সামরিক শাসনের অবসান ঘটেছিল। ২০১১ সালে সামরিক বাহিনী কাগজে কলমে দেশ পরিচালনার কাজ ছেড়ে দিলে প্রেসিডেন্ট থিন সেইন এর নের্তৃত্বে ইউনিয়ন সলিডারিটি এ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (USDP) অর্ধশত বছরের জাতিগত সহিংসতা অবসানের জন্য আলোচনার সূচনা করে। দেশটির ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মুসলিম সংখ্যালঘু এ গ্রুপটিকে সরকার কোণঠাসা করে রেখেছে এবং সহিংস বৌদ্ধরাও তাদের টার্গেট করেছে। পার্লামেন্টের উভয় অংশে এক-চতুর্থাংশ আসন সামরিক বাহিনীর জন্য সংরক্ষিত। উল্লেখ্য যে, ২০১১ সালের নির্বাচনে একজন মুসলিমকেও প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হয়নি। ২০১২ সালের ৩ জুন আরাকানের কয়েকজন মুসলমান একজন রাখাইন তরুনীকে গণধর্ষণ শেষে হত্যা করা হয়েছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। আরাকানের রাজধানী আকিয়াবের টংগুপ নামক স্থানে উচ্ছৃংঙ্খল মগ-রাখাইন বাস থামিয়ে তাবলীগ এর যাত্রিদের নামিয়ে গণপিটুনি দিলে ঘটনাস্থলে ৯ জন মুসলমান নিহত হয় ও একজন হাসপাতালে ভর্তি হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ৮ জুন, ২০১২ সালে জুম্মার নামাজের আগে মংডুর টাউনশিপে রোহিঙ্গা মুসলমানরা মিছিল বের করার চেষ্টা করলে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর মদদপুষ্ঠ হয়ে রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন মিছিলে হামলা করে। তাছাড়া মিছিলে গুলি চালালে ঘটনাস্থলে চারজন মুসলমান নিহত হয় এবং আহত হয় শতাধিক (*দৈনিক আমাদের সময়*, ২৬ মার্চ, ২০১৩)। মিয়ানমারের রাজধানী ইয়াঙ্গুনসহ এর

আশপাশে সাম্প্রদায়িক রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির তেমন কোন উন্নতি হয়নি। ইয়াঙ্গুনের আশপাশের এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে স্থানীয় মুসলমানদের ওপর হামলার খবর পাওয়া গেছে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা রোধে দেশটির আরও তিন শহরে কারফিউ জারি করেছে সরকার। এক সপ্তাহে দেশটির মধ্যাঞ্চলে নতুন করে সৃষ্ট এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় কমপক্ষে ৪০ জন প্রাণ হারিয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়। বিভিন্ন দফায় রোহিঙ্গা নিপীড়নের পর ২০১২ সালে সিত্তুয়ে এবং উত্তর আরাকানে ৮ থেকে ১২ জুন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় আরাকানের রাখাইন সম্প্রদায়ের সদস্যরা রোহিঙ্গাদের ওপর এক ভয়াবহ সহিংসতা এবং সম্পত্তি ধ্বংসের কাজ করেছে। রোহিঙ্গাদের শিরচ্ছেদ, ছুরিকাঘাত, গুলি, মারধর এবং ব্যাপক অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া যায়। উভয় সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষদর্শীরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে জানিয়েছে, এই সময়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাদের সুরক্ষার অভাব ছিল, তা সত্ত্বেও যথাযথভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের হস্তক্ষেপে সরকারের ব্যর্থতা সহিংসতা আরও বাড়াতে অবদান রাখে (HRW interview, June: 2012)। এ পরিস্থিতিতে ৩ জুন সুপরিকল্পিতভাবে তুরঙ্গপে রাখাইন জনতার দ্বারা মুসলিম ভ্রমণকারীদের উপর হামলায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছে কিন্তু হস্তক্ষেপ করেনি। এর সাথে জড়িত উভয় পক্ষের বেআইনী সমন্বিত হামলা ছিল এমনকি (HRW interview, 2012)। একজন সাক্ষী হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছে যে কর্তৃপক্ষ কেবল মৃতদেহ সংগ্রহের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল (HRW interview, 2012)। স্বাধীন ইলেভেন মিডিয়া গ্রুপ এক বিবৃতিতে বলেছে: "বিদেশি মিডিয়া এখন সংঘর্ষের বিষয়ে পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিবেদন উপস্থাপন করছে [বার্মা] এর চিত্র ধ্বংস করতে। এর জনগণ [আরাকান] এবং রোহিঙ্গাদের মধ্যে....কেবল রোহিঙ্গাদের হত্যা করেছিল এবং তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে" (Eleven Media Group, 2012)। ২০১২ সালে সংগঠিত সহিংসতায় আরাকানে রাখাইন সম্প্রদায় কর্তৃক সরকারী বাহিনীর সহায়তায় রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাড়িঘরে আগুণ ধরিয়ে দেয়। প্রমাণ হিসেবে ছবিতে অদূরে পুলিশ বাহিনীর গাড়ি ও তাদের সদস্যদের দেখা যাচ্ছে (https://www.hrw.org/report/2013/04/22)।

চিত্র-৬.২ঃ রাখাইনে বৌদ্ধ সম্প্রদায় কর্তৃক রোহিঙ্গা মুসলিমদের বাড়িঘরে আগুণ লাগায়

Source: www.humanrightwatch-2013

রোহিঙ্গা এক ব্যক্তি হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে এ সম্পর্কে বলেছে ২৯ শে জুন, ২০১২ সকালে সিত্তুয়ের একটি মসজিদে হামলা চালানো হয়েছিল। সে সময় পর্যন্ত ছিল সাম্প্রদায়িক সহিংসতা দ্বারা প্রভাবিত। তিনি আরও বলেছেন: পৌরসভার লোকেরা [স্থানীয় সরকার কর্মচারী] তাদের ধ্বংস করছিল মার্চেন্ট স্ট্রিট এবং অং Htaw II স্ট্রিটের কোণের রোহিঙ্গাদের মসজিদ। এই মসজিদটি যা আমাদের এবং তারা এটি ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা ছিল সরকার এবং ফায়ার ব্রিগেড এবং সিত্তুয়ের অন্যান্য লোক (HRW interview, 2012)। বেশ কয়েকটি জায়গায় রোহিঙ্গারা অভিযোগ করেছে যে কর্তৃপক্ষ সহিংসতায় নিহত রোহিঙ্গাদের যথাযথ দাফনকে কার্যকরভাবে অস্বীকার করেছে। তারা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছে যে, সঠিকভাবে মুসলিম দাফন অস্বীকার করা অত্যন্ত উচ্চমানের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কষ্টদায়ক। ১২ জুন পুলিশ সিত্তুয়ের নার্জি কোয়ার্টারে রোহিঙ্গাদের ওপর গুলিবর্ষণ ও হত্যা করার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার পরে ২৬ বছর বয়সী রোহিঙ্গা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছেন, তিনি বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গার লাশ সংগ্রহ করতে সহায়তা করেছিলেন এবং তাদের সামরিক ট্রাকে রাখা হয়। তিনি আরও বলেন, "তারা [সেনাবাহিনী] কিছু লাশ নিয়ে যায়, কিন্তু তাদের বাকিদের আমরা নিতে পারি নাই। বেশিরভাগ মুসলিম মৃতদেহ কর্তৃপক্ষ তাদের মাধ্যমে নিয়ে গিয়েছিল এবং বৌদ্ধ শ্মশান কেন্দ্রে দাহ করা হয়" (HRW interview, 2012)। আমি যে জায়গাতে বাস করছি সে জায়গাও কবরস্থান থেকে এক মাইল দূরে। আমরা [শ্মশান কেন্দ্রে] জ্বলতে দেখতে পেলাম" (HRW interview, 2012)।

মংডুর এক বাসিন্দা যা দেখেছিলেন তা ব্যাখ্যা করেছেন: ৮ ই জুন যখন সহিংসতা শুরু হয়েছিল, তখন লাশগুলো তাদের সেতুর কাছে পড়েছিল। তাদের একটি ধর্মীয় দাফনের জন্য আমরা তাদের পেতে পারি নি। এখনও যদি সেতুতে যান, আপনি এর নীচে মৃতদেহ দেখতে পাবেন (HRW interview, 2012)। এ পরিস্থিতি উল্লেখ করে আরাকান রাজ্যের রোহিঙ্গা ব্যক্তি ২০১২ সালের অক্টোবরে সহিংস হামলার আগে মুসলমানদের জাতিগত নির্মূলের শিকার হন। আরাকানীরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে আমাদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এক আরাকানিজ আমাকে বললেন, "আমরা আপনার জন্য সমস্ত খাবার বন্ধ করে দেব, আর কেন জানো? আমরা এটি করব যাতে আপনি দ্রুত এবং স্থায়ীভাবে এখান থেকে চলে যান" (Human Rights Watch interview, 2013)। জুন, ২০১২ সালে আরাকানিজ রাজনৈতিক দলসমূহ, স্থানীয় সন্ন্যাসীদের সমিতি এবং আরাকানিজ নাগরিক গোষ্ঠীগুলো জনসমক্ষে বিবৃতি দেয় এবং অসংখ্য পত্রপত্রিকা তা প্রচার করে। তারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে আরাকান রাজ্য থেকে রোহিঙ্গাদের জাতিগত নির্মূল করার আহ্বান জানায়। এ সকল বিবৃতি এবং পত্রপত্রিকা সাধারণত রোহিঙ্গাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে রোহিঙ্গাদের ভিটাছাড়া করা এবং তাদের দেশ থেকে অপসারণের আহ্বান জানায়। ২০১২ সালের দাঙ্গায় শত শত মুসলিমকে হত্যা আরা হাজার

হাজার মুসলিমকে বিতাড়িত করা হলেও সুচি কিছু বলেন নি (*দৈনিক যুগান্তর*, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫)। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জুন এবং জুলাই ২০১২, বার্মা ও বাংলাদেশে গবেষণা পরিচালনা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে। জুনে সহিংসতায় ১০৪ জন প্রত্যক্ষ বা সরাসরি প্রভাবিত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে রোহিঙ্গা, কামান এবং আরাকানিজের সাথে অন্তত ১০টি গোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এখানে উল্লেখ করা হয় যে, ২০১২ সালের জুনে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পরে, স্থানীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মুসলিমদের বিচ্ছিন্নতার আহ্বান জানিয়ে পত্রিকায় সংবাদ প্রচার করে। ২৯ জুন, ২০১২ সন্ন্যাসীদের মধ্যে সিত্তুওয়ে স্থানীয় আরাকানীদের জনসংখ্যার কাছে একটি উদ্দীপক প্যামপ্লেট বিতরণ করে। আরাকানীদের বলছে যে তাদের “বাঙালিদের [রোহিঙ্গাদের] সাথে ব্যবসা করতে হবে না”। এ দাবিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল “আরাকানিজের বিলুপ্তি” রোধে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে রোহিঙ্গাদের আলাদা করুন (Association of Young Monks, 2012)। রাখাইন কর্তৃক রোহিঙ্গা নির্যাতনের যে চিত্র পাওয়া যায়- (Kipgen, 2013) -

সারণী-৬.৪ঃ রাখাইন কর্তৃক রোহিঙ্গা নির্যাতনের খতিয়ান চিত্র

টাউনশিপ	**ক্ষয়ক্ষতি**			**আহত**		
	রাখাইন	**রোহিঙ্গা**	**মোট**	**রাখাইন**	**রোহিঙ্গা**	**মোট**
সিত্তুওয়ে	১১	২৩	৩৪	৩৫	২২	৫৭
কিউকপিউ	-	৪	৪	-	-	-
কিওয়াকতাও	-	৩	৩	৬	১০	১৬
রাথিডং	১০	৪	১৪	৩	২৬	২৯
বুথিডং	-	১	১	-	-	-
মংডু	১০	১০	২০	৬	-	৬
ইয়ানবাই	-	১	১	-	-	-
মিনপায়ার	-	-	-	-	১	১
সর্বমোট	**৩১**	**৪৬**	**৭৭**	**৫০**	**৬২**	**১১২**

Source: Kipgen (2013)

৬.৩.৪ বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমন ২০১৬-১৭

২০১৬ সালের ৯ অক্টোবর থেকে ২০১৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত কমপক্ষে সাত লাখ রোহিঙ্গা নাগরিক বাংলাদেশে এসেছে। পূর্ব থেকে আরো তিন লাখ রোহিঙ্গা অবস্থান করছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গার বোঝা এখন বাংলাদেশের কাঁধে (*দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ২৮ নভেম্বর, ২০১৭)। রোহিঙ্গা সঙ্কট নিরসনে গঠিত আনান কমিশন এক রিপোর্টে রাখাইন পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। আনান কমিশনের প্রধান কফি আনান তাঁর রাখাইন বিষয়ক ৬৬ পৃষ্ঠার রিপোর্টে বেশ কয়েকটি সুপারিশ উপস্থাপন করেছেন। এরমধ্যে অন্যতম হলো নাগরিকত্ব যাচাই, ১৯৮২ নাগরিকত্ব আইন, চলাফেরার স্বাধীনতা, অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের সুরক্ষা

(আইডিপিএস), মানবিক প্রবেশাধিকার, মিডিয়ার প্রবেশ, শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্য সেবা, মাদক নির্মূল, সাধারণ প্রতিনিধি নির্বাচন, আন্তঃ সাংস্কৃতিক কাউন্সিল, সুরক্ষা, বিচার পাওয়া, সাংস্কৃতিক বিকাশের বিষয়সমূহ, বাংলাদেশ ও আঞ্চলিক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ইত্যাদি (Kofi A Annan, Advisory Commission, p.16)। জাতিসঙ্ঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে গঠিত ওই কমিশন গত ৮ জুন ২০১৬ সালে 'সঞ্চিত অভিজ্ঞতা' (Lessons Learned) শীর্ষক ওই রিপোর্টটি প্রকাশ করে। এ রিপোর্টে বলা হয়, রাখাইন পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি, বরং তা আরো খারাপ হয়েছে। রিপোর্টটিতে আরো বলা হয়েছে, কমিশনের চূড়ান্ত সুপারিশগুলো মিয়ানমারের সঙ্কট মোকাবেলার ক্ষেত্রে দেশটির সরকার ও তাদের আন্তর্জাতিক সহযোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রূপরেখায় পরিণত হয়েছে। রাখাইন সঙ্কট সমাধানের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আনান কমিশনের এক বছরের কার্যকাল শুরুর পরপরই রোহিঙ্গা পরিস্থিতির খারাপ রূপ ধারণ করে। ২০১৬ সালের অক্টোবর ও ২০১৭ সালের আগস্টে রাখাইনে ব্যাপকভাবে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। ইরাবতি জানায়, দুই সময়েই নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির (আরসা) কথিত হামলার পরেই এই সহিংসতা ছড়িয়েছে। এই হামলার পরই রাখাইনে সেনাবাহিনীর শুরু করা ক্লিয়ারেন্স অপারেশনে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সংগঠিত হয়। আর এই কারণে প্রাণ হারায় হাজার হাজার নিরীহ রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ ও শিশু। নতুন করে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে প্রায় সাত লাখ নির্যাতিত মানুষ।

রাখাইন সঙ্কট নিয়ে ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে পড়ে মিয়ানমার সরকার ও এর ডি ফ্যাক্টো নেতা অং সান সু চি। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জাতিসঙ্ঘ এবং যুক্তরাষ্ট্র জাতিগত নিধনযজ্ঞের অভিযোগ করলেও তারা তা অস্বীকার করছে। আনান কমিশনের নতুন রিপোর্টে বলা হয়, ২০১৬ সালে দায়িত্ব গ্রহণের সময়ই অং সান সু চি জানতেন রাখাইন তার জন্য বড় রাজনৈতিক বাধা হয়ে উঠবে। দায়িত্ব নেয়ার দ্বিতীয় মাসেই সু চি নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী জাতিসঙ্ঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের সাথে যোগাযোগ করেন। রাখাইন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সুপারিশ তৈরির জন্য একটি কমিশনের নেতৃত্ব দিতে তিনি আনানকে অনুরোধ জানান। ২০১৬ সালের জুনে মিয়ানমারে সফর করে কফি আনান। ২০১৭ সালের ২৪ আগস্ট কমিশনের কার্যকাল শেষে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় (দৈনিক নয়াদিগন্ত, ০৮ জুলাই, ২০১৮)। মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশের (বিজিপি) তিনটি স্থাপনায় ৯ অক্টোবর, ২০১৬ সালে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ৯ জন বিজিপি সদস্যকে হত্যা এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট করে। মিয়ানমার সরকার এই ঘটনার জন্য 'রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন'কে (আরএসও) সন্দেহ করে। এই ঘটনার প্রায় এক মাস পর মিয়ানমার সরকার ১০ নভেম্বর থেকে অপারেশন শুরু করে। মূলত আরএসও দমনের নামে শুরু করা অভিযানেই হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দেশটির সরকারি বাহিনী। নির্যাতনের শিকার হয়ে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। ভয়াবহ নির্যাতনের শুরুতে ঘরে ঘরে তল্লাশি হয়। ভাতের চাল পেলে বাগীদের

(বিদ্রোহী) খাওয়ানোর জন্য চালগুলো ঘরে রাখা হয়েছে বলা হয়। আবার চাল না পেলে বলে, চাল বাগীদের খাইয়েছ। সরকারী বহিনী তাদের ভাত, পানি ও আশ্রয় প্রদানের অজুহাতে রোহিঙ্গাদের ঘর পোড়ায়, মানুষ মারে, যুবকদের গুলি ও তরুণীদের ধর্ষণ করেছে। বাংলাদেশে পালিয়ে আসাদের মধ্যে ধর্ষিতা কয়েকজনও আছেন। বর্বরতা শুরুর আগে সেখানে কর্মরত এনজিও কর্মীদের সরিয়ে নেওয়া হয়। বাইরে থেকে যাতে কেউ ওই সব এলাকায় ঢুকতে না পারে সে জন্যও নজরদারি বাড়ানো হয়। বিদ্রোহী খোঁজার নামে মূলত রোহিঙ্গা মুসলমানদের নিধন করছে সেই দেশের নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা। ঘর পোড়ানোর সময় শিশুদের আগুনে নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটেছে। রোহিঙ্গাদের হত্যার মহা উৎসব করছে ও শিশুরা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে (*দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২৫ নভেম্বর, ২০১৬)। মগরা (মিয়ানমার সেনাবাহিনী) হঠাৎ করেই বাড়ির ভেতরে ঢুকে অতর্কিতে গুলি চালায়। উপায় না দেখে গহীন অরণ্য পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে। হোয়াইক্যং চেকপোষ্ট তথা বিওপি ২৯৪ জন রোহিঙ্গার স্বদেশে ফেরত পাঠিয়েছে। তারপরও গভীর রাতে জেলে নৌকা মাঝিদের হাতে পায়ে ধরে দলে দলে হোয়াইক্যং এর বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে অনেকে অনুপ্রবেশ করেছে। যারা রাতে অনুপ্রবেশের সময় বিজিবির হাতে আটক হয়। পরের দিন খাদ্যদ্রব্য দিয়ে তাদের ফেরত পাঠিয়েছিল বিজিবি। কিন্ত রাতের অন্ধকারে দলে দলে বিজিবির চোখ ফাঁকি দিয়ে অনুপ্রবেশ করে টেকনাফের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। এসব রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের নাফ নদী হয়ে সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে প্রবেশ করেছে। টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং এর মিনা বাজার, খারাংখালী, কাঞ্জরপাড়া, লম্বাবিল, হ্নীলার জাদিমুরা, নয়াপাড়া, লেদা, মুচুনী, নাইট্যং পাড়া এবং কায়ুকখালী খাল দিয়ে এসব রোহিঙ্গারা দলে দলে রাতের বেলায় অনুপ্রবেশ করছে। পরে নতুন রোহিঙ্গা শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছে এবং অনেকে আত্মীয় স্বজনের বাসায় অবস্থান করেছে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সাম্প্রতিক সহিংসতার পর আবারো গভীর উদ্বেগ জানিয়েছেন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান। আনান এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য রাখাইন শহর সিত্তুয়ে তার নেতৃত্বাধীনে ৭ সদস্যের একটি কমিশনকে তদন্তের সুযোগ দেয়ার জন্যে দেশটির সরকারের কাছে আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'রাখাইন রাজ্যে সহিংসতা এবং অস্থিতিশীলতা পুনরায় চরম আকার ধারণ করেছে। সকল সম্প্রদায়কে সহিংসতামূলক মনোভাব বর্জন করতে হবে এবং নিরাপত্তা সংস্থাকে আইনের রক্ষা এবং যথাযথ প্রয়োগের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে (*দৈনিক আমাদের সময়*, ২৮ নভেম্বর, ২০১৬)।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে (সাবেক আরাকান) কয়েক দশক ধরে রোহিঙ্গাদের ওপর সরকারি বাহিনীর দমন-পীড়নে রোহিঙ্গাসহ সংশ্লিষ্টরা বলছে, রাখাইন অঞ্চলে অপতৎপরতা চালিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করছে মিয়ানমার ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন 'রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন' (আরএসও)। এর পরিপ্রেক্ষিতে মিয়ানমারের সরকারি বাহিনী রাখাইনে অভিযানে নামলে রোহিঙ্গারা বাড়িঘর ছেড়ে ভিড় করে বাংলাদেশ সীমান্তে। আর আরএসও দমনের অজুহাতে

অসহায় রোহিঙ্গাদের ওপর বর্বর নির্যাতন চালাচ্ছে মিয়ানমার সরকার। ওপারের পাশাপাশি বাংলাদেশ সীমান্তেও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির তৎপরতা চালাচ্ছে আরএসও। তাদের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের জঙ্গি দলে ভেড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে চলমান এ পরিস্থিতিতে উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ। সংকটে থাকা সংখ্যালঘু রোহিঙ্গারা কেন বিজিপির চৌকিতে হামলা চালিয়ে অস্ত্র-গুলি লুট করতে যাবে; সেটি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ওই রাতে তাহলে সেখানে হামলা চালিয়েছিল কারা, মিয়ানমার সরকারও তাৎক্ষণিকভাবে এ প্রশ্নের জবাব স্পষ্ট করেনি। হামলার ঘটনার পর মিয়ানমারের সরকারি গণমাধ্যমে বলা হয়েছিল, বিদ্রোহী গোষ্ঠীরাই এ হামলার জন্য দায়ী। হামলার ঘটনার পর অক্টোবরেই রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর দমন-পীড়ন শুরু করে সরকারি বাহিনী। তবে ‘প্রতিশোধ’ নিতে তারা চূড়ান্ত অভিযান শুরু করার এক মাস পর রাখাইনের অন্তত ১৫টি গ্রামে ‘দুষ্কৃতকারী বিরোধী’ চিরুনি অভিযান শুরু করে। কক্সবাজারে পতাকা বৈঠকে মিয়ানমারের বিজিপির উপমহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল থোরা শান লুইন অভিযানের কথা স্বীকার করেন। গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ছোট গজিরবিল ছাড়াও বড় গজিরবিল, হোয়াবেক, নাকফুরা, গোয়াখালী, বুড়া সিকদারপাড়া, বাইম্যা, কালিপ্রাণ, লংগদু, কুলাচিং, জামবইন্যা, বাহাইল্যাসহ রোহিঙ্গা অধ্যুষিত কমপক্ষে ১৫টি গ্রামে সেনাদের অপারেশন চলেছে। এসব গ্রামের হাজারো রোহিঙ্গা পালিয়ে ধানক্ষেতসহ পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় নিয়েছে ও কেউ কেউ বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার পরে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন প্রকাশ্যে মিয়ানমারের এই অবস্থানকে নাকচ করে দিয়েছেন। বান কি মুন বলেছেন, ‘রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের বিষয়টি কেবল তাদের আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন নয়। এই মানুষগুলো অনেক প্রজন্ম ধরে এ দেশে বাস করছে। দেশের অন্য নাগরিকেরা নাগরিকত্ব বা যে আইনি স্বীকৃতি পায়, তাদেরও তা পাওয়ার অধিকার আছে।’ সু চি তাঁর এনএলডির নেতা-কর্মীকে পরামর্শ দেন যে তাঁরা যেন ‘রোহিঙ্গা’ শব্দটি উচ্চারণ না করেন। এর পরিবর্তে এনএলডি প্রশাসন তাদের ‘রাখাইনের মুসলিম’ হিসেবে আখ্যা দিচ্ছে। ‘রাখাইনের মুসলিম’ হিসেবেও একটি গণতান্ত্রিক সমাজে যেটুকু ন্যূনতম অধিকার, সেটা তারা ভোগও করতে পারছে না। সু চির কাছে মানবিক মিয়ানমারের বিনির্মাণের আশায় সতর্কতার সঙ্গে হলেও কফি আনানের নেতৃত্বে যে বিশেষ কমিশন হয়েছে তাকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে দেখা হয়। কারণ, রাখাইন ও মিয়ানমারের রাজনীতির যে প্রভাবশালী মহল রোহিঙ্গাদের সে দেশের নাগরিক হিসেবে মানে না, তারা সবাই একযোগে সু চির কফি আনান কমিশন গঠনের তীব্র বিরোধিতা করছে। কিন্তু সু চি এখন পর্যন্ত এই কমিশন যাতে ভালোভাবে কাজ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে সংকল্পবদ্ধ।

আনান কমিশন ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা ছাড়াও ভারত, চীন, মালয়েশিয়া এবং অন্যান্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গ্রুপের সাথে পরামর্শ করেছে। ইউএন অফিসিরিয়াল, মিয়ানমার ভিত্তিক কূটনীতিক প্রতিনিধিসহ আঞ্চলিক বেসরকারী সংস্থা (আইএনজিও), সংগঠন এবং বিশ্লেষকগণের সাথে আলোচনা করেছেন। যেহেতু কমিশন ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ এ উদ্বোধন

করা হয়েছিল, তারা সিত্তুওয়ে, ম্রাউক-উ, মায়ুবন-এ ১৫৫টি পরামর্শ সভা করেছে। কিওয়াকতাও, থানডওয়ে, কিউকপিউ, রামরি, মংডু, বুথিডং, ইয়াঙ্গুন এবং নেপিডোর পাশাপাশি ব্যাংকক, ঢাকা (কক্সবাজারে) এবং জেনেভায় কমিশনাররা বৈঠক করেছেন বিভিন্ন পক্ষের প্রায় ১,১০০ প্রতিনিধির সাথে (Annan, 2016)। রাখাইনে প্রায় ১৪০,০০০ আইডিপি'র (অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠী) মধ্যে মুসলমান ছিলেন প্রায় ১২,০০,০০০ জন। সিত্তুয়ে ও কিউকপিউ কেন্দ্রসহ বেশ কয়েকটি অঞ্চল-বেশিরভাগ মুসলমানকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। অক্টোবর ২০১৬ বুথিডং, মংডুর একাধিক পুলিশ ফাঁড়িতে এবং উত্তর রাখাইন রাজ্যে রাথিডং টাউনশিপগুলোতে কথিত মারাত্মক হামলার জন্য দায়ী রোহিঙ্গা জঙ্গিগোষ্ঠী নিজেকে আল-ইয়াকিন আন্দোলন সদস্য বলে অভিহিত করেছিল যা আরসা নামেও পরিচিত (এআরএসএ, ARSA/PR/01/2017, March 29, 2017)। রাখাইন রাজ্যের বাসিন্দারা এই দলটিকে আল-ইয়াকিন হিসাবে উল্লেখ করেছেন (Fortify Rights interviews, 2016-17)। মিয়ানমার সরকারের মতে, ৯ অক্টোবর ২০১৬ সালে আরএসএ-এর আক্রমণে নয় জন পুলিশ অফিসার ও নিরাপত্তা কর্মী নিহত হয়েছে (Global New Light of Myanmar, 2016)। তাই মিয়ানমার সরকার আরএসওকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করেছিল (Waxing Day of Tawthalin, 2017)। অক্টোবরের মিয়ানমারে প্রথম আক্রমনের পরে গ্রুপটি ভিডিও অনলাইনে বিভিন্ন প্রচার চালিয়েছে। পরে আতা উল্লাহ নামের একজন নেতা চিহ্নিত হয়েছিল। এখানে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবীদের জড়িত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন (Fortify Rights, 2016)। এছাড়া গ্রুপের প্রধান আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন মানুষকে এখন [বাংলাদেশে] আসতে দেবে না (Fortify Rights interview, 2017)। অক্টোবর ২০১৬ এর ছাড়পত্র অপারেশনগুলো ছিল নিরাপত্তা কর্মীদের পুলিশ ফাঁড়িতে আক্রমণকারী এবং সাম্প্রতিক হামলার সময় হারিয়ে যাওয়া অস্ত্রগুলো রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা বাহিনী পুনরুদ্ধার করতে শুরু করে" (U.N. Special Rapporteurs, no.30/3-27/91, United Nations, 2017)। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সশস্ত্র মিলিশিয়ারা বেসামরিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর একটি বিস্তৃত ও নিয়মিত পদ্ধতিতে আক্রমণে পুরো গ্রাম ধ্বংস করে দিয়েছে। এতে পুরুষ, মহিলা এবং শিশুরা নির্যাতিত হয়েছে; রোহিঙ্গা মহিলাদের ধর্ষণ ও গণধর্ষণ করেছে এবং বহু রোহিঙ্গা পুরুষ ও তরুণদের গ্রেপ্তার করেছে। পরিবারের সদস্যদের মতে যাদের অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন। জাতিসংঘের এক কর্মকর্তা ক্লিয়ারেন্স অপারেশনগুলি পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন, এটি একটি আপত্তিজনক পরিস্থিতি হিসেবে সশস্ত্র লোকদের নয়, বেসামরিক লোকেরা এর শিকার হয়েছে (Fortify Rights interview, 2016)।"

ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ সালে মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার এর ইউএন অফিস অভিযোগ করেছে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে মিয়ানমার বাহিনী 'খুব সম্ভবত' প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (UNHC for Human Rights, 2017)।' সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মানবাধিকার কমিশনার রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতি 'জাতিগত নির্মূলকরণে' পাঠ্যপুস্তকের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন (Washington Post,

2017)। উখিয়া ও টেকনাফের কোল ঘেঁষে শান্ত নাফ নদী বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের বিশাল ভৌগোলিক অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ২০১৭ সালের শেষে সীমান্তের ওপারের অশান্ত ঘটনা আছড়ে পড়ে এপারের দুটি সীমান্ত অঞ্চল উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায়। বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) ও কোস্ট গার্ড সদস্যরা বেশ তৎপর হয়ে ওঠে। কারণ টেকনাফের নাইটংপাড়া, দমদমিয়া ও জাদিমুরা এলাকা থেকে আরাকানের আকাশে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়তে দেখা গেছে। পরদিন দেখা গেল তাদের ৮ থেকে ১০টি নৌকা বালাদেশের কোস্ট গার্ড সদস্যদের পাহারায় নাফ নদীর তীরে এসে পৌঁছালো। ভেতরে অসহায় ও নির্যাতিত রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী। যদিও বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে বর্ডার পাস ও ট্রানজিট পাস নিয়ে দৈনিক তিন শতাধিক মানুষ যাতায়াত করত। কিন্তু এখন সেই পাস ইস্যু বন্ধ থাকায় কার্যত দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত বন্ধ হয়। মিয়ানমারে রাখাইন রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল ও মংডু শহরের উত্তরে অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন সরকারি বাহিনীর ভয়াবহ তাণ্ডবে এলাকা ছেড়ে যারা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পেরেছে তাদের কাছে শোনা যায় ভয়াবহ নির্যাতনের ঘটনা। জীবন্ত মানুষ পোড়ানো, বসতবাড়ি জ্বালানো কিংবা নারী ধর্ষণের মতো ভয়াবহ নারকীয় তাণ্ডব চলে। রোহিঙ্গারা নিজ দেশে পরবাসী হয়ে এখন নিজের জীবনকে বোঝা ভেবে চরম অনিশ্চয়তায় মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। এখন প্রশ্ন তাহলে এসব কী হচ্ছে মংডুতে? রোহিঙ্গাদের জীবনের ভবিষ্যতই বা কি হবে? একটি বড় শরণার্থী (১.২ মিলিয়ন) প্রেরণকারী দেশ হিসেবে মিয়ানমারের নাম এবং একটি বড় শরণার্থী-আশ্রয় প্রদানকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের (১১,১৮০০০ শরণার্থীসহ) নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আগস্ট, ২০১৭ সালে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে একটি নতুন দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়ার পরেই এটি হয়েছে। প্রায় ৭০০,০০০ রোহিঙ্গা সাম্প্রতি প্রতিবেশী বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে মিয়ানমার থেকে পালাতে বাধ্য করা হয়েছিল (Dussich 2018, p. 4)। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে আসা রোহিঙ্গারা একটি মুসলিম সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠী এবং জনসংখ্যায় বিশ্বের অন্যতম নিপীড়িত সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মিয়ানমারে তাদের নাগরিকত্ব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রহীন অবস্থায় বসবাস করছে (Milton, and Jimmy, 2017, p. 942)। মিয়ানমারের ভাষ্য মতে, "আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি" (এআরএসএ) নামে একটি জঙ্গি গোষ্ঠী ২৫ আগস্ট, ২০১৭ সরকারী বাহিনীর উপর আক্রমণ করলে রাখাইনে বৌদ্ধ মিলিশিয়াদের সহায়তায় মিয়ানমারের সেনাবাহিনী একটি নতুন অভিযান পরিচালনা করে (Ratcliffe, 2017)।

বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য তার সীমানা খুলেছে; জনগণের প্রচুর সহায়তায় এবং শরণার্থী শিবিরে মানবিক প্রতিক্রিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছে। বিশ্ব সম্প্রদায় দ্রুত মানবিক প্রতিক্রিয়ায় এ উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য এর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করেছে (UNHCR, 2017, p. 7-9)। ডিসেম্বর, ২০১৬ সালে এবং মার্চ ২০১৭ সালে ফোর্টিফাই রাইটসের সাক্ষাৎকার নেওয়া বেশিরভাগ রোহিঙ্গা রাখাইন রাজ্যে বা অন্য কোথাও কোনও সক্রিয় রোহিঙ্গা মিলিশিয়াদের কথা

শুনেনি বলে জানায়। এছাড়া এই গোষ্ঠীর পক্ষে খুব কম লোকই সুস্পষ্ট নৈতিকতা বা অন্যান্য সমর্থন প্রকাশ করেছেন (Fortify Rights interviews with no. 24, 2016)। ২৫ আগস্টের হামলার আগ মুহূর্তে ফরটিফাইস রাইটস উত্তরের রাখাইন রাজ্য জুড়ে বেশ কয়েকটি গ্রামে এআরএসএ-র যুবকদের নিয়োগের বিষয়টি নথিভুক্ত করে (Fortify Rights interviews with no. 24, 2017)। সেখানের বাসিন্দা এবং এআরএসএ-এর সদস্যরা অক্টোবর এবং নভেম্বর, ২০১৬ সালে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর আক্রমণের এবং এআরএসএ কর্তৃক ভয় দেখানোর কৌশল হিসাবে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুর হুমকিসহ উল্লেখ করেছেন (Fortify Rights interviews with no. 24, 2017)। ক্লিয়ারেন্সের অভিযান পর্যবেক্ষণকারী জাতিসংঘের এক কর্মকর্তা এটিকে "আপত্তিজনক পরিস্থিতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সশস্ত্র লোকদের কাছে নয়, সাধারণ নাগরিকদের কাছে বেসামরিক লোকেরা এর শিকার হয়েছিল (Fortify Rights interviews with no. 24, 2016)। ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ সালে মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার অফিসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল যে মিয়ানমার বাহিনী "মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে" (Fortify Rights interviews with no. 24, 2016)। সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সালে মানবাধিকার হাই কমিশনারকে উল্লেখ করা হয়েছে রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতিটিকে "জাতিগত নির্মূলকরণের পাঠ্যপুস্তক উদাহরণ" হিসেবে দেখানো হয়েছে (Washington Post, 12 September, 2017)। রাষ্ট্রীয় বাহিনী ঘনিষ্ঠ পরিসরে হেলিকপ্টার থেকে বন্দুক দিয়ে পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের উপর গুলি চালিয়েছিল এবং এতে বহুসংখ্যক মানুষ মারা গিয়েছিল। এন ইসলাম (৫১) যিনি নদীর তীরে গণহত্যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তিনি ফরটিফাই রাইটসকে বলেছে যে, নিহতদের মধ্যে ছোট বাচ্চারাও ছিল। তিনি বলেছিলেন: "কিছু ছোট বাচ্চাকে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল...তারা অর্ধেক বেঁচে থাকা ছোট বাচ্চাদেরও কুপিয়েছিল"। সেই সকল দু'বছর, তিন বছর, পাঁচ বছর বয়সী শিশুরা মায়ের বুকের দুধ খেত" (Washington Post, 4 September, 2017)।

৬.৩ বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের শিবিরে অবস্থান (উখিয়া ও টেকনাফ)

উখিয়া ও টেকনাফ দু'টি নিবন্ধিত শরণার্থী শিবির রাজাপালং ও হ্নীলা ইউনিয়নে যথাক্রমে কুতুপালং ও নয়াপাড়া অবস্থিত শরণার্থীদের জীবন-ধারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ২০০৫ সালের পর থেকে। সর্বশেষ ২০০৫ সালে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের পর ১৪ হাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে থেকে যায়। এক সময় বাংলাদেশ সরকার ২০টি শরণার্থী ক্যাম্প এর মধ্যে ২টি রেখে বাকি ১৮টি শরণার্থী ক্যাম্প বন্ধ করে উপরোক্ত মাত্র দু'টি ক্যাম্প চালু রাখে। যদিও এ নিবন্ধিত শরণার্থীদের বর্তমান সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এখন প্রায় ৪০ হাজার এ উপনীত হয়েছে। এ আগমনের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ২০১৭ সালেও তাদের আশ্রয় হয় শরণার্থী শিবিরে। বর্তমানে এ দু'টি উপজেলায় ৩৩টি শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্প অবস্থিত রয়েছে। উক্ত শিবিরগুলোর মধ্যে ২০০৭ সাল থেকে দু'টি উপজেলায় (কুতুপালং নিবন্ধিত শরণার্থী শিবির, উখিয়া ও নয়াপাড়া

নিবন্ধিত শরণার্থী শিবির, টেকনাফ) নিবন্ধিত শরণার্থী শিবিরে পুরাতন রোহিঙ্গারা বসবাস করে আসছে। যদিও সে সংখ্যা এখন দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ক্যাম্প দু'টি পরিচালনায় দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব অথবা অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা কমিশনার হিসেবে কক্সবাজার জেলা শহরে অবস্থিত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসনের কমিশনার কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এই কমিশনারের কার্যালয় থেকেই দু'টি নিবন্ধিত শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উল্লিখিত ক্যাম্পদ্বয়ে দুইজন ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বধানে ক্যাম্প দু'টি মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যদিও ২০১৭ সালে রোহিঙাদের ব্যাপক আগমনের ফলে ক্যাম্প তত্ত্বধানে একের অধিক ম্যাজিস্ট্রেট এর সমন্বয়ে মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া শিবিরের অবস্থাকে ভালভাবে বুঝতে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় যথাক্রমে দু'টি মেকশিফ্ট ক্যাম্পে তাদের কিছু কর্মকাণ্ডকে পৃথকভাবে বুঝতে রাজাপালং ও হ্নীলা ইউনিয়নে যথাক্রমে কুতুপালং মেকশিফ্ট শিবির ও লেদা মেকশিফ্ট শিবিরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তারা ক্যাম্প নির্মাণে দিনে শ্রমিক হিসেবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করে থাকেন। যদিও বাস্তবে রোহিঙ্গারা স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন: ব্যবসা-বাণিজ্য, দিন মজুরী, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, মাছ ধরা, ভূমি চাষ, রিক্সা-ভ্যান-সিএনজি চালানো, লবন চাষসহ বেশ কিছু কাজের জড়িত রয়েছে। নিবন্ধিত শিবির বা শরণার্থী ক্যাম্পে ছোট খাটো হাতের কাজ শিখতে তাদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। একই সময়ে তাদের জীবনে গতিশীলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম ও জীবন গঠনমূলক কর্মকাণ্ড। তাদের এ গঠনমূলক কর্মকাণ্ডকে জীবন-ধারণ প্রক্রিয়া হিসেবে বুঝানো হয়েছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় আগমন করে। এ দু'টি শরণার্থী শিবির অত্র গবেষণার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল। তাই নতুন আগত রোহিঙ্গাদের বসবাসের (কুতুপালং মেকশিফ্ট ক্যাম্প, উখিয়া ও লেদা মেকশিফ্ট ক্যাম্প, টেকনাফ) কে দু'টি উপজেলায় সমসংখ্যক শিবিরকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিম্নে গবেষণার অন্তর্ভূক্ত এ চারটি শিবির বা ক্যাম্প সম্পর্কে আলোকপাত করা হল-

জাতিসংঘের পাঁচটি সংস্থার পাশাপাশি ছয়টি এনজিও রয়েছে যা বাংলাদেশে অবস্থিত দুটি নিবন্ধিত শিবিরে শরণার্থীদের বিভিন্ন ধরণের সহায়তা প্রদান করে। সংস্থাগুলোর বেশিরভাগই স্বাস্থ্য সহায়তা কার্যক্রমের জন্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা, স্যানিটেশন ইত্যাদির মতো বিভিন্ন শ্রেণির স্বাস্থ্য সহায়তা সরবরাহ করে থাকে টিএআই স্বনির্ভর কার্যক্রমের জন্য যেমন গৃহ, বাগান, হাঁস-মুরগি, বৃক্ষরোপণ, দক্ষতা বিকাশ, সেলাই, ছুতার, স্কুল ব্যাগ তৈরি এবং সামাজিক সচেতনতা; প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা; স্যানিটেশন ম্যানেজমেন্ট; ও খাবারের ঝুড়ি তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বিডিআরসিএস ও এমএসএফ-হল্যান্ডের অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকার,

ইউএনএইচসিআর এবং ডাব্লিউএফপি গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও পরিচালনা প্রশিক্ষণ (আরটিএমআই) সরবরাহকারী খাদ্য এবং অ-খাদ্য আইটেমগুলো প্রধানত রোগীদের বিভাগে চলমান (আইপিডি) স্বাস্থসেবা প্রদান করে। রেফারাল রোগীরা প্রজনন অধিকার, পছন্দ এবং প্রয়োজনীয় ডেলিভারি (ESD) এর প্রচার এবং সুরক্ষা প্রদান করেন। সম্প্রতি এমএসএফ (হল্যান্ড) প্রত্যাহারের পরে ইসলামিক রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল (আইআরআই) শরণার্থীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ শুরু করেছে। হ্যান্ডিকেপ ইন্টারন্যাশনাল (এইচআই) এবং এটির বাস্তবায়ন অংশীদার প্রোগ্রাম ফর হেল্পলেস অ্যান্ড লেগ সোসাইটি (পিএইচএলএস) নিবন্ধিত শরণার্থীদের জন্য এবং টালে বসবাসরত নতুন রোহিঙ্গা উভয়কে সহায়তা প্রদান করে, যার মধ্যে প্রতিবন্ধীদের সহায়তা অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ (জিওবি'র) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে (এমওএইচ) শরণার্থীদের বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা সরবরাহ করে যার মধ্যে আউট-রোগী বিভাগ (ওপিডি) অন্তর্ভুক্ত। অন্য রোগীদের বিভাগ (আইপিডি); প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা; টিকাদান; পরিবার পরিকল্পনা; বার্ষিক কৃমিনাশক খাওয়ানোর কর্মসূচি (এসএফপি এবং টিএফপি) (সিআইসিএস কুতুপালং এবং নয়াপাড়া শরণার্থী শিবির)। তদুপরি স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে যা স্বাস্থ্যকর পুষ্টি এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত। কিশোরী বয়সী মেয়ে শিশুদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১০ বছরের কম বয়সী সমস্ত শরণার্থী শিশুদের টিকা দেওয়া হয় এবং পুষ্টির ঘাটতি যেমন রাতে অন্ধত্বের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য পরিস্থিতির প্রতিরোধের জন্য ভিটামিন এ বিতরণ করা হয় (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর ২০১৬*)।

৬.৩.১ কুতুপালং ও নয়াপাড়া অবস্থিত নিবন্ধিত শরণার্থী শিবির

উখিয়া উপজেলা সদর থেকে টেকনাফ রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে ৫ কিলোমিটার পর কুতুপালং নিবন্ধিত শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্প অবস্থিত। ১৯৯১-১৯৯২ সালে শরণার্থী সমস্যা শুরুর প্রথম দিকে উখিয়া উপজেলার কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী অবস্থান গ্রহণ করে। কুতুপালং নিবন্ধিত শরণার্থী ক্যাম্পের আয়তন ৭৫ একর এবং এখানে ব্লক রয়েছে ০৭টি (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর ২০১৬*)। প্রথম দিকে বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং পরে এখানে শরণার্থীদের বসবাসের জন্য (ইউএনএইচসিআর) বা আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থার পক্ষ থেকে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ব্লকে অবস্থিত শেড নির্মাণ করা হয়েছে। এই ক্যাম্পের পুরাতন ও নতুন আগত শরণার্থীদের ঘরগুলো খুব কাছাকাছি গড়ে উঠেছে। তবে, শেডের ধরণ দেখলে বোঝা যায় কোনটি নতুন শরণার্থীদের শেড। সাধারণ অর্থে যেটিকে আমরা বসবাসের ঘর বলে থাকি এর থেকে এই শেডের মধ্যে একটু ভিন্নতা রয়েছে। তা হচ্ছে একটি শেডে ৫টি, ৬টি অথবা ৮টি করে কক্ষ থাকে। এই শেডে একটি পরিবারের চার জন সদস্যের জন্য একটি করে কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হয়। ঐ একই পরিবারের ৭ সদস্য পর্যন্ত একটি কক্ষ, ৮ থেকে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য ২ টি কক্ষ এবং ১২ সদস্য বিশিষ্ট বা তার বেশি সদস্যের পরিবারের জন্য ৩টি কক্ষ বরাদ্দ দেয়ার নিয়ম রয়েছে। এ কক্ষগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক একটি

কক্ষ ১০ ফুট দৈর্ঘ্য × ১২ ফুট প্রস্থ অথবা ১৫ ফুট দৈর্ঘ্য × ১৫ ফুট প্রস্থ। এর মেঝে মাটির, তার উপরে ২ ফুট টিনের বেড়া, টিনের বেড়ার উপরে লম্বা বাঁশের বেড়া, বাঁশের বেড়ার উপরে আবার ৬ ইঞ্চি বাঁশের জানালা মত (রোহিঙ্গারা একে বাশের গ্যারেঞ্জা বলে থাকে) এবং এর উপরে মোটা পলিথিন দিয়ে চালার ন্যায় করে টানানো থাকে, যাকে আমরা সাধারণত ঘরের চাল বা চালা বলে থাকি (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর ২০১৬*)। এই শরণার্থী ক্যাম্পে বসবাসকারী সদস্য প্রায় সকলে মুসলিম হলেও ব্যতিক্রম হচ্ছে এখানে প্রথম দিকে দু'টি হিন্দু পরিবার থাকলেও বর্তমানে রেশন বইয়ের তালিকায় এখানে ৭টি পরিবার রয়েছে (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর ২০১৬*)।

এখানে শরণার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি বা সাবলম্বি করে তোলা হয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। এ নিবন্ধিত ক্যাম্পে শরণার্থীদের সীমিত আকারে প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পের রোগিদের জন্য রয়েছে ২২টি বিছানার আইপিডি বা আন্ত;বিভাগ এবং ওপিডি বা বহি:বিভাগ ব্যবস্থা রয়েছে। তবে, ওপিডি বা বহি:বিভাগে রোগিদের থাকার জন্য কোন বিছানার ব্যবস্থা নেই। অভ্যন্তরীন ক্যাম্পের কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে ডাক্তার উন্নত চিকিৎসার জন্য সুপারিশ করার পর ক্যাম্প ইন চার্জ এর স্বাক্ষরসহ ইউএনএইচসিআর এর এ্যম্বুলেন্স কক্সবাজার বা আরো উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে সেখানেও প্রেরণের ব্যবস্থা রয়েছে (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর ২০১৬*)। কক্সবাজার সদর হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে শরণার্থীদের চিকিৎসা কার্যক্রম সহায়তা করার জন্য শরণার্থী পুনর্বাসন ও প্রত্যাবাসন কমিশন কার্যালয় এর পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা স্বাস্থ্য ইউনিট এ যথাক্রমে চট্টগ্রাম মেডিকেল ১ জন ও কক্সবাজার মেডিকেল কলেজে ২ জন রেফারেল সহকারী অবস্থান করে। ইউএনএইচসিআর বা আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থার দুই জন করে প্রতিনিধি তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকেন। ইউএনএইচসিআর বা আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থার পক্ষ থেকে শরণার্থী ক্যাম্পে প্রত্যেক নিবন্ধিত শরণার্থী ব্যক্তির জন্য পণ্যমূল্য অনুযায়ী নির্ধারিত অংকের অর্থের পণ্য সরবরাহ করা হয়। ২০১৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত একজন শরণার্থী ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য ৬৯২ (ছয়শত বিরানব্বই) টাকার পণ্য পেতে পারেন। তবে, পণ্যের মূল্য ওঠানামা করলে এই বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণও ওঠানামা করে থাকে। কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পে শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী প্রত্যেক শরণার্থীর জন্য পাক্ষিক হিসাবে ৬ কেজি ৩০০ গ্রাম চাল, ৫৬০ গ্রাম ডাল, ২৮০ গ্রাম তেল, ১৪০ গ্রাম লবন এবং ৭০০ গ্রাম চিনি বরাদ্দ রয়েছে। এর বাইরে সাবান, সিআরএইচ জ্বালানী, টুথ পাউডার, কেরোসিন ও ছাতু প্রদান করা হয় (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর ২০১৬*)।

জ্বালানী হিসেবে একটি পরিবারের চার জন সদস্যের জন্য ২০ কিলোগ্রামের এক বস্তা লাকড়ি প্রদান করা হয়। ঐ একই পরিবারের ৭ সদস্য পর্যন্ত ২০ কিলোগ্রামের এক বস্তা লাকড়ি প্রদান, ৮ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার হলে ২০ কিলোগ্রামের দুই বস্তা অর্থাৎ ৪০ কিলোগ্রাম দুই বস্তা লাকড়ি প্রদান, ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্যও ৪০ কিলোগ্রাম লাকড়ি প্রদান এবং ১২ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য ৬০ কিলোগ্রাম তিন বস্তা লাকড়ি প্রদান হয় (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর* ২০১৬)। তবে ২০১৮ সাল থেকে জ্বালানী হিসেবে এলপিজি গ্যাস রিলিন্ডার প্রদান করা হচ্ছে। শরণার্থী শিবিরে যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তাতে একজন মানুষের পরিপূর্ণ পুষ্টি মেলে না। এ জন্য জুলাই ২০১৪ সাল থেকে কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার কুতুপালং নিবন্ধিত শরণার্থী শিবির ও টেকনাফ উপজেলার নয়াপাড়া নিবন্ধিত শরণার্থী শিবিরের শরণার্থীদের নিজেদের পছন্দমত খাদ্য ক্রয় ও রেশনের পরিবর্তে 'ক্যাশ ভাউচার' ব্যবস্থা চালু হয়। শরণার্থীদের ফুড কার্ড বা ই-ভাউচারের মাধ্যমে স্থানীয় বাজার মূল্যে প্রদান করা হয় (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর* ২০১৬)। সরবরাহকৃত খাদ্যের বাইরে যাতে শরণার্থীরা নিজেদের পছন্দ মত খাদ্য কিনতে পারে সে জন্য এই ক্যাশ ভাউচার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ইউএনএইচসিআর বা আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থার মতে, অপর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ, খাদ্যাভ্যাসে সুষম খাবারের অভাব, খাদ্যবিক্রির প্রক্রিয়া, মায়েদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবার অপর্যাপ্ততা, ডায়রিয়া, স্বল্প পারিবারিক আয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শিশু বিকল্প খাদ্যের অভাব হলো রোহিঙ্গা শিশুদের মধ্যে পুষ্টিহীনতার অন্যতম প্রধান কারণ। ২০১৩ সাল থেকে ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে জিএএম (গ্লোবাল অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রেশন) রেট ১৩.১ শতাংশ (২০১২ সালে গ্লোবাল অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রেশন ছিল ১২.৬ শতাংশ)। জিএএম ১০ থেকে ১৪ শতাংশকে 'গুরুতর' হিসেবে বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (*দৈনিক টেকনাফ নিউজ*, ৬ মে ২০১৪)। বিশেষ দিনগুলোতে যেমনঃ কোরবানীর পর মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত কোরবানীর ঈদের পর গোস্ত ক্যাম্প ইন চার্জ এর তত্ত্বাবধানে শরণার্থীদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। নিবন্ধিত শরণার্থী ক্যাম্পে বিয়ে-শাদি ও প্রয়োজনে তালাকের ব্যবস্থা ক্যাম্প ইন চার্জ এর কাজের আওতাধীন। এ কাজে তাকে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়। কারণ অভাবের সংসারে কিছু দিন পর পর সমস্যা লেগেই থাকে। সেগুলো মেটাতে তারা ক্যাম্প ইন চার্জ এর দ্বারস্থ হয়। এ ক্যাম্পগুলোতে বাল্য বিবাহের প্রচলন না থাকলেও বিশ বছরের পূর্বেই অধিকাংশ মেয়েই সংসার জীবন শুরু করে।

১৯৯১-১৯৯২ সালে শরণার্থী সমস্যা শুরুর প্রথম দিকে টেকনাফ উপজেলার নয়াপাড়ায় শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী অবস্থান গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থা বা (ইউএনএইচসিআর) এর পক্ষ থেকে এখানেও শরণার্থীদের বসবাসের জন্য ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ব্লকে অবস্থিত শেড নির্মাণ করা হয়েছে। এক সময় এই ক্যাম্পে শুধু নিবন্ধিত শরণার্থীদের বসবাস ছিল। এই রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের ৭টি ব্লক রয়েছে। নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্পের আয়তন

৮৬.৩৮ একর। এখানে শরণার্থী পরিবারের সংখ্যা রয়েছে ৩৭৬৩ টি এবং মোট শরণার্থী সংখ্যা রয়েছে ১৯৪৪১ জন। এখানে শরণার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি বা সাবলম্বী করে তোলা হয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। এই ক্যাম্পে রয়েছে ২৬ শয্যা বিশিষ্ট একটি মেডিকেল সেন্টার যেটি বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা করে থাকে। ক্যাম্পে প্রবেশের পর একই রাস্তা ধরে কিছুপদূর এগিয়ে গেলে দু'টি বড় জলাশয় দেখতে পাওয়া যায়। এখান থেকেই শরণার্থীদের বিশুদ্ধ করে পাম্পের মাধ্যমে সারা বছর খাবারের পানি সরবরাহ করা হয়। এখানে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের ডি ব্লক রয়েছে যেটি শালবন ক্যাম্প নামেও পরিচিত। শরণার্থীর জন্মহার ২.৬০% এবং মৃত্যুহার ০.৪%। শরণার্থী শেড সংখ্যা ৫৬২, স্কুল সংখ্যা ১২টি, মসজিদ সংখ্যা ১২ টি। একজন ম্যাজিস্ট্রেট এর নের্তৃত্বে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনীর সদস্য রয়েছে ১৪ জন, আনসার বাহিনীর সদস্য রয়েছে ৪৬ জন এবং বিজিবি'র সদস্য রয়েছে ৫০ জন (ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ, নভেম্বর ২০১৬)। এ ক্যাম্পের শেডের মধ্যে একটু ভিন্নতা রয়েছে তা হচ্ছে একটি শেডে ৬টি করে কক্ষ থাকে। এই শেডে একটি পরিবারের বসবাসের জন্য কুতুপালং শরণার্থী শিবিরের অনুরূপ নিয়ম অনুসরণ করা হয় (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর* ২০১৬)।

এখানেও শরণার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি বা সাবলম্বি করে তোলা হয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। নিবন্ধিত ক্যাম্পে শরণার্থীদের সীমিত আকারে প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এ শরণার্থী ক্যাম্পের রোগিদের জন্য রয়েছে আইপিডি বা আন্ত;বিভাগ এবং ওপিডি বা বহি:বিভাগ ব্যবস্থা রয়েছে। অভ্যন্তরীন ক্যাম্পের কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে ডাক্তার উন্নত চিকিৎসার জন্য সুপারিশ করার পর ক্যাম্প ইন চার্জ এর স্বাক্ষরসহ ইউএনএইচসিআর এর এ্যাম্বুলেন্স কক্সবাজার বা আরো উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে সেখানেও প্রেরণের ব্যবস্থা রয়েছে। কক্সবাজার সদর হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে শরণার্থীদের চিকিৎসা কার্যক্রম সহায়তা করার জন্য শরণার্থী পুনর্বাসন ও প্রত্যাবাসন কমিশন কার্যালয় এর পক্ষ থেকে যথাক্রমে চট্টগ্রাম মেডিকেল ১জন ও কক্সবাজার মেডিকেল কলেজে ২জন রেফারেল অবস্থান করে। ইউএনএইচসিআর বা আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থার দুই জন করে প্রতিনিধি প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকেন (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর ২০১৬*)। ইউএনএইচসিআর বা আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থার পক্ষ থেকে শরণার্থী ক্যাম্পে প্রত্যেক নিবন্ধিত শরণার্থী ব্যক্তির জন্য পণ্যমূল্য অনুযায়ী নির্ধারিত অংকের অর্থের পণ্য সরবরাহ করা হয়। ২০১৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত একজন শরণার্থী ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য ৬৯২ (ছয়শত বিরানব্বই) টাকার পণ্য পেতে পারেন। তবে, পণ্যের মূল্য ওঠা-নামায় এই বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণও কম-বেশি ওঠা-নামা করে থাকে। কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পের ন্যায় নয়াপাড়া শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী প্রত্যেক শরণার্থীর জন্যও পাক্ষিক হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই ধরণের সহায়তা বরাদ্দ থাকে। বিশেষ দিনগুলোতে যেমন: কোরবানীর ঈদের পর

মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত কোরবানীর গোস্ত ক্যাম্প ইন চার্জ এর তত্ত্বাবধানে শরণার্থীদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার পাশাপাশি নূরানী মাদ্রাসার ব্যবস্থা রয়েছে। বসবাসকৃত শরণার্থীদের মধ্যে হতাশা, অসুস্থতা, পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত লক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রথমে ক্যাম্প ইনচার্জ ও ইউএনএইচসিআরের সমন্বয়ে সেগুলো সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যদি সমাধান না হয় সেক্ষেত্রে থানায় মামলার আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ রয়েছে (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর ২০১৬*)।

৬.৩.২ কুতুপালং মেকশীফ্‌ট ও লেদা মেকশীফ্‌ট শিবির বা ক্যাম্প

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর যারা নিবন্ধিত হতে পারেনি অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যারা শরণার্থীর মর্যাদা পায়নি সেই সকল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এই 'নতুন ক্যাম্প' বা টালে বসবাস করে। এর একটি উখিয়া উপজেলায় অবস্থিত কুতুপালং মেকশীফ্‌ট ক্যাম্প রয়েছে। যা নিবন্ধিত 'কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পে'র পাশেই কুতুপালং গ্রামে অবস্থিত। কুতুপালং এর প্রবেশ পথ রয়েছে 'কুতুপালং নিবন্ধিত শরণার্থী ক্যাম্প' কেন্দ্রীক গড়ে ওঠা কুতুপালং বাজার পার হয়ে উখিয়া-টেকনাফ রাস্তা থেকে ডান দিকে ৩০ গজ হাঁটা পথ। প্রায় বিশ হাজার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরের পর এই ক্যাম্পে আরও প্রায় চল্লিশ হাজার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আশ্রয় গ্রহণ করে। ২০১৭ সালের শেষ দিকে কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গা এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ ক্যাম্পে নিয়মিত রোহিঙ্গাদের উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে বলে এটিকে মেগা ক্যাম্প বলা হয়। এ ক্যাম্পের দক্ষিণ দিকে কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এখানেও নিবন্ধিত শরণার্থী ক্যাম্পের মত ক্যাম্পটি পরিচালনার সুবিধার্থে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে দু'টি নির্বাচিত কমিটি রয়েছে। একটি হচ্ছে ব্লক ম্যানেজমেন্ট কমিটি সংক্ষেপে বিএমসি এবং অপরটি ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট কমিটি সংক্ষেপে সিএমসি নামে পরিচিত। এ দু'টি কমিটি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের তত্ত্বাবধানে এ গঠিত হয়। সর্বশেষ ২০১৬ সালের ৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত মিয়ানমারের সেনা বাহিনীর দমন নিপীড়ন এরপর থেকে উপরোক্ত পরিসংখ্যান প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। বিপুল সংখ্যক নতুন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আশ্রয় গ্রহণের ফলে এখানে মানুষের অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য এ কুতুপালং মেকশিফট ক্যাম্পেও নিবন্ধিত শরণার্থী ক্যাম্পের ন্যায় দু'টি ক্যাম্প পরিচালনার সুবিধার্থে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে দু'টি নির্বাচিত কমিটি রয়েছে। একটি হচ্ছে ব্লক ম্যানেজমেন্ট কমিটি সংক্ষেপে বিএমসি এবং অপরটি ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট কমিটি সংক্ষেপে সিএমসি নামে পরিচিত। এ দু'টি কমিটি এনজিও এবং স্থানী ইউনিয়ন পরিষদের তত্ত্বাবধানে এ কমিটি গঠিত হয়। শরণার্থী শেড বলতে এখানে ব্যক্তি উদ্যোগে তৈরী পলিথিনে মুড়ানো ছোট্ট একটি ঘর বুঝায়। 'কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পে' পাশে ক্যাম্প কেন্দ্রিক গড়ে ওঠা কুতুপালং বাজার পার হয়ে উখিয়া-টেকনাফ রাস্তা থেকে বাম দিকে অর্থাৎ 'কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প' এর বিপরীত দিকে 'এ্যাকশন কন্ট্রা লা ফেইম'

(এসিএফ) এবং 'ডক্টরর্স উইদাউট বর্ডারর্স' Médecins Sans Frontières বা (এমএসএফ) এর অফিস রয়েছে। এখানে তাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া 'কুতুপালং মেকশীফট ক্যাম্প' পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন অব মাইগ্রেশ (আইওএম) এবং কিছু এনজিও এখানকার পানি ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন ও নিউট্রেশন এর সমন্বয় করে থাকে। এনজিওসমূহ এখানে শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। ৪/৫ টি স্কুলে প্রায় হাজার খানেক শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে থাকে জানা গেলেও ক্যাম্পে এই এনজিওর অফিস বা কার্যক্রম আমার নজরে পড়েনি। এছাড়াও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সেবা ও ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কাজ করে। ডব্লিউএফপি বা বিশ্ব খাদ্য সংস্থার অর্থায়নে এসিএফ ৬ মাসের উপরে এবং ৫৯ মাসের নিচে শিশুদের নিউট্রেশন হিসেবে সুজি সরবরাহ করে থাকে (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর ২০১৫*)। তবে এই ক্যাম্পের আইনশৃংঙ্খলা পরিস্থিতি থানা পুলিশ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকেন উপজেলা নির্বাহি অফিসার বা ইউএনও। পাশপাশি অত্র থানার ওসি (অফিসার ইনচার্জ) ও এখানের আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের জন প্রতিনিধিও এখানের পরিস্থিতি দেখভাল করে থাকেন (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর*, প্রাগুক্ত, নভেম্বর ২০১৫)।

বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি নিয়ে কিছু দেশী বিদেশী এনজিও এই মেকশীফট ক্যাম্পে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় স্যানিটেশনের দায়িত্ব ও পানি সরবরাহ করে থাকে। নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত মেকশীফট ক্যাম্প স্পষ্টত আলাদা বুঝা গেলেও উভয় শ্রেণির মৃত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে একই স্থানে কবর দেবার ব্যবস্থা রয়েছে এ ক্যাম্পের পাশের সরকারী বনবিভাগের জমিতে (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর*, ২০১৫)। এই অনিবন্ধিত মেকশীফট ক্যাম্প কে নমুনা ধরেও গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে। শিক্ষার জন্য প্রাক প্রাথমিক ও বিদ্যালয়ের পরিবর্তে কোরআন শিক্ষার জন্য নূরানী মাদ্রাসার ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন অভাব অনটনের কারণে এখানে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অসুখ-বিসুখ, পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত পর্যন্ত হয়ে থাকে (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর ২০১৬*)। এই মেকশীফট ক্যাম্পের শরণার্থী পরিবার ও জনসংখ্যার হিসাব রাখা খুব জটিল ব্যাপার। কারণ আরাকানে কোন ধরনের সমস্যা দেখা দিলেই অথবা নাগরিকত্ব প্রশ্নে যে কোন সময় এই মেকশীফট ক্যাম্পের সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। এমনকি যে সকল রোহিঙ্গা অনুমতি ছাড়া অল্পদিন বা দীর্ঘদিন যাবৎ বিদেশে বসবাস করে তারা আর আরাকানে প্রবেশ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে ঐ সকল রোহিঙ্গা এই মেকশীফ্ট ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এখানে বসবাসকৃত শরণার্থীদের মধ্যে অসুখ-বিসুখ, পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত পর্যন্ত হলে ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট কমিটির নেতা, ব্লক ম্যানেজমেন্ট কমিটির নেতা ও স্থানীয় ইউপি মেম্বরের সমন্বয়ে সেটি মিটিয়ে থাকেন; যদি না মেটে সেক্ষেত্রে থানায় মামলার

আশ্রয় নেবার সুযোগ রয়েছে (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর* ২০১৬)। ২০১৬ সালে ৯ অক্টোবর সেনা অভিযানের পর আগত রোহিঙ্গাদের জন্য এই টালে ডব্লিউএফপি'র অর্থায়নে চারটি ধাপে প্রতি পরিবার ২৫ কেজি করে চাল বিতরণ করে। বিশেষ দিনগুলোতে যেমন: কোরবানীর ঈদের পর মধ্যপ্রাচ্য থেকে পাঠানো কোরবানীর গোস্ত ক্যাম্প ইন চার্জ এর তত্ত্বাবধানে অন্যান্য সহায়ক ব্যক্তিবর্গ ও ক্যাম্প মাঝিদের সহায়তায় শরণার্থীদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। ইসলামিক ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক এর অর্থায়নে ২০১৬ সালে সৌদি আরব থেকে ৩৫০ কার্টন কোরবানীর গোস্ত বরাদ্দ এসেছে বলে জানা যায় (*ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, কুতুপালং ও নয়াপাড়া, নভেম্বর* ২০১৬)। আরাকানে নির্যাতন শুরু হলেই এই মেকশীফ্ট ক্যাম্পে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোহিঙ্গা পরিবারের সংখ্যা বেড়ে যায়। এতে করে দক্ষিণ কক্সবাজারের উখিয়া রেঞ্জে বনভূমি জবর দখল বেড়ে যায়।

তবে, ইচ্ছা করলেই এখানে বসতি গড়া যায় না। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহায়তায় গড়ে ওঠে শরণার্থীদের এসকল অস্থায়ী ঝুপড়ি ঘরগুলো। অপরটি টেকনাফ উপজেলায় অবস্থিত লেদা মেকশীফ্ট ক্যাম্প; যা নিবন্ধিত 'নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্প থেকে এক কিলোমিটার উত্তর দিকে লেদা গ্রামে অবস্থিত। আর লেদা বাজার থেকে পশ্চিম দিকে ৫০০ গজ ইটের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে এগোলে এই ক্যাম্পের অবস্থান। কুতুপালং মেকশীফ্ট ক্যাম্প ও লেদা মেকশীফ্ট ক্যাম্প কে গবেষণার নমুনা সংগ্রহ করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে জীবন ধারণের জন্য মৌলিক প্রয়োজন মেটানো বেশ কঠিন। নিবন্ধিত ক্যাম্পের ন্যায় এখানে ইউএনএইচসিআর এর পক্ষ থেকে বড় ধরণের সহায়তা প্রদান করা হয় না। যদিও ২০১৭ সালে আওএম ও ইউএনএইচসিআর উভয়ে সহায়তা করে। ২০০০ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী টেকনাফ উপজেলা সদরে ফুটবল খেলার মাঠের পাশে নতুন রোহিঙ্গারা অবস্থান গ্রহণ করে। ২০০৩ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত তারা দমদমিয়ায় বসবাস করে। প্রশাসন ও এনজিও'র সহায়তায় ২০০৮ সালে লেদায় বনবিভাগের জমিতে এ ক্যাম্পটি গড়ে ওঠে। প্রথম দিকে ইসলামিক রিলিফ নমের একটি বিদেশী সংস্থা এই টালে মানবিক সহায়তা প্রদান করত। পরে ২০০৯ সাল থেকে মুসলিম এইড (ইউ কে) এই টালের দায়িত্ব গ্রহণ করে। 'এ্যাকশন কন্ট্রা লা ফেইম' (এসিএফ) এবং 'ডক্টরর্স উইদাউট বর্ডারর্স' Médecins Sans Frontières বা (এমএসএফ)ও কিছুদিন এখানে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরে বাংলাদেশ সরকার এখানে এনজিওসমূহের কার্যক্রম নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং মুসলিম এইডসহ বেশ কিছু বিদেশী এনজিও কার্যক্রম লেদা টালে নিষিদ্ধ করে। এরপর কিছুদিন লেদায় মানবিক সহায়তা কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এনজিও ফোরাম নামের একটি এনজিও কিছু দিন এ ক্যাম্পের দেখভাল করে। পরবর্তীতে এটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর অধীনে পরিচালিত হয় এবং সেখানে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে আইওএম (ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন অব মাইগ্রেশ) নামক আন্তর্জাতিক সংস্থাকে। ৫ একর ভূমিতে

অবস্থিত এই ক্যাম্পে মোট কক্ষ রয়েছে ১৯৭২ টি। প্রতিদিন ২ লক্ষ ২৫ হাজার লিটার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হয়। এ লেদা মেকশীফট ক্যাম্পটি লেদা গ্রামের মধ্যেই অবস্থিত। লেদা মেকশীফট ক্যাম্পে ১৫০০০ হাজার হলেও প্রায় ২০,০০০ হাজার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে (লেদা, মাঠ পর্যায়ের গবেষণাকর্ম, *নভেম্বর* ২০১৬)। 'লেদা মেকশীফট ক্যাম্প' বা (স্থানীয় ভাষায় বলে 'টাল') পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর অধীনে পরিচালিত হয়। ২০১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী এখানে পরিবারের সংখ্যা রয়েছে ৪,৭৪০টি। ৬টি ব্লকের শেড এ ৩৩২ বি ৩৬৯ সি ৩৮৫ ডি ৩৬৭ ই ২৯৯ এফ ৩৪০ মোট শেড সংখ্যা ২০৯২ টি। শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় একটিও নাই, মসজিদ সংখ্যা ৯টি এবং (মক্তব) নূরনী মাদ্রাসার সংখ্যা ১টি। এই মেকশীফট ক্যাম্পের মধ্যে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনী, আনসার বাহিনী বা বিজিবি'র কোন সদস্য নিয়োজিত নেই। আইওএম (ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন অব মাইগ্রেশ) নামক আন্তর্জাতিক সংস্থা আবার কিছু এনজিওকে এখানকার পানি ব্যবস্থাপনা ও স্যানিটেশন সমন্বয় এর প্রদান করেছে। তবে এই ক্যাম্পের আইনশৃংঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন, জ্বালানী সবরাহ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকেন উপজেলা নির্বাহি অফিসার। পাশপাশি অত্র থানার ওসি (অফিসার ইনচার্জ)ও এখানের আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তবে কিছু দেশী বিদেশী এনজিও অনিবন্ধিত শরণার্থী ক্যাম্পে জীবন ধারণের জন্য আইওএম (ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন অব মাইগ্রেশ) থেকে অনুমতি নিয়ে প্রয়োজনীয় স্যানিটেশনের দায়িত্ব ও পানি বিতরণ করে থাকে।

২০১৬ সালের শুরু থেকে আইওএম (ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন অব মাইগ্রেশ) অনিবন্ধিত ক্যাম্পের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হ্নেদা বাজারের দক্ষিণ পাশে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেছে। মাত্র ২ জন ডাক্তার দ্বারা এখানে স্বল্প পরিসরে স্বাস্থ্য চিকিৎসার সেবা পাওয়া যায়। আইওএম ছাড়াও এনজিও ফোরাম, হ্যান্ডিক্যাপ ও ডব্লিউএফপি নামক সংস্থাগুলো এখানে মৌলিক চাহিদা ও স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের জন্য ইউএনএইচসিআর এর পক্ষ থেকে কোন প্রকার সহায়তা প্রদান করা হয় না। এ সকল রোহিঙ্গারা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জীবন নির্বাহ করে থাকে। জ্বালানী জন্য স্থানীয় বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল তারা। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি নিয়ে স্যানিটেশন, পানি, গারবেজ ও বায়ো গ্যাস ব্যবস্থা আইওএম (ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন অব মাইগ্রেশ) করছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বলে মনে করে ক্যাম্পে বসবাসকারী শরণার্থীরা। অনিবন্ধিত লেদা মেকশীফট ক্যাম্পে হেপাটাইটিস 'সি' এর প্রকোপ বেশী বলে জানা যায়। লেদা ক্যাম্পের সাবেক সভাপতি ঔষধ ব্যবসায়ী দুদু মিয়া নিজেও এ রোগে আক্রান্ত বলে জানান (দুদু মিয়া, লেদা শরণার্থী শিবির, *নভেম্বর* ২০১৬)। এখানে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। টেকনাফ উপজেলায় অবস্থিত লেদা মেকশীফট ক্যাম্পটি নিবন্ধিত 'নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্পে'র পাশে অবস্থিত। লেদা মেকশীফ্‌ট ক্যাম্প'কে নমুনা সংগ্রহ করার জন্য

গবেষণার এলাকা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৯১-১৯৯২ সালের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত যে সকল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে কিন্তু নিবন্ধিত হতে পারেনি; সেই সকল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এই 'লেদা মেকশীফট ক্যাম্প' এ বসবাস করে। এখানে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের কোন ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন অভাব অনটনের কারণে এখানে পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে শারিরিক সমস্যা, পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬.৩.৩ নতুন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিবিরে অবস্থান ও ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা ২০১৭

২৫ আগষ্ট, ২০১৭ সালের পর হতে ২৬ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত আনুমানিক ৬ লক্ষ ৯২ হাজার ৬০৮ জন আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পূর্বে আগত ২ লক্ষাধিক আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গাসহ প্রায় ১১ লক্ষ বাংলাদেশে অবস্থান করছে। নিবন্ধনকৃত আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ১০৯২,৪৭০ জন। পাসপোর্ট অধিদপ্তর ও বিজিবি'র সহযোগিতায় ৫০টি রেজিস্ট্রেশন বুথ পরিচালনা করেছে। ২৫ আগষ্ট, ২০১৭ এর পূর্বেও আগত রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধনের আওতায় আনা হয়েছে। আশ্রয়প্রার্থী এতিম শিশুর সংখ্যা ৩৬,৩৭৩ জন (ছেলে-১৭,৩৯৫ ও মেয়ে-১৮,৯৭৮); ৭,৭৭১ জনের বাবা-মা কেউ নেই এবং সমাজ সেবা অধিদপ্তর জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এতিম শিশুদের তত্ত্বাবধান ও সুরক্ষার জন্য সমাজ সেবা অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ এর যৌথ উদ্যেগে একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে। এ পর্যন্ত ১৭,১০০ জন গর্ভবর্তী নারীকে সনাক্ত করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কক্সবাজার জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং কার্যক্রম চলমান আছে। সিভিল-সার্জন, কক্সবাজার ও উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের তথ্যানুসারে, প্রসুতিসেবার আওতায় জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা ৩,১২২ জন।

নতুন ক্যাম্পের জন্য বরাদ্দকৃত ভূমি ৪,০০০ একর আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকার আওতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ প্রাথমিকভাবে বরাদ্দকৃত ২,০০০ একরের স্থলে ৪,০০০ একরে পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। আশ্রয় গ্রহণকারীদের আবাসস্থলে ক্যাম্প প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকাকে ২০টি ক্যাম্পে বিভক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, উখিয়ার হাকিমপাড়া, জামতলী ও পুটিবুনিয়া এবং টেকনাফের কেরনতলী, উনছিপ্রাং, আলীখালী, লেদা, জাদিমুরা, নয়াপাড়া শালবন ও শামলাপুরকেও পৃথক পৃথক ক্যাম্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সর্বশেষ হিসাব মতে ক্যাম্পের মোট সংখ্যা ৩৩ এ গিয়ে পৌঁছে। নতুন ক্যাম্পগুলিতে প্রশাসনিক ও সেবা অবকাঠামো তৈরীসহ এর তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানে ইউএনএইচসিআর এর সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। অস্থায়ী আশ্রয় নির্মাণ- ১৯৫,০০০ ঘর প্রাথমিকভাবে ৮৪ হাজার অস্থায়ী ঘর তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ধরা হয়।

পরবর্তীতে আশ্রয়প্রার্থীদের আগমন অব্যাহত থাকায় এবং ইতোমধ্যে নতুন করে প্রবেশকৃত আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ৭ লক্ষের কাছাকাছি হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা ২ লক্ষ পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। আশ্রয়প্রার্থীদের খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ত্রাণ সহায়তা প্রদান আনুমানিক ৬,৮৪,৪২২ জন (১৫২,৩১৬ পরিবার)। বর্তমানে বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী কর্তৃক প্রতি রাউন্ডে (১৫ দিন পর পর) পরিবার প্রতি ৩০ কেজি (৫ সদস্যবিশিষ্ট পরিবার) ও ৬০ কেজি (৫ এর অধিক সদস্যবিশিষ্ট পরিবার) করে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০ রাউন্ড বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। নভেম্বর মাস হতে পর্যায় ক্রমিকভাবে ভোজ্য তেল, চিনি ও লবণও সরবরাহ করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত আশ্রয় গ্রহণকারীসহ স্থানীয় অধিবাসিদের মধ্যে অতি দরিদ্রদের জন্য খাদ্য সরবরাহে ডব্লিউএফপি'র সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৭ হতে এ পর্যন্ত ৪৩,৬৩৫ মেট্রিকটন চাল, ৮,৯৯৮ মেট্রিকটন ডাল, ২৭,৯৫,৬৭৫ লিটার তেল, ৩৪৮ মেট্রিকটন চিনি, ২১৫ মেট্রিকটন লবন ও ৪০.৩০০ মেট্রিকটন সুজি সরবরাহ করা হয়েছে (শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন কার্যালয়, কক্সবাজার, ২৭ মার্চ, ২০১৮)।

জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সেপ্টেম্বর, ২০১৭ হতে বিভিন্ন সরকারী দফতর, বেসরকারী সংস্থা, স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিবর্গ ও বন্ধুপ্রতিম দেশ হতে প্রাপ্ত খাদ্য ও খাদ্য জাতীয় অন্যান্য ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে। তবে ডব্লিউএফপি'র সহায়তার আওতা সম্প্রসারণের পাশাপাশি অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত সহায়তার পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকায় বর্তমানে এ ধরণের ত্রাণ কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ক্যাম্প এলাকায় ৬,০৭৪টি নলকূপ স্থাপন করা হলেও অগভীর নলকূপের মধ্যে ১,১৭৯টি ইতোমধ্যে অকেজো হয়ে পড়েছে। অকেজো হয়ে পড়া নলকূপ প্রতিস্থাপনসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন নলকূপ (গভীর) স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তাছাড়া, ডিপিএইচই ১৪টি মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ০৭টি ভ্রাম্যমান ওয়াটার কেরিয়ার (৩,০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন) এর মাধ্যমে কয়েকটি ক্যাম্প এলাকায় প্রতিদিন পানি সরবরাহ করছে। বর্তমানে কোনো অগভীর নলকূপ স্থাপন করতে দেয় হচ্ছে না। উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকার ১২ নং ক্যাম্পে জাইকা, আইওএম ও ডিপিএইচই'র যৌথ উদ্যেগে ৩০,০০০ মানুষের জন্য পানি সরবরাহের উপযোগি ১,৪০০ ফুট গভীরতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ নলকূপ স্থাপনের কাজ শুরু করেছে। এছাড়া ক্যাম্প এলাকায় ৫০,৪৪১টি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। এ ল্যাট্রিনের মধ্যে ৯,৭৪৩টি ইতোমধ্যে অকেজো হয়ে পড়েছে। অকেজো হয়ে পড়া ল্যাট্রিন প্রতিস্থাপনসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন ল্যাট্রিন স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় ইউনিসেফের সহায়তায় এএফডির মাধ্যমে ১০,০০০ ল্যাট্রিন নির্মিত হয়েছে। ইউনিসেফের সহায়তায় এএফডির মাধ্যমে আরো ৫,০০০ ল্যাট্রিনসহ ৫,০০০ গোসলখানা নির্মাণের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এফডি-৭ এর আওতায় ল্যাট্রিন ও গোসলখানা নির্মাণের

কার্যক্রমও চলমান আছে। ল্যাট্রিনসমূহের ব্যবহারযোগ্যতা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারে পয়:ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সারণী-৬.৫ঃ ২০১৭ সালে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য উখিয়া ও টেকনাফের উদ্যোগ

উদ্যোগ	বাস্তবায়ন	কার্য সম্পন্ন
কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় বিদ্যুৎ লাইন	প্রস্তাবিত ১৭ কি.মি. দীর্ঘ বিদ্যুৎ লাইন লাইন	৯ কি.মি. লাইন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
সড়ক বাতি স্থাপন	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	নতুন ক্যাম্প এলাকায় ৫০টি সড়ক বাতি ও ১০টি ফ্লাড লাইট স্থাপন করেছে।
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়	এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন	১,০০০টি সৌরবাতি স্থাপন করা হয়েছে।
ক্যাম্প এলাকায় সংযোগ সড়ক নির্মাণ ১৩.৫ কি.মি.	------	১১.৭৯ কি.মি. দৈর্ঘ্যের ১৪টি রাস্তার কাজের ৯০% সম্পন্ন হয়েছে
১০ কি.মি. মূল সংযোগ সড়ক নির্মাণ	ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে	৭.৭ কি.মি. রাস্তার মাটির কাজ ও ৫৬৫ মিটার রাস্তার এইচবিবি কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
সংযোগ সড়কের ২.৫ কি.মি. মাটির কাজ চলমান আছে	আইওএম কর্তৃক ৫টি রাস্তা	৩টি রিং কালভার্ট নির্মিত হয়েছে এক্সেস রোড ৬.৪ কি.মি.এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ কাজ চলছে

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা
ক্যাম্প এলাকা সংলগ্ন ২৯,৭৫০ জনকে চিকিৎসা প্রদান। মোট ৭টি ফিল্ড হাসপাতাল ও সেবা এমআর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ৬৯,৫৩৯ জনকে ওপিভি দেয়া হয়েছে। ১২৭,৮১৬ জনকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল দেয়া হয়েছে ও ১৮,২৩,৭৪০ জন রোগীকে বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রথম দফায় ৭০০,৪৮৭ জন এবং ২য় দফায় ২৮২,৬৫৮ জনকে কলেরা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ১৬৯,১২৭ জনকে ডিপথেরিয়া ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ১৬২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ১০টি হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্র ২৪ ঘণ্টা সেবা প্রদান করছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ১২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে। এমএসএফ ও আরএইচইউ পরিচালিত বিদ্যমান স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের সক্ষমতা (৩৫ শয্যার কলেরা হাসপাতালসহ) বৃদ্ধি করা হয়েছে। সবক'টি ক্যাম্পে সরকারী-বেসরকারী মিলে মোট ১২৪টি সংস্থা বর্তমানে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে নিয়োজিত আছে। এর আওতায় ১,০০০ জনের ক্যাটার‍্যাক্ট আই সার্জারী সম্পাদন ও ৫,০০০ জনকে চশমা প্রদান করা হবে।

তাছাড়া, পেডিয়াট্রিক অপথালমোলজি কর্মসূচীর অধীনে এ বছরে ৫০,০০০ শিশুকে স্ক্রিনিং করাসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা হবে। অস্থায়ী গুদাম নির্মাণ ১৯টি বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী কর্তৃক ১৯টি অস্থায়ী গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। আরো গুদাম নির্মাণের কাজ চলমান আছে। বান্দরবান জেলায় অবস্থান নেয়া আশ্রয়প্রার্থীদের নতুন ক্যাম্প স্থলে স্থানান্তর ১৬,১৯৮ জন বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের পশ্চিমকুল ও সদর ইউনিয়নের চাকডালায় আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদেরকে কুতুপালং মেগা ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়েছে। নির্ধারিত এলাকার বাইরে ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ কক্সবাজার থেকে উদ্ধারকৃত ৫২,৩৪৬ জন ও অন্যান্য জেলা থেকে উদ্ধারকৃত ২৮৩৯ জনকে ক্যাম্পে স্থানান্তর আশ্রয়প্রার্থী রোহিংগাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে রামু, টেকনাফ, উখিয়া ও সদর উপজেলার ১১টি স্থানে পুলিশ চেকপোষ্টের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি সম্ভাব্য ভূমিধ্বস ও পাহাড়ী ঢলের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাসরতদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর। (ক) ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে সম্ভাব্য ভূমিধস ও পাহাড়ী ঢলে আক্রান্ত হতে পারে এমন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব এলাকায় বাসবাসরত প্রায় ১ লক্ষ লোককে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকার বর্তমান সীমানার পশ্চিমে ক্যাম্প সম্প্রসারণের কাজ শুরু করা হয়েছে। (খ) Cyclone Preparedness Programme (CPP)-কে আইওএম ও ইউএনএইচসিআরসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (গ) সম্ভাব্য ঘুর্ণিঝড় হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নির্মিত অস্থায়ী শেল্টারসমূহকে মজবুত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে এ কাজ শেষ হবে। (ঘ) ৫, ৭, ৮ ও ১০ নং ক্যাম্প হতে ২,৫৬৫ পরিবারের মোট ১০,৬৪০ জনকে ১৭, ১৮ ও ২০ নং ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়েছে। আরো ১,৩৫৯ পরিবারের ৬,১১৬ জনকে স্থানান্তরের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে। বন্য হাতির আক্রমণ হতে সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা বন্য হাতির একাধিক আক্রমণে ১২ জন রোহিঙ্গার প্রাণহানি হাতির বিচরণ ও চলাচলের পথ সংকুচিত হয়ে পড়ায় উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত বন্য হাতির আক্রমণের ৫টি ঘটনা ঘটেছে। ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে হাতির গ্রহণ চলাচলের পথ নির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইউএনএইচসিআর এর আর্থিক সহায়তায় আইইউসিএন (International Union for Conservation of Nature) কাজ শুরু করেছে। পরিবেশ ও বন রক্ষা বিকল্প জ্বালানীর অভাবে ইতোমধ্যে ৫০০ একরেরও বেশী বনভূমি উজাড় আশ্রয় গ্রহণকারীদের খাদ্যদ্রব্য রান্নার জন্য বিকল্প জ্বালানীর ব্যবস্থা না থাকায় শুরু থেকেই ক্যাম্প সংলগ্ন বনভূমির ওপর চাপ পড়ে। বন থেকে সংগৃহীত জ্বালানী কাঠের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং নিকটস্থ বনভূমির উপর চাপ কমাতে জ্বালানী সাশ্রয়ী চুলাসহ প্রথম দিকে তুষ বা চারকোল (Compressed Rice Husk) সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে প্রায় ১,০০,০০০

পরিবারকে এর আওতায় আনা সম্ভব হলেও যোগান স্বল্পতার কারণে এর অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। এ প্রেক্ষাপটে বিকল্প হিসেবে সীমিত আকারে বায়োগ্যাস ও ব্যাপকভিত্তিক তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) সরবরাহের প্রাথমিক পর্যায়ে পাইলট হিসেবে ১,০০০ স্থানীয় পরিবারসহ মোট ১১,০০০ রোহিঙ্গা পরিবারকে এলপিজি কার্যক্রমের আওতায় আনার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এর আওতা প্রয়োজন অনুযায়ী সম্প্রসারণ করা হবে। একই সাথে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে তুষ বা চারকোল সরবরাহও অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি সীমিত আকারে বায়োগ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

গোরস্থানে মৃতদের দাফনের ব্যবস্থা ও অগ্নি দূর্ঘটনা, হাতির আক্রমণসহ স্বাভাবিক বয়সজনিত কারণে এ পর্যন্ত কয়েকশত লোক মৃত্যুবরণ করেছে। শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাদান কার্যক্রম আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের তথ্যানুসারে ৪ লক্ষাধিক ছেলে-মেয়ের শিক্ষা সহায়তা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ১,১০২টি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও ১,৮০৫ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। ১৪ বছরের কম বয়সী ১,১৩,৭৬১ জন বালক-বালিকাকে এসব শিক্ষা কেন্দ্রে মিয়ানমার ও ইংরেজী ভাষায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ৪১৭টি শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য পরিচালনা কমিটি গঠন ও কার্যকর করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭৮,২৮৫ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাসহায়ক কিট সরবরাহ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও শিক্ষাসহায়ক কিট সরবরাহ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পুষ্টিমান উন্নয়ন অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি রোধ কার্যক্রম আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের তথ্যানুসারে ৪৭০,০০০ রোহিঙ্গা অপুষ্টিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। আশ্রয় গ্রহণকারীদের অধিকাংশই সাধারণ অপুষ্টির শিকার। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু ও গর্ভবতী মহিলা আছে। এ পর্যন্ত অনুর্ধ ৫ বছরের ২৫,৮৩৬ জন শিশু এবং ১,৭০১ জন গর্ভবতী নারীকে পুষ্টি চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। সম্পূরক পুষ্টি কর্মসূচীর আওতায় নেয়া হয়েছে অনুর্ধ ৫ বছরের ৭৬,৮১৫ জন শিশু ও ২৩,৪৯১ জন গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মহিলাকে। ভবিষ্যত পরিকল্পনা চলমান মানবিক সহায়তা কর্মসূচীর ধারাবাহিকতা রক্ষা সেপ্টেম্বর, ২০১৭ হতে চলমান ৬ মাস মেয়াদী জরুরী সহায়তা কর্মসূচীর মেয়াদ চলতি ফেব্রুয়ারী মাসে শেষ হবে। প্রত্যাবাসন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার কোন বিকল্প নেই। সে আলোকে চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রস্তুতি হিসেবে এ কার্যক্রমে জড়িত জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের উদ্যোগে মার্চ-ডিসেম্বর, ২০১৮ মেয়াদের জন্য একটি অংশগ্রহণমূলক যৌথ সাড়াদান কর্মসূচী (Joint Response Programme-JRP) প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় সার্বিক ৯৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থ সহায়তার আবশ্যকতা নিরূপন করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা, ওয়াশ, আশ্রয় ও খাদ্যবহির্ভূত দ্রব্যাদি, ক্যাম্প-সাইট ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, পুষ্টি ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট জরুরী কার্যক্রম এ কর্মসূচীর মূল প্রতিপাদ্য। কর্মসূচীর আওতাধীন অন্যূন ২৫% স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন খাতভিত্তিক উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচীটি প্রণয়ন ও

চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়ায় শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়সহ অন্যান্যদেরও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে (শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন কার্যালয়, কক্সবাজার, ২৭ মার্চ, ২০১৮)।

৬.৩.৩.১ নিবন্ধিত কুতুপালং ও নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্পের প্রশাসনিক ব্যবস্থা

১৯৯২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নিবন্ধিত 'কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প' এ পর্যন্ত মোট দায়িত্বপ্রাপ্ত ও ভারপ্রাপ্ত হিসেবে অর্ধ-শতাধিক ম্যাজিস্ট্রেট (ক্যাম্প ইন চার্জ) দায়িত্ব পালন করেছেন (ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ, নভেম্বর ২০১৬)। এ শরণার্থী ক্যাম্পে অন্য যে কেউ ক্যাম্পের ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে নিরাপত্তা চৌকিতে পরিচয় দিয়ে অনুমতি সাপেক্ষে ক্যাম্পে প্রবেশ করতে হয়। এই নিরাপত্তা চৌকি পার হলে বাম পাশে রয়েছে ক্যাম্প ইন চার্জ এর বাসভবন। এই বাসভবনের পাশেই রয়েছে ক্যাম্প ইন চার্জ এর কার্যালয় বা অফিস। এখানে তিনি অফিসিয়াল কাজকর্ম, শরণার্থীদের সমস্যা, অভাব-অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শোনেন বা লিখিত আবেদন থাকলে তার অধীনস্থদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। ক্যাম্পের কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে ডাক্তার উন্নত চিকিৎসার জন্য সুপারিশ করার পর ক্যাম্প ইন চার্জ স্বাক্ষর প্রদান করেন। শরণার্থীদের ক্যাম্পের বাইরে অন্য কোথাও গমনের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য কারণ সাপেক্ষে ক্যাম্প ইন চার্জ অনুমতি প্রদান করেন। ক্যাম্পে শরণার্থীদের মধ্যে বিয়ে-শাদী ও বৈধ উপায়ে তালাকের ব্যবস্থা করার যাবতীয় দায়িত্ব ক্যাম্প ইন চার্জ এর তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে। ক্যাম্প ইন চার্জ এর কার্যালয়ের পর পুলিশ এবং আনসার ক্যাম্প রয়েছে। এখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব মূলত ক্যাম্প ইন চার্জ এর তত্ত্বাবধানে এই পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যগণ করে থাকেন। এর পর বিভিন্ন দেশী বিদেশী এনজিও বা সংস্থার অফিস, ট্রেনিং সেন্টার, স্কুল এবং মিয়ানমার ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে শরণার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় (ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, নভেম্বর ২০১৭)।

নয়াপাড়া ক্যাম্পে প্রবেশের শুরুতে রয়েছে একটি নিরাপত্তা চৌকি। শরণার্থী ছাড়া অন্য যে কেউই ক্যাম্পে প্রবেশ করতে চাইলে এই চৌকিতে পরিচয় দিয়ে ক্যাম্পে প্রবেশ করতে হয়। এই নিরাপত্তা চৌকি পার হলে পুলিশ ক্যাম্প অবস্থিত। এই ক্যাম্পেও একজন ম্যাজিস্ট্রেট (ক্যাম্প ইন চার্জ) এর তত্ত্বাবধানে আইনশৃংঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন, পানি ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো নির্মাণ, নিরাপত্তা ও পনর্বাসনের সার্বিক সমন্বয় করা হয়। কুতুপালং ক্যাম্পের ন্যায় একইভাবে নয়াপাড়া ক্যাম্প ইন চার্জ সংক্ষেপে (সিআইসি) এবং ইউএনএইচসিআরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়। ১৯৯২ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নিবন্ধিত 'নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্প' এ পর্যন্ত অর্ধ শতাধিক ম্যাজিস্ট্রেট (ক্যাম্প ইন চার্জ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন (ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, নভেম্বর ২০১৬)। বাসভবনের পাশেই রয়েছে ক্যাম্প ইন চার্জ এর কার্যালয় বা অফিস। এখানে ক্যাম্প ইন চার্জ অফিসিয়াল কাজকর্ম, শরণার্থীদের সমস্যা, অভাব-অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শোনেন বা লিখিত

আবেদন থাকলে তার অধীনস্থদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। ক্যাম্পের কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে ইউএনএইচসিআর এর ডাক্তার উন্নত চিকিৎসার জন্য সুপারিশ করার পর ক্যাম্প ইন চার্জ স্বাক্ষর প্রদান করেন। শরণার্থীদের ক্যাম্পের বাইরে অন্য কোথাও গমনের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য কারণ সাপেক্ষে ক্যাম্প ইন চার্জ অনুমতি প্রদান করেন। ক্যাম্পে শরণার্থীদের মধ্যে বিয়ে-শাদী ও বৈধ উপায়ে তালাকের ব্যবস্থা করার যাবতীয় দায়িত্ব ক্যাম্প ইন চার্জ এর তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে। ক্যাম্প ইন চার্জ এর কার্যালয়ের পর পুলিশ এবং আনসার ক্যাম্প রয়েছে। এখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব মূলত ক্যাম্প ইন চার্জ এর তত্ত্বাবধানে এই পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যগণ করে থাকেন। এর পর বিভিন্ন দেশী বিদেশী এনজিও বা সংস্থার অফিস, ট্রেনিং সেন্টার স্কুল এবং মিয়ানমার ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে যেখানে শরণার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় (ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, নভেম্বর ২০১৬)। এই ক্যাম্পে পানি ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ এখানে পানির স্তর অনেক নিচে হওয়ায় ক্যাম্পের ভেতর অবস্থিত দু'টি বড় পুকুর এর পানি কৃত্রিম রিজার্ভার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ক্যাম্প ইন চার্জ এর অধীনে একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এই পানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছেন। এই কৃত্রিম রিজার্ভারের আয়তন ৪.১৮ একর এবং এর ধারণ ক্ষমতা ৭ কোটি লিটার পানি। প্রতিদিন ৫ লক্ষ লিটার পানি বিশুদ্ধ করে প্রথমে ৮ টি সরবরাহ ট্যাংকে রাখা হয়, ট্রিটমেন্টের পর এই পানি ৬৯টি পয়েন্টে ৪০৭টি ট্যাপের মাধ্যমে দিন দুইবার সরবরাহ করা হয়। জনপ্রতি দিনে ২০ লিটার পানি প্রদান করা হলেও গরমের সময় এই পরিমাণ পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয় না বলে তখন মাঝেমধ্যে শরণার্থীদের পানির অভাব দেখা দেয় (ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, নভেম্বর ২০১৮)।

কুতুপালং ক্যাম্পে প্রবেশের শুরুতে রয়েছে একটি নিরাপত্তা চৌকি। 'কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প' দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর অধীনে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট (ক্যাম্প ইন চার্জ) এর তত্ত্বাবধানে আইনশৃংঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন, পানি ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো নির্মাণ, নিরাপত্তা ও পনর্বাসনের সার্বিক সমন্বয় করেন। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি নিয়ে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা বা ইউএনএইচসিআর ছাড়াও দেশী বিদেশী বিভিন্ন এনজিও নিবন্ধিত শরণার্থী ক্যাম্পে প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী, জ্বালানী ও জীবন ধারণের জন্য খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে থাকে। ক্যাম্পটি পরিচালনার সুবিধার্থে শরণার্থীদের মধ্যে দু'টি নির্বাচিত কমিটি রয়েছে। একটি হচ্ছে ব্লক নেতা সংক্ষেপে বিএল এবং অপরটি ক্যাম্প নেতা সংক্ষেপে সিএল নামে পরিচিত। ইতিপূর্বে ব্লক নেতা এবং ক্যাম্প নেতা মনোনীত হলেও ২০১৬ সাল থেকে প্রতিটি ব্লক থেকে ৫ জন পুরুষ × ৭টি ব্লক= ৩৫ জন এবং ২ জন নরী × ৭টি ব্লক= ১৪ জন নারীসহ মোট ৪৯ জন সদস্যকে নির্বাচিত করা হয়। তবে এই ৪৯ জন সদস্যের মধ্যে দুই জন পুরুষকে আলাদাভাবে ক্যাম্প নেতা সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে এবং ১জন নারী সদ্যকে সেক্রেটারীর পদে দায়িত্ব প্রালন করে। এ দু'টি কমিটি ক্যাম্প ইন চার্জ সংক্ষেপে (সিআইসি)

এবং ইউএনএইচসিআরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত হয়। শরণার্থী শেড সংখ্যা ৪৫৩ টি, প্রাথমিক স্কুল সংখ্যা ১২টি, ২০১৫ সাল থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার অনুমতি মিলেছে। কুতুপালং ও নয়াপাড়া নিবন্ধিত শরণার্থী ক্যাম্পে ২০১৬ সাল থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। তবে শরণার্থী ক্যাম্পে এসকল শিক্ষাকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম বলা হয়ে থাকে। কুতুপালং ক্যাম্পে মসজিদ সংখ্যা ১৪টির মধ্যে একটি মসজিদে দাওয়াতে তাবলীগের দ্বারা ইসলাম প্রচারের কার্যক্রম পরিচালিত হয় বলে এটিকে মারকাজ মসজিদ বলা হয়। একজন ম্যাজিস্ট্রেট এর নের্তৃত্বে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনীর সদস্য রয়েছে ১৪ জন, আনসার বাহিনীর সদস্য রয়েছে ৪৬ জন (ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, নভেম্বর ২০১৭)।

৬.৩.৩.২ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কার্যক্রম

শরণার্থীদের জন্য শিবিরে অন্যান্য সংস্থার পাশাপশি দৃশ্যমান ও উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থা বা ইউএনএইচসিআর ও বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বা ডব্লিউএফপি। এই সংস্থাদ্বয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো-দীর্ঘস্থায়ী শরণার্থী পরিস্থিতিতে ইউএনএইচসিআর এবং ডাব্লিউএফপি-এর কর্মপন্থার আওতায় বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ১.৫ মিলিয়ন শরণার্থী রয়েছেন, যার মধ্যে মাত্র ২০% এর মতো ব্যক্তি ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে সুরক্ষিত রয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ৮০% সাব-সাহারান আফ্রিকাতে এবং আরও ১৩% উত্তর আফ্রিকা, এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্যে অবস্থান করছেন। দীর্ঘস্থায়ী শরণার্থী পরিস্থিতি আশ্রিতের জন্য বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। সরকার, আশ্রিত সম্প্রদায়, উদ্বাস্তু, দাতা রাষ্ট্র এবং মানবিক সংস্থা ১৯৫০ (General Assembly resolution 428 (V) of December 1950) সালে এর প্রতিষ্ঠা সংবিধি এবং ১৯৫১ সালের জেনেভা কনভেনশন-এর অধীনে ম্যান্ডেট অনুসারে শরণার্থী এবং ১৯৬৭ প্রোটোকলের স্থিতিতে, ইউএনএইচসিআরের ভূমিকা আন্তর্জাতিক সরবরাহ করা শরণার্থীদের সুরক্ষা এবং শরণার্থী সমস্যার টেকসই সমাধান অনুসন্ধান করা হয়। এটি বাধ্যতামূলক উদ্বাস্তুদের সুরক্ষা এবং শরণার্থী সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের নেতৃত্ব এবং বিশ্বব্যাপী সমন্বয় করে। শরণার্থীদের চাহিদা পূরণ করা ১৯৬৩ সালে ডাব্লিউএফপি এর অন্যতম অন্যতম লক্ষ্য ছিল এবং মূল ক্রিয়াকলাপ, ত্রাণ এবং বিকাশ উভয়ই পরিবেশন করতে সম্ভাব্য এই সহায়তাটি ব্যবহার করে (WFP General Regulations: 2009)। দীর্ঘমেয়াদী শরণার্থী কর্যক্রম তদারকির দায়িত্বে বিস্তৃত পরিসীমা ইউএনএইচসিআর-এর দীর্ঘায়িত শরণার্থী পরিস্থিতিসহ (Slaughter & Crisp, 2009) এটি মোকাবেলা করার চ্যালেঞ্জ গ্রহন, সাম্প্রতিক বিভিন্ন উদ্যোগের ফলস্বরূপ প্রকল্প, শরণার্থী জীবন-যাপন নেটওয়ার্ক, তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশ-বিশেষ প্রকল্পসমূহ এবং সুরক্ষার সক্ষমতা জোরদার করেছে। ২০০৯ সালে ইউএনএইচসিআরের কার্যনির্বাহি কমিটির নেতৃত্বের বর্ধনশীল সচেতনতা নতুন করে মনোযোগ দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে (Milner &

Loescher, 2011)। ইউএনএইচসিআর এবং ডাব্লিউএফপি প্রথম স্মারকলিপি দেওয়ার আগেও শরণার্থীদের সেবায় একসাথে কাজ করতে ১৯৮৫ সালে তাদের মধ্যে সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সমঝোতা স্মারক (১৯৮৫, ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৭ এবং ২০০২) কার্যকারী সম্পর্ক এবং ভূমিকার বিভাজনে বিবর্তন ঘটিয়েছে খাদ্য সহায়তার বিষয়ে। ২০০৪ সাল থেকে ধারাবাহিক কৌশলগত পরিকল্পনার আওতায় ডাব্লিউএফপি'র দীর্ঘায়িত খাদ্য সহায়তায় কাজ শরণার্থী উপস্থিতিতে কৌশলগত উদ্দেশ্যে অবদান রাখা কেন্দ্রীয় দায়িত্ব হিসাবে বিবেচিত হয়। ২০১৭ সালে নতুন করে রোহিঙ্গাদের ব্যাপক আগমন ঘটলে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা বা আইএমও এখানের সকল ক্যাম্পে তাদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে আসছে। ক) শরণার্থী ক্যাম্পে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে রয়েছে ইউএনএইচসিআর বা আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থা। বাংলাদেশ ও ইউএনএইচসিআর এর সাথে চুক্তির মাধ্যমে ১৯৯২ সাল থেকে এটি সরকার ও বিভিন্ন এনজিওকে অর্থায়ন, শরণার্থীদের সুরক্ষা, স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন, নন-ফুড আইটেম সরবরাহ, পর্যবেক্ষণ এবং পূনর্বাসন এর ব্যবস্থা করে থাকে। খ) ডব্লিউএফপি বা বিশ্ব খাদ্য সংস্থা: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস) এর মাধ্যমে ১৯৯২ সাল থেকে শরণার্থীদের জন্য খাদ্য সরবরাহ, স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য খাদ্য সরবরাহ, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বিস্কুট সরবরাহ ও খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। গ) ডব্লিউএইচও বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা: এ সংস্থাটি শরণার্থী ক্যাম্পে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি ও ঘ) ইউএনএফপিএ বা আন্তর্জাতিক প্রসূতি স্বাস্থ্য সংস্থা: এ সংস্থাটি শরণার্থী ক্যাম্পের প্রসূতি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায় প্রদানকরে থাকে বিভিন্ন এনজিও ক্যাম্প ইন চার্জ (সিআইসি) এর তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। (ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, নভেম্বর ২০১৭)।

৬.৩.৩.৩ ক্যাম্পে বিভিন্ন এনজিও কার্যক্রম

ক) বিডিআরসিএস বা বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি: ১৯৯২ সাল থেকে শরণার্থীদের জন্য আরআরআরসি কার্যালয়ের অনুমোদিত সংখ্যা ও বরাদ্দ মোতাবেক খাদ্য সামগ্রী এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত নন-ফুড আইটেম বিতরণ কার্যক্রম করে থাকে। খ) এসিএফ বা এ্যাকশন কন্ট্রা লা ফেইম: এর অর্থাৎ ক্ষুধার বিরুদ্ধে অভিযান যা ২০০৯ সাল থেকে শরণার্থী ক্যাম্পের পুষ্টি কার্যক্রম, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা, হাইজিন প্রোমশনও স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিচালনা করে। গ) টিএআই বা টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ইনকর্পোরেটেড: ২০০৬ সাল থেকে এই সংস্থাটি আত্মনির্ভরশীল কার্যক্রম, দক্ষতা বৃদ্ধি, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সামাজিক সচেতনতা, বয়স্ক শিক্ষা ও স্কাউটিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ঘ) আরটিএমআই বা রিসার্স ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল: এই সংস্থাটি প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রসবকালীন নারীদের সহায়তা, পরিবার পরিকল্পনা প্রসব পূর্ব ও প্রসব উত্তর সেবা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে ও পরামর্শ প্রদান করে। ঙ) ভার্ক বা ভিলেজ এডুকেশন রিসার্চ সেন্টার: এটি আন্তর্জাতিক সংস্থা সেভ দ্যা চিল্ড্রেন এর অর্থ সহায়তায় ও পরামর্শে পরিচালিত হয়। ২০১২ সাল থেকে এই ভার্ক শরণার্থী ক্যাম্পে

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে কারিগরী সহায়তা প্রদান এবং মিয়ানমার ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে। তবে ২০১৬ সাল পর্যন্ত এই এনজিও শিক্ষা বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পেরেছে। চ) এইচআই বা হ্যাণ্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল: এই সংস্থাটি ২০১৩ সাল থেকে প্রতিবন্ধিদের জন্য বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ ও সেবা কর্যক্রম পরিচালনা করে থাকে (ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি, নভেম্বর ২০১৭)। তবে, ২০১৭ সালের জানুয়ারী মাস থেকে কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট সেন্টার সংক্ষেপে (CODAC) নামের এনজিও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা শুরুর অনুমতি প্রদান করেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। এছাড়াও এক নজরে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থাসমূহ সেখানে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৬.৩.৩.৪ পরিচিতি (আইডি) নথি ও পারিবারিক বই বা ফ্যামিলি বুক

রোহিঙ্গাদের জন্য ব্যবহৃত ১৯৯১-১৯৯২ সালে শরণার্থী প্রবাহ আসার পর থেকে প্রথম নথি হিসেবে পারিবারিক নথির এই নিবন্ধীকরণ ফর্মটি চালু করা হয়েছিল। এতে তিনটি কপি রয়েছে: এক. শরণার্থীদের, দুই. ইউএনএইচসিআর-এর এবং তিন. জিওবি বা বাংলাদেশ সরকারের জন্য। মাস্টার রেজিস্ট্রেশন কার্ড (এমআরসি) নম্বর ও নিবন্ধীকরণ ফর্মটি 'গোলাপী ফর্ম' হিসেবে পরিচিত। পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত এবং তাদের নিজ নিজ মৌলিক তথ্য ছাড়াও গোলাপি ফর্ম পরিবারের বই দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ইউএনএইচসিআর ব্যাখ্যা করেছিল যে এফবি (ফ্যামিলি বুক) বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের নিবন্ধীকরণ ফর্ম হিসেবে চালু করা হয়। জিওবি কর্তৃক এই তালিকায় জালিয়াতির অভিযোগে ক্যাম্প ইন চার্জ (সিআইসি) কর্তৃক স্বাক্ষর জারি করা হয়। ১৯৯২ সালে এফবি ইস্যুটি শেষ হয়, তবে তারা শিবিরে এখনও ব্যবহার করছে এবং এটি এখন নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ক্যাম্পে খাদ্য রেশন গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ইউএনএইচসিআর জানায় এফবি একটি সরকারি দলিল এবং কেবল সরকারি কর্মকর্তা বা সিআইসি এফবিতে পরিবর্তন করতে পারেন। এফবি'র কভার পৃষ্ঠার উপরে ক্যাম্পের নাম এবং মাস্টার রেজিস্ট্রেশন কার্ডে (এমআরসি) নাম উল্লেখ থাকে। রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত নিয়মগুলো বাঙলা ভাষার তালিকাভুক্ত। ১৯৯১ সালে মিয়ানমার সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত রোহিঙ্গাদের পরিচিতি কার্ড নিম্নে সংযুক্ত করা হয়[৪]-

৪. http://www.ndphr.net/2012/09/ethnic-cleansing-nightmare-buddhist.html (Accessed on 12.12.2016)

চিত্র-৬.৩ঃ পারিবারিক নথির নিবন্ধীকরণ ফর্ম

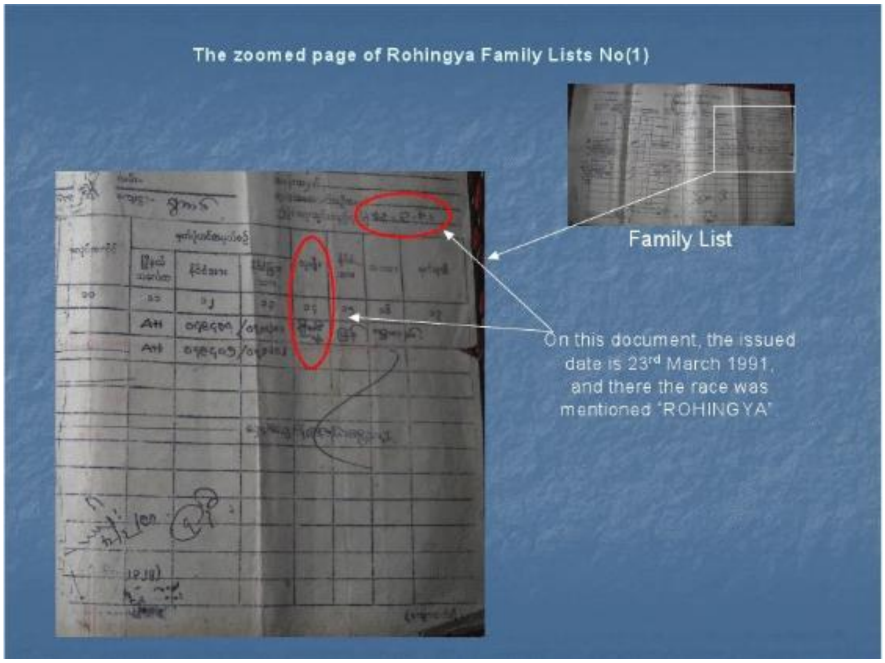

http://www.ndphr.net/2012/09/ethnic-cleansing-nightmare-buddhist.html

এফবিতে আরও রয়েছে পরিবারের তথ্য, সিরিয়াল নম্বর, নাম, বয়স, লিঙ্গ এবং (HoF) হেড অব ফ্যামিলি বা পরিবারের প্রধান এর সাথে সম্পর্ক। সিআইসি'র নিকট নিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের পরিবারকে দেওয়া প্রতিটি বই সমস্ত খাদ্য রেশনগুলোর একটি রেকর্ড আছে। বিতরণের তারিখগুলোর (দ্বি-সাপ্তাহিক) পাশাপাশি একটি স্বাস্থ্য তথ্য পৃষ্ঠা রয়েছে; যেখানে পৃথক চিকিৎসা তালিকাভুক্ত আছে। নতুন জন্ম নেয়া শিশুর পরিবরের সদস্যদের এফবিতে নাম যোগ করা হয়। পিতামাতার শুধুমাত্র একজন যদি একটি নিবন্ধিত শরণার্থী হয় ঐ এফবিতে শিশুর নাম নিবন্ধিত হবে না এবং খাদ্য রেশনও অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। প্রত্যাবাসনকৃত রোহিঙ্গারা যারা বার্মায় প্রত্যাবর্তন করেছিল তারা তাদের সঙ্গে নিজেদের এফবি আনতে পারেনি। সে সমস্ত রোহিঙ্গাদের এফবি প্রত্যাবাসন ও শরণার্থী সনাক্ত করতে ক্যাম্প প্রশাসন সক্ষম হতে পারেন। উপরন্তু, তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের নাম বাছাই করেছে ক্যাম্প ইনচার্জের উপর নির্ভর করে; এতে যোগ করা বা অপসারণ করা হয়েছে অথবা সেটি বিক্রিও হতে পারে। অতীতে অ-নিবন্ধিত তৃতীয় কোনো দেশে আশ্রয়ের দাবির জন্য এটি ব্যবহার করতেন। সিআইসি একইভাবে ব্যাখ্যা করে যে পারিবারিক বই শরণার্থীদের সম্পত্তি। যখন একটি নিবন্ধিত রোহিঙ্গার পরিবার ফেরত এসেছে, কর্তৃপক্ষ বইয়ের কোণে উল্লেখ করে থাকে ডকুমেন্টটি আর বৈধ নয়; যা ১৯৯৫-৯৮ সাল পর্যন্ত অনুশীলন ছিল। একটি ব্যক্তিগত আইডি কার্ড ছিল ২০০৮ সালে চালু করা হয়, যা সঠিক লোকদের চিহ্নিত করা আরও সহজ করে তোলে; তবে খাদ্য রেশন, শুধুমাত্র ঋণ বিতরণের জন্য চালু রয়েছে। খাদ্য রেশন বিতরণে একটি নতুন সিস্টেম প্রস্তাব করা হয় এবং পরে তা বিবেচনাও করা

হয়েছে। মিয়ানমার সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত কার্ডে রোহিঙ্গাদের বর্ণ ও মুসলিম পরিচিতি সংযুক্ত করা হয়েছিল[৫]-

চিত্র-৬.৪ঃ রোহিঙ্গাদের বর্ণ ও মুসলিম পরিচিতি কার্ড

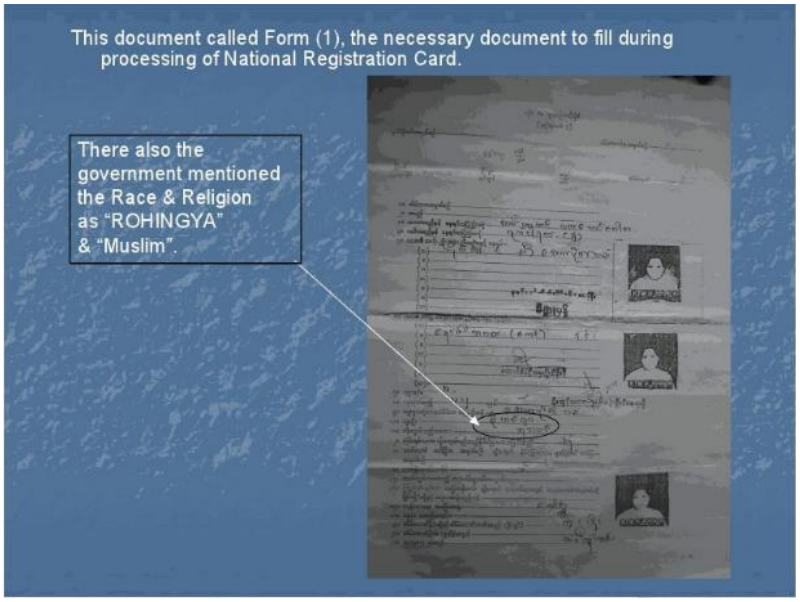

http://www.ndphr.net/2012/09/ethnic-cleansing-nightmare-buddhist.html

সিআইসি’র অফিসও জানায় যে পরিবারের বইয়ের পরিবর্তন শুধুমাত্র সিআইসিই করতে পারেন। একজন নবজাতক শিশুর জন্মের ওপর ভিত্তি করে এটি যোগ করা হয়। শিশুর জন্ম প্রশংসাপত্র মেডিকেল কর্মীদের দ্বারা জারি করা হয়। সিআইসি অফিস আরও জানায়, ক্যাম্পে নিবন্ধিত ব্যক্তিদের তালিকায় এখন রাখা হয়েছে কম্পিউটারাইজড সিস্টেমে। একজন রোহিঙ্গা যারা সিআইসি’র অফিসও জানায় যে পরিবারের বইয়ের পরিবর্তন শুধুমাত্র সিআইসিই করতে পারেন। একজন নবজাতক শিশুর জন্মের ওপর ভিত্তি করে এটি যোগ করা হয়। শিশুর জন্ম প্রশংসাপত্র মেডিকেল কর্মীদের দ্বারা জারি করা হয়। সিআইসি অফিস আরও জানায়, ক্যাম্পে নিবন্ধিত ব্যক্তিদের তালিকায় এখন রাখা হয়েছে কম্পিউটারাইজড সিস্টেমে। একজন রোহিঙ্গা যারা পরবর্তীতে শিবিরে ফিরে আসে পরিবারের বইয়ে তাদের পুনর্বহাল করা হয় না। সিআইসি’র অফিস ব্যাখ্যা করেছে যে ইউএনএইচসিআর তাদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি নিবন্ধিত উদ্বাস্তুদের বিচ্ছিন্নতার ব্যাখ্যাগুলো ইউএনএইচসিআর এবং সরকার দ্বারা নিবন্ধিত সংখ্যা নির্ধারিত হয়। **১৯৯১** সালে মিয়ানমারের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ইস্যুকৃত রোহিঙ্গাদের পারিবারিক তালিকার কার্ড দেওয়া হয় যা নিম্নে সংযুক্ত করা হলো-

৫. http://www.ndphr.net/2012/09/ethnic-cleansing-nightmare-buddhist.html (Accessed on 12.12.2016)

চিত্র-৬.৫ঃ মিয়ানমারের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট ইস্যুকৃত রোহিঙ্গাদের পারিবারিক তালিকা[৬]

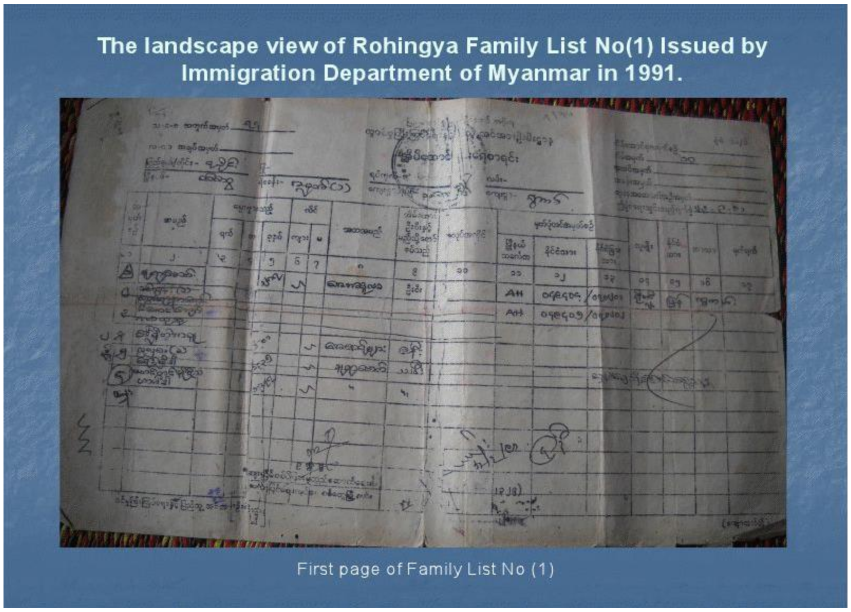

http://www.ndphr.net/2012/09/ethnic-cleansing-nightmare-buddhist.html

৬.৩.৩.৫ নন ফুড আইটেম (এনএফআই) বিতরণ

ইউএনএইচসিআর ডাটাবেসে নিবন্ধিত সমস্ত শরণার্থী পরিবারের জন্য ২০০৭ সালের মাঝামাঝি এনএফআই (NFI) বা নন ফুড আইটেম শীট জারি করেছিল। প্রায় ৫,০০০ নিবন্ধিত উদ্বাস্তুদের মধ্যে কেবল ইউএনএইচসিআর-এর তালিকাটি নিবন্ধিত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই শরণার্থীরা কেবল নন ফুড আইটেম বা এনএফআই শীটে উল্লিখিত নন ফুড আইটেমসমূহ গ্রহণ করার সুযোগ পেতেন। এই নথির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল স্বতন্ত্র ছবি (নবজাতকের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া)। নন ফুড আইটেম শীট তাদের রঙের কারণে "হলুদ শীট" হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এতে মৌলিক তথ্য রয়েছে যেমন: (সিরিয়াল নম্বর, নাম, বয়স, লিঙ্গ, সম্পর্ক, শরণার্থী অবস্থা) এবং ক্যাম্প হিসেবে অন্যান্য ঠিকানার তথ্য এবং সংযুক্ত (এমআরসি) মাস্টার রেজিস্ট্রেশন কার্ড রয়েছে। এনএফআই শীটগুলোতে ইউএনএইচসিআর-এর একটি বৃত্তাকার সীল রয়েছে। কিছু অনুলিপি, ফটোগ্রাফ ও এমআরসি নম্বর ইত্যাদি জালিয়াতি রোধের জন্য প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টায় এনএফআই শিট তৈরী করা হয়েছিল, যা ছিল এক আলাদা বৈশিষ্ট্যের তথ্য ব্যাংক।

৬.৩.৩.৬ শরণার্থী পরিচিতি (আইডি) কার্ড ও মেডিকেল ডেটা শীট

জুলাই, ২০০৭ সালে জারি করা হয়েছিল ইউএনএইচসিআর এর ডাটাবেস-এ নিবন্ধিত সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবারের তালিকা। এতে নন ফুড আইটেম বা এনএফআই শীটের অনুরূপ পৃথক ছবি

৬. http://www.ndphr.net/2012/09/ethnic-cleansing-nightmare-buddhist.html (Accessed on 12.12.2016)

দেখা যায় (নবজাতকের ব্যতিক্রম ছাড়া)। মেডিকেল তথ্য (ডেটা) শীটেও মৌলিক পৃথক তথ্য রয়েছে (সিরিয়াল নম্বর, নাম, বয়স, লিঙ্গ, সম্পর্ক ও শরণার্থী অবস্থা)। শরণার্থী শিবিরের ঠিকানা এবং সংযুক্ত (এমআরসি) মাস্টার রেজিস্ট্রেশন কার্ড নম্বর হিসেবে অন্যান্য তথ্য রয়েছে। উদ্বাস্তুদের জন্য পৃথক আইডি কার্ড সমস্ত উদ্বাস্তু ব্যক্তির (জুলাই, ২০০৮ সালে জারি করা হয়েছিল) ইউএনএইচসিআর ডাটাবেস নিবন্ধন রয়েছে। কার্ডের সামনে প্রতিটিতে প্লাস্টিকের স্তর রয়েছে যা একটি আইডি কার্ডে স্তরিত ইউএনএইচসিআর এর লোগো সমন্বলিত একটি নিরাপত্তা হোলোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত আছে। সংযুক্ত ছবিটির নীচে একটি ১১ সংখ্যার স্বতন্ত্র সংখ্যা রয়েছে যা ৭৪২ সংখ্যা দিয়ে শুরু (জিওবি এবং ইউএনএইচসিআর দ্বারা নিবন্ধিত) অথবা ২৮৭ সংখ্যা দিয়ে শুরু হয়ে থাকে (যদি শুধুমাত্র ইউএনএইচসিআর দ্বারা নিবন্ধিত হয়)। শরণার্থী কার্ডের মূল তথ্য এমআরসি নম্বর, নাম, লিঙ্গ, জন্মের বছর, মূল দেশ এবং ইস্যুর বছরও ইত্যাদি রয়েছে। বিপরীত দিকে অন্যান্য কিছু তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে (ইউএনএইচসিআর এর ইংরেজি এবং বাংলাতে লেখা ঠিকানাসহ)। এফবি এবং এনএফআই প্রতিস্থাপনের জন্য ইউএনএইচআর উদ্বাস্তুদের কাছে একটি রেশন কার্ডের প্রস্তাব উত্থাপন করে যার শীট ডাটাবেসের দ্বারা খাদ্য বিতরণে সংযোগ করা হয়। এটি একটি অনন্য সিরিয়াল নম্বর যাতে ডাটাবেস আপডেট আছে। এটি পরিবার অনুযায়ী বিতরণ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি কার্ডের বন্টনের পর একটি সেল- খাদ্য এবং অ-খাদ্য (নন ফুড) আইটেম বিতরণের প্রমাণ হিসেবে বন্টন করা হয়। ইউএনএইচসিআর এবং জিওবি এর মধ্যে তথ্য সুসংহত করার পরে এটি সম্পূর্ণ ইস্যু করার প্ররিকল্পনা করে।

৬.৩.৩.৭ ইউএনএইচসিআর-এর নিবন্ধন আপডেট ও নিবন্ধন যাচাই পদ্ধতি

১৯৯৪ সালে সমস্ত নিবন্ধিত উদ্বাস্তুদের একটি আপডেট তথ্য সংগৃহীত হয়। যা ইউএনএইচসিআর-এর ডাটাবেস হিসেবে রয়েছে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রশ্নোত্তরের (আইএফকিউ) উপর ভিত্তি করে ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ সালের মধ্যে সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছিল। ইউএনএইচসিআর ডাটাবেস ২০০১ সালে এই ফাইলগুলির তথ্য দিয়ে আপডেট করা হয়েছিল। ২০০৫ সালে পৃথক পৃথক শরণার্থীদের তথ্য আপডেট করা হয়েছে এবং পৃথকভাবে ছবি ডাটাবেসের মধ্যে নেওয়া এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে। এতে পরিবারের নতুন তালিকা নবজাতকসহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিছু নবজাতক, যারা শুধুমাত্র ইউএনএইচআর দ্বারা নিবন্ধিত এবং শুধুমাত্র অ-খাদ্য আইটেমের জন্য যোগ্য ছিল। এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল শিবিরে শরণার্থীদের আরো একটি বিশ্বাসযোগ্য ডাটাবেস নিশ্চিত করা। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইউএনএইচসিআর-এর নতুন ডাটাবেস আপডেট করা হয়েছে (Rohingya refugees in Bangladesh and Thailand, (2011)। ২০০৯ সালে আরও একটি বিস্তৃত প্রোফাইলিং করা হয় যাতে আরও ভালভাবে সনাক্ত করার জন্য ইউএনএইচসিআর উদ্বাস্তু ক্যাম্পে পারিবারিক সম্পর্ক যাচাই করতে ঝুঁকি মূল্যায়ন সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারে (Rohingya refugees in

Bangladesh and Thailand, (2011)। এরপর ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এবং ইউএনএইচসিআর নিবন্ধীকরণের সাথে তথ্য একত্রিকরণ করতে সম্মত হয়। বাংলাদেশ সরকার যখন শরণার্থী যাচাই করে নেওয়ার দাবি জানায় ইউএনএইচসিআর কমপক্ষে এমআরসি নম্বরের অধীনে ব্যক্তিটির নিবন্ধন, তার নাম, পরিবারের সদস্যদের নাম ও নিবন্ধিত ব্যক্তির সম্ভাব্য নাম ফেরত পাঠানো হয়। এমআরসি নম্বরটি পাশাপাশি ১৯৯২ সালে নিবন্ধনের পর পারিবারিক নামগুলো ১৯৯৪ সালে আপডেট ও সুসংহত করা হয়েছে। ২০০১, ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৯ সাল থেকে ইউএনএইচসিআর-এর আপডেট তথ্য বা ডাটাবেস চেক করা হয়। এই ডাটাবেসে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যাবাসন পরিবারের পাশাপাশি বিচ্ছিন্ন পরিবারের তথ্য উল্লেখ করা হয়।

৬.৩.৩.৮ শরণার্থী শিবিরের শিক্ষা কার্যক্রম

দু'টি শরণার্থী ক্যাম্পে প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের জন্য মোট ২১টি স্কুল রয়েছে। এছাড়া প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য একটি স্কুল রয়েছে, তাতে শিক্ষণ শেখানো হয় বাংলায় এবং বাংলাদেশ জাতীয় প্রাঠক্রম অনুসরণ করে। তবে, উভয় শরণার্থী শিবিরেই মিয়ানমার ল্যাংগুয়েজ ল্যাব রয়েছে, যেখানে মিয়ানমারের বার্মীজ ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইউএনএইচসিআর (বাংলাদেশ) এর সহায়তায় ও বাংলাদেশ সরকারের সরাসরি সহযোগিতায় এই ক্যাম্পগুলো পরিচালিত হয়। প্রতিটি শিবিরে একটি আবাসিক ক্যাম্প-ইন-চার্জ কক্সবাজারে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) অধীনে কাজ করেন। এই আরআরআরসি কমিশনার আবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে রিপোর্ট করেন। ইউএনএইচসিআর এর পক্ষ থেকে নিবন্ধিত ক্যাম্পের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্যাম্পের বিদ্যুতের কাঠামো এক সময় (রোহিঙ্গা নেতা) বা মাঝিদের হাতে ছিল যারা শিবির পরিচালনা করতে সাহায্য করেন। ২০০৭ সালে জিওবি (বাংলাদেশ সরকার) এবং ইউএনএইচসিআর দ্বারা শরণার্থীরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল যদিও সেই সকল মাঝিরা এখনও ক্যাম্প-ইন-চার্জ এর অধীনে কাজ করেন এবং তারা সাধারণ রোহিঙ্গাদের চেয়ে মুটামুটি অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল বা লেখা-পড়ায় এগিয়ে আছে।

৬.৪ উপসংহার

দীর্ঘ চার দশক ধরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমন ও অবস্থান কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলা বিশেষ করে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিকট একটি স্বাভাবিক বিষয়। ১৯৭৮, ১৯৯১-১৯৯২, ২০১২ সালে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমন ও অবস্থান এক ধরনের স্বাভাবিকতা ছিল। কিন্তু ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমন ও অবস্থান এতো দ্রুত, অস্বাভাবিক ও ব্যাপক ছিল যে, অন্যা যে কোনো সময়ের চেয়ে এবারের আগমন এর ভিন্নতা বা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্বের ন্যায় এবারও বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘ ও এর অংঙ্গ সংগঠনগুলো যুক্ত হয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান করে

চলেছে। একটি আন্তর্জাতিক ইস্যু হিসেবে এবার বাংলাদেশ ও এর জনগন; আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা এবং দাতা রাষ্ট্র অনেক বেশি সাহায্য-সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়া এবার অনেক বেশি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ন্যায় মুসলিম বিশ্বের সংস্থা ও রাষ্ট্রসমূহ ব্যাপক আকারে এবারের মানবিক সহায়তা কার্যকমে সাড়া প্রদান করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সমন্বয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পাহাড়ে বা জঙ্গলে বসবাস করা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বায়োমেট্রিক ডাটা বেজ সিস্টেমের আওতায় রেজিস্ট্রেশন করে অন্যান্য উপজেলা থেকে শুধু উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় ৩৩টি শরণার্থী শিবিরে একত্রিত করে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্প জীবন-যাপনের আলোকপাত করা হয়েছে। এর আলোকে এই ব্যাপক সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির ফলে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন-জীবনে অভিঘাত বা প্রভাবসমূহ কীরূপ তা গভীরভাবে মাঠপর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়:
গবেষণার ফলাফল

৭.১ শরণার্থী শিবিরে (ক্যাম্প) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপন

ভূমিকা

এ গবেষণাটি বুঝতে প্রথমত উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার চারটি রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ৪০০ জন উত্তরদাতা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিকট এবং উক্ত উপজেলাদ্বয়ের আটটি গ্রামের ৪০০ জন উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে সর্বমোট ৮০০ জন উত্তরদাতার পরিমাণগত তথ্য আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে, এ গবেষণায় পরিমাণগত ও গুণগত দুই ধরণের সংগ্রহীত তথ্যের ব্যবহার করা হয়েছে। এ গবেষণার ফলাফল বুঝতে প্রথম অংশে (রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপন) দু'টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ক) মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কি কি;

খ) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশের ক্যাম্পে জীবন-ধারণ প্রক্রিয়ার অনুসঙ্গ বুঝতে চেষ্টা করা;

এ সংগৃহীত তথ্যসমূহ প্রথমত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপন এবং দ্বিতীয়ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপন বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়েছে। এ পর্যায়ে গবেষণা থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

৭.২ উত্তরদাতাদের জনমিতিক বিশ্লেষণ:

এ গবেষণায় প্রশ্নপত্র জরিপ পদ্ধতির ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, বাসস্থান, বৈবাহিক অবস্থা ও সম্পর্ক, আয়, পেশা প্রভৃতি বিষয়ে জনমিতিক তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

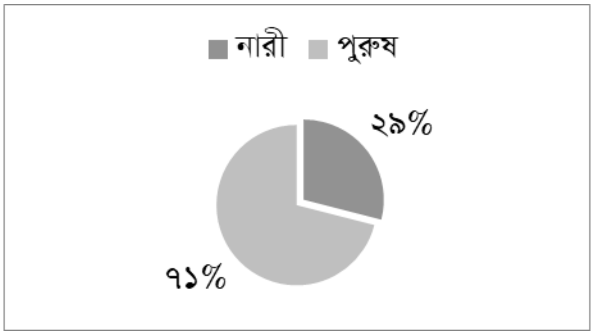

চিত্র-৭.২.১: গবেষণায় উত্তরদাতা পুরুষ-নারীর অংশগ্রহণ

উক্ত চিত্রের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে মোট ৪টি শরণার্থী ক্যাম্পের উত্তরদাতাদের মধ্যে পুরুষ ছিল শতকরা ৭১% ও নারী ছিল শতকরা ২৯%।

সারণী-৭.২.১: গবেষণার উত্তরদাতাদের বয়স ও শিক্ষার চিত্র

চলক		শতকরা হার (%) (n=৪০০)
বয়স	১৮ বছর হতে ৩০ পর্যন্ত	১১.৩
	৩১-৪০	২৭.০
	৪১ বছর হতে ৫০ পর্যন্ত	৩০.৮
	৫১ বছর হতে ৬০ পর্যন্ত	২০.৩
	> ৬১ বছর হতে তদুর্ধ্ব পর্যন্ত	১০.৮
শিক্ষা	নিরক্ষর	২৫
	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	১৩.৭৫
	প্রাথমিক	৮.২৫
	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	৫.২
	মক্তব	৩৭

শরণার্থী ক্যাম্পে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর উপস্থিতি থাকলেও ধর্মীয় কারণে পর্দা রক্ষার জন্য কম সংখ্যক নারী সাক্ষাৎকার প্রদানে ইচ্ছুক ছিলেন। তারপরও এ গবেষণায় নারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তালিকায় দেখা যাচ্ছে এ গবেষণা কার্যক্রমে প্রধান উত্তরদাতা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বয়স ছিল ১৮ বছর থেকে শুরু করে ৬০ বছর এবং তদুর্ধ্ব পর্যন্ত। কারণ এ বয়সের উত্তরদাতাগণ তাদের জীবন-ধারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভেবে-চিন্তে উত্তর দিতে পারেন। এ গবেষণার ক্ষেত্রে ১৮-৩০ বছর পর্যন্ত উত্তরদাতা রয়েছে শতকরা ১১.৩%; ৩১-৪০ বছর শতকরা ২৭%; ৪১-৫০ বছর শতকরা ৩০.৮%; ৫১-৬০ বছর শতকরা ২০.৩% এবং ৬১ বছর থেকে তদুর্ধ্ব বছর পর্যন্ত উত্তরদাতা রয়েছে শতকরা ১০.৮%। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এ গবেষণায় ৪১-৫০ বছর পর্যন্ত উত্তরদাতার সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি ৩০.৮% এবং ৬০ থেকে তদুর্ধ্ব উত্তরদাতার সংখ্যা ছিল সবচেয়ে কম ১০.৮%।

এ গবেষণা কার্যক্রমে প্রধান উত্তরদাতা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শিক্ষা বিষয়ক উত্তরে নিরক্ষরতা ছিল শতকরা ২৫%; স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ১৩.৭৫%; প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ৮.২৫%; মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ৫.২% এবং মক্তব পর্যন্ত ছিল ৩৭%। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এ গবেষণায় উত্তরদাতাগণ নিরক্ষর ছিল ২৫% এবং উত্তরদাতাগণ মক্তবের শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল সবচেয়ে বেশি ৩৭%।

৭.৩ শিবিরের শিক্ষা কার্যক্রম

সারণী-৭.৩.১ঃ গবেষণায় উত্তরদাতাদের সন্তানের শিক্ষার অংশগ্রহণ

রোহিঙ্গা শিশুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমন	
হ্যাঁ	না
১২%	৮৮%

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের শিশুরা সাধারণত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়ে থাকে। এ শিক্ষা গ্রহণে তাদের সন্তানরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যায় কিনা এর উত্তরে ১২% উত্তরদাতা হ্যাঁ বলেছেন, ৮৮% উত্তরদাতা না বলেছেন।

বাংলাদেশ মিয়ানমার কারিকুলামের আওতায় রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষাদানের বিষয়টিকে শিশুদের গঠনমূলক ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করছে, যা তাদের দ্রুত স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনে উৎসাহ যোগাবে বলে শরণার্থী ত্রাণ, প্রত্যাবাস ও পুনর্বাসন কমিশন মনে করে। যদিও রোহিঙ্গারা বাংলাদেশি কারিকুলামে শিক্ষা গ্রহণের দাবি করে আসছে। এ বিষয়ে কুতুপালং ক্যাম্পের সাবেক এক রোহিঙ্গা মাঝি (নেতা) সাক্ষৎকারে বলেন, "আমাদের সন্তানদের মিয়ানমারের কারিকুলামে লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ কি? আমরা তো সেখানে দীর্ঘদিন হলো ফেরত যেতে পারছি না। সেখানকার কারিকুলামে লেখাপড়া শিখে আমাদের বাচ্চাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এ বাচ্চারা যদি লেখাপড়া শিখতে না পারে তাহলে তারা এদেশের জন্যও বোঝা।" নিবিড় স্বাক্ষাৎকারে রোহিঙ্গা শিবিরের একজন মাদ্রাসার শিক্ষক বলেন, আমাদের দেশে যদি আমরা যেতে পারি তাহলে রোহিঙ্গা হিসেবে রোহিঙ্গা ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলব। "বাংলাদেশের জেল খানার কয়েদি আমাদের থেকে অনেক ভাল আছে"। আরাকানে বর্তমানে স্কুল কলেজ বন্ধ বা তালা লাগানো। আমাদের জীবন তো শেষ; কিন্তু সন্তানদের কী হবে এ চিন্তায় সারা দিন কাটে। আমাদের মত অসহায় লোক দুনিয়াতে আর কেউ নেই। দলীয় আলোচনা বা এফজিডি'তে লেদা শিবিরের একজন জানান, আমাদের সন্তানদের স্কুল নেই ৯ বছর ধরে, অশিক্ষার কারণে ছেলে মেয়ে অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। অপর এক রোহিঙ্গা ব্যক্তি জানান, আমাদের শিক্ষা কম হবার কারণে পরিবারে ঝামিলা (ঝামেলা) বাড়ে।

৭.৪ রোহিঙ্গাদের নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশে আগমন

দীর্ঘদিন থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী রাখাইন প্রদেশে (আরাকান) নির্যাতিত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছে। এর মধ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের উখিয়া-টেকনাফ এলাকায় এসেছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী।

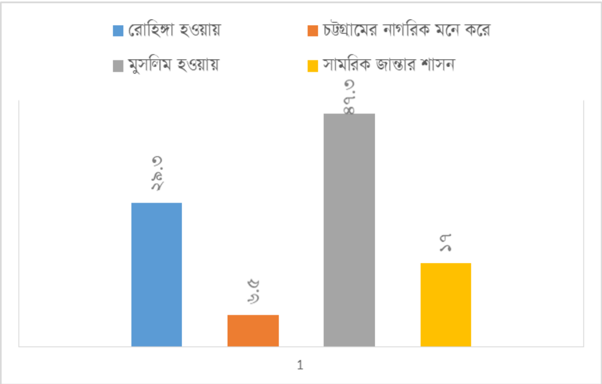

চিত্র-৭.৪.১: আরাকান থেকে রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদের কারণ

এ গবেষণা কার্যক্রমে উত্তরদাতা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমার কর্তৃক আরাকান থেকে উচ্ছেদের কারণ জানতে চাওয়া হলে, চট্টগ্রামের নাগরিক মনে করে শতকরা ৬.৫%; সামরিক জান্তার শাসন চলার কারণে উচ্ছেদ হয়েছেন মনে করেন ১৭.০%; রোহিঙ্গা হওয়ার কারণে উচ্ছেদ হয়েছেন মনে করেন ২৯.৩% এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার কারণে উচ্ছেদ হয়েছেন মনে করেন ৪৭.৩%। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এ গবেষণায় উচ্ছেদের কারণ হিসেবে উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে কম (৬.৫%) চট্টগ্রামের নাগরিক হওয়ার কারণে এবং সবচেয়ে বেশি ৪৭.৩% উত্তরদাতা মুসলিম হওয়ার কারণে উচ্ছেদ হয়েছেন মনে করেন। আবার রোহিঙ্গা হওয়ার কারণে ২৯.৩% উচ্ছেদ হয়েছেন।

নিবিড় সাক্ষাৎকারে কুতুপালং মেকশিফ্‌ট ক্যাম্পের রোহিঙ্গা নারী জানান, চাঁদা না দিলে সেনা বাহিনী জুলুম করত। আমার স্বামীকে শরীরে প্রচন্ড আঘাত করে, এ জন্য সেখানে ২ লাখ টাকা চাঁদাও দিতে হয়েছে। টেকনাফ থেকে দমদমিয়া এসেছি একটি বিদেশি এনজিও'র সহায়তায়। সেই বিদেশি সংস্থা আমাদের ঘর বাড়ি দিয়েছে, ব্যবসা করার জন্য নগদ অর্থ প্রদান করেছে।

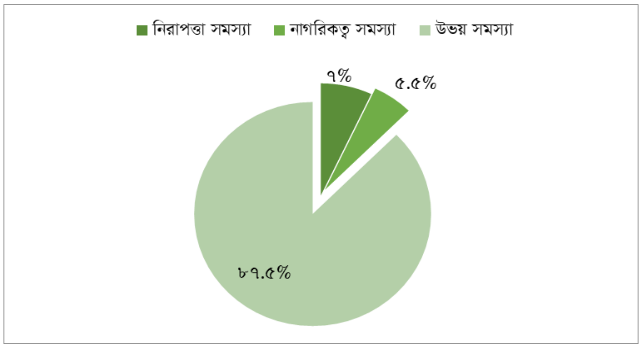

চিত্র-৭.৪.২ঃ রোহিঙ্গাদের আরাকানে বসবাসে বড় সমস্যা

এ গবেষণা কার্যক্রমে উত্তরদাতা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আরাকানে বসবাসে বড় সমস্যা জানতে চাওয়া হলে, নাগরিকত্ব সমস্যা বলে মনে করেন শতকরা ৫.৫%; নিরাপত্তা সমস্যা বলে মনে করেন ৭% এবং উভয় সমস্যা বলে মনে করে ৮৭.৫% উত্তরদাতা।

কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পের পঞ্চাশ উর্ধ্বো এক রোহিঙ্গা পুরুষ বলেন, অং সাং সুচির প্রতি অনেক বেশি আশা ছিল, আমরা ভুল করছি। কোনো অবস্থাই আমরা বুঝতে পারিনা। ভাবনা চিন্তা করতে করতে পাগলের মত হয়ে গেছি। পথ খুঁজে পেতে সমস্যা হচ্ছে। এতদিন একটি আশ্বাস ছিল এখন আশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। অথচ অং সাং সুকির পিতা অং সাং এর সাথে রোহিঙ্গা মুসলিমদের এক সময় ভালো সম্পর্ক ছিল। তাই আমরা আশা করেছিলাম পিতার কথা চিন্তা করে অং সাং সুকি আমাদের প্রতি আর একটু সদয় হবেন। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা গেল না।

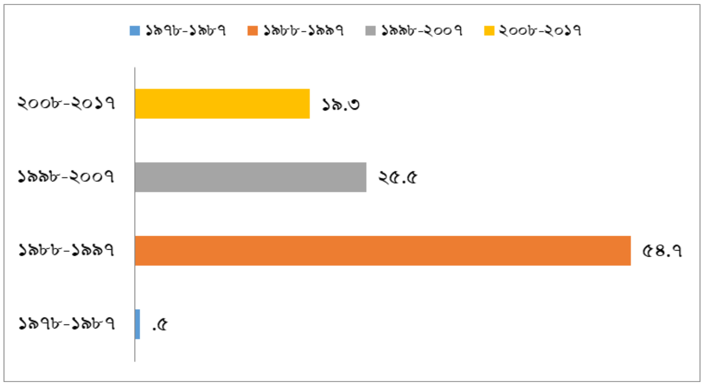

চিত্র-৭.৪.৩ঃ আরাকান থেকে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আগমন দশক

শত শত বছর ধরে রোহিঙ্গা এবং রাখাইন জনগোষ্ঠীর নাফ নদীর এপার-ওপার হওয়া স্বাভাবিক বিষয় হলেও সত্তরের দশকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশে আগমন করে। এ গবেষণা কার্যক্রমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতাদের মতামত অনুসারে বিভিন্ন সময়ে চার দশকে মিয়ানমার হতে বাংলাদেশে আগমনের শতকরা হার ছিল নিম্নরূপ। উত্তরদাতা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এক দশকে আগমনের হার ছিল শতকরা ০.৫%; ১৯৮৮-১৯৯৭ এক দশকে ৫৪.৮%; ১৯৯৮-২০০৭ এক দশকে ২৫.৫% এবং ২০০৮-২০১৭ এক দশকে ১৯.৩%। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এ গবেষণায় ১৯৭৮-১৯৮৭ সাল পর্যন্ত উত্তরদাতার আগমন ছিল সবচেয়ে কম (০.৫%) এবং ১৯৮৮-১৯৯৭ এ সময়ে আগমন সবচেয়ে বেশি (৫৪.৮%) ছিল। যদিও সর্বশেষ ২০১৭ সালে আগত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ছিল সংখ্যায় আরো অনেক বেশি।

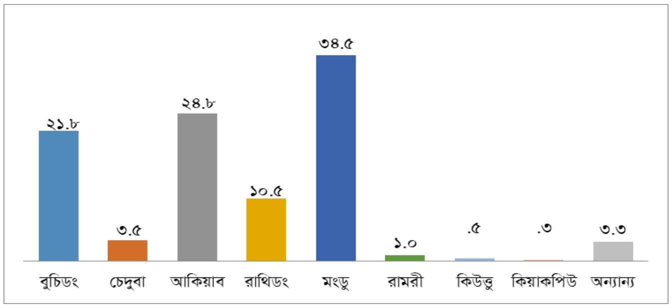

চিত্র-৭.৪.৪ঃ উত্তরদাতা রোহিঙ্গাদের আরাকানের আগত এলাকাসমূহ

এ গবেষণা কার্যক্রমে উত্তরদাতা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আরাকানের কোন কোন এলাকা থেকে মিয়ানমার কর্তৃক তাদের উচ্ছেদের নির্দিষ্ট এলাকার কথাজানান, মংডু, আকিয়াব, বুচিডং ও রাথিডং এই এলাকা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রোহিঙ্গা বাংলাদেশে জীবন বাঁচাতে এসেছেন। এর মধ্যে মংডু থেকে বাংলাদেশে এসেছে সবচেয়ে বেশি শতকরা ৩৪.৫%। এরপর আকিয়াব থেকে এসেছে শতকরা ২৪.৮%। তারপর বুচিডং থেকে এসেছে শতকরা ২১.৮%। উল্লেখ্য যে, এ গবেষণায় উচ্ছেদের এলাকা হিসেবে উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল মংডু (৩৪.৫%)

এবং সবচেয়ে কম ছিল কিয়াকপিউ (.৩%)। এছাড়া অন্যান্য স্থান থেকে আগত উত্তরদাতাও বেশ ছিল (৩.৩%)। সুতরাং এই পরিসংখ্যান মতে রোহিঙ্গারা আরাকানের বিভিন্ন এলাকা থেকে উচ্ছেদ হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করলেও নাফ নদীর ওপারে অবস্থিত সীমান্তবর্তী মংডু থেকে এসেছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোহিঙ্গা।

৭.৫ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শিবিরে বসবাস

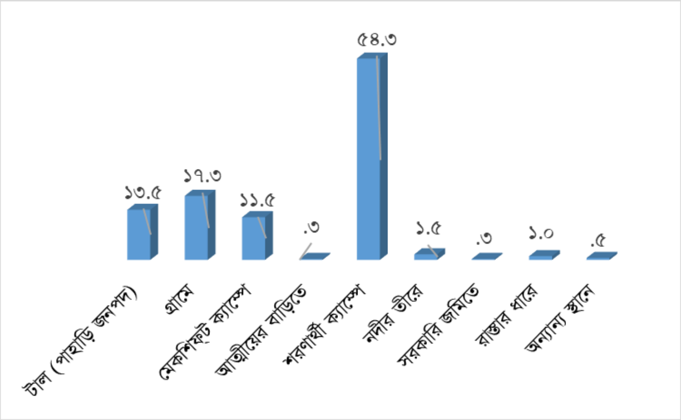

চিত্র-৭.৫.১ঃ আরাকান থেকে এসে প্রথম বসবাস

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট তাদের বাংলাদেশে প্রথম আশ্রয় স্থান সম্পর্কে জানা যায় যে, শরণার্থী ক্যাম্পে ছিলেন সবচেয়ে বেশি শতকরা ৫৪.৩%; গ্রামে থেকেছেন শতকরা ১৭.৩% উত্তরদাতা; মেকশিফ্‌ট ক্যাম্পে থেকেছেন শতকরা ১১.৫% উত্তরদাতা; টাল বা পাহাড়ি জনপদে থেকেছেন শতকরা ১৩.৫% উত্তরদাতা; নদীর তীরে ১.৫%; রাস্তার ধারে ১%।

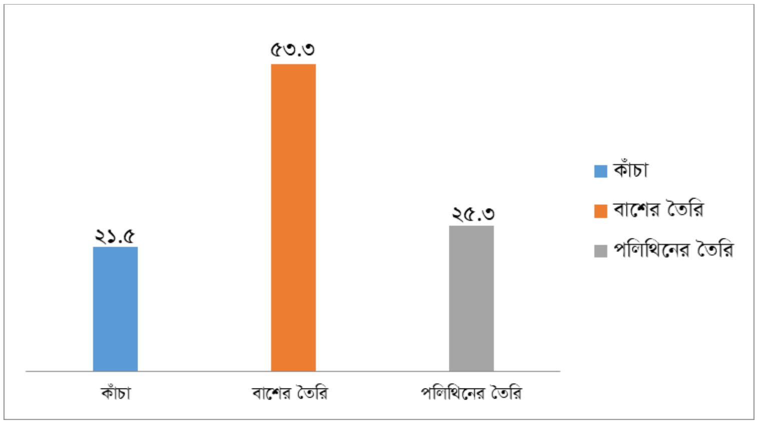

চিত্র-৭.৫.২ঃ আরাকান থেকে আগত রোহিঙ্গাদের বাসস্থানের ধরণ

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট তাদের বাসস্থানের ধরণ সম্পর্কে জানা যায় যে, তাদের বসবাসের জন্য কাঁচা ঘর রয়েছে শতকরা ২১.৫%; বাঁশের তৈরি ঘর রয়েছে শতকরা ৫৩% উত্তরদাতা; পলিথিনের তৈরি ঘর রয়েছে শতকরা ২৫.৫% উত্তরদাতার।

এ সকল উত্তরদাতা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বেশি বাঁশের ঘর হওয়ার কারণ বিভিন্ন সংস্থা তাদের অর্থায়নে ঘর নির্মাণ করে দিয়েছে এবং যাদের পলিথিনের ঘর তারা মূলত সকলেই সকলেই প্রায় মেকশিফট ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্য।

কুতুপালং শরণার্থী শিবিরের একজন রোহিঙ্গা নারী জানান, আমাদের কাজকর্ম, চলাফেরা সব জায়গায় জ্যাম, লোকজন বেড়ে গেছে। নিয়মিত দুই বেলা ঠিকমতো খাবার পাইনা। আপনাদের গরু ছাগল যেখানে থাকে আমরা (রোহিঙ্গারা) সেখানে থাকি। এখন সন্তানরা বড় হয়েছে, বিয়ে-শাদি করেছে তারপরও ছোট্ট একটি ঘরে দশজন সদস্যের বসবাস। গরমের সময় গাদাগাদি করে থাকা যায় না আবার শীতের সময় ঘরের মেঝে ঠাণ্ডা থাকে। আসলে আন্তর্জাতিক মহলেও আমাদের নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। না হলে কেন এ সমস্যা মিটবে না।" আমাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের মাথা ব্যথা রয়েছে। কিন্তু অন্যরাও তো দেখতে আসে। কাজের কাজ তো কিছু হয় না। আমরা আমাদের দেশে ফিরে যেতে চাই, ভিটে মাটিতে যেতে চাই।

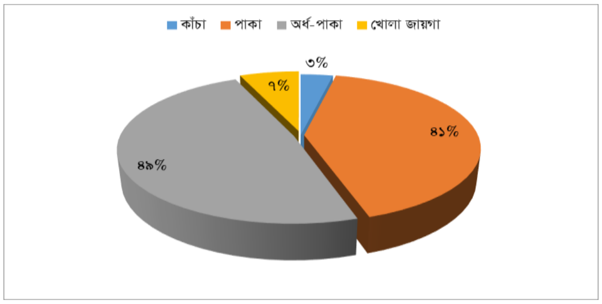

চিত্র-৭.৫.৩ঃ আগত রোহিঙ্গাদের সৌচাগারের অবস্থা

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট সৌচাগার সম্পর্কে জানা যায় যে, তাদের সৌচাগার যথাক্রমে কাঁচা শতকরা ৩%, পাকা শতকরা ৪৬.৫%, অর্ধ পাকা শতকরা ৪৯.৮% এবং অন্যান্য শতকরা ০.৮%। এক্ষেত্রে রোহিঙ্গা উত্তরদাতাগণ যেহেতু শরণার্থী শিবির ও মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প উভয়ই স্থানেই বসবাস করে তাই পাকা এবং অর্ধ পাকার বাইরেও কিছু সংখ্যক মানুষ (কাঁচা ও অন্যান্য) উন্মুক্ত স্থানে সৌচ কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

সারণী-৭.৫.১ঃ আরাকান থেকে আগত রোহিঙ্গাদের সৌচাগার পর্যাপ্ত

পর্যাপ্ত সৌচাগার	হ্যাঁ	না
	৩%	৯৭%

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট তাদের পর্যাপ্ত টয়লেট এর ব্যবস্থা আছে কিনা এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতাদের শতকরা ৯৭% না এবং শতকরা ৩% হ্যাঁ বলেছেন।

৭.৬ শরণার্থীদের পেশা ও জীবন-ধারণ

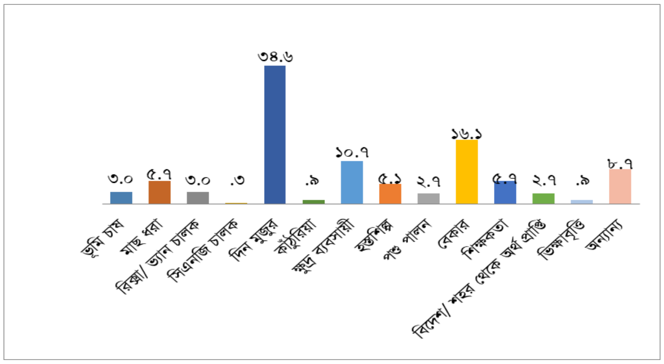

চিত্র-৭.৬.১ঃ আরাকান থেকে আগত রোহিঙ্গাদের পেশার ধরণ

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট ১৪ টি পেশার সাথে জড়িত। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পেশার সাথে জড়িত দিনমজুরীর পেশায় রয়েছে শতকরা ৩৪.৬% । এরপরই রয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত শতকরা ১০.৭%; তাদের পেশার মধ্যে মাছ ধরা, হস্তশিল্প ও শিক্ষকতা পেশা যথাক্রমে শতকরা ৫.৭%, শতকরা ৫.১% ও শতকরা ৫.৭%। এছাড়া তাদের পেশার মধ্যে ভূমিচাষ ও রিক্সা/ভ্যান চালানো পেশায় যথাক্রমে শতকরা ৩% জড়িত। পশুপালন পেশায় ২.৭% জড়িত ও দৈনন্দিন খরচের জন্য আত্মীয় স্বজনের আয় থেকে অর্থ আসে শতকরা ২.৭% উত্তরদাতার। তবে, তাদের পেশার মধ্যে সিএনজি চালক, কাঁঠুরিয়া ও ভিক্ষাবৃত্তি পেশায় যথাক্রমে ১% এর নিচে জড়িত বলে স্বীকার করেছেন। পেশার ক্ষেত্রে উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, আলোচ্য পেশা ছাড়াও রোহিঙ্গা উত্তরদাতাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য অন্যান্য পেশায় (৮.৭%) এবং ১৬.১% উত্তরদাতা বেকার রয়েছে।

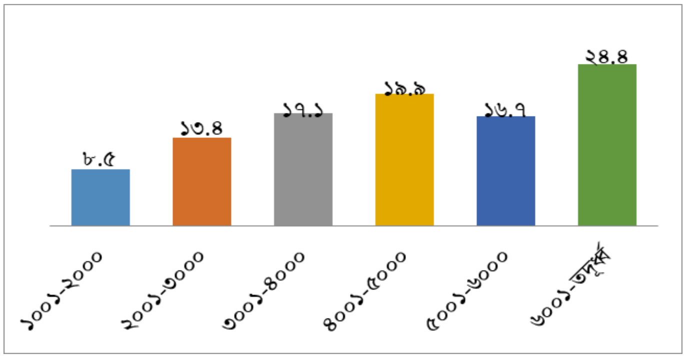

চিত্র-৭.৬.২ঃ আরাকান থেকে আগত রোহিঙ্গাদের আয়

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট তাদের আয় সম্পর্কে জানা যায় যে, ১০০১ টাকা থেকে ২০০০ টাকা আয় করে শতকরা ৮.৫%; ২০০১ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা আয় করে শতকরা ১৩.৪%; ৩০০১ টাকা থেকে ৪০০০ টাকা আয় করে শতকরা ১৭.১%; ৪০০১ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা আয় করে শতকরা ১৯.৯%; ৫০০১ টাকা থেকে ৬০০০ টাকা আয় করে শতকরা ১৬.৭% এবং ৬০০১ টাকা থেকে তদূর্ধ্ব টাকা আয় করে শতকরা ২৪.৪%।

এক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, রোহিঙ্গা উত্তরদাতাগণের আয় সবচেয়ে বেশি ৬ হাজার টাকা থেকে তার উর্ধ্বে।

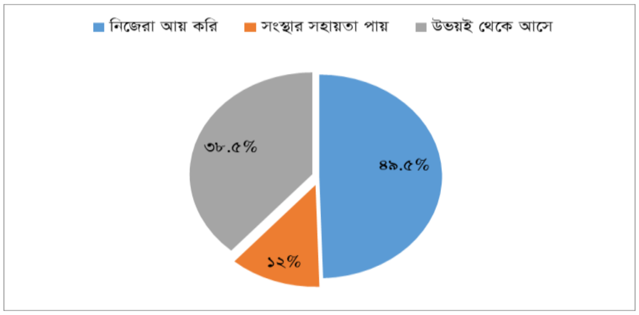

চিত্র-৭.৬.৩ঃ আগত রোহিঙ্গাদের জীবিকা নির্বাহের উৎসসমূহ

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট থেকে নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় যে, তাদের জীবিকা নির্বাহের উৎসসমূহ কি কি। এ প্রশ্নের উত্তরে তারা জানান, নিজেরা চেষ্টা করে জীবিকা নির্বাহ করে শতকরা ৪৯.৫%; এছাড়া তারা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে শতকরা ১২%। তারা নিজেরা চেষ্টা করে এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে সাহায্য-সহযোগিতা উভয় থেকে জীবিকা নির্বাহ করে শতকরা ৩৮.৫% উত্তরদাতা। উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, জীবন ধারণের মানবিক সহায়তা পাওয়ার পরও জীবিকা নির্বাহের জন্য উত্তরদাতা রোহিঙ্গাদের অর্ধেক জনগোষ্ঠী বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত রয়েছেন।

সারণী-৭.৬.১ঃ রোহিঙ্গা হিসেবে আপনি মজুরী কম পান

	হ্যাঁ	না
মজুরী কম পায়	৭৪%	২৬%

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট কম পরিমাণ মজুরী পাওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে উত্তরে শতকরা ৭৪% উত্তরদাতা ‘হ্যাঁ’ বলেছেন এবং শতকরা ২৬% ‘না’ বলেছেন। অর্থাৎ চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ উত্তরদাতা মজুরী কম পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন।

সারণী-৭.৬.২ঃ আরাকান থেকে আগত রোহিঙ্গাদের মজুরী কম দেবার কারণ

	রোহিঙ্গা হওয়ায়	শারীরিকভাবে দুর্বল	শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য	কাজের অনুমতি নাই
৪৭%	৩৯%	৪%	৮%	২%

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট থেকে মজুরী কম দেবার কারণ হিসেবে জানা যায় যে, শরণার্থী হওয়ার কারণে মজুরী কম পায় শতকরা ৪৭% উত্তরদাতা;

রোহিঙ্গা হওয়ার কারণে মজুরী কম পায় শতকরা ৩৯% উত্তরদাতা; শারীরিকভাবে দূর্বল হওয়ায় ৪% উত্তরদাতা; সহজে শ্রমিক প্রাপ্যতা পাওয়ার কারণে মজুরী কম পায় শতকরা ৮% উত্তরদাতা এবং কাজের অনুমতি না থাকায় ২% উত্তরদাতা মনে করেন। উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, জীবিকা নির্বাহের জন্য উত্তরদাতা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বিভিন্ন কারণে মজুরী কম পেয়ে থাকেন।

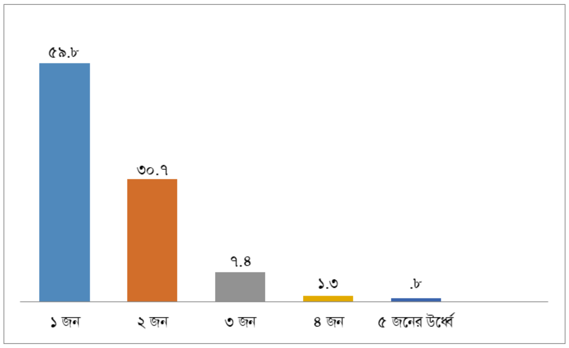

চিত্র-৭.৬.৪ঃ আগত রোহিঙ্গাদের উপার্জনকারী পারিবারিক সদস্য সংখ্যা

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট থেকে নির্দিষ্ট ভাবে জানার জন্য প্রশ্ন করা হয় যে, তাদের পরিবারের কয়জন সদস্য উপার্জন করেন। এ প্রশ্নের উত্তরে তারা বলেন, একজন উপার্জনকারী সদস্য আছে শতকরা ৫৯.৮%; দুইজন সদস্য আছে শতকরা ৩০.৭%; তিনজন সদস্য আছে শতকরা ৭.৪%; চারজন সদস্য আছে শতকরা ১.৩% এবং পাঁচজন বা ততোধিক উপার্জনকারী রয়েছে শতকরা ০.৮% সদস্য।

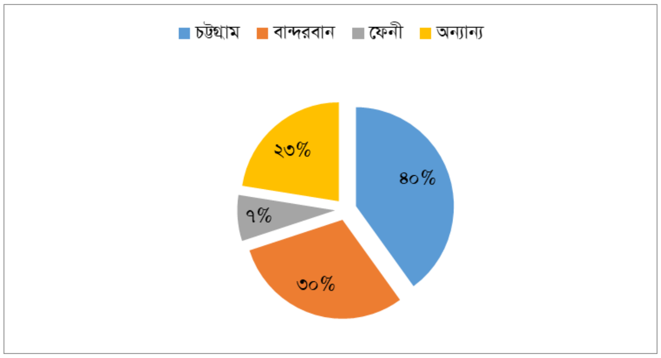

চিত্র-৭.৬.৫ঃ রোহিঙ্গাদের কক্সবাজারের বাইরে কাজ করার অভিজ্ঞতা

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট থেকে নির্দিষ্ট ভাবে জানার জন্য প্রশ্ন করা হয় যে, তারা কক্সবাজার জেলার বাহিরে কাজ করে কিনা অথবা কাজের অভিজ্ঞতা আছে কিনা। এ প্রশ্নের উত্তরে তারা জানিয়েছেন চট্টগ্রামে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে শতকরা ৪০%; বান্দরবানে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে শতকরা ৩০%; ফেনি জেলায় বান্দরবানে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে শতকরা ৭% এবং অন্যান্য স্থানে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে শতকরা

২৩%। এ অন্যান্য স্থান বুঝাতে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থান বুঝানো হয়েছে। উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অর্থাৎ ৭৭% রোহিঙ্গার কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে, রোহিঙ্গাদের অন্যান্য স্থানে কাজ করার অভিজ্ঞতাও কম নয় এবং শতকরা ২৩% রোহিঙ্গা চট্টগ্রামের বাইরে অন্যান্য জেলায় কাজ করে থাকেন। বিশেষ করে বড় বড় শহরের বিভিন্ন স্থানে তাদের কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

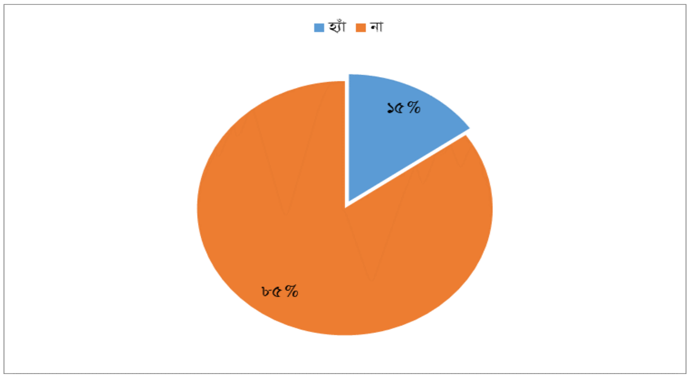

চিত্র-৭.৬.৬ঃ রোহিঙ্গাদের বিদেশ থেকে অর্থের যোগান আসে

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট বিদেশ থেকে অর্থের যোগান বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে উত্তরে শতকরা ১৫% উত্তরদাতা 'হ্যাঁ' বলেছেন এবং শতকরা ৮৫% 'না' বলেছেন।

৭.৭ রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আত্মীয়তার সম্পর্ক

সারণী-৭.৭.১ঃ আরাকান থেকে আগত উত্তরদাতা রোহিঙ্গাদের বৈবাহিক অবস্থা

অবিবাহিত	বিবাহিত	বিধবা	বিপত্নিক
০.৫%	৯৩.৮%	৫.৮%	০.৮%

এ গবেষণা কার্যক্রমে উত্তরদাতা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বৈবাহিক অবস্থা জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর ছিল নিম্নরূপ। উখিয়া ও টেকনাফে অবস্থিত রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট থেকে জানা যায় যে, তাদের মধ্যে অবিবাহিত শতকরা ০.৫%; বিবাহিত সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ৯৩.৭%; বিধবা সংখ্যা ৫.৮% এবং বিপত্নিক ০.৮%। উক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, উত্তরদাতা রোহিঙ্গাদের মধ্যে ৫.৮% বিধবা যা ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক।

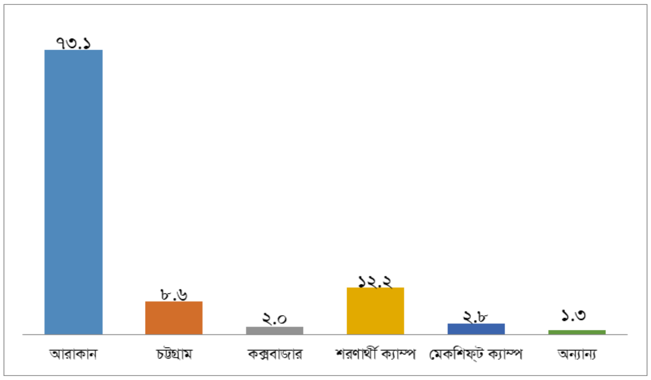

চিত্র-৭.৭.১ঃ আরাকানের থেকে আগত রোহিঙ্গাদের বৈবাহিক স্থান

এ গবেষণা কার্যক্রমে বাংলাদেশে অবস্থানরত উত্তরদাতা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বৈবাহিক স্থান জানতে চাওয়া হলে উত্তর ছিল নিম্নরূপ। উত্তরদাতা রোহিঙ্গাদের নিকট থেকে জানা যায়, তারা ক্যাম্প এলাকায় বিবাহ করেছেন ১৬.৫%; চট্টগ্রাম এলাকায় বিবাহ করেছেন ১১.৩%; এবং আরাকানে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৭২.৩%। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এ গবেষণায় বৈবাহিক স্থান হিসেবে উত্তরদাতাদের মধ্যে আরাকানে সবচেয়ে বেশি (৭২.৩%); কারণ রোহিঙ্গারা মিয়ামারের আরাকান থেকে আগত এবং দীর্ঘদিন ক্যাম্পে বসবাস করায় সেখানেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এবং চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় শতকরা ১১.৩% রোহিঙ্গা বিয়ে করেছেন। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট থেকে আরো নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় যে, তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক কোথায় কোথায় হয়েছে। শরণার্থী হয়ে এদেশে আসার পর রেজিষ্ট্রি ছাড়া বিয়ে করেছে চট্টগ্রামে শতকরা ৮.৬% এবং অন্যান্য স্থানে শতকরা ১.৩%; কক্সবাজারে বিয়ে করেছে শতকরা ২.০%; নিবন্ধিত শরণার্থী শিবিরে শতকরা ১২.২%; অনিবন্ধিত শরণার্থী শিবিরে বিয়ে করেছে শতকরা ২.৮% এবং অন্যান্য স্থানে বিয়ে করেছে শতকরা ১.০৩%। এক্ষেত্রে উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ৯.০৯% রোহিঙ্গা অর্থাৎ প্রায় ১০% রোহিঙ্গা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

কুতুপালং ক্যাম্পের একজন রোহিঙ্গা জানান, যেসব রোহিঙ্গা ২৫/৩০ বছর আগে এদেশে এসে কাজ করেছে তারা এখানে সম্মান পেয়েছে, বিয়ে শাদী করেছে বা দিয়েছে। এখন আইডি কার্ড করার পর সমস্যা হয়েছে। বাড়িতে বউ থাকার পরও স্থানীয়রা ক্যাম্পে বিয়ে করে। কারণ ক্যাম্পে বিয়ে করতে খরচ কম, বৈধ কোনো কাগজপত্র ছাড়াই এ হয়ে থাকে। অনেক স্থানীয় ব্যক্তি বিয়ে করে গোপনে ক্যাম্পে অবস্থান করে। কুতুপালং ক্যাম্পের মধ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পুরুষ অনেক বেশি পরিমাণে বিয়ে করেছে বলে জানান ক্যাম্পের একজন রোহিঙ্গা মাঝি।

৭.৮ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সামাজিক সমস্যা

সারণী-৭.৮.১ঃ আরাকানে রোহিঙ্গাদের সমস্যার ধরণ

আরাকানের সমস্যার ধরণ	শতকরা হার (n=৪০০)
নাগরিকত্ব সমস্যা	৫.৫%
নিরাপত্তা সমস্যা	৭%
উভয় সমস্যা	৮৭.৫%

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট আরাকানে বসবাসে সমস্যা কি কি ছিল আছে জানতে চাইলে জানা যায় যে, নাগরিকত্ব সমস্যা ৫.৫%; নিরাপত্তা সমস্যা ৭% এবং উভয় সমস্যা আছে শতকরা ৮৭% উত্তরদাতা সদস্য।

লেদা ক্যাম্পের রোহিঙ্গা মাঝি (নেতা) রাখাইনে মারামারি আগের থেকে আবার বেড়ে গেছে। রাতে ঘুম আসে না দেশের চিন্তায়। সবারই ঘুম নাই দেশের চিন্তায়। আরাকানে ১২ সালের পর থেকে মসজিদ বন্ধ করেছে। মানুষ ঘরে নামাজ পড়ে। "আমাদের এখানে থাকার ইচ্ছা নেই, সমস্যার সমাধান না হলে না হলে অন্য কোন দ্বীপে ফেলে দিক। আরাকান থেকে ইয়াবা আসে মগরা নিয়ে আসে। চিংড়ি মাছের ব্যবসা করে তারা আর ইয়াবায় ধরা পড়ে রোহিঙ্গা। আমাদের জীবন তো শেষ; কিন্তু সন্তানদের কী হবে এ চিন্তায় সারা দিন কাটে। আমাদের মত অসহায় লোক দুনিয়াতে আর কেউ নেই। সেখানে সেনা+মগ+ভিক্ষু এরা সকলে মিলে ঝামেলা করে। তারা (মগরা) মাছ, মুরগী, গাছের ফল সব জোড় করে নিয়ে যায়। মিয়ানমারে আমাদের খাওয়া পড়ার সমস্যা, বাজার করতে সমস্যা, জেল খানায় দিলে উকিলকে টাকা পয়সা দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হয়। সপ্তাহে ৭ দিনের মাঝে সেনাদের ৩ বার ফ্রি লেবার দিতে হবে এবং চাঁদা দিতে হবে। তারা মেয়েদেরও কাজ করতে বলে। আমাকে মেরে মেরুদন্ড ব্যাথা করেছে, সেখানে গরু মরে গেলেও টাকা দেয়া লাগছে। কে আই আই এর তথ্যে একজন মসজিদের ইমাম বলেন, মগরা সুন্দরি মেয়েদের নিয়ে ধর্ষণ করে মেরে ফেলে। আমাদের দুঃখের কথা আল্লাহ ছাড়া কারে কই। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের ন সুখ, শুকরিয়া যে, বাংলাদেশের সরকার আমাদের থাকতে দিয়েছে। আমাদের ভবিষ্যৎ আল্লাহ ছাড়া কেউ যানে না।

সারণী-৭.৮.২ঃ বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গাদের সামাজিক সমস্যা

চলক	শতকরা হার (n=৪০০)	
বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গাদের সমস্যা	হ্যাঁ	না
	২৪	৭৬

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট তাদের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জানতে চাইলে জানা যায় যে, শতকরা ২৪% রোহিঙ্গা উত্তরদাতার সামাজিক সমস্যা আছে এবং শতকরা ৭৬% রোহিঙ্গার সামাজিক সমস্যা নেই বলেছে।

চিত্র-৭.৮.১ঃ কি ধরণের সামাজিক সমস্যা আছে

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট তাদের সামাজিক সমস্যার ধরণ সম্পর্কে জানতে চাইলে জানা যায় যে, রোহিঙ্গাদের শতকরা ৩৩.৩% বিবাহ বিচ্ছেদ এর শিকার; ১৩.৬% চুরি/ডাকাতি/ছিন্তাই এর শিকার এবং শতকরা ৫৩.১% রোহিঙ্গার ঝগড়া-ঝাটি ও বাচ্চাদের মারামারি ধরণের সামাজিক সমস্যায় রয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামে আসার পরও কেউ কেউ নির্যাতন করেছে। তাদের সাথে মাতি না পারি (ঝামেলায় জড়িয়ে পরিনা)। অমাদের মুরগীগুলো বিশ খাওয়ায়ে মারে, গ্রামের মহিলারা আমাদের মারতে আসে। পুরুষ লোকেরা সমস্যা করে, বাংলাদেশের থাকার জন্য কেউ কেউ আবার বেইজ্জতী করে, গালা গাল করে। আমাদের পুরুষরা কাজের জন্য বন্দরে গেলে, ট্রাকে না পেলে মাটি কাটতে যায়। তাদের টাকাগুলো অনেক সময় স্থানীয়রা অন্ধকারে কেড়ে নেয়। ব্রিক ফিল্ডে কাজ করতে গেলেও সেখানে মারে। ঘনবসতি বলে আমাদের ঝামেলা বেশি হয়। চুরি ডাকাতি আগে বেশি হতো, এখন কম হয়। গরমের সময় পানির সমস্যা হয়, মুরার মাঝে (টিলা/পাহাড়) গাত করে (গর্ত করে) পানি নিয়ে আসতে হয়। পড়ার খরচ দিতে পারি না বলে ছেলেকে মাদ্রাসা থেকে বের করে দিয়েছে।

৭.৯ শরণার্থী শিবিরের পরিবেশগত বিষয়

সারণী-৭.৯.১ঃ আপনি কি রান্নার জ্বালানী সংগ্রহে বনের কাঠের ব্যবহার

চলক	শতকরা হার (n=৪০০)	
বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গাদের সমস্যা	হ্যাঁ	না
	১৯	৮১

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট বনে কাঠ কাটতে যাওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা যায় যে, শতকরা ১৯% উত্তরদাতা হ্যাঁ বলেছেন এবং শতকরা ৮১% না বলেছেন।

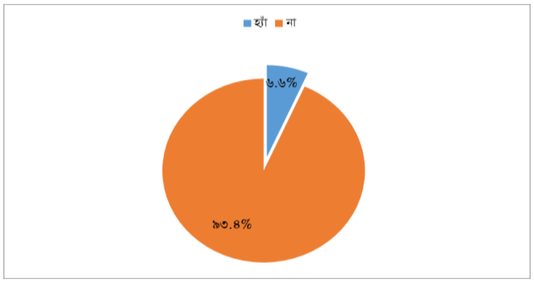

চিত্র-৭.৯.১ঃ আপনার পরিবারের অন্য সদস্যগণ বনে কাঠ কাটতে যান

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট বনে কাঠ কাটতে যাওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তাদের শতকরা ৬.৬% উত্তরদাতা হ্যাঁ বলেছেন এবং শতকরা ৯৩.৪% না বলেছেন।

চিত্র-৭.৯.৩ঃ প্রথমে এসে আপনার পরিবারের রান্নার জ্বালানী ব্যবহৃত হয়

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণ শতকরা ৫২.৫% জ্বালানী হিসেবে কাঠের ব্যবহার করেন; শতকরা ১৯% জ্বালানী হিসেবে নলখাগড়া ব্যবহার করেন; ১৫.৫% জ্বালানী হিসেবে গাছের শুকনা পাতা ব্যবহার করেন; ৯.৩% জ্বালানী হিসেবে কেরসীন তেলের ব্যবহার করেন এবং ২.৫% উত্তরদাতা জ্বালানী হিসেবে অন্যান্য কাঠের ব্যবহার করেন।

লেদা ক্যাম্পের একজন মাঝি জানান, আমাদের খাওয়া পড়ার অশান্তি আছে। বাচ্চারা মুরাতে গিয়ে লাকুড়ী কেটে আনে। স্থানীয়রা দা কেড়ে নেয়, মার দেয়। এক পার্টিকে টাকা পয়সা দিলে আর এক পার্টি মারা-ধরা করে। টাকা পয়সার কাজ করলে কিছু স্থানীয় সামান্য কিছু দেয় আবার দেয় না।

সারণী-৭.৯.১ঃ রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে নাগরিক সুবিধা লাভের প্রচেষ্টা

ভোটার হয়েছেন	হ্যাঁ	না

	--	১০০%
পাসপোর্ট আছে	হ্যাঁ	না
	--	১০০%

রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের উত্তরদাতাগণের নিকট থেকে নির্দিষ্টভাবে জানতে চাওয়া হলে তাদের শতভাগ (১০০%) উত্তরদাতা ভোটার হননি এবং পাসপোর্টও নেই বলে জানান।

নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্প এর একজন রোহিঙ্গা শিক্ষক বলেন, প্রথম দিকে যখন আমরা এখানে এসেছিলাম তখন এখানে অনেকে ভোটার হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এখন আর এই সুযোগ নেই, কারণ বায়োম্যাটিক রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর থেকে অনেকে ভোটার প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়েছে। এখানে কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়ার আশায় রোহিঙ্গারা স্মার্ট কার্ড করে থাকলেও এখন করার সুযোগ কমে গেছে।

৭.২ উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব (উখিয়া ও টেকনাফ)

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব বুঝতে যে দু'টি উদ্দেশ্যকে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা হলো নিম্নরূপ-

গ) রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন অনুসন্ধান ও

ঘ) রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক মিথস্ক্রিয়া অনুসন্ধান।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ন্যায় একইভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে পরিচালিত গবেষণা জরিপ কার্যক্রম এর আলোকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

৭.২.১ উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জনমিতিক পরিসংখ্যান

এ গবেষণায় প্রশ্নপত্র জরিপ পদ্ধতির ব্যবহার করে নির্দিষ্ট হারে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, বাসস্থান, বৈবাহিক অবস্থা ও সম্পর্ক, আয়, পেশা প্রভৃতি বিষয়ে জনমিতিক তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০১৭ সালে সর্বশেষ ১১ লাখ এর বেশি রোহিঙ্গা আগমনের পর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রায় কি ধরণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় যথাক্রমে মোট ৮(আট)টি গ্রামে বসবাসরত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে দ্বৈচয়ন ভিত্তিতে এ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে।

সারণী-৭.২.১ঃ গবেষণায় উত্তরদাতা পুরুষ-নারীর অংশগ্রহণ

	চলক	শতকরা হার (n=৪০০)
লিঙ্গ	নারী	৫০

	পুরুষ	৫০

উক্ত তালিকার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে মোট ৮টি (আট) গ্রামে উত্তরদাতাদের মধ্যে সমসংখ্যক পুরুষ শতকরা ৫০% ও নারী শতকরা ৫০% ছিল।

সারণী-৭.২.২ঃ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতাদের বয়স ও শিক্ষা

চলক		শতকরা হার (n=৪০০)
বয়স	১৮ বছর হতে ৩০ পর্যন্ত	১১.৫
	৩১ বছর হতে ৪০ পর্যন্ত	৪২
	৪১ বছর হতে ৫০ পর্যন্ত	৩০
	৫১ বছর হতে ৬০ পর্যন্ত	১৪.৫
	> ৬১ বছর হতে তদুর্ধ্ব পর্যন্ত	২
শিক্ষা	নিরক্ষর	২৫
	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	১৫.৫
	প্রাথমিক	১৯
	মাধ্যমিক/এসএসসি/দাখিল	২৭.৫
	উচ্চ মাধ্যমিক/এইচএসসি/আলিম	০৪
	বিএ/বিএসএস ও এমএ/এমএসএস	০২
	মাদ্রাসা	০৭

২০২০ সালে এ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনায় উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার আট (৮)টি গ্রামে মোট ৪০০ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে দৈচয়ন ভিত্তিতে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। সারণীর চার্টে দেখা যাচ্ছে এ গবেষণা কার্যক্রমে প্রধান উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বয়স ছিল ১৮ বছর থেকে শুরু করে ৬০ বছর এবং তদুর্ধ্ব পর্যন্ত। কারণ এ বয়সের উত্তরদাতাগণ তাদের জীবন-ধারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভেবে-চিন্তে উত্তর দিতে পারেন। এ গবেষণার ক্ষেত্রে ১৮ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত উত্তরদাতা রয়েছে শতকরা ১১.৫%; ৩১ বছর থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত উত্তরদাতা রয়েছে শতকরা ৪২%; ৪১ বছর থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত উত্তরদাতা রয়েছে শতকরা ৩০%; ৫১ বছর থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত উত্তরদাতা রয়েছে শতকরা ১৪.৫%; ৬১ বছর থেকে তদুর্ধ্ব বছর পর্যন্ত উত্তরদাতা রয়েছে শতকরা ০২%। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এ গবেষণায় ৬০ বছর থেকে তদুর্ধ্ব উত্তরদাতার সংখ্যা ছিল সবচেয়ে কম ০২% এবং ৩১ বছর থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত উত্তরদাতার সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি ৪২%। এ গবেষণা কার্যক্রমে প্রধান উত্তরদাতা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শিক্ষা বিষয়ক উত্তরে ছিল নিরক্ষরতা শতকরা ২৫%; স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ছিল ১৫.৫%; প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ছিল ১৯ ভাগ; মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ২৭.৫%; উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ৪%; বিএ/বিএসএস ও এমএএমএসএস ২% এবং মক্তব পর্যন্ত ৭% ছিল। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এ গবেষণায় উত্তরদাতাগণ নিরক্ষর ছিল অনেক বেশি ২৫% এবং

মাধ্যমিক বিদ্যালয় (এসএসসি/এইচএসসি) পর্যন্ত উত্তরদাতার সংখ্যা ছিল ২৭.৫%। সুতরাং এটি বলা যায় স্থানীয় সমাজে শিক্ষার প্রতি তুলনামূলকভাবে গুরুত্ব কম।

কুতুপালং গ্রামের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বাসিন্দা দলভিত্তিক আলোচনা বা এফজিডিতে বলেন, "রোহিঙ্গারা এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করায় স্থানীয় ভাষায় বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। এখন যদি তাদের বাংলাদেশি কারিকুলামে লেখাপড়া থাকে অর্থাৎ সার্টিফিকেট তাহলে তো আর কথাই নেই। আমাদের সন্তানদের সাথে তারা আগামীতে প্রতিযোগিতা করবে। এটা দেশের জন্য আগামীতে কতটুকু ক্ষতির কারণ হতে পারে তা এখনই বিবেচনায় নিতে হবে।"

৭.২.২ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বসবাস

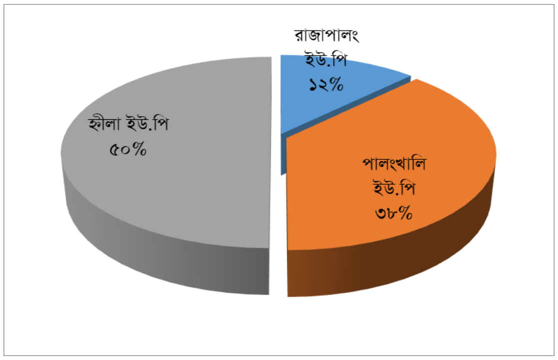

চিত্র-৭.২.২.১ঃ উত্তরদাতাদের ইউনিয়ন ভিত্তিক শতকরা হার

এ গবেষণা কার্যক্রমে উখিয়া উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ইউনিয়ন ভিত্তিক উত্তরদাতা সদস্য সংখ্যা ছিল রাজাপালং ১২%; পালংখালি ইউনিয়নে ছিলেন ৩৮% এবং টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ইউনিয়ন ভিত্তিক উত্তরদাতা সদস্য সংখ্যা ছিল হ্নীলা ৫০%। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এ গবেষণায় উভয় উপজেলায় উত্তরদাতাদের মধ্যে সমসংখ্যক সদস্য উত্তরদাতা থাকলেও সবচেয়ে বেশি ছিল হ্নীলা ইউনিয়নে (৫০%) এবং সবচেয়ে কম ছিল কুতুপালং ইউনিয়নে (১২%)।

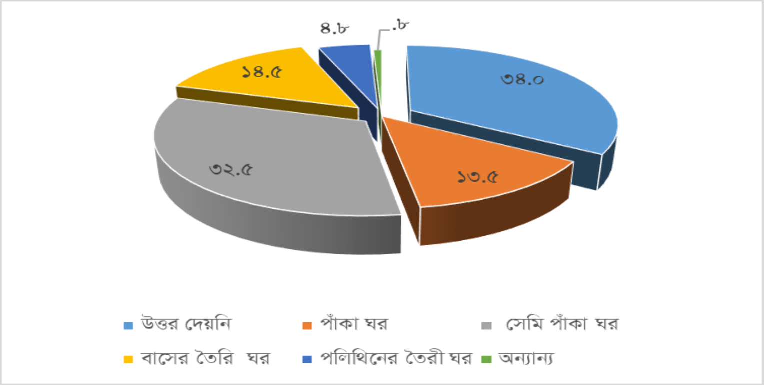

চিত্র-৭.২.২.২ঃ স্থানীয় উত্তরদাতাগণের আবাসস্থলের ধরণ

এ গবেষণা কার্যক্রমে উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উখিয়া ও টেকনাফ এলাকায় বসবাস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর ছিল নিম্নরূপ। স্থানীয় উত্তরদাতাগণের আবাসস্থলের ধরণ সম্পর্কে জানান পাঁকা ১৩%; সেমি পাঁকা ৩২.৫%; বাসের দ্বারা তৈরি ঘর ১৪.৫%; পলিথিনের দ্বারা তৈরি ঘর ৪.৮% এবং অন্যান্য এর মধ্যে রয়েছে ০.৮%। এছাড়া স্থানীয় উত্তরদাতাগণের তথ্য মতে, ৩০-৩৫ বছর বসবাস করছেন ১১%; স্থানীয় উত্তরদাতাগণের ৩৪% কোনো উত্তর প্রদানে আগ্রহী ছিলেন না।

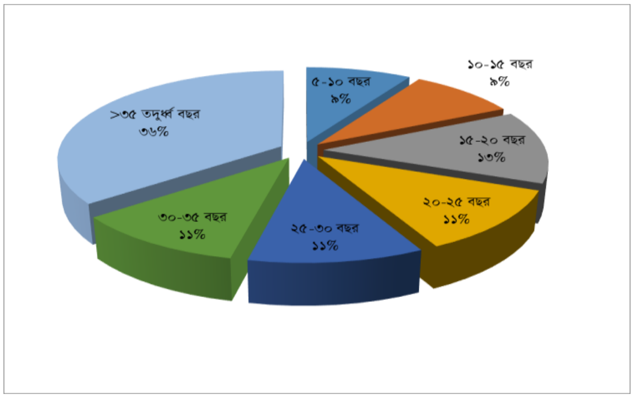

চিত্র-৭.২.২.৩ঃ স্থানীয় উত্তরদাতাগণ এখানে কতদিন যাবত বসবাস করছেন

এ গবেষণা কার্যক্রমে উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উখিয়া ও টেকনাফ এলাকায় বসবাস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর ছিল নিম্নরূপ। স্থানীয় উত্তরদাতাগণের তথ্য মতে, ৩৫ বছরের উর্ধ্বে বসবাস করছেন ৩৬%; ৩০-৩৫ বছর বসবাস করছেন ১১%; ২৫-৩০ বছর বসবাস করছেন ১১%; ২০-২৫ বছর বসবাস করছেন ১১%;স্থানীয় উত্তরদাতাগণের তথ্য মতে, ১৫-২০ বছর বসবাস করছেন ১৩%; স্থানীয় উত্তরদাতাগণের তথ্য মতে, ১০-০৫ বছর বসবাস করছেন ০৯%; ও স্থানীয় উত্তরদাতাগণের তথ্য মতে, ০৫-১০ বছর বসবাস করছেন ০৯%।

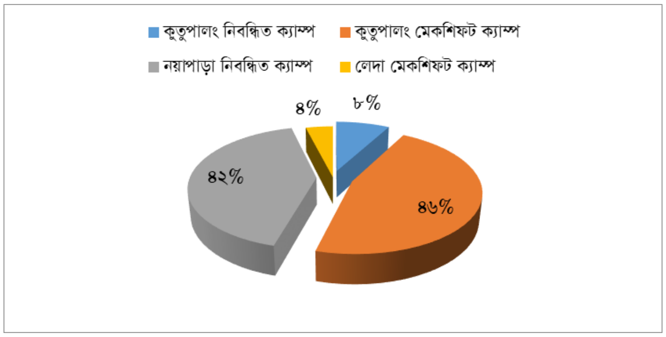

চিত্র-৭.২.২.৪ঃ স্থানীয় উত্তরদাতাগণ যে যে ক্যাম্পের নিকট বসবাস করছেন

এ গবেষণা কার্যক্রমে উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উখিয়া ও টেকনাফ এলাকায় পরিচালিত গবেষণা ক্যাম্পসমূহের কোন কোন ক্যাম্পের নিকট বসবাস করেন জানতে চাওয়া হলে উত্তর ছিল

নিম্নরূপ। কুতুপালং মেকশিফ্‌ট ক্যাম্পে ৪৬%; নয়াপাড়া নিবন্ধিত ক্যাম্পের নিকট বসবাস করেন ৪২%; কুতুপালং নিবন্ধিত ক্যাম্পের নিকট বসবাস করেন ৮% ও লেদা মেকশিফ্‌ট ক্যাম্পের নিকট বসবাস করেন ৪%।

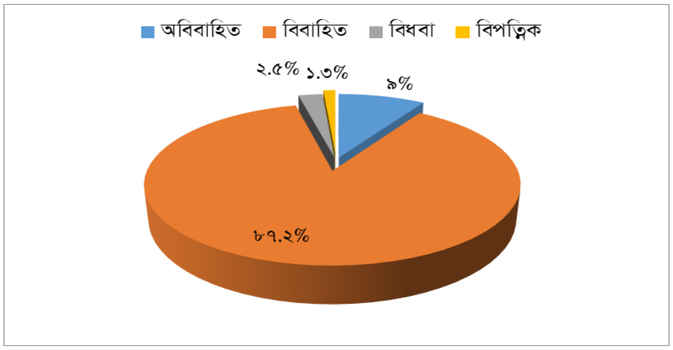

চিত্র-৭.২.২.৫ঃ উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা

এ গবেষণা কার্যক্রমে উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বৈবাহিক অবস্থা জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর ছিল নিম্নরূপ। উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার উত্তরদাতাগণের বৈবাহিক অবস্থা অবিবাহিত শতকরা মাত্র ৯%; বিবাহিত সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ৮৭.২%; বিধবা ২.৫% এবং বিপত্নিক ছিল ১.৩%। উক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে বিবাহিত জনগোষ্ঠীর সংখ্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৮৭.২%)।

কুতুপালং গ্রামের বাসিন্দা জানায়, নতুন আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বেশি অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। তারা স্থানীয়দের গরু ছাগল নিয়ে খেয়ে ফেলে। আমাদের এলাকায় আগে চুরি ডাকাতি এতো বেশি ছিল না। বর্তমানে চুরি ডাকাতি বেড়ে গেছে, স্থানীয়দের জমিদখল করে বসতি নির্মাণ ও বাগান বাড়ি দখল করা হয়েছে। গাছের কলা সুপারিসহ বিভিন্ন বিষয় পেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্থানী জনপ্রতিনিধির নিকট অভিযোগ করা হচ্ছে, কিন্তু কোনো প্রতিকার নেই। যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগের কারণে পরিবেশ ও বায়ু দুষণ বাড়ছে। স্থানীয় খাল বা ছড়ার পানি ব্যবহারে ও খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগের ফলে তা পান করার অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

৭.২.৩ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পেশা ও আয়

সারণী-৭.২.৩ঃ স্থানীয় উত্তরদাতাদের পেশা

ক্রমিক নং	পেশার ধারণ	শতকরা হার (n=৪০০)
১.	ক্ষুদ্র ব্যবসা	১৬.৫
২.	এনজিও কর্মী	১০.৮
৩.	ভূমি চাষ	৪.৩
৪.	দিনমজুর	২
৫.	পশু পালন	৬.৫

৬.	খামারী	৬.৫
৭.	ভ্যান/রিক্সা/টমটম	১.৩
৮.	সিএনজি চালক	৬
৯.	শিক্ষকতা	১.৮
১০	কাঠুরিয়া	১.৩
১১.	বেকার	৩.৮
১২.	দর্জির কাজ	৩.৮
১৩.	অন্যান্য	২৬.৮
১৪.	উত্তর প্রদান করেনি	৯

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতা সদস্যরা ১৩টি পেশায় জড়িত ছিলেন। এরমধ্যে উল্লেখিত এ সকল পেশার বাহিরে অন্যান্য পেশায় ২৬.৮% সবচেয়ে বেশি জড়িত রয়েছে। এরপর ক্ষুদ্র ব্যবসায় ১৬.৫%, এনজিও কর্মী ১০.৮%, ভূমি চাষ ৪.৩%, দিনমজুর ২%, খামারি ৬.৫% পশুপালন ৬.৫%, খামারী ৬.৫, রিক্সা/ভ্যান চালক ১.৩, ও সিএনজি চালক রয়েছে ৬%। স্থানীয়দের পেশার ক্ষেত্রে উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, উত্তরদাতাদের খুবই কম সংখ্যক সদস্য রয়েছে শিক্ষকতায় ১.৮% ও কাঠুরিয়া পেশায় ১.৩% জড়িত রয়েছে। আবার অনেক বেশি বেকার ৩.৮% বেকারও রয়েছে। এছাড়া ৯% উত্তরদাতা উত্তর প্রদান করা থেকে বিরত ছিল।

লেদার স্থানীয় বাসিন্দ ও টমটম চালক জানায়, গাড়ি চালাতে আমাদের লাইসেন্স লাগে, টমটম বা রিক্স চালাতে তাদের (রোহিঙ্গাদের) লাইসে লাগে না। টমটম চালক সমিতির পক্ষ থেকে রোহিঙ্গারা যেন লাইসেন্স ছাড়া টমটম, সিএনজি ও ট্রাক চালাতে না পারে এ জন্য প্রশাসনের নিকট প্রতিবাদ লিপি প্রদান করেছে। তার মতে, নিজের জায়গায় রোহিঙ্গারা ঘর করে বসবাস করে থাকলে টাকা পেতাম বলে জেল খাটা লেগেছে । পুলিশ স্থানীয়দের সম্পদে ভাগ বসাতে চায়। ফোনে ফোনে ইয়াবা ব্যবসা হয়। ধনীর ছেলেরা ইয়াবা খেয়ে নষ্ট হচ্ছে। আবার গরিবরা ইয়াবা বহন করে ধরা পড়ে জেল খাটে। যারা স্থানীয় হয়ে গেছে তারা প্রথমে অন্যদিকে ভোটার হয়ে পরে এখানে নিয়ে এসে ভোটার হয়।

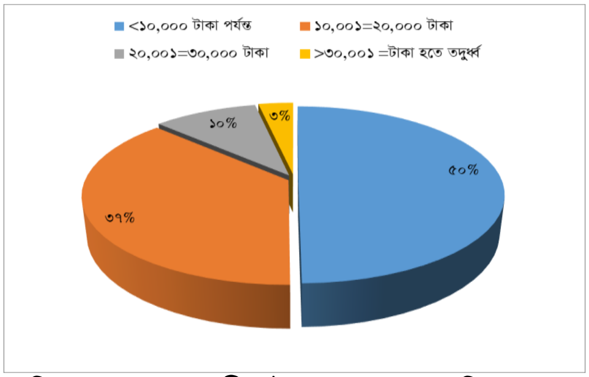

চিত্র-৭.২.৩.১ঃ স্থানীয় উত্তরদাতাদের মাসিক আয়

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতাগণের নিকট তাদের আয় সম্পর্কে জানা যায় যে, ১/-১০,০০০/ টাকা পর্যন্ত আয় করে শতকরা ৫০%; ১০,০০১/ থেকে ২০,০০০/ পর্যন্ত আয় করে শতকরা ৩৭%; ২০,০০১/ থেকে ৩০,০০০/ পর্যন্ত আয় করে শতকরা ১০% এবং ৩০,০০১/ থেকে তদুর্ধ্ব পর্যন্ত আয় করে শতকরা ৩% । সুতরাং উত্তরদাতা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের অর্ধেক সদস্য কম আয় করে থাকে এবং বেশি আয় করে থাকে মাত্র ৩% ।

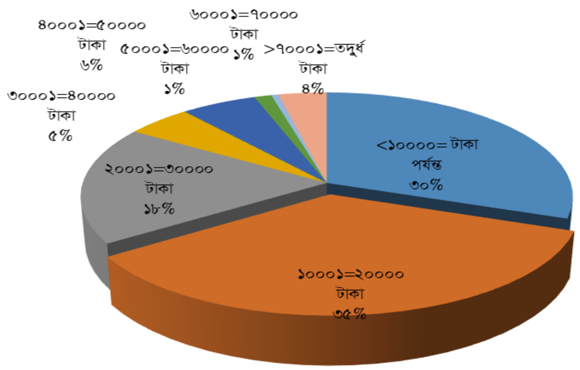

চিত্র-৭.২.৩.২: স্থানীয় উত্তরদাতাদের পরিবারের মাসিক আয়

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতাগণের নিকট তাদের আয় সম্পর্কে জানা যায় যে, ১০,০০/-এর নিচে আয় হয় শতকরা ৩০%; ১০,০০১/ থেকে ২০,০০০/ পর্যন্ত আয় করে শতকরা ৩৫%; ২০,০০১/ থেকে ৩০,০০০/ পর্যন্ত আয় করে শতকরা ১৮% এবং ৩০,০০১/ থেকে ৪০০০০/ পর্যন্ত আয় করে ৫%; ৫০০০১/-৬০০০০/ পর্যন্ত আয় হয় শতকরা ১%; ৬০০০১/-৭০০০০/ পর্যন্ত আয় হয় শতকরা ১% এবং ৭০০০১/ থেকে তদুর্ধ্বো পর্যন্ত আয় হয় ৪% ।

৭.২.৪ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপনে প্রভাব

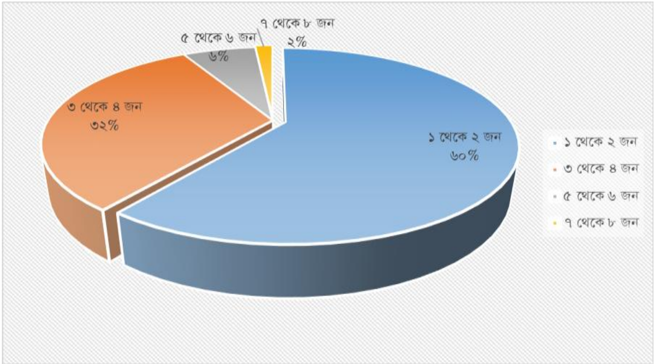

চিত্র-৭.২.৪.১ঃ স্থানীয় উত্তরদাতাদের উপার্জনকারী সদস্যদের সংখ্যা

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতাগণের নিকট তাদের উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে জানান, ১-২ জন পর্যন্ত রয়েছেন ৬০%; ৩-৪ জন পর্যন্ত রয়েছেন ৩২%; ৫-৬ জন পর্যন্ত রয়েছেন ৬% এবং ৭-৮ জন পর্যন্ত রয়েছেন ২% ।

সারণী-৭.২.৪ঃ শরণার্থী আগমনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপনে প্রভাব

শরণার্থী আসার প্রভাব	**শতকরা হার (n=৪০০)**
সঞ্চয় ভাঙ্গতে হয়েছে	৪৬.৮
খাদ্য ক্রয়ে প্রভাব পড়েছে	১৪
সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ কমাতে হয়েছে	৯.৮
স্বাস্থ্য খাতে কমাতে হয়েছে	৩.৮
অন্যান্য খাতে কমাতে হয়েছে	৬.৮

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতাদের যে সকল বিষয়ে প্রভাব পড়েছে সঞ্চয় ভাঙ্গতে হয়েছে ৪৬.৫%; খাদ্য ক্রয়ে প্রভাব পড়েছে ১৪%; সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ কমাতে হয়েছে ৯.৮%; স্বাস্থ্য খাতে খরচ কমাতে হয়েছে ৩.৮%; অন্যান্য খাতে খরচ কমাতে হয়েছে ৬.৮% ।

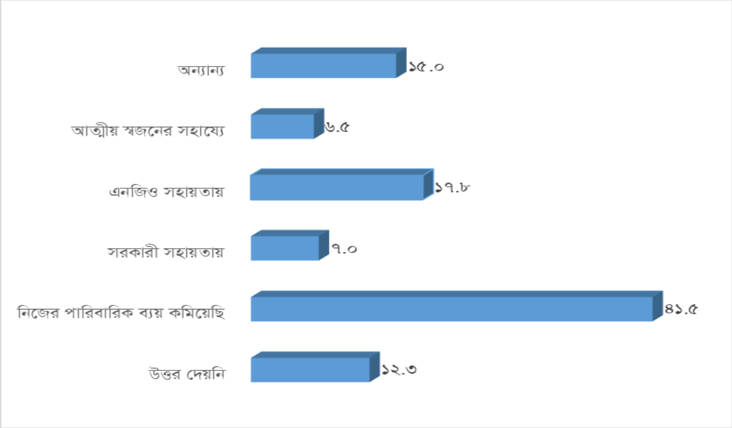

চিত্র-৭.২.৪.২ঃ স্থানীয় উত্তরদাতাদের এ ক্ষতি পুষিয়েছে

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ৪১.৫% উত্তরদাতা নিজের পরিবারের ব্যয় কমিয়েছে; ১৭.৮% উত্তরদাতা এনজিও সহায়তা পেরেছে; ৭% সরকারি সহায়তায় কমিয়েছে; ৬.৫% উত্তরদাতা আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে; ১৫% অন্যান্য মাধ্যমে কমিয়েছে। ১২.৩% উত্তরদাতা এ বিষয়ে উত্তর প্রদান করেনি।

৭.২.৫ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে রোহিঙ্গাদের সামাজিক সম্পর্ক

সারণী-৭.২.৫ঃ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে গড়ে ওঠা সম্পর্ক

	চলক	শতকরা হার (n=৪০০)
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে গড়ে ওঠা সম্পর্ক	হ্যাঁ	৫১
	না	৪৯

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক জানতে চাইলে উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠী উত্তরে হ্যাঁ বলেছেন ৫১% এবং না বলেছেন ৪৯% ।

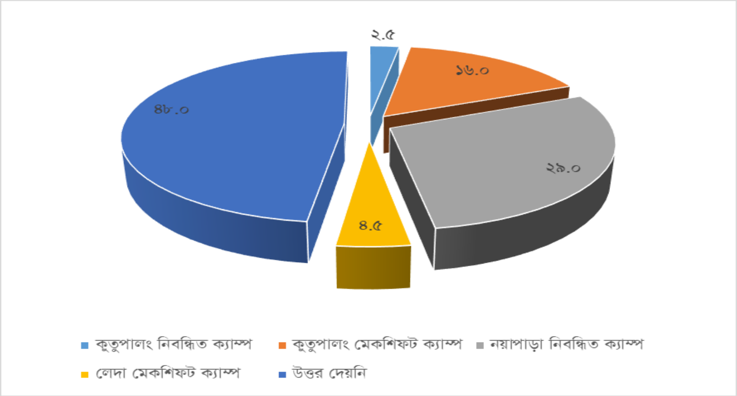

চিত্র-৭.২.৫.১ঃ উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে রোহিঙ্গাদের সম্পর্ক

এ গবেষণা কার্যক্রমে উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে রোহিঙ্গাদের সম্পর্ক বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর ছিল নয়াপাড়া নিবন্ধিত ক্যাম্প ২৯%; কুতুপালং নিবন্ধিত ক্যাম্প ২.৫%; লেদা মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প ৪.৫% এবং কুতুপালং মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প ২.৫% । তবে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়নি ৪৮% উত্তরদাতা।

সারণী-৭.২.৬ঃ একে অপরের বাড়িতে আসা-যাওয়া করে

	চলক	শতকরা হার (n=৪০০)
রোহিঙ্গাদের শিবিরে আসা-যাওয়া করেন	হ্যাঁ	১৩.৫
	না	৮৬.৫
রোহিঙ্গারা আপনার বাড়িতে আসা-যাওয়া করেন	হ্যাঁ	৩০.৩
	না	৬৯.৭
সবচেয়ে বেশি আসা-যাওয়া করে কে কে	আপনি নিজে	১০.৮
	আপনার স্ত্রী	২.৩

	সন্তান	২
	পরিবারের অন্যান্য সদস্য	.৫
	রোহিঙ্গা	১.৫
	রোহিঙ্গা পরিবারের সদস্য	১.৮
	উত্তর প্রদান করেনি	৮১.২

এ গবেষণা কার্যক্রমে উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর ছিল ১৩.৫% হ্যাঁ এবং ৮৬.৫% ছিল না। উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠী বাড়িতে রোহিঙ্গাদের আসা-যাওয়া সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর ছিল ৩০.৩% হ্যাঁ এবং ৭৯.৭% ছিল না। সবচেয়ে বেশি আসা-যাওয়া করেন কে কে এমন প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতা নিজে বলেছেন, ১০.৮%; স্ত্রী ২.৩%; সন্তান ২%; পরিবারের অন্যান্য সদস্য .৫%; রোহিঙ্গা শরণার্থী ১.৫%; রোহিঙ্গা পরিবারের অন্যান্য সদস্য ১.৮%। এছাড়া এ প্রশ্নের উত্তর দেননি ৮১.২% উত্তরদাতা।

সারণী-৭.২.৭ঃ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক

	চলক	**শতকরা হার (n=৪০০)**
স্থানীয় উত্তরদাতার সাথে রোহিঙ্গাদের আত্মীয়তার অবস্থা	হ্যাঁ	৬.৭
	না	৮৭
	উত্তর প্রদানে বিরত ছিল	৬.৩
এ আত্মীয়তা কার মাধ্যমে হয়েছে	আপনি নিজে	২.৩
	সন্তান	১.০
	পরিবারের অন্যান্য সদস্য	১.৮
	প্রতিবেশির মাধ্যমে	১.৫

এ গবেষণা কার্যক্রমে উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর ছিল ৬.৭% হ্যাঁ এবং ৮৭% না। এছাড়া ৬.৩% উত্তরদাতা উত্তর প্রদান করেনি। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আত্মীয়তা সম্পর্কিত বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এর

উত্তর ছিল নিজের মাধ্যমে ২.৩%; সন্তান ১%; পরিবারের অন্যান্য সদস্য ১.৮% এবং প্রতিবেশির মাধ্যমে ১.৫% উত্তরদাতার আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়েছে।

থাইংখালি গ্রামের একজন গ্রাম্য ডাক্তার বলেন, রোহিঙ্গা আগমনে স্থানীয়দের মধ্যে বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ হচ্ছে, বিয়ে সাদির সমস্যায় ঝামেলা বেড়েছে। ফলে সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে, ইয়াবা ব্যবসার প্রসার ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, স্থানীরা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নিবিড় সাক্ষাৎকারে কুতুপালং গ্রামের একজন স্থানীয় ব্যক্তি বলেন, স্থানীয়দের সাথে বিয়ে-শাদী বেড়ে গেছে। অনুমতি বা রেজিষ্ট্রেশন ছাড়া বিয়ে হচ্ছে। গ্রামের ছেলেরা আগে বউ থাকার পরও রোহিঙ্গা মেয়েদের বিয়ে করেছে। খেতে না পেরে স্থানীরা রোহিঙ্গা হয়ে যাচ্ছে। নয়াপাড়া গ্রামের একজন ব্যবসায়ী জানান, শরণার্থী শিবিরের জাদিমুরা ও দমদমিয়াতে প্রচুর রোহিঙ্গা স্থানীয় হয়ে গেছে। রোহিঙ্গারা আর কিছু দিন এখানে থাকলে আমরা এখানে থাকতে পারবো না। স্থানীয়রা প্রচুর হয়রানীর শিকার হচ্ছে, গাড়ীতে উঠলে প্রচুর চেক হচ্ছে। আমরা ছেলেরা ভবিষ্যত চিন্তা করে বসবাস করি না। রোহিঙ্গা নারীরা বিয়ে করলে সন্তান হলেও আবার অন্য জনের বিয়ে করে ফেলে। স্থানীরা টাকা নিয়ে দাদার খতিয়ানের কাগজ দিয়ে ভোটার তৈরি করে দেয় রোহিঙ্গাদের। নতুন প্রজন্মের জীবন কঠিন হবে। রোহিঙ্গাদের খাবার বন্ধ হলে বা ত্রাণ বন্ধ হলে দিনে দুপুরে ডাকাতি হবে। ছুরি মারামারি হবে, অশান্তি বাড়বে, এখানে কলা গাছ খেয়ে থাকারও ব্যবস্থা থাকবে না।

সারণী-৭.২.৮ঃ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত

	চলক	শতকরা হার (n=৪০০)
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত	হ্যাঁ	১২
	না	৮৭.২
	উত্তর দেয়নি	.৮

এ

গবেষণা কার্যক্রমে উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে রোহিঙ্গাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তরে হ্যাঁ ১২%; না ৮৭.২%। তবে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়নি .৮% উত্তরদাতা।

নয়াপাড়া গ্রমের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বলেন, স্থানীয়া তাদের নিকট থেকে দ্রব্য কিনতে বললেও তারা নিজেরাই ক্যাম্পে এখন লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করে এবং হয় সেখান থেকে ক্রয় করে না হয় সরাসরি চট্টগ্রাম বা কক্সবাজার থেকে পণ্য ক্রয় করে। স্থানীরা কিছু বললে তাদের সাথে সমস্যা হয়। তারা UNHCR-কে জানালে UNHCR স্থানীয় প্রশাসনকে বললে প্রশাসন ও পুলিশ স্থানীয়দের বিরুদ্ধে সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রয়োজনে স্থানীয়দের জেল খাটার ব্যবস্থা করে থাকে। নয়াপাড়া গ্রামের অপর একজন সবজী ব্যবসায়ী বলেন, রোহিঙ্গাদের নিকট ২৫ হাজার টাকা পাই কিন্তু বাকি টাকা না দিয়ে অন্য দোকান থেকে মাল ক্রয় করে। আমাদের প্রশাসন,

আমাদের পুলিশ, কিন্তু আমরা বাকি টাকা চাইতে গেলেও টাকা না পেয়ে জেলে যেতে হয়। আমরা কি দিয়ে ব্যবসা করব। তিনি আরও বলেন, আমি বলেছি এদের এখান থেকে ওপারে পাঠানো সহজ হবে না। প্রয়োজনে এরা যুদ্ধ করবে। ক্যাম্পের ভেতরে একটি গ্রুপ আছে যারা ডাকাতি করে ও ভাড়ায় খাটে।

সারণী-৭.২.৯ঃ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কারণে শ্রমবাজারে শ্রমের মজুরি হ্রাস-বৃদ্ধি

	চলক	**শতকরা হার (n=৪০০)**
রোহিঙ্গাদের কারণে স্থানীয় উত্তরদাতার শ্রমের মজুরি কমেছে	হ্যাঁ	৩৩.৭
	না	৬০.৩
	উত্তর দেয়নি	৬

এ গবেষণা কার্যক্রমে উত্তরদাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা উপস্থিতিতে মজুরি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উত্তর ছিল ৩৩.৭% হ্যাঁ এবং ৬০.৩% না। এছাড়া ৬% উত্তরদাতা উত্তর প্রদান করেনি।

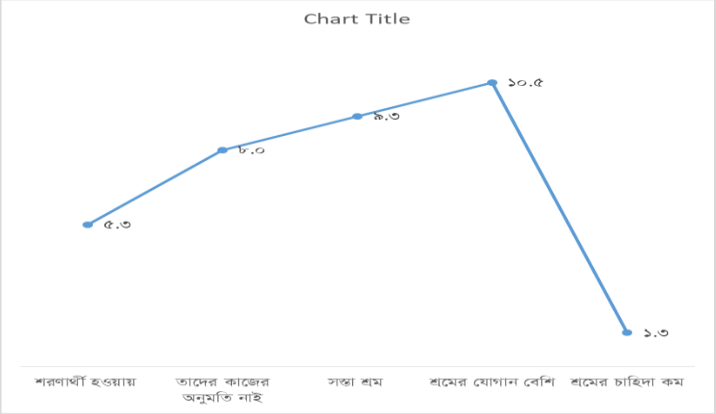

চিত্র-৭.২.৫.২ঃ কি কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মজুরি কমেছে

কি কি কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মজুরি কমেছে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর ছিল শরণার্থী উপস্থিতি ৫.৩%; তাদের কাজের অনুমতি নেই ৮%; সস্তা শ্রম ৯.৩%; শ্রমের যোগান বেশি ১০.৫% এবং শ্রমের যোগান কম ১.৩%।

এ্যাকশান এইড নামের এনজিও প্রতিনিধি বলেন, যারা যোগ্য তাদের কিছু চাকুরী হয়েছে। কিন্তু এর বাহিরে অনেক মানুষ রয়ে গেছে। যারা খুব একটা ভালো নেই। কুতুপালং এর কৃষক বলেন, তারা আমাদের জমি দখল করে বসবাস করছে। যে জমি থেকে আমরা ফসল পেতাম সে জামিতে ফসল হয় না। বালুখালি গ্রামের অনেক কৃষি জমি শরণার্থীদের ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক পণ্যে কৃষি

জমি বরাট হয়ে গেছে এবং এটি এখন চাষের অনুপোযোগী। এজন্য জমি ভাড়া দিলে ঘর প্রতি স্থানীয়রা ১০০/২০০ টাকা পায়। কুতুপালং গ্রামের স্থানীয় দোকানদার জানায়, আগে দোকানে বেচা বিক্রি বেশি ছিল এখন কমে গেছে। কারণ ক্যাম্পের ভেতরে রোহিঙ্গারা নিজেরাই দোকান দিয়েছে। আমাদের দোকান ভাড়া বেড়েছে কিন্তু বিক্রি আগের মতো নেই। আমরা সমস্যায় যে আছি তা কাউকে বলতে পারছি না। স্কুল, কলেজে ভর্তি হতে জন্ম নিবন্ধন জোগাড় করতে হয় টাকা দিয়ে। আবার মুচুনী গ্রামের স্থানীয়দের থেকে জানা যায়, কৃষি কাজ কমে যাওয়ায় এখন অধিকাংশ মুচুনী বাসী ক্ষুদ্র ব্যবসায় জড়িত হচ্ছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ও এখন আর আগের মতো বেচা বিক্রি নেই।

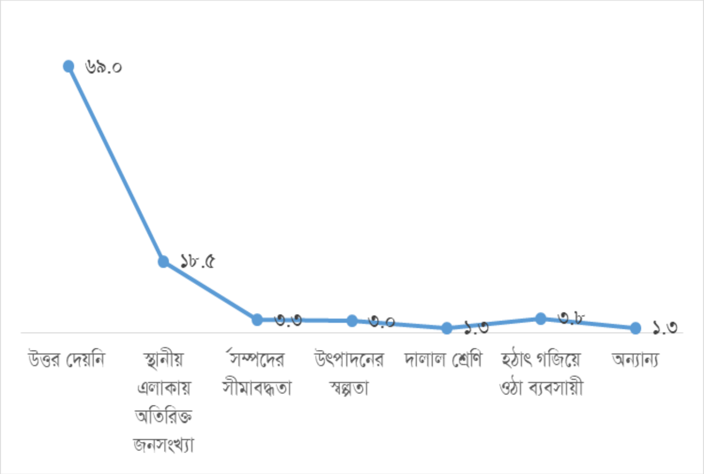

চিত্র-৭.২.৫.৩ স্থানীয় বাজরে শ্রমের মজুরি বৃদ্ধির কারণ

স্থানীয় শ্রম বাজারে শ্রমের মূল্য বৃদ্ধির কারণ জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর ছিল স্থানীয় এলাকায় অতিরিক্ত জনসংখ্যার উপস্থিতি ১৮.৫%; সম্পদের সীমাবদ্ধতা ৩.৩%; উৎপাদনের স্বল্পতা ৩%; দালাল শ্রেণির জন্য ১.৩%; হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ব্যবসায়ী ৩.৮% এবং অন্যান্য ১.৩%।

লেদা গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা জানায়, রোহিঙ্গা শরণার্থী আসার পর জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে গেছে। রোহিঙ্গারা কাপড়, কম্বল, ডাল, তেল বিক্রি করে অন্য কিছু ক্রয় করে, কিন্তু তারা চাছ, মাংস ও সবজী সহায়তা হিসেবে পায় না। এ জন্য মাছ ও শবজীর দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এবারের মতো শরণার্থী মানুষ অন্য বার দেখি নাই।

সারণী-৭.২.১০ঃ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রায় প্রভাব

	চলক	শতকরা হার (n=৪০০)
স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রায় প্রভাব	হ্যাঁ	৭৪
	না	২৪.৭
	উত্তর দেয়নি	১.৩

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রায় প্রভাব বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর হ্যাঁ ছিল ৭৪% এবং না ছিল ২৪.৭%। এছাড়া উত্তর প্রদানে বিরত ছিল ১.৩%।

সারণী-৭.২.১১ঃ জীবন-যাত্রায় প্রভাব ইতিবাচক-নেতিবাচক

	চলক	শতকরা হার (n=৪০০)
স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রায় প্রভাব	ইতিবাচক	২১.৮
	নেতিবাচক	৭২.৪
	উত্তর দেয়নি	৫.৮

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রায় প্রভাব নেতিবাচক না ইতিবাচক জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর ইতিবাচক ছিল ২১.৮% এবং নেতিবাচক ছিল ৭২.৪%। এছাড়া উত্তর প্রদানে বিরত ছিল ৫.৮%।

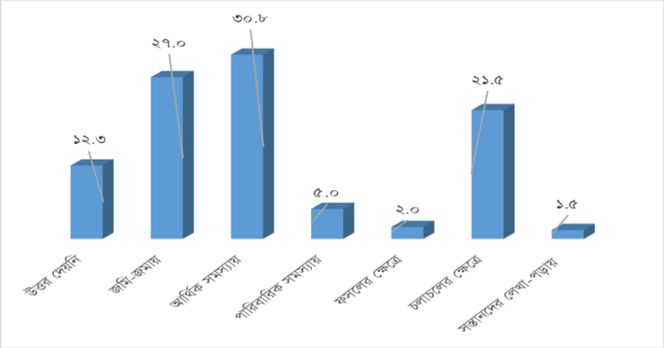

চিত্র-৭.২.৫.৪ঃ সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর আর্থিক সমস্যা ছিল ৩০.৮%; জমি-জমা সংক্রান্ত সমস্যা ছিল ২৭%; চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল ২১.৫%; পারিবারিক সমস্যা ছিল ৫%; ফসলের ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল ২% এবং সন্তানের লেখা-পড়ায় সমস্যা ছিল ১.৫%। এছাড়া উত্তর প্রদানে বিরত ছিল ৫.৮%।

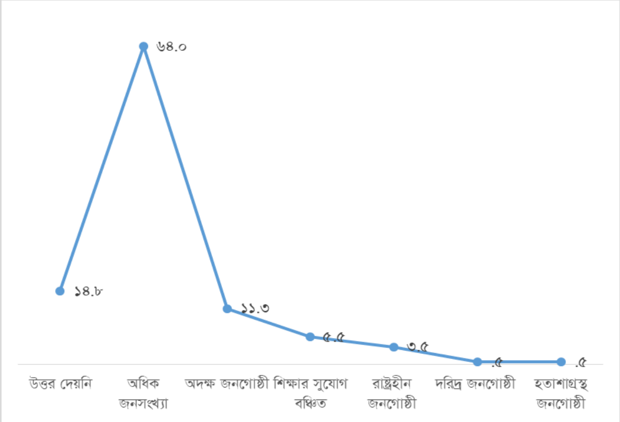

চিত্র-৭.২.৫.৫ঃ এ প্রভাব বেশি হওয়ার কারণ কি কি

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রায় বেশি প্রভাব হওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর অধিক জনসংখ্যা ছিল ৬৪%; অদক্ষ জনগোষ্ঠী ছিল ১১.৩%; শিক্ষর সুযোগ বঞ্চিত ছিল ৫.৫%; রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠী ছিল ৩.৫%; দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল .৫% এবং হতাশাগ্রস্থ জনগোষ্ঠী ছিল .৫%। এছাড়া উত্তর প্রদানে বিরত ছিল ১৪.৮%।

কুতুপালং এর স্থানীয় একজন কৃষক জানান, সন্তানদের লেখাপড়ার সমস্যা হচ্ছে, আগে লেখাপড়া করত, এখন করতে পারে না। আগে চাষ করতাম এখন চাষ করতে পারি না। ২ জনের পড়া লেখা বন্ধ। শরণার্থী আসায় এখন আয় কমে গেছে ক্ষেতে চাষ করতে পারি না। সব জায়গা-জমি তারা দখল করে নিয়েছে। দোকান ছিল-তবে এখন আর দোকান এখন নেই। রোহিঙ্গাদের সাহায্যে সেনাবাহিনী ক্যাম্প করতে গিয়ে দোকান ভেঙ্গে ফেলে। গরু-ছাগলের খাবারের সমস্যা-আগে গরু ছাগল যেখানে ঘাস খেতে পারতো সেখানে এখন ক্ষেত-খোলা না থাকায় গরু ছাগলের খাবার সমস্যা হয়। আমার ৪ টা গরু আছে। ৩টি ছাগল মারা গেছে খাবার না পেয়ে। ১টি ছাগল বাকী ছিল অন্য জায়গায় তা বর্গা (মোছার খোলা গ্রামে) দিয়েছি। বিরানী ভাত খেয়ে কয়েক জনের গরু ছাগল মারা গেছে। আমাদের চারপাশে রোহিঙ্গারা বসবাস করায় সমস্যা হয়, তারা ঝগরা-ঝাটি, চিল্লা-চিল্লি করে। রাতে ঘুমাতে সমস্যা হয়। আমাদের বাড়ির কল, ল্যাট্রিন, গোসলখানা রোহিঙ্গারা ব্যবহার করে নষ্ঠ করে ফেলেছে। প্রথম ২/৪ দিন আমাদের সাথে খাবার খেত কারণ ধান চাল ছিল। তারা আমাদের কাপড় চোপড় চুরি করে নিয়ে গেছে। মেয়ের বোরখা চুরি করে নেয়ায় মেয়ে স্কুলে যেতে পারে না।

সারণী-৭.২.১২ঃ আপনি বা আপনার পরিবার কৃষি কাজের সাথে জড়িত

	চলক	শতকরা হার (n=৪০০)
কৃষি কাজের সাথে জড়িত	হ্যাঁ	২৯
	না	৬৯.২
	উত্তর দেয়নি	১.৮

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কৃষির সাথে জড়িত কিনা এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর হ্যাঁ ছিল ২৯% এবং না ছিল ৬৯.৮%। এছাড়া উত্তর প্রদানে বিরত ছিল ১.৮%।

সারণী-৭.২.১৩ঃ শরণার্থী আগমনে কৃষিতে প্রভাব পড়েছে

	চলক	শতকরা হার (n=৪০০)
কৃষি প্রভাব পড়েছে	হ্যাঁ	৬২.৩
	না	২৮.৪
	উত্তর দেয়নি	৯.৩

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কৃষিতে প্রভাব পড়েছে কিনা এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর হ্যাঁ ছিল ৬২.৩% এবং না ছিল ২৮.৪%। এছাড়া উত্তর প্রদানে বিরত ছিল ৯.৩%।

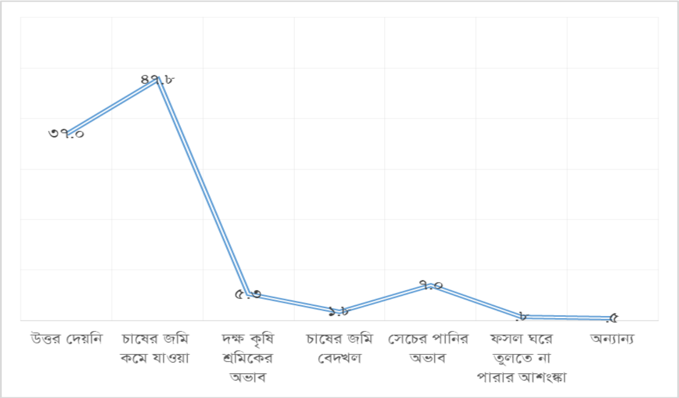

চিত্র-৭.২.৫.৬ঃ কৃষিতে কি কি ধরণের প্রভাব পড়েছে

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কৃষিতে কি কি ধরণের প্রভাব পড়েছে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর চাষের জমি কমে যাওয়া ছিল ৪৭.৮%; দক্ষ কৃষি শ্রমিকের অভাব; চাষের জমি বেদখল ১.৮%; সেচের পানির অভাব ৭%; ফসল ঘরে তুরতে না পারার আশংঙ্কা .৮% এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে .৫%। এছাড়া উত্তর প্রদানে বিরত ছিল ৩৭%।

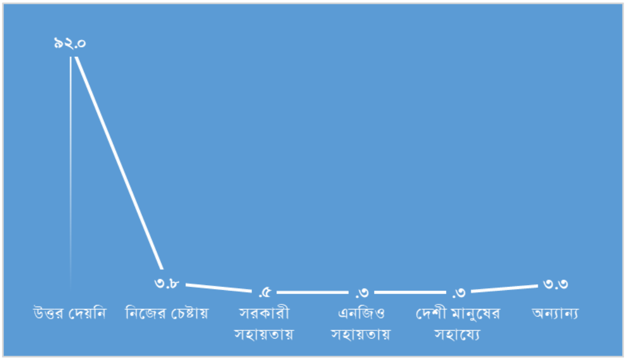

চিত্র-৭.২.৫.৭ঃ কৃষিতে প্রভাব কাটিয়ে উঠেছে

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কৃষিতে প্রভাব কাটিয়ে উঠেছে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর নিজের চেষ্টায় ছিল ৩.৮%; সরকারি সহায়তায় .৫%; এনজিও সহায়তায় .৩%; দেশি মানুষের সহায়তায় .৩% এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৩.৩%। এছাড়া উত্তর প্রদানে বিরত ছিল ৯২%।

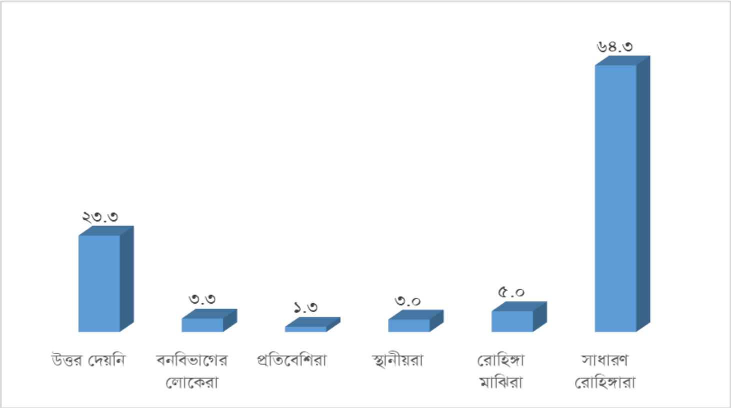

চিত্র-৭.২.৫.৮ঃ কৃষিতে প্রধান ঝুঁকি হয়

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কৃষিতে প্রধান ঝুঁকি করা জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর বনবিভাগের লোকেরা ছিল ৩.৩%; প্রতিবেশিরা ১.৩%; স্থানীয়রা ৩%; রোহিঙ্গা মাঝিরা ৫% এবং সাধারণ রোহিঙ্গারা ৬৪.৩%। এছাড়া উত্তর প্রদানে বিরত ছিল ২৩.৩%।

কৃষি কাজ নির্ভর দক্ষিন কুতুপালং এর একজন কৃষকের ৪ ছেলে ৪ মেয়ে। বসবাস করেন বনবিভাগ এর জমিতে, তার ৪/৫ কানি চাষের জায়গা-জমি ছিল বনবিভাগ থেকে লিজ (বন্দবস্ত) নেওয়া। ১০ টির ওপর গরু ছিল খাবার না পেয়ে মারা গেছে সবগুলো। বাড়ির জায়গা ও চাষের জায়গা ছিল মোট সাড়ে ১২ কানি, এখন জমির কাছেও যেতে পারি না। মরিচ তরকারী কিছ চাষ করি এবং ৯৫টি পরিবারের সরদারি করে। বাপ-দাদার চৌদ্দ পুরুষের এখনে বসবাস ছিল। ছেলে মেয়ে এখন রোহিঙ্গাদের মত। ছেলে মেয়েকে এখন পড়া লেখা করাতে পারি না। মানুষ মারা গেলেও বাড়ি থেকে বের হওয়া কষ্টকর। আশপাশে শুধু ঘর আর ঘর। প্রসাব পায়খানা করার জায়গা নেই। অনেকে এখন ছোট খাট পানের দোকান, মুদি দোকান করে চলে। প্রথম দিকে আমাদের বলেছে আমাদেরও ত্রাণ দিবে বা জায়গার ভাড়া দিবে। মাসে ২০০/- টাকা ভাড়া দেবে বলেছে। সেনাবাহিনী এসে আমাদের মারা-ধরা করে ভাড়া দিতে নিষেধ করেছে। স্থানীয় অনেক বিবাহিত লোকে ক্যাম্পেও থাকে আবার গ্রামে থাকে। গরু-ছাগল সবজী খেয়ে ফেলেছে, দাম পাওয়া যায় না। মিয়ানমারের সঠিক বিচার না হলে রোহিঙ্গারা এখান থেকে যাবে না বলেছে। এখন ট্যাবলেট (ইয়াবা) এর ব্যবসা বেড়ে গেছে। রোহিঙ্গা সংসারে পুরুষের তুলনায় মহিলা বেশি। ঘর তুলতে বাঁধা দেওয়ায় পুলিশ এসে মার দিয়েছে। দিনে ঘুমাতে পরি না। আম, কাঠাল, পেয়ারা সব খেয়ে ফেলেছে। সুপারির বাগান অল্প আছে এখন। আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত। আমাদের মেয়ে বিয়ে দেবার জন্য কেউ গাড়ি নিয়েও আসতে পারবে না। ছেলে মেয়েদের ভালো কপাল থেকে উঠে গেছে। মুই, তুই বলে রোহিঙ্গারা-আমি আপনি বলে স্থানীয়রা। রোহিঙ্গা মাঝিরা সেনাবাহিনীর সাথে মিলে কাজ করে। রোহিঙ্গারা ক্যাম্পে চাকুরী করে, এনজিওতে কাজ করে। "চেয়ারম্যান মেম্বররা বলেছে রোহিঙ্গাদের সাথে আর ঝামিলায় যেওনা তাহলে অনেক সমস্যা হয়ে যাবে।" আমাদের বাড়ি ঘর নষ্ঠ হয়ে গেছে কেউ খবর নেয়

না। আগে ১৫০ ফুট গভীরে গেলে পানি পাওয়া যেত। এখন ৮০০/১০০০ ফুট নীচে এনজিওরা পানির পাম্প করেছে। আমাদের শতকরা ৩০টি কল থেকে রোহিঙ্গা পানি নেয়। আমাদের টয়লেটে রোহিঙ্গাদের টয়লেট করতে নিষেধ করলে পুলিশ ও সেনাবাহিনী বকা দেয়। গাছের ফল পারতে নিষেধ করেছি। সেনাবাহিনীকে বিচার দিলে বলে গাছ কেটে ফেলেন। এখানে পরিবেশ পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে গেছে।

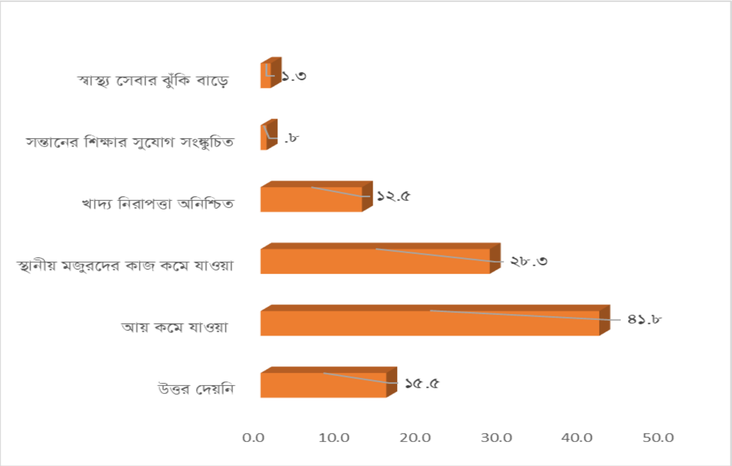

চিত্র-৭.৮ঃ কৃষির কোন কোন ক্ষেত্র ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কৃষির কোন কোন ক্ষেত্র ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে এর উত্তরে ছিল স্থানীয় দিন মজুরদের কাজ কমে যাওয়া ২৮.৩%; আয় কমে যাওয়া ৪১.৮%; খাদ্য নিরাপত্তা অনিশ্চিত ১২.৫%; সন্তানের শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হওয়া .৮% এবং স্বাস্থ্য সেবায় ঝুঁকি বাড়ে ১.৩%। এছাড়া উত্তর প্রদানে বিরত ছিল ১৫.৫%।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের মতে, অপরিকল্পিত শরণার্থী বসতির কারণে কৃষি জমি নষ্ট হয়েছে। কৃষির সাথে যারা জড়িত তাদের আগ্রহ হারিয়ে গেছে। কারণ স্থানীয়রা সংখ্যালঘু হওয়ায় তারা হতাশ হয়ে পড়ে। এনজিও আসায় স্থানীয়রা আগ্রহ হারিয়ে জমি ভাড়া দিয়েছে। ঘর তৈরি করে স্থানীয়রা রোহিঙ্গাদের কাছে ভাড়া দিচ্ছে। শুকনা সময় ছড়ার পানি সেচের জন্য স্থানীয়রা ধরে রাখত। খালের দুই ধারের জমিগুলো পড়ে আছে। প্রায় ৫০০ হেক্টর জমি পড়ে থাকছে। আশংকার বিষয় প্রভাবশালীরা এখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে চাচ্ছে। এখানে ৫০০০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি আছে। স্থানীয় খাদ্য ঘাটতি আরও দেখা দিতে পারে।

৭.২.৬ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ

সারণী-৭.২.১৪ঃ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষা গ্রহণে সমস্যা

	চলক	শতকরা হার (n=৪০০)
স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষা গ্রহণে সমস্যা	হ্যাঁ	৩৬.৫

	না	৫৬.৩
	উত্তর দেয়নি	৭.২

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষা গ্রহণে সমস্যা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর হ্যাঁ ছিল ৩৬.৫% এবং না ছিল ৫৬.৩%। এছাড়া উত্তর প্রদান করে নাই ৭.২% উত্তরদাতা।

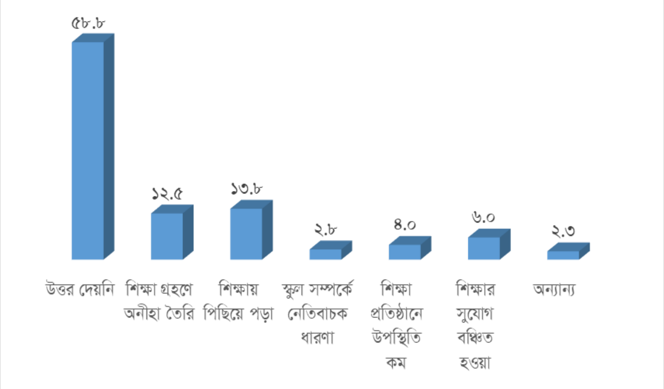

চিত্র-৭.২.৬.১ঃ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণে বিরূপ প্রভাব

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষায় বিরূপ প্রভাব পড়েছে যে যে বিষয়ে তার মধ্যে শিক্ষা গ্রহণে অনীহা তৈরি করেছে ১২.৫%; শিক্ষায় পিছিয়ে পড়েছে ১৩.৮%; স্কুল সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা ২.৮%; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি কম ৪%; শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত হওয়া ৬% এবং অন্যান্য ২.৩%। এছাড়া উত্তর দেয়নি ৫৮.৮% উত্তরদাতা।

হ্নীলা ইউনিয়নের স্থানীয় বাসিন্দা ও একজন জনপ্রতিনিধি জানান, ২০১৭ সালে রোহিঙ্গারা প্রথমে এসে স্কুলগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তখন স্কুলে পড়ালেখা হয়নি। এখন আবার রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মলমূত্র উন্মুক্ত খাল দিয়ে বিদ্যালয়ের ও বসত বাড়ির পাশে বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছে। সত্যিকার অর্থে এখানে পড়ালেখার কোনো পরিবেশ থাকার কথা নয়।

৭.২.৭ স্থানীয় পরিবেশগত বিষয়ক

সারণী-৭.২.১৫ঃ বনে আগের মতো সুবিধা পাওয়া যায়

	চলক	**শতকরা হার (n=৪০০)**
বনের আগের মতো সুবিধা পাওয়া	হ্যাঁ	৫.৮
	না	৯৪.২

স্থানীয় বনে আগের মতো সুবিধা পাওয়া যায় কিনা এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর হ্যাঁ ছিল ৫.৮% এবং না ছিল ৯৪.২%।

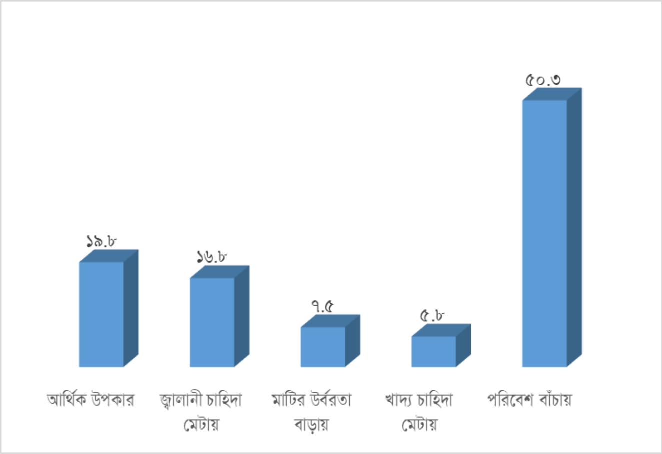

চিত্র-৭.২.৬.২ঃ বন কি কি উপকার আসে

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বনে আর্থিক উপকার ছিল ১৯.৮%; জ্বালানী চাহিদা মেটায় ১৬.৮%; মাটির উর্বরতা বাড়ায় ৭.৫%; খাদ্য চাহিদা মেটায় ৫.৮% এবং পরিবেশ বাঁচায় ৫০.৩%।

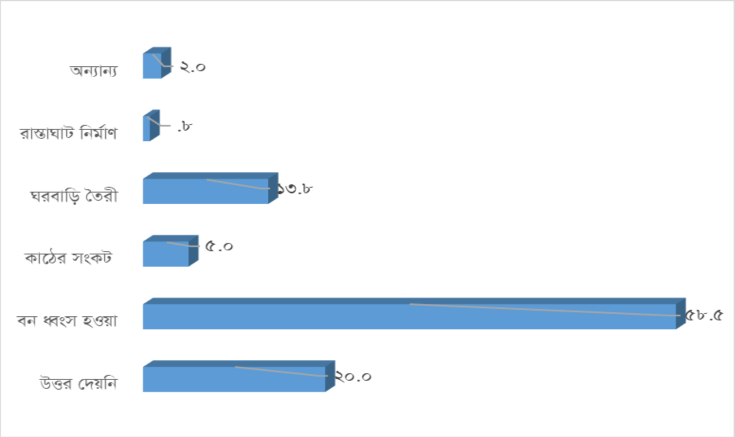

চিত্র-৭.২.৬.৩ঃ বনে আগের মতো সুবিধা না পাওয়ার কারণ

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বনে আগের মতো সুবিধা না পাওয়ার কারণ বন ধ্বংস হওয়া ৫৮.৫%; ঘরবাড়ি তৈরি ১৩.৮%; কাঠের সংকট ৫% এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ .৮%। এছাড়া উত্তর দেয়নি ২০%।

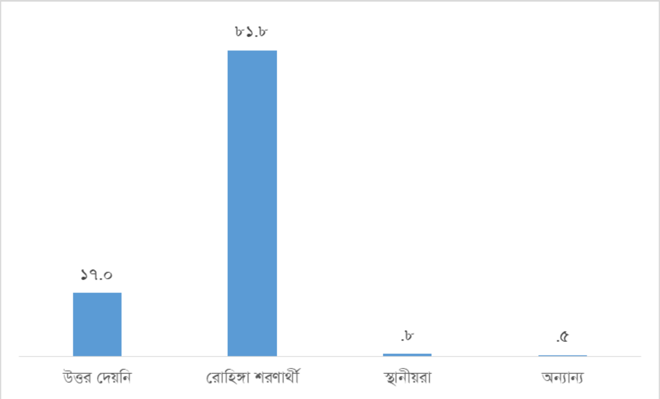

চিত্র-৭.২.৬.৪ঃ বন ধ্বংসে কারা দায়ী বলে মনে হয়

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বন ধ্বংসে দায়ী রোহিঙ্গা শরণার্থী ৮১.৮%; স্থানীয়রা দায়ী .৮% এবং অন্যান্য দায়ী .৫%। এছাড়া উত্তর দেয়নি ১৭%।

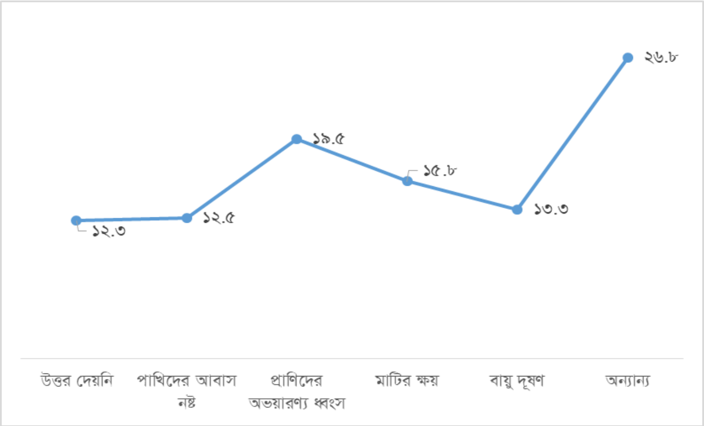

চিত্র-৭.২.৬.৫ঃ বন ধ্বংসে কি কি সমস্যা হয়েছে

স্থানীয় এলাকার বন ধ্বংসে সমস্যার পাখিদের আবাস নষ্ঠ ১২.৫%; প্রাণিদের অভয়ারাণ্য ধ্বংস ১৯.৫%; মাটির ক্ষয় ১৫.৮%; বায়ু দূষণ ১৩.৩ এবং অন্যান্য সমস্যা ২৬.৮%। এছাড়া উত্তর দেয়নি ১২.৩%।

টেকনাফ বন বিভাগের পক্ষ থেকে জানা যায়, সামাজিক বনায়নের স্থানীয় লোকেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আবর্জনা ও পাহাড় কাটার বালি এসে জমি নষ্ট হয়েছে। দলিলভূক্ত জায়গাও শরণার্থীরা বসে গেছে। যাদের জমি আছে ভাড়া পায় কেউ আবার কেউ পায় না। লোন নিয়ে মার্কেট ও ঘর তৈরী করেছি। টেনশন কাজ করছে মার্কেট করার কারণে। রোহিঙ্গাদের মধ্যে হিংশ্রতা বেশি। রোহিঙ্গারা মাদক ব্যবসার সাথে জড়াচ্ছে, এখন মাদক সেবী বেড়ে গেছে। স্থানীয়রাও জড়িত। স্থানীয়রা সহজে ক্যাম্পে আসে। ১০% রোহিঙ্গা এখানে বিয়ে শাদী করেছে। যৌতুক প্রথা চালু আছে ক্যাম্পে, বাল্য বিয়ে চালু আছে। স্থানীয়দের মধ্যে যৌতুক প্রথা চালু নেই। চাষবাস বন্ধ, বিভিন্ন সমস্যা, লাকড়ী নাই আবার দাম বেশি। প্লাষ্টিক বতলে ফসলের মাঠ ভরে গেছে, তাতে চাষ হয় না। আগের মত চলতে পারছে না। কিছু কিছু সাহায্য আসে। কেউ গ্যাস পায়, ক্যাম্পে (বোম মটর) মটর দেয়ার কারণে আমাদের কলে পানি সমস্যা হয়। গোপনে বিয়ে হয়। কি করে চলবে এখন টেনশনে আছে স্থানীয়রা। তাই কাঠুরিয়া-জেলেসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ এখন টমটম চালায়। পালংখালি গ্রামের একজন পল্লী চিকিৎসক জানান, ব্রিটিশ আমল থেকে এখানে বনবিভাগের পাশাপাশি বনকর্মী হিসেকে গ্রামীরা বন পাহারা দেয়। এ জন্য তখন থেকেই গ্রামীদের ৫/৭ কানি করে জমি বন্তবস্তি বা লিজ দেয় সরকার। তাদের বলা হতো 'ভিলিজার' বা বনকর্মী। শরণার্থী উপস্থিতির ফলে এই ভিলিজারদের এখন উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে তোমরা সরকারী খাস জমিতে বাস করো, ৩০ বছরের খাজনা বাকি

আছে। এভাবে বিভিন্ন ভয়ভীতি দেখিয়ে সরকারের লোকজন স্থানীয়দের অন্যত্র চলে যেতে বলেছে। কিন্তু এরা অধিকাংশই গরিব মানুষ। তাই অন্যত্র যাবার জায়গাও নেই।

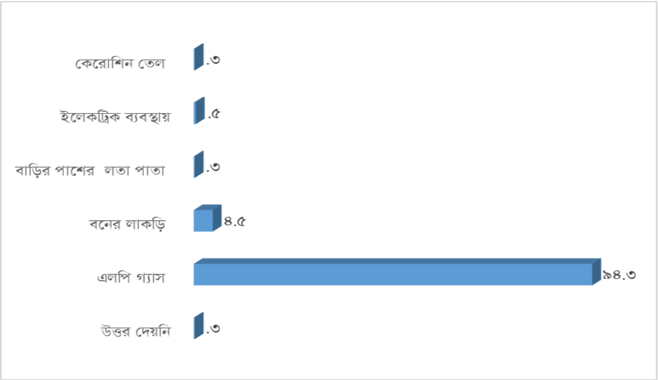

চিত্র-৭.২.৬.৬ঃ রান্নার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার

স্থানীয় এলাকার মানুষ রান্নার জ্বালানী হিসেবে এলপি গ্যাস ব্যবহার করে ৯৪.৩%; বনের থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করে ৪.৫%; বাড়ির পাশের লতা পাতায় .৩%; ইলেকট্রিক ব্যবস্থায় .৫% এবং কেরশিন তেল .৩%। এছাড়া উত্তর দেয়নি .৩%।

সারণী-৭.২.১৬ঃ জ্বালানী সংগ্রহে বর্তমানে কোনো সমস্যাবোধ করছেন

	চলক	শতকরা হার (n=৪০০)
জ্বালানী সংগ্রহে সমস্যা হচ্ছে	হ্যাঁ	৪৬
	না	৫৪

স্থানীয়দের জ্বালানী সংগ্রহে বর্তমানে কোনো সমস্যাবোধ করছেন কিনা এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এর উত্তর হ্যাঁ ছিল ৪৬% এবং না ছিল ৫৪%।

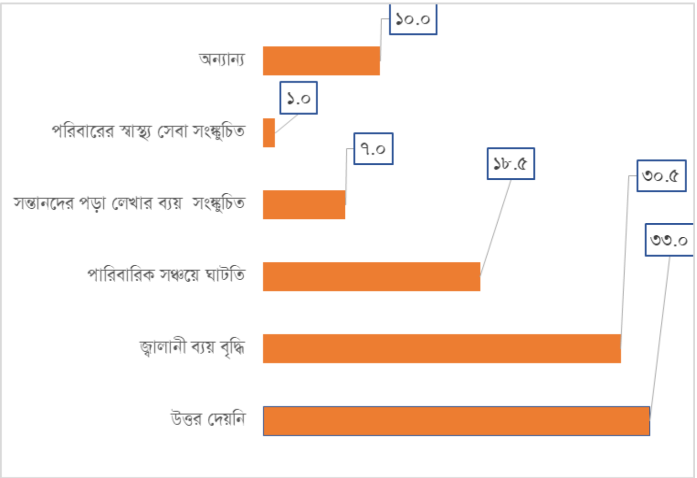

চিত্র-৭.২.৬.৭ঃ জ্বালানী সংকটে পরিবারর ওপর কি কি প্রভাব তৈরি করেছে

স্থানীয় এলাকার মানুষ রান্নার জ্বালানী সংকটে পরিবারের ওপর কি কি প্রভাব তৈরি করেছে জ্বালানী ব্যয় বৃদ্ধি ৩০.৫%; পারিবারিক সঞ্চয়ে ঘাটতি পড়েছে ১৮.৫%; সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যয় সংঙ্কুচিত ৭%; পরিবারের স্বাস্থ্য সেবা সঙ্কুচিত ১% অন্যান্য ১০%। এছাড়া উত্তর দেয়নি ৩৩% উত্তরদাতা।

দক্ষিণ বনবিভাগ, কক্সবাজার এর মতে, এ বনবিভাগের গেজেটভূক্ত সংরক্ষিত বনভূমিতে ৩৩টি রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প গড়ে উঠেছে। উক্ত জনগোষ্ঠীর বনভূমিতে বসবাসের ফলে একদিকে যেমন বনভূমি জবর দখল হয়েছে অন্যদিকে তাদের জীবিকার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বনভূমির গাছ কর্তন ও পাচারে লিপ্ত হয়। এ বিপুল পরিমাণে জনগোষ্ঠীর জ্বালানী চাহিদা মেটাতে বনভূমি হতে ব্যাপক জ্বালানী সংগ্রহ, পাহাড় কর্তন ও মাটি বিক্রি, অবৈধভাবে কাঠ ও অন্যান্য বনজ দ্রব্য পাচার কাজে শ্রমিক হিসেবে রোহিঙ্গাদের ব্যবহার, তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গণস্বাস্থ্য, পয়:নিষ্কাশন, সামাজিক কর্মকাণ্ড, গণযোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিরুপ প্রভাব পড়ে। প্রথমত রোহিঙ্গাদের জন্য ৬১৬৪.০২ একর বনভূমিতে বসবাসের অনুমতি পেলেও পরে অবশ্য তাদের জন্য ৮০০০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়।

সারণী-৭.২.১৭ঃ উখিয়া ও টেকনাফে শ্রেণিভিত্তিক বনভূমির পরিমাণ-২০১৫

উপজেলাসমূহ	রক্ষিত বন	সংরক্ষিত বন	সর্বমোট বনভূমি
উখিয়া উপজেলা			
১. উখিয়া রেঞ্জ	১৮৬৫.২১ হেক্টর	৭৫১৩.৩৭ হেক্টর	৯৩৭৮.৫৮ হেক্টর
২. ইনানী রেঞ্জ	৪৩৩.২১ হেক্টর	৭৭৬৯.৬৩ হেক্টর	৮৪০২.৬৯ হেক্টর
	রক্ষিত বন	**সংরক্ষিত বন**	**সর্বমোট বনভূমি**
টেকনাফ উপজেলা			
১. টেকনাফ রেঞ্জ	৫৭৬.১৬ হেক্টর	৬০১৫.০৯ হেক্টর	৬৬৬১.৯০ হেক্টর
২. হোয়াইক্যং রেঞ্জ	১০.৮৭ হেক্টর	৫১৮৬.৩০ হেক্টর	৫১৯৭.১৬ হেক্টর
৩. শিলখালী রেঞ্জ	২২.২১ হেক্টর	২৯৫৬.২৭ হেক্টর	২৯৭৮.৪৮ হেক্টর

(সূত্র: দক্ষিণ বনবিভাগ, কক্সবাজার-২০১৫)

দক্ষিণ বনবিভাগ, কক্সবাজারের তথ্য মতে, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার শ্রেণিভিত্তিক বনভূমির পরিমাণ দেখানো হয়েছে। দুটি উপজেলায় মোট পাঁচটি রেঞ্জ অফিস রয়েছে। এই রেঞ্জের মধ্যে রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনভূমি রয়েছে। এর মধ্যে শত শত হেক্টর বনভূমিতে রোহিঙ্গা জনবসতি গড়ে উঠেছে।

সারণী-৭.২.১৮ঃ উখিয়া ও টেকনাফে শ্রেণিভিত্তিক বনভূমির পরিমাণ-২০১৫

উপজেলাসমূহ	প্রাকৃতিক বন	সৃজিত বন	সামাজিক বনায়ন	সর্বমোট বনভূমি
উখিয়া উপজেলা	১৩৯৬২.৫০ হেক্টর	১০৬৮ হেক্টর	১৮০৪.৪০ হেক্টর	১৬৮৩০.৯০ হেক্টর
টেকনাফ উপজেলা	৮০৫৩.৩৬ হেক্টর	১৮০৫.০ হেক্টর	২০০০.৭ হেক্টর	১১৮৫৯ হেক্টর

(সূত্র: দক্ষিণ বনবিভাগ, কক্সবাজার-২০১৫)

দক্ষিণ বনবিভাগ, কক্সবাজারের তথ্য মতে, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার শ্রেণিভিত্তিক বনভূমির পরিমাণ দেখানো হয়েছে। এ দুটি উপজেলায় মধ্যে প্রাকৃতিক, সৃজিত ও সামাজিক বনায়ন রয়েছে। বন বিভাগের তথ্য মতে এ সকল বনভূমির অনেক বনায়ন ধ্বংস হয়েছে। নিম্নে এর পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো।

সারণী-৭.২.১৯ঃ উখিয়া ও টেকনাফে শ্রেণিভিত্তিক বনভূমি ধ্বংস হওয়া পরিমাণ-২০২০

বনভূমিতে অবস্থান	প্রাকৃতিক বন	সৃজিত বন (সামাজিক বনায়ন)	সর্বমোট বনভূমি
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী	৪১৩৬.৫২ একর	২০২৭.৫০ একর	৬১৩৬.৫২ একর

(সূত্রঃ দক্ষিণ বনবিভাগ, কক্সবাজার-২০২০)

দক্ষিণ বনবিভাগ, কক্সবাজারের তথ্য মতে, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার শ্রেণিভিত্তিক ধ্বংস হওয়া বনভূমির পরিমাণ দেখানো হয়েছে। এ দুটি উপজেলায় মধ্যে প্রাকৃতিক, সৃজিত বা সামাজিক বনায়ন ধ্বংস হয়েছে।

সারণী-৭.২.২০ঃ উখিয়া রেঞ্জ ও টেকনাফ রেঞ্জ এর অধীনে বনভূমির পরিমাণ-২০১৫

উখিয়া উপজেলা			
ক্রমিক নং	**রেঞ্জসমূহ**	**বিটসমূহ**	**হেক্টর**
১.	উখিয়া রেঞ্জ	১.উখিয়া সদর বিট ২. ওয়ালাপালং বিট ৩.দোছড়ি বিট ৪. ভালুকিয়া বিট ৫.হলুদিয়াপালং বিট ৬. থাইনখালী বিট ৭.উখিয়ার ঘাট বিট ৮.মোছার খোলা টহল ফাঁড়ি	৮৬৭০.০৭ হেক্টর
২.	ইনানী রেঞ্জ	১. ইনানী সদর বিট ২.জালিয়াপালং বিট ৩. সোয়ানখালী বিট ৪. রাজাপালং বিট	৮২০২.৮৪ হেক্টর
টেকনাফ উপজেলা			
	রেঞ্জসমূহ	**বিটসমূহ**	**হেক্টর**
১.	টেকনাফ রেঞ্জ	১. টেকনাফ বিট ২. হ্নীলা বিট ৩. মোচনী বিট ৪. মধ্যহ্নীলা বিট	৬৫৯১.২৫ হেক্টর
২.	শিলখালী রেঞ্জ	১. শিলখালী বিট ২. রাজারছড়া বিট ৩. মাথাভঙ্গা বিট	২৯৭৮.৪৮ হেক্টর
৩.	হোয়াইক্যাং রেঞ্জ	১. হোয়াইক্যাং বিট ২. রইক্ষ্যং বিট ৩. শাপলাপুর বিট ৪. মনখালী বিট	৫১৯৭.১৭ হেক্টর

- সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি কার্যক্রম শুরু হয় ২০০১ সালে
- উখিয়া রেঞ্জ ও টেকনাফ রেঞ্জ এর অধীনে সামাজিক বনভূমির পরিমান- ৩৮০৫.১০ হেক্টর
- উখিয়া রেঞ্জ ও টেকনাফ রেঞ্জ এর অধীনে **রক্ষিত ও সংরক্ষিত** বনভূমির পরিমান- ২৮৬৮৯.৯০ হেক্টর। (সূত্রঃ দক্ষিণ বনবিভাগ, কক্সবাজার-২০২০)

দক্ষিণ বনবিভাগ, কক্সবাজারের তথ্য মতে, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার রেঞ্জ ও বিটভিত্তিক বনভূমির পরিমাণ দেখানো হয়েছে। উক্ত দুটি উপজেলায় মোট পাঁচটি রেঞ্জ অফিসের অধিনে ২৩টি

বিট রয়েছে। এই রেঞ্জের মধ্যে রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনভূমি রয়েছে। এর মধ্যে শত শত হেক্টর বনভূমিতে রোহিঙ্গা জনবসতি গড়ে উঠেছে।

সারণী-৭.২.২১ঃ রোহিঙ্গাদের জন্য নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনা

অস্থায়ী ঘর নির্মাণ	নলকূপ স্থাপন	ল্যাট্রিন	গোসলখানা স্থাপন
২,১২,৬০৭ টি	৯৬৩৯ টি	৫৭,৩৬৩ টি	১৮,৫২২ টি
বিদ্যুৎ লাইন	**সংযোগ সড়ক**	**গুদাম নির্মাণ**	**খাল খনন**
২০ কি. মি.	৩৪.৬০ কি. মি.	২০ টি	৩০ কি. মি.

(সূত্রঃ দক্ষিণ বনবিভাগ, কক্সবাজার-২০২০)

দক্ষিণ বনবিভাগ, কক্সবাজারের তথ্য মতে, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য উক্ত অস্থায়ী ঘর নির্মাণ, নলকূপ ও ল্যাট্রিন এবং গোসলখানা স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ রাইন, সংযোগ সড়ক, গুদাম নির্মাণ ও খাল খনন করেছে।

সারণী-৭.২.২২ঃ রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য জ্বালানী

সরবরাহ পণ্য	রোহিঙ্গাদের জন্য	স্থানীয় জনগোষ্ঠী
এলপিজি গ্যাস	১,৯২,৫৪৭ টি	২০,০৫৩ টি

(সূত্রঃ দক্ষিণ বনবিভাগ, কক্সবাজার-২০২০)

দক্ষিণ বনবিভাগ, কক্সবাজারের তথ্য মতে, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য উক্ত এলপিজি গ্রাস সরবরাহ করা হয়েয়ে।

সারণী-৭.২.২৩ঃ মাদক উদ্ধারের কয়েক বছরের খতিয়ান

সাল	মোট মামলা	গ্রেফতার	উদ্ধারকৃত আলামত
২০১৬	১৫৬	১৬২	ইয়াবা-২০,৩০৬ পিস, গাঁজা-৪৮৬০ কেজি ও অন্যান্য
২০১৭	২৫১	২৬০	ইয়াবা-৮৫,৫৭৮ পিস, হেরোইন-৩৬ গ্রাম ও অন্যান্য
২০১৮	৩০৩	৩২৮	ইয়াবা-৪,৭১,৫২৪ পিস, সিডাক্সিন ইজেকশন-৫৪৯৪০ এ্যাম্পুল, গাঁজা-১০,৩৫৫ কেজি ও অন্যান্য
২০১৯	৩৯২	৪৪০	ইয়াবা-২,২৪,৪৬৩৮ পিস, শিশা-১৩,৬৫০ কেজি, গাঁজা-৪৮৬০ কেজি ও অন্যান্য

সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার কার্যালয়, কক্সবাজার, ২০২০

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার এর মতে, উপরের তালিকায় প্রাপ্ত মাদকদ্রব্য আলামত হিসেবে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে, প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসেবে রয়েছে ইয়াবা টেবলেট এর পরিমাণ। যা অন্যান্য মাদকের ন্যায় প্রতিনিয়ত ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদ্ধারকৃত এ সকল মাদকের সরবরাহ মিয়ানমার থেকে আগত মাদক কারবারী ও সেবনকারী হিসেবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষও রয়েছে।

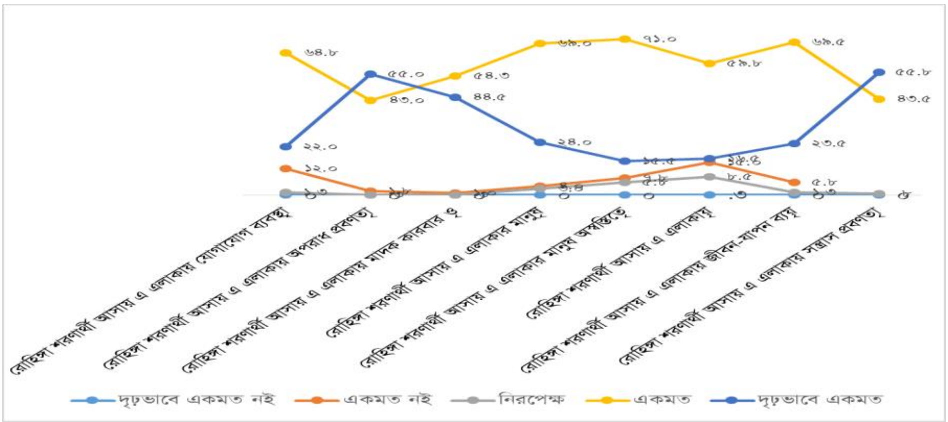

চিত্র-৭.২.৭.২ঃ লিকার্ড স্কেলের মাধ্যমে বিভিন্ন মতামত জানতে চাওয়া হয়

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিকট মতামত জানতে চাওয়া হয় রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যহত হয়েছে কিনা ৬৮.৮% উত্তরদাতা একমত পোষণ করেন এবং ২২% উত্তরদাতা দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। তবে, ১২% উত্তরদাতা একমত নয় বলে মতামত প্রদান করেন।

রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে ৫৫% উত্তরদাতা দৃঢ়ভাবে একমত বলে জানান এবং ৪৩% উত্তরদাতা একমত বলে মতামত দিয়েছেন।

রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় মাদক কারবার বেড়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে ৫৪.৩% উত্তরদাতা দৃঢ়ভাবে একমত বলে জানান এবং ৪৪.৫% উত্তরদাতা একমত বলে মতামত দিয়েছেন।

রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকার মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে কিনা জানতে চাওয়া হলে ৬৯% উত্তরদাতা দৃঢ়ভাবে একমত বলে জানান এবং ২৪% উত্তরদাতা একমত বলে মতামত দিয়েছেন। রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকার মানুষ অস্বস্তিতে আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে ৭১% উত্তরদাতা দৃঢ়ভাবে একমত বলে জানান এবং ১৫% উত্তরদাতা একমত বলে মতামত দিয়েছেন। রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় বেআইনী/অনানুষ্ঠানিক বিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে ৫৯.৮% উত্তরদাতা দৃঢ়ভাবে একমত বলে জানান এবং ১৬.৫% উত্তরদাতা একমত বলে মতামত দিয়েছেন। রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় বেআইনী/অনানুষ্ঠানিক বিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে ৬৯.৮% উত্তরদাতা দৃঢ়ভাবে একমত বলে জানান এবং ২৩.৫% উত্তরদাতা একমত বলে মতামত দিয়েছেন। রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় বেআইনী/অনানুষ্ঠানিক বিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে ৪৩.৫% উত্তরদাতা দৃঢ়ভাবে একমত বলে জানান এবং ৫৫.৫% উত্তরদাতা একমত বলে মতামত দিয়েছেন।

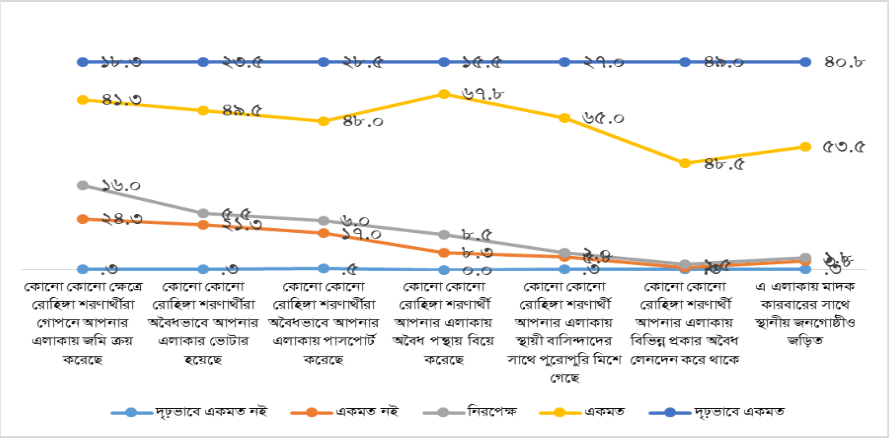

চিত্র-৭.২.৭.২ঃ লিকার্ড স্কেলের মাধ্যমে বিভিন্ন মতামত জানতে চাওয়া হয়

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিকট মতামত জানতে চাওয়া হয়, রোহিঙ্গা শরণার্থীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোপনে আপনার এলাকায় জমি ক্রয় করছে জানতে চাওয়া হলে ৪১.৩% উত্তরদাতা একমত পোষণ করেন এবং ১৮.৩% উত্তরদাতা দৃঢ়ভাবে একমত পোষণ করেন। তবে, ২৪% উত্তরদাতা একমত নয় বলে মতামত প্রদান করেন।

রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় অবৈধভাবে ভোটার হয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে ৪৯.৫% উত্তরদাতা দৃঢ়ভাবে একমত বলে জানান এবং ২৩.৫% উত্তরদাতা একমত বলে মতামত দিয়েছেন। তবে, ১৭% উত্তরদাতা একমত নয় বলে মতামত প্রদান করেন।

রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ তারা এলাকায় অবৈধভাবে পাসপোর্ট সংগ্রহ করেছে কিনা জানতে চাওয়া হলে ৪৮% উত্তরদাতা দৃঢ়ভাবে একমত বলে জানান এবং ২৮.৫% উত্তরদাতা একমত বলে মতামত দিয়েছেন।

রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় অবৈধ পন্থায় বিয়ে করেছে কিনা জানতে চাওয়া হলে ৬৭.৮% উত্তরদাতা দৃঢ়ভাবে একমত বলে জানান এবং ১৫.৫% উত্তরদাতা একমত বলে মতামত দিয়েছেন।

রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে পুরোপুরি মিশে গেছে কিনা জানতে চাওয়া হলে ৬৫% উত্তরদাতা দৃঢ়ভাবে একমত বলে জানান এবং ২৭% উত্তরদাতা একমত বলে মতামত দিয়েছেন।

রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় অবৈধভাবে লেনদেন করে থাকে জানতে চাওয়া হলে ৪৮% উত্তরদাতা দৃঢ়ভাবে একমত বলে জানান এবং ৪৯% উত্তরদাতা একমত বলে মতামত দিয়েছেন।

রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় মাদক কারবারের সাথে স্থানীয় জনগোষ্ঠীও জড়িত কিনা জানতে চাওয়া হলে ৫৩.৫% উত্তরদাতা দৃঢ়ভাবে একমত বলে জানান এবং ৪০.৮% উত্তরদাতা একমত বলে মতামত দিয়েছেন।

উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করে প্রায় অর্ধেক পুরাতন রোহিঙ্গা সদস্যের ভোটার আইডি বা জন্ম নিবন্ধন রয়েছে। এর মাধ্যমে অনেকে পাসপোর্ট তৈরি করে

বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বিদেশ পাড়ি জমিয়েছে। একজন ক্যাম্প-ইন-চার্জ এর মতে, কুতুপালং ক্যাম্প বর্ধিত আকারে বর্তমানে ৬৫০০ একর জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে। এখানে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের ৩০% বাংলাদেশি এনআইডি কার্ড আছে। রোহিঙ্গারা স্থানীয়দের সাথে শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা করে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের হাজার হাজার দোকানের মধ্যে স্থানীয়দের রয়েছে অর্ধেক দোকান। এখানের সংরক্ষিত বন নষ্ঠ হয়েছে। এখানে স্থানীয়দের একটি অংশ দালাল শ্রেণির ভূমিকায় আছে। হুন্ডি নিয়ন্ত্রণ করে স্থানীয়রা। প্রতিবছর প্রায় ৩০ হাজার রোহিঙ্গা জন্ম হচ্ছে তা এর সাথে যোগ হচ্ছে। স্থানীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আরো প্রান্তি হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়দের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে রোহিঙ্গাদের এক ধরণের প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠছে। এতে করে স্থানীয়রা দিন দিন হোষ্ট থেকে হোষ্টাইল হয়ে উঠছে। নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষের একজন বলেন, এ এলাকায় রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় নানা ধরণের সামাজিক অস্থিরতা তৈরী হচ্ছে। স্থানীয়দের সাথে রোহিঙ্গাদের যেন কোনো ভুল বুঝাবুঝি বা সংঘর্ষ তৈরী না হয় এ জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। স্থানীয়দের চাকরি সহজ করার জন্য আমরা চাকরি মেলা করেছি। স্থানীয়দের এনজিওতে চাকরি দিচ্ছি। এখানে রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ করছি। এখানে কাজ করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ আছে আবার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারলে ইতিবাচক প্রভাবও আছে। স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভবন করা হচ্ছে, গাড়ির ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। মাদক নিয়ে এখানে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আছে। এ বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সাথে নিয়ে কাজ করছি। এসকল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক কোর কমিটি নিয়ে কাজ করছি। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি। স্থানীয়দের জন্য স্বাস্থ্য সেবা, পানি শোধনাগার ও গাছপালা লাগানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নষ্ট হয়ে যাওয়া জীব বৈচিত্র্য আমরা দেখভাল করছি।

৭.৩ উপসংহার

উপরোক্ত পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য বিশ্লেষণে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাবের একটি বাস্তব চিত্র ফুঁটে উঠেছে। এ তথ্য বিশ্লেষণ স্পষ্ট করে যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাসস্থান, আয়, পেশা, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রভাবের একটি অংশ। তাই এ গবেষণা প্রশ্নের আলোকে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট; রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশের ক্যাম্পে জীবন-ধারণ প্রক্রিয়ার অনুসঙ্গ; রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া অনুসন্ধান করা হয়েছে। রোহিঙ্গারা এ সকল বিষয়ে জড়িত বলেই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। স্থানীয়দের জীবিকা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, বনভূমি, জ্বালানী প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ছে। এ প্রভাব নিরসনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পরিকল্পিতভাবে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়:
গবেষণার ফলাফল আলোচনা

৮.১ ভূমিকা

এ অধ্যায়ে গবেষণার ফলাফল ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনার মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমন, আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ক্যাম্পে জীবন-যাপন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা, স্থানীয় সমাজে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর গ্রহণ ও বর্জন, ভূমি থেকে উচ্ছেদের শিকার স্থানীয়রা, পরিচয় সংকটে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের চাপ বাড়ছে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে স্থিতিশীলতা বজায় থাকা ও বাংলাদেশের নীতি-অবস্থান।

এ গবেষণায় তত্ত্বগতভাবে সামাজিক স্থিতিস্থাপকতার আলোকে রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতির ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপনে প্রভাব বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে শরণার্থী আসার ফলে স্থানীয়দের সামাজিক বা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে যে সক্ষমতাগুলো ছিল তা বৃদ্ধি পেয়েছে অথবা দূর্বল করে দিয়েছে কিনা-এ প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে এ গবেষণায় স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণার উদ্দেশ্য কেন্দ্রিক ফলাফল আলোচনা করা হলো।

ক) মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কি কি তা গবেষণা প্রশ্নের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে-

৮.২ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমন

১৭৮৫ সালে বর্মীদের আরাকান দখলের পর রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিদ্রোহ, হত্যা ও ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে আরাকানে রাখাইন ও আরাকানীজ মুসলিম উভয়ের জনজীবন বিপন্ন ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ অনুন্নত বর্মী সৈন্যরা আরাকানের মুদ্রা ব্যবস্থা ও ব্যবসা বাণিজ্য দেখে হতবাক হয়ে লুণ্ঠন, হত্যা, নির্দোষ মানুষকে বন্দী করে মুক্তিপণ আদায়, এমনকি চরম নির্যাতনের পর আগুনে পুড়িয়ে মানুষকে হত্যা করত। ত্রাণকর্তা হিসেবে এসে বোধপায়া কয়েক বছরেই আরাকানকে দেউলিয়া করে ফেলে। আরাকান বিজয় সাম্রাজ্যবাদী বোধপায়াকে দিগ্বীজয়ে উৎসাহিত করে এবং ১৭৮৬ সালে বার্মার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রতিবেশী রাজ্য শ্যাম (বর্তমান থাইল্যান্ড) দখলের মনোভাব পোষণ করে। এরই প্রেক্ষিতে বোধপায়া আরাকান থেকে প্রচুর লোকজন, অস্ত্র-সস্ত্র ও রসদ দাবি করে। দাবীর অর্ধেক অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ হলে গভর্ণর হারি (ঘা থিন ডা) কে হত্যা করা হয়। তার একমাত্র জীবিত পুত্র সিন পিয়ান (Sin Pian) বর্মীরাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচন্ডভাবে রুখে দাঁড়ান। এ সময় থেকে প্রচুর পরিমাণে আরাকানীজ মুসলিম ও রাখাইন বৌদ্ধরা প্রাণ বাচাঁতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে। আরাকান রাজ ওয়েমো চট্টগ্রামের লাহোমরাং, আরাকানী সর্দার এ্যাপালং এবং সিন পিয়ানের তৎপরতা রাজদ্রোহী মনে হলেও তা ছিল

মূলতঃ বর্মীদের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধ সোচ্চার প্রতিবাদ। মং বা অং নামে একজন রাখাইন লেখক পরিস্থিতিকে এভাবে তুলে ধরেছেন যে, এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবার আশায় এবং হৃত স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নিমিত্তে অসংখ্য রাখাইন এককালে নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত তৎকালীন ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক শাসিত দক্ষিণ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী দ্বীপে এসে আশ্রয়গ্রহণ করে।

এখন থেকে ২০০ বছর পূর্বে ব্রিটিশ শাসনাধীন এলাকায় তাদের এ আগমন অব্যাহত ছিল। রাখাইন ও মুসলিম উভয় জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মিল থাকার ফলে তারা সহজে একত্রে এ এলাকায় এসেছে ও শান্তিপূর্ণভাবে এ এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেছে। তখন এ অঞ্চলে কোনো সীমানা বিরোধ ছিল না। তাছাড়াও আরাকান অঞ্চল থেকে মানুষ চিকিৎসা ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনাসহ বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে আসা-যাওয়া অব্যাহত রেখেছে। ব্রিটিশরা এ এলাকা থেকে চলে যাওয়ার পর এ অঞ্চলে ধর্মীয় বিভাজন ও উন্মাদনা বৃদ্ধি পায়। এতে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়। রাষ্ট্র যদি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পাশে না দাঁড়ানোয় তাদের বিপদ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নাগরিক অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হলে বার্মার শাসক উ নু এর সময় মুসলিমরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বার্মার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বার্মা নামক রাষ্ট্রের বিভিন্ন পক্ষ যেমন- রাষ্ট্র, সরকার, সাধারণ জনগোষ্ঠী, বৌদ্ধ ভিক্ষু, মিলিশিয়া ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সম্মিলিতভাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরাধিতা করেছে। প্রথমত সংখ্যালঘু মুসলিম ও দ্বিতীয়ত অ-বার্মীজ জনগোষ্ঠী রাখাইেন রাজ্যে নির্যাতিত হতে থাকে।

১৯৪৯ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনী সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক ডজনের বেশি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে। যার ফলে ১৯৭৮ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মিয়ানমারের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কয়েক দফায় বাংলাদেশে আগমন ঘটেছে। ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন পাশের মধ্যদিয়ে বার্মায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের নাগরিকত্ব পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করা হয়। সর্বশেষ ২০১৭ সালে 'অপারেশন ছাড়পত্র' এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধরণের নির্যাতনের মাত্রা সর্বোচ্চ বেগবান হয়। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কয়েক শতাব্দী ধরে আরাকান রাজ্যে বসবাস করলেও তারা আজ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আক্রশের শিকার হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। তাই এ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মিয়ানমারে অচ্ছুৎ এবং বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বা শরণার্থী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। অথচ ১৭৮৫ সালে বার্মা কর্তৃক আরাকান রাজ্য দখলের পর নির্যাতিত হয়ে একইসাথে রাখাইন ও মুসলিম জনগোষ্ঠী আরাকান ছাড়লেও তখন উভয় জনগোষ্ঠীর প্রতি

বার্মীজদের যে ভূমিকা ছিল বর্তমানে সে রাখাইন রাজ্যে রাখাইন জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা মুসলিম নির্যাতনে সেই একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৮.৩ আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

এ অবস্থায় রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়ে বাংলাদেশ এক ক্রান্তিকালে উপনীত হয়েছে। এ সঙ্কটে রোহিঙ্গাদের লালন-পালনে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে চাপ সৃষ্টিতে যারা বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। এ সঙ্কট সমাধানে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এমন বিশ্ব শক্তি চীন, রাশিয়া ও ভারত অন্য দিকে রয়েছে। অথচ বাংলাদেশের উন্নয়ন সহায়তায়, ক্রান্তিকালে স্বাধীনতা বিপন্ন করার মতো আগ্রাসনেও কার্যকরভাবে বাংলাদেশের পাশে ছিল এ সকল শক্তিসমূহ। দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষভাবে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তারের খেলায় স্নায়ুযুদ্ধের বিষয়টি এখন কারো অজানা নয়। কোনো এলাকার প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থান আন্তর্জাতিক শক্তির প্রাধান্য বিস্তারের জন্য আকর্ষিত করলে তখন সে স্থানের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। রাখাইন অঞ্চল দিয়ে চীনের অর্থনৈতিক করিডোর ও জ্বালানি পাইপলাইন স্থাপনের মহাপরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব সুপ্ত অবস্থা থেকে অনেকখানি প্রকাশ্যে চলে আসে। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ভিত্তি করে চীন ২০২০ সালের পর থেকে বিশ্ব রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে পারে। এ কারণে প্রাধান্য বিস্তারের খেলায় চীনকে আটকে রাখতে মালাক্কা প্রণালী দিয়ে চীনের জ্বালানি পরিবহন হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কা বেইজিংয়ের বরাবরই ছিল। চীনের অগ্রাধিকারের 'রুট অ্যান্ড বেল্ট' প্রকল্পের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পাকিস্তানে বেলুচ অঞ্চল আর মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য।

১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন পাশের মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গাদের অ-নাগরিক করে যেভাবে বাংলাদেশে বারবার ঠেলে দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে তাতে পুরো রাখাইন রাজ্যেই এক ধরনের রোহিঙ্গামুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। আসামের এনআরসি নিয়ে আসাম গণপরিষদ ও সহযোগী শক্তিগুলোর সাথে চুক্তি এবং এরপর চূড়ান্ত তালিকা করে ১৯ লাখ লোককে ভারতের অ-নাগরিক ঘোষণার সাথে এর বেশ মিল রয়েছে। মিয়ানমার আর বাংলাদেশের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য থাকায় দেশটি হুমকি বা ভয় দেখিয়ে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠাতে না পারলেও রোহিঙ্গাদের ওপর বারবার গণহত্যা, গণধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি করে মিয়ানমার তাদেরকে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে। তাই বাংলাদেশকে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে করণীয় ঠিক করতে আসাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, এমনকি বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিষয়টিকেও সামনে রাখতে হবে। কারণ একটি রাষ্ট্রের সরকারের আসা-যাওয়ার ন্যায় কিন্তু সার্বভৌমত্ব বা অখণ্ডতা আসা-যাওয়ার বিষয় নয়।

খ) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশের ক্যাম্পে জীবন-ধারণ প্রক্রিয়ার অনুসঙ্গ বিষয়ে গবেষণা প্রশ্নের আলোকে নিম্নে ফলাফল আলোচনা করা হলো-

৮.৪ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ক্যাম্পে জীবন-যাপন

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নির্যাতনের শিকার হয়ে শরণার্থী হিসেবে কয়েক ধাপে এদেশে এসেছে। এ আগমন ধারা ১৯৭৮ সালে শুরু হলেও ১৯৯১-৯২, ২০১২ ও সর্বশেষ ২০১৬-১৭ সালে আরেক দফায় বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমন ঘটে। মিয়ানমার থেকে প্রথম দফায় ২ লাখ ৫০ হাজার রোহিঙ্গা আগমন করলেও ২০১৭ সালে এসেছে প্রায় ৭ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। ১৯৯০ এর দশকে ২০টি শরণার্থী ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের বসবাসের ব্যবস্থা হলেও প্রত্যাসান চুক্তির আওতায় বেশ কিছু রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফিরে গেলে মাত্র ২টি ক্যাম্প রেখে বাকিগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০১২ সালে রাখাইন কর্তৃক কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গা নির্যাতনের শিকার হয়ে উখিয়া ও টেকনাফ এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এ সময় রোহিঙ্গারা মূলত বিভিন্ন এনজিও সহায়তায় ২টি লেদা ও কুতুপালং মেকশিফ্‌ট ক্যাম্পে বসতি গড়ে তোলে। সর্বশেষ ২০১৭ সালে নির্যাতনের শিকার হয়ে পুরাতন রোহিঙ্গাদের সাথে যুক্ত হয়ে ৩৩টি ক্যাম্পে সর্বমোট ১১ লাখ এ গিয়ে পৌঁছায়। রোহিঙ্গারা দীর্ঘদিন ধরে এখানে ক্যাম্পগুলোতে বসবাস করছে। এখানে তাদের কোনো নাগরিক অধিকার পাওয়ার সুযোগ নেই। আর্ন্তজাতিক শরণার্থী সংস্থার সহায়তায় বিভিন্ন এনজিও'র মাধ্যমে শুধু মৌলিক চাহিদা পূরণে তারা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। এর পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে কিছু প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পায়। ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা মাঝি বা নেতাদের সহায়তায় এক বা একাধিক ম্যাজিস্ট্রেট (ক্যাম্প-ইন-চার্জ) এর নের্তৃত্বে (এপিবিএন পুলিশ, আনসার ও জিজিবি'র উপস্থিতিতে) মূলত এ সকল ক্যাম্পসমূহ পরিচালিত হয়ে আসছে। ক্যাম্প-ইন-চার্জ এর অনুমতি সাপেক্ষে এ ক্যাম্পসমূহের মধ্যে মসজিদ, মাদ্রাসা, দোকান, হোটেল ও বাজার গড়ে উঠেছে। এছাড়া তিনি শিবিরের শরণার্থীদের পরিচালনার জন্য সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করেন। এ ক্যাম্পকে ঘিরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় এক বা একাধিক (ক্যাম্প-ইন-চার্জ) এর নের্তৃত্বে সকলকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়।

গ) রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন অনুসন্ধান বিষয়ে গবেষণা প্রশ্নের আলোকে ও

ঘ) রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক মিথস্ক্রিয়া অনুসন্ধান বিষয়ে গবেষণা প্রশ্নের আলোকে নিম্নে ফলাফল আলোচনা করা হলো-

৮.৫ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা

২০১৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের মানবিক আশ্রয় প্রদানের পর উখিয়া ও টেকনাফ অঞ্চলের বনভূমি ও চাষের জমিতে শরণার্থী শিবির গড়ে ওঠায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিভিন্নভাবে চাপের মুখে পড়ে। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদানের পর উখিয়া ও টেকনাফ অঞ্চলের

মানুষের জীবন-যাপন প্রক্রিয়ায় কষ্ট বেড়েছে। মানুষ প্রথম দিকে রোহিঙ্গাদের সাথে খাবার ভাগাভাগি করে খেয়েছে, কাপড়, বাসস্থান, চুলা, টয়লেট একসাথে ব্যবহার করতে দিলেও পরবর্তীতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বাড়ির আঙ্গিনায় বা ক্ষেত খামারে যে চাষাবাদ, গবাদি পশু পালন, খাল-বিলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ, বন-জঙ্গল থেকে জ্বালানী বা ঔষধি গাছপালা সংগ্রহ এবং গ্রামীণ নারী হাস-মুরগী পালন বা সবজী চাষ করে পরিবারের সঞ্চয় বৃদ্ধি করত। কিন্তু রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বসবাসের কারণে স্থানীয়দের এ সবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যার ফলে এ অঞ্চলে উৎপাদন ব্যবস্থায় ও উৎপাদিত পণ্যমূল্যে প্রভাব পড়েছে। হঠাৎ করে অতিরিক্ত কয়েক লাখ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় দিনমজুর হয় তার কাজ হারিয়েছে, না হয় তার মজুরি কমেছে। কিন্তু অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয়রা তা ক্রয়ের সামর্থ্য হারিয়েছে। কারণ দীর্ঘ সময় পার হলেও রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরুই করা যায়নি। এতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অনেকে এখন চাষের জমি হারিয়ে, উৎপাদন ব্যবস্থায় সংকট তৈরি হওয়ায় এবং জীবন-যাপনে অনেক বিষয় সংঙ্কুচিত হওয়ায় তারা অর্থনৈকিতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে স্থানীয়দের একটি ক্ষুদ্র অংশের সম্পর্ক গড়ে ওঠায় অবৈধ বিয়ে-শাদি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সংঘাতে রূপান্তরিত হয়েছে। যার ফলে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাস্তাঘাটে মানুষ বৃদ্ধি পাওয়ায়, সেখানে শতাধিক এনজিও কর্মী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ায় তাদের থাকার ব্যবস্থা বা যাতায়াত এর জন্য যানবাহন বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে একদিকে গ্রামীণ রাস্তায় গাড়ির চাপ বেড়েছে। এজন্য প্রয়োজন পড়েছে নতুন নতুন রাস্তা তৈরি বা রাস্তা প্রশস্তকরণ কার্যক্রম। প্রতিদিন এ বিপুল সংখ্যক মানুষের পানির চাহিদা পূরণে এ এলাকার পানির স্তর নিচে নেমে গেছে। অতিরিক্ত গাছপালা কাটার কারণে বন-জঙ্গল উজাড় হয়ে পড়েছে। ফলে সংরক্ষিত বনের এলাকা হওয়ার পরও গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড দাবাদাহ শুরু হয়ে যায়। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ মাছ ধরে বা কাঠ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু শুষ্ক মৌসুম আসার আগেই হয় পুকুর, খাল বিলের পানি শুকিয়ে যাচ্ছে না হয় ময়লা আবর্জনায় এর পানি ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে।

৮.৬ স্থানীয় সমাজে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর গ্রহণ ও বর্জন

কক্সবাজারের মানুষ পূর্ব থেকেই অতিথিপরায়ণ হিসেবে পরিচিত। রোহিঙ্গাদের এই অঞ্চলে আগমনের পর থেকে বছরের পর বছর ধরে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রসমূহ বিকশিত হয়েছে। মিয়ামনার থেকে প্রথম দিকে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশে এসে পৌঁছালে স্থানীয় জনগণ তাদের প্রতি ব্যাপক সহানুভূতিশীল ছিল। তাই স্থানীয়রা খাবার, কাপড় এবং আশ্রয় প্রদানের মাধ্যমে তাদের সাধ্যানুযায়ী সহায়তা করেছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ অবস্থা চলতে থাকায় পরিস্থিতি বদলে গেছে। বর্তমানে রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক আগের মতো নেই। প্রকৃতপক্ষে কক্সবাজারের স্থানীয় লোকেরা অনুভব করেছিল, এ সংকটে অন্যান্য মুসলিম ভাইদের সহায়তা করা তাদের নৈতিক ও পবিত্র কর্তব্য। রোহিঙ্গারা থাকার জন্য যে ময়লা-

আবর্জনা করেছেন তার পরও স্থানীয়রা তাদের প্রতি সহানুভূতি বজায় রেখেছে। যেহেতু রোহিঙ্গারা মুসলিম তাই স্থানীয় লোকেরা মিয়ানমনারে সংকট চলাকালে তাদের পক্ষে সংহতি অনুভব করেছিল। রোহিঙ্গা যখন বাংলাদেশের শরণার্থী হওয়ার জন্য সীমানা পেরিয়েছিল, স্থানীয়রা মুসলিম ভাই হিসাবে তাদেরকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু স্থানীয় সমাজের মানুষ বর্তমান পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা বিষয়টি নিয়ে এতো বেশি উদ্বিগ্ন, তাদের নিজেদের সমস্যা এতো বেশি এবং সমস্যাসমূহ দীর্ঘায়িত হয়ে পড়ছে; তাতে করে স্থানীয় জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি দিন দিন নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছে। কারণ স্থানীয় জনগোষ্ঠী তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক জনগোষ্ঠী দীর্ঘ মেয়াদে জায়গা দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিছু ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড স্থানীয় সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে ছিন্তাই, চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ ও মাদক (ইয়াবা) ব্যবসা বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের অবস্থানকে দায়ি করছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যা লিখিত আবেদন বা অভিযোগসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের দারস্থ হচ্ছেন। বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে রিক্সা, অটোরিক্সার শ্রমিক ও দিমজুর তাদের জীবিকার সমস্যায় পড়ছে। কারণ এ পেশাগুলোতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর তুলনায় বেশি সংখ্যক রোহিঙ্গারা সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। যাদের জমি দখল করে রোহিঙ্গা বসতি গড়ে উঠেছে তারাও এখন বাংলাদেশের নাগরিক অধিকার হিসেবে প্রশাসনের বা আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন। এসব বিষয়ে স্থানীয় সাধারন মানুষের পাশাপশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও ভূক্তভোগির তালিকায় আছেন। এ অবস্থায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী আগের মতো অনুভূতির জায়গায় নেই। বরং তারা এখন 'আপদ বিদায় নিলে হাফ ছেড়ে জীবন বাঁচে' এমন মানসিক অবস্থায় আছে।

৮.৭ ভূমি থেকে উচ্ছেদের শিকার স্থানীয়রা

শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রায় নেতিবাচক সমস্যার মধ্যে আর্থিক সমস্যায় বেশি হলেও জমিজমা সংক্রান্ত সমস্যাটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে চরম উদ্বেগজনক একটি বিষয়। কারণ এ গবেষণা এলাকায় শত শত বছর ধরে বসবাসরত স্থানীয় প্রান্তিক কৃষক, কাঠুরিয়া বা শ্রমজীবি মানুষ বনবিভাগের সংরক্ষিত এলাকায় জমি লিজ (বন্দবস্ত) নিয়ে বসবাস বা ভূমি চাষ করে আসছিল। বাপ-দাদার পৈত্রিক ভিটেমাটি মনে করে এতদিন অনেকে জানেও না যে তারা বন বিভাগের জমিতে বসবাস করে। তাই অনেকে পাকা ঘর ও মার্কেট স্থাপন করে বসবাস করছে এবং বিপুল সংখ্যক শরণার্থী আমগমনে অনেকে নতুন করে ঘর তুলে বা মার্কেট তৈরি করে অন্যের নিকট ভাড়া দিয়েছে। এ অবস্থায় আবার অনেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বসতি নির্মাণে বা রাস্তা তৈরিতে তাদের জমি হারিয়েছে অথবা জমি হারানোর আশঙ্কায় রয়েছে। জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত রয়েছে। এ এলাকার স্থানীয় প্রশাসনের সাথে স্থানীয়দের জমিজমা নিয়ে নানা সমস্যা চলছে। স্থানীয়রা অনেকে (ক্রয়কৃত) কবলা দলিরের জমি হারিয়ে মামলা করেছে এবং স্থানীয় প্রশাসনকে তারা প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করেছে। বনবিভাগ থেকে লিজ নেওয়া অনেক গরিব কৃষক, দিনমজুর ও কাঠুরিয়া এ সংক্রান্ত সমস্যায় চাষের

জমি হারিয়ে অনেকটা দিশেহারা অবস্থায় জীবন-যাপন করছে। গবেষণা প্রশ্নের আলোকে রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন অনুসন্ধান বিষয়ে উক্ত ফলাফল পাওয়া যায়।

৮.৮ পরিচয় সংকটে স্থানীয় জনগোষ্ঠী

এ গবেষণা এলাকার রাজাপালং, থাইংখালি ও হ্নীলা তিনটি ইউনিয়নে স্থানীয়দের সাথে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিয়ে-শাদি ২০১৪ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার নিষিদ্ধ করলেও অত্যন্ত গোপনে অবৈধ বৈবাহিক কার্যক্রম সীমিত পরিসরে চলমান রয়েছে বলে গুণগত তথ্যের মাধ্যমে জানা যায়। প্রথম দিকে প্রেম-ভালোবাসা, বিভিন্ন এনজিওতে ক্যাম্পে কর্মরত উঠতি বয়সী তরুন-তরুণীদের আবেগিক দৃষ্টিভঙ্গি, আর্থিক লেনদেন বা পূর্ব আত্মীয়তার সূত্র ধরে উভয় জনগোষ্ঠীর সদস্যদের অবৈধ বিয়ে এ সকল ইউনিয়নে স্বল্প পরিসরে হয়েছে ও হচ্ছে। কখনও কখনও স্থানীয় পুরুষরা বিয়ে করে পরিচয় গোপন করে ক্যাম্পেই বসবাস করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয়দের স্ত্রী-সন্তান নিয়ে গ্রামে বসবাস করলেও গোপনে রোহিঙ্গা নারীর সাথে বিয়ে হওয়ায় আগের সংসারের দায়িত্বে অবহেলা করছে। এতে করে পূর্বের সংসারে ভাঙ্গন সৃষ্টি হচ্ছে এবং এক ধরণের মানসিক অশান্তি তৈরি হচ্ছে। স্থানীয়দের সাথে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিয়ে-শাদির ফলে সন্তান-সন্তানাদি হলে তাদের পরিচয় নিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এ মিশ্র প্রজন্ম কি পরিচয়ে পরিচিত হবে-বাঙালি না রোহিঙ্গা? এর কোনো সমাধান স্থানীয় পর্যায়ে মিলছে না এবং এ বিষয় নিয়ে এক ধরণের সংকট চলছে।

৮.৯ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের চাপ বাড়ছে

কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় ও রোহিঙ্গাদের সাথে গোপনে বিয়ে হওয়ায় আগের সংসারের দায়িত্বে অবহেলা করায় গ্রামের সংসারে ভাঙ্গন সৃষ্টি হচ্ছে এবং এক ধরণের সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। রোহিঙ্গা সদস্যদের দ্বারা বা স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর যৌথ অংশগ্রহণে গ্রামগুলোতে চুরি-ডাকাতি বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রায়ই বিচার-সালিশ করতে হচ্ছে। এজন্য তাদের আলাদা সময় বের করে জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। স্থানীয়দের সাথে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিয়ে-শাদির ফলে সন্তান-সন্তানাদি হলে তাদের পরিচিতি কি হবে-বাঙালি না রোহিঙ্গা? এ বিষয়ে জন্ম সনদ বা নাগরিকত্ব সনদের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত মিলছে না। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্য যদি পিতা হিসেবে হয় পুরুষ; তবে তার সন্তান দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর বা অনেক ধরণের উপায় বের করে ক্ষেত্র বিশেষ জন্ম সনদ পেয়েছে। কিন্তু স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্য যদি পিতা হিসেবে হয় রোহিঙ্গা পুরুষ বা মাতা হিসেবে হয় স্থানীয় নাগরিক ততে তাদের সন্তান এর জন্ম সনদ সহজে মিলছে না। এ জন্ম সনদ প্রদানে পরিচয় সনাক্তকরণে যদি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অবহেলা ধরা পরে তাহলে স্থানীয় প্রশাসন তাদের জরিমানা করার ব্যবস্থা রেখেছে। রাজাপালং ইউনিয়নের একজন জনপ্রতিনিধিকে পরিচয় সনাক্তকরণে দায়িত্বে অবহেলা করার কারণে জরিমান প্রদান করতে হয়েছে বলে জানা যায়। তাই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ এক

ধরণের মানসিক ও পারিপার্শ্বিক চাপ বাড়ছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া অনুসন্ধান বিষয়ে উক্ত ফলাফল পাওয়া যায়।

৮.১০ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে স্থিতিশীলতা বজায় থাকা

রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে যে অর্থনৈতিক চাপ অনুভূত হচ্ছে এবং সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হচ্ছে। প্রতিকূল পরিবেশে জীবিকার মাধ্যমগুলো নষ্ট হয়ে স্থানীয়রা বড় ধরণের ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। এ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে না পারলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না পারলে তারা তাদের জীবন-জীবিকার স্থিতিস্থাপকতা হারাতে পারে। তাই স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্ব দ্বারা বিষয়টি অনুধাবন করে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কারণ স্থিতিস্থাপকতা হলো-একটি নতুন বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিছু বাহ্যিক অভিঘাত মোকাবেলা করে যে পদ্ধতিতে বা প্রক্রিয়ায় পুণরায় স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে আসা যায়। স্থিতিস্থাপকতার অর্থ হলো পুনরায় ফেরা, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা এবং নমনীয়তা বা পুনরুদ্ধারযোগ্য অবস্থা।

উপাদানের ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধারে সক্ষম বা প্রসারিত ও সংকুচিত হওয়ার পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু ব্যক্তি সক্ষম কঠিন অবস্থা থেকে দ্রুত প্রতিরোধ বা পুনরুদ্ধার করে যা একটি নাজুক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। স্থিতিস্থাপকতা দুর্বলতা এবং ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্কের একটি স্পষ্ট বিবরণের রূপরেখা সত্ত্বেও ডেটন-জনসন অর্থনৈতিক দিকের বাইরে স্থিতিস্থাপকতাকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেন নি। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক দুর্বলতায় সামাজিক স্থিতিস্থাপকতাকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করে। অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক সংকট মোকাবেলা করার ক্ষমতা এবং এটিকে কার্যকরভাবে সমাধান করা নয় বরং ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী এটি থেকে শিখতে, শক্তিশালী হতে এবং পৃথকভাবে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। শরণার্থী আগমনে এ অবস্থায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী অনেক কিছু হারিয়ে মানসিক চাপ যুক্ত অবস্থা থেকে মানিয়ে নিয়ে আবার আগের অবস্থানে ফিরে যেতে সক্ষম হতে সহায়তা করে। উখিয়া ও টেকনাফ এলাকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে বা বজায় রাখতে স্থিতিশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে অভিঘাত মোকাবেলায় কার্যকরী হতে পারে।

৮.১১ বাংলাদেশের নীতিগত অবস্থান

বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমারের সাথে সামরিক শক্তি প্রয়োগ না করে রোহিঙ্গা সঙ্কটের দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর সমাধান চাইছে। দেশটি মিয়ানমারের ওপর অপ্রতিরোধ্য অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঢাকার অনেক বেশি অগ্রাধিকারের কিছু বিষয় রয়েছে। যে কোনো জাতির পরিস্থিতি, নীতি এবং কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির আলাদা কিছু বিষয় থাকে। বাংলাদেশ নিজেই দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশ হিসেবে অর্থনৈতিক উত্থানের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য অনেক দেশগুলো থেকে

এগিয়ে আছে। বাংলাদেশের সরকার সেই গতিটি বজায় রাখতে এবং এটি শতাব্দীর মধ্যভাগে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে চায়। প্রায় ১১ লাখ মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সীমিত ভূমি ও সম্পদ সত্ত্বেও আশ্রয় প্রদান এবং কক্সবাজার এলাকায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবনযাপন নষ্ট হওয়ার জন্য বাংলাদেশ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের, বন্ধু দেশগুলোর এবং বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করছে। এ সময় মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়তে দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এতে দেশটি রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে চাইবে নাকি বিদেশী হস্তক্ষেপের ঝুঁকির মধ্যে থাকবে-সে সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করবে। মিয়ানমারকে সরকারি বাহিনী এবং আরাকান আর্মিসহ রাখাইন সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাত থেকে রক্ষার পওয়ার জন্য ‘উত্তর রাখাইন রাজ্যে’ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ একটি নিরাপদ অঞ্চল গঠনের পরামর্শ দিয়েছে। বাংলাদেশে চীনের স্বার্থ যাতে হুমকির মুখোমুখি না হয়, তা নিশ্চিত করতে যে কোনো সামরিক পদক্ষেপ বন্ধ করার জন্য বেইজিং ঢাকাকে অনুরোধ করেছে। বিনিময়ে চীন নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারে সঙ্কট সমাধানের জন্য কাজ করছে। জাপানের মতো অন্যান্য কিছু দেশও বাংলাদেশকে আরো কিছু সময় ধৈর্য ধরে রাখতে বলেছে। কারণ জাপানের মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরসহ ২৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ রয়েছে। আর এই অ্যানার্জি হাব নিয়ে তাদের গভীর উদ্বেগও রয়েছে।

৮.১২ উপসংহার

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শরণার্থী বা বাস্তুচ্যুত মানুষ আগমনের ফলে দুই ধরণের প্রভাব দেখা যায়। যে দেশে তারা আশ্রয়গ্রহণ করে সেখানে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি হয় আবার একইভাবে গবেষণায় দেখা গেছে অনেক দেশে শরণার্থী উপস্থিতিতে স্থানীয় আর্থ-সমাজিক ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে। কাজেই সবকিছুর ব্যাপার নির্ভর করে স্থান, কাল ও অবস্থান এর ওপর। কোথাও কোথাও এ প্রভাব ইতিবাচক হয় আবার কোথাও এ প্রভাব নেতিবাচক হয়। এ গবেষণায় দেখা গেছে রোহিঙ্গা উপস্থিতির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ে যে একটি শক্তি ছিল তা ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে। রোহিঙ্গাদের প্রতি স্থানীয়দের প্রথম দিকের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা কমে এসেছে। এছাড়া ভূ-রাজনৈতিক কারণে এ অঞ্চলের রোহিঙ্গা ইস্যুটি একটি জটিল সমীকরণে উপনীত হয়েছে। যেহেতু সাম্প্রতিক সময়ে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না তাই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার চাপ নিয়ে বিকল্প নিয়ে ভাবতে হবে। কারণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর এই উপস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী যে ধরণের চাপে পড়েছে তা অন্য অঞ্চলের মানুষের বুঝতে পারার কথা নয়। স্থানীয়দের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাদের জীবন-জীবিকার স্থিতিস্থাপকতা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় তাদের চাপমুক্ত রাখতে ও স্থিতিশীল পরিস্থিতি বজায় রাখতে উদ্যোগ না নিলে এক সময় অভিঘাত মোকাবেলা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। তাই এ ধরণে পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পূর্বেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

এ গবেষণাটি একটি নির্দষ্ট প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে করা হয়েছে। এটি গবেষণা এলাকার একটি ক্ষুদ্র চিত্র। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক মহলে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, শরণার্থী উপস্থিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে কি ধরণের প্রভাব পড়তে পারে এবং এ প্রভাবের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বা করা উচিত তার একটি নমুনা মাত্র। এ গবেষণার সুপারিশমালা চূড়ান্ত কোনো ব্যবস্থা নয়, কারণ এ সুপারিশমালারও একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে; কারণ এটি একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। কিন্তু এ ক্ষুদ্র পরিপ্রেক্ষিতে এটি সুপারিশ করে যে ভবিষ্যতেও বাংলাদেশে এ ধরণের সমস্যা দেখা দিলে রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রের নাগরিকের নিরাপত্তায় কি ধরণের রোডম্যাপ বা পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে তা এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়:
উপসংহার ও সুপারিশমালা

উপসংহার

এ গবেষণায় রোহিঙ্গা শরণার্থী উপস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে আর্থ-সামাজিক প্রভাব বুঝতে পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের ভিত্তিতে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। দীর্ঘ চার দশক ধরে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা গবেষণা এলাকা উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় জন-জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে। রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আগমনের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব পড়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থনীতি বিশেষ করে কৃষি, শ্রম বাজার, উৎপাদন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন ও প্রাকৃতিক পরিবেশে এর প্রভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সকল প্রভাবের পাশাপাশি মাদকের ভয়াল আগ্রাসন উভয় জনগোষ্ঠীকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ একদিকে স্থানীয় জনজীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে অন্যদিকে মাকদদ্রব্য শারীরিক ও মানসিক ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করছে। এতে করে স্থানীয় সমাজে এক ধরনের চাপ অনুভূত হচ্ছে। এই চাপ সামলানো সক্ষমতা সকলের ক্ষেত্রে এক রকম নয়। যার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে এক ধরনের সামাজিক অস্থিরতার মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এটি দীর্ঘ মেয়াদী চলতে থাকলে খুব শীঘ্রই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে স্থিতিশীলতা ব্যাপকভাবে নষ্ঠ হতে পারে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অনেকে এখনই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে চিন্তিত। এ অবস্থায় তাদের একার পক্ষে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা কঠিন। বিভিন্ন দুর্যোগে এমনকি শরণার্থী আগমনে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা, দেশি এনজিও ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেভাবে এগিয়ে আসে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এরকমটি দেখা যায় না। এটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে নিজেদের অসহায় ভাবতে প্রভাবিত করে। স্থানীয়রা যেটুকু সহায়তা পায়, অধিকাংশ শরণার্থীর মতে তাদের উপস্থিতির কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। এ জাতীয় ভাবনা স্বাভাবিক কারণেই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করছে।

নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যায় রাষ্ট্র পাশে থেকে তার সীমিত সম্পদ নিয়ে পাশে দাঁড়াবে এটিই স্বাভাবিক। বাংলাদেশও সে কাজটি তার সাধ্য অনুযায়ী করে যাচ্ছে। কিন্তু শরণার্থী আগমনে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাদের প্রত্যাবাসন ছাড়া এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সহজ হবে না। যেহেতু প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়, তাই এ প্রক্রিয়াটি এগিয়ে নেওয়ার প্রতি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাংলাদেশকেই প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যেতে হবে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনে স্থানীয় জনজীবনে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তাদের প্রত্যাবাসনেই অধিকাংশ সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে।

পরবর্তী গবেষণা

একটি গবেষণায় একজন গবেষকের পক্ষে অনেক বিষয় নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব নয়। এ গবেষণায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উপস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করা

হয়েছে। পরবর্তী কোনো গবেষণায় স্থানীয়দের জীবিকা, বিদেশি (সংস্থা ও রাষ্ট্রসমূহের) আর্থিক সহায়তা ও ব্যয়ের যথার্থতা, পানির সংকট দূরীকরণে করণীয়, মানব পাচার, বন-বনভূমি ধ্বংস, পাহাড় কাটা এবং কৃষিজমি হ্রাস, জমির অবক্ষয়, মাটি পানি ও বায়ু দূষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ইকো-সিস্টেম এবং জীববৈচিত্র্য, দেশি-বিদেশি এনজিওসমূহের কর্মকাণ্ড, স্থানীয়দের মানসিক স্বাস্থ্য, আয় হ্রাস, বনজ সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ এবং উপজেলা দু'টিতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উপস্থিতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষায় বিরূপ প্রভাব পড়েছে কিনা এগুলো নিয়ে গবেষণা হতে পারে। প্রতিটি অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়ানো রাষ্ট্রের দায়িত্ব। উখিয়া ও টেকনাফ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার আশংকা অনেকে করছেন। শরণার্থী উপস্থিতির ফলে শতাধিক দেশি-বিদেশি এনজিও শরণার্থীদের সহায়তায় বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি চালু রেখেছে। এসকল এনজিও পরিচালনায় স্থানীয় ভাষা বলতে ও বুঝতে পারে এমন শিক্ষিত শ্রেণির দক্ষ-অল্পদক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হয়। এসময় স্থানীয় স্কুল কলেজের শিক্ষকতার পেশা ত্যাগ করে অনেক যোগ্য শিক্ষক/শিক্ষিকা এ সকল এনজিওগুলোতে চাকরি গ্রহণ করেন। এতে করে স্কুল-কলেজসমূহ দক্ষ মানব সম্পদ হারায় এবং শিক্ষার্থীরা পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং এ বিষয়টি আরো গভীরে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। যার মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে।

সুপারিশমালা

কক্সবাজারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য প্রধানত উখিয়া-টেকনাফ এলাকায় রোহিঙ্গাদের জীবনে আর্থ-সামাজিক প্রভাব মোকাবেলায় সুপারিশসমূহ হলো-

১. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই উন্নয়নের সুবিধার্থে ২৫ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ ও এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ৩০ শতাংশে উন্নীত করা।

২. স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সতর্ক থাকতে হবে; যাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সংগঠিত না হয়। যারা এ সকল কাজে জড়িত থাকবে বা সহযোগিতা করবে তাদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে সচেতনামূলক প্রচারণার পাশাপাশি এর প্রয়োজনীয় আইন কার্যকর থাকা আবশ্যক।

৩. স্থানীয় সাধারণ মানুষকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সনাক্ত করার জন্য প্রচারাভিযান পরিচালনা করা। যাতে তারা সহজে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে যেতে না পারে।

৪. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য রোহিঙ্গা ক্যাম্পে স্থায়ী পুলিশ স্টেশন নির্মাণ করা। শরণার্থীদের বায়োমেট্রিক ডাটাবেস এর মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি জালিয়াতির মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট পেতে না পারে তা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা।

৫. শরণার্থীরা শিবিরের বাইরে কাজে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতি না পাওয়ার বিষয়টি যথাযথভাবে নিশ্চিত করা।

৬. রোহিঙ্গা সমস্যা একটি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ইস্যু বিধায় বাংলাদেশ জাতিসংঘ, আসিয়ান ও ওআইসি-তে বিষয়টি উত্থাপন করে অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা।

৭. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে স্থিতিশীলতা আনয়নে বিকল্প জীবিকা সৃষ্টিরর জন্য স্থানীয়ভাবে উপযোগি প্রশিক্ষণ (ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, সিএনজি-রিক্সা-অটোরিক্সার ম্যাকানিক তৈরি ও গাড়ি চালানো ইত্যাদি) ও অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮. স্থানীয় পর্যায়ে কৃষিভিত্তি শিল্প গড়ে তোলা যেখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাকুরির ব্যবস্থা থাকবে।
৯. কৃষি জমির স্বল্পতায় লবনাক্ত সহিষ্ণু ও বালু মিশ্রিত জমিতে পণ্য দ্রব্য উৎপাদনে সরকারিভাবে সহায়তা করা।

১০. উখিয়া ও টেকনাফ এলাকায় পান ও সুপারির চাষ হয় প্রচুর। এ বিষয়ে আধুনিক চাষাবাদের স্থানীয়দের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

১১. এ অঞ্চলের জেলেরা প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ আহরোণ করে থাকে। সেগুলো সংরক্ষণে এ এলাকায় শুটকি শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২. সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়নে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষত পয়:বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৩. জন্ম নিবন্ধন ও ভোটার নিবন্ধন করতে স্থানীয়দের ১৮ প্রকার কাগজ প্রয়োজন হয়। তাঁরা মনে করেন টাকা খরচ করলে দ্রুত জন্ম নিবন্ধন ও ভোটার নিবন্ধন করা যায়। তাই জন্ম নিবন্ধন ও ভোটার নিবন্ধনে এক ধরণের সংকট দূরীকরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় নাগরিক হিসেবে আবেদনকারিদের জন্য কিছু নীতিমালার ভিত্তিতে এর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৪. রাস্তার কোল ঘেঁসে শিবির গড়ে ওঠায় রোহিঙ্গারা যত্রতত্র সহজেই বিভিন্ন জায়গায় গমন করে থাকে। শরণার্থীদের জন্য তৈরিকৃত শিবির কক্সবাজার-টেকনাফ সড়ক থেকে আরও ভেতরে সরিয়ে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা। তবে, স্থানীয়দের বসতিগুলো শিবিরের আশপাশ থেকে সরিয়ে নেয়া।

১৫. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণের সুব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনে মান-সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৬. শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ছদ্মবেশে রোহিঙ্গারা যেন বাংলাদেশে নাগরিকত্ব অর্জনসহ অন্যান্য সুবিধা পেতে না পারে। কারণ শিক্ষা গ্রহণের ফলে তাদের এখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে পাওয়া যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র: *Books*

Ahmed, Imtiaz, (2010), The Plight of the Stateless Rohingyas, Dhaka: The University Press Limited

Angrosino, Michael, (2007), *Doing Ethnographic and Observational Research (Qualitative Research Kit)*, SAGE Publications Ltd 1 Oliver's Yard 55 City Road London EC1Y 1SP

Anthony, E. J. (1987). Risk, vulnerability, and resilience: An overview. In E. J. Anthony & B. J. Cohler (Eds.), The invulnerable child (pp. 3– 48). New York: Guilford Press.

Banglapedia, (2017), "Cox's Bazar District.", last modified "July ", accessed April 24, 2019, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Cox%E2%80%99s_Bazar_District.

BERA, (2004), (British Educational Research Association) Revised Eathical Guidelines for Educational Research, 2004

Berg, B.L. (2001), *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. Pearson Education Company.

Berkes, F.; Colding, J. and Folke, C. (2003), *Navigating social-ecological systems.* Building resilience for com plexity and change. Cambridge.

Berlie, J.A., (2008), *The Burmanization of Myanmar's Muslims*, (White Lotus press, Thailand

Betts A. et al. (2014), Refugee Economies, Refugee Studies Centre, Oxford University

Betts, A (2009), 'Development Assistance and Refugees, towards a North-South Grand Bargain?', Forced Migration Policy Briefing 2, Refugee Studies Centre, University of Oxford, United Kingdom.

Bolesta, A. (2005), Refugee Crises and International Response: Towards Permanent Solutions? Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw, Poland.

Bourgois, Philippe (1992), "Confronting the Ethics of Ethnographic: Lessons from Fieldwork in Central America", in A. C. G. M. Robben and J. A. Sluka (eds.)

Bowen, G. A. (2009), *Document Analysis as a Qualitative Research Method*, Qualitative Research Journal, vol. 9, no. 2, 2009

Bryman, A. (2008), *Social Research Methods*, 3rd Ed. Oxford: Oxford University Press

Buchanan, Francis, (1798), *Francis Bucanan in Southeast Bengal: His Journey to Chittagong, the Chitttagong Hill Tracts, Noakhali and Comilla.* Dhaka: Dhaka University Press

Burns, N. and Grove, S.K. (2001), The Practice of Nursing Research, Conduct, Critique, and Utilization, 4th Edition, W.B. Saunders Company, Philadelphia.

C. Geertz, (1963), *"The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the new states",* in C. Geertz (ed.) *Old Societies and New States- The Quest for Modernity in Asia and Africa*, New York: The Free Press of Glencoe

Callahan, Mary P. (2007), *Political Authority in Burma's Ethnic Minority States: Devolution, Occupation and Coexistence*. Washington, D.C.: East-West Center

Charles, A. Fisher, (1964), *South-East Asia, A Social Economic and Political Geography*, (London: Methuen and Co. Brian Hunter, *The Statesmans year-Book*

Charmaz, K. (2006), *Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis.* London: Sage Publications.

Charney, Michael W., (2000), *"Buddhist or Muslim Rulers? Models of Kingship in Arakan (Western Burma) in the Fourteenth to Fifteenth Centuries,"* unpublished paper,. Available online here: http://eprints.soas.ac.uk/10220/

Chowdhury, Mohammed Ali, (2004), *BENGAL-ARAKAN RELATION (1430-1666 A.D.),* Firma KLM Privet Limited, Kolkata, India

Col. Ba Shin, (1961), *"Coming of Islam to Burma, down to 1700 A. D.",* Lecture before Asian History Congress, Unpublished, New Delhi,. Colonel Ba Shin is a noted historian in Burma and a Muslim.

Col. Henry Youle and A. C. Burnell, (1903), *Hobson-fobson*, new ed. edited by William Crooke [London: John Murray,], Bishop Bigandet, *An Outline of the History of the Catholic Burmese Mission: From the Years 1720 to 1887* Rangoon: Hanthawaddy Press, 1887

Constantine, G (2012), 'Bangladesh: The Plight of the Rohingya', Pulitzer Center on Crisis Reporting, Washington DC, USA, viewed 6 April 2018, .

Creswell, J.W., (2009), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd edition. Sage Publications

D.G.E. Hall, (1994), *A History of* South-*East Asia*, London: Macmillan press Ltd.

Daniel Jonah Goldhagen, (2009), Worse Than War: Genocide, Eliminationism, and the OngoingAssault on Humanity New York: Public Affairs.

Davies, J. C., (1962); (1979), Toward a Theory of Revolution: American Sociological Review 27 http://www.jstor.org/stable/2089714

Deikun, G & Zetter R (2010), Meeting Humanitarian Challenges in Urban Areas, Forced Migration Review's website, issue no. 34, February, University of Oxford, United Kingdom, viewed 03 May, 2018

Desai, W. S. (1961), *A Pageant of Burmese History* (Bomby: Orient Longmens)

Earvolino-Ramirez, M. (2007), *East Asia, A Social Economic and Political Geography,* London: Methuen and Co. 1964

Eisenhart, M. (1991). Conceptual Frameworks for Research Circa 1991: Ideas from a Cultural Anthropologist ; Implications for Mathematics Education Researchers. Virginia: Blacksburg Press

Fatimi, S. Q., (1959), "The Role of China in the spread of Islam in South East Asia" (University of Singapore, (Mimeo)

Fisher, C. (2007). Researching and Writing a Dissertation: A Guidebook for Business Students. Financial Times Prentice Hall: Intervarsity Press

Flin, R. (1996). Sitting in the hot seat: Leaders and teams for critical incident management. Chichester: Wiley

Fraser, M. W., Richman, J. M., & Galinsky, M. (1999). Risk, protection, and resilience: Toward a conceptual framework for social work practice. *Social Work*, *23*(3)

Gang Yin, (2002), *Arab-Israeli Conflict: Problems and Way Out,* Beijing: International Cultural Press

Genzuk, M. (2003). A Synthesis of Ethnographic Research. Occasional Papers Series. Center for Multilingual, Multicultural Research (Eds.). Center for Multilingual, Multicultural Research, Rossier School of Education, University of Southern California. Los Angeles

Gesthuizen, M., van der Meer, T., & Scheepers, P. (2009). Ethnic diversity and social capital in Europe: Tests of Putnam's thesis in European countries. Scandinavian Political Studies, 32(2), https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2008.00217.x.

Glavovic, B. C.; Scheyvens, R. A. and Overton, J. D. (2003): *Waves of adversity, layers of resilience: explor ing the sustainable livelihoods approach. In: Storey,* D.; Overton, J. and Eds, B. N. (eds.): Contesting develop ment: pathways to better practice. Proceedings of 3rd Biennial Conference of the Aotearoa New Zealand In ternational Development Network (Dev Net). Palmer ston North, NZ

Glesne, C., & Peshkin, A. (1992), Becoming qualitative researchers: An introduction. New York: Longman.

Gravers, Mikael. (1999), *Nationalism as Political Paranoia in Burma: An Essay on the Historical Practice of Power*. Richmond, Surrey: Curzon,

Gravers, Mikael. (2007), *Exploring Ethnic Diversity in Burma*. Copenhagen: NIAS

Green P and Ward T, (2004), State Crime: Governments, Violence and Corruption, London: Pluto Press,. 19 Feierstein, D, Genocide as Social Practice

Green P and Ward T, (2004), State Crime: Governments, Violence and Corruption, (London: Pluto Press, Lowenstein, Allard K. is *Genocide oc Curring in Myanmar's Rakhine State?* International Human Rights Clinic, Yalelaw School for Fortify Rights

Green, Penny/MacManus, (2015), Thomas/Venning, Alicia de la Cour, *COUNTDOWN TO ANNIHILATION: GENOCIDE IN MAYANMAR*, International State Crime Initiative, School of Law, Queen Mary University of London Mile End Road, London E1 4NS, United Kingdom

Greve, B. & Staudinger, U. (2006), *Resilience in later adulthood and old age: Resources and potentials for successful aging*. In D. Cicchetti & D. Cohen (Eds.) *Developmental psychopathology: Risk, disorder and adaptation, vol. 3* New York, NY: Wiley and Sons

Grinvald, M (2010), Problems of Integration of Refugees and Internally Displaced Persons in Serbia, Palacky University, Czechia, Czech Republic.

Hall, D.G.E. (1968), *Histry of* South-East Asia, Burma Research Society, London.

Haque, Mozzammil, (1978), *The Institute of Muslim Minority Affairs Bulletin,* Jeddah, King Abdul Aziz University

Harris, P & Reilly, B., (2003), Democracy and Deep –Rooted Conflict: Options for Negotiations, IDEA Sweden.: Tryndells Tryckeri

Harvey, G.E. (1967), *From the Earliest Time to 10 March 1824, The Beging of the English Conquest*, London: Frank Cass & Co

Harvey, L. and MacDonald M., (1993), *Doing Sociology*, London, Macmillan, ISBN 033355082X pbk

Hassan, Mohammad Shahid (2016), *Refugee crisis in Bangladesh: A case study on Rohingya refugee,* Department of Political Science, University of Dhaka

Hbo Chey, Hsaya, (1939), *Bama Mutsalin do i Sheihaun Atoukpati* [the Old Biography of Bamar Muslims], Sagain Myo: Mya Than Sa Pounhneiktaik

Heale,1 Dorothy Forbes, (2013) *Understanding triangulation in research Roberta*, Evidence-Based Nursing Online First, published on August 13, as 10.1136/eb-2013-101494 Research made simple

Helton, A. (2002), The Price of Indifference: Refugees and Humanitarian Action in the New Century, Oxford University Press, p. 10

Henley, David. (2014), *"Dealing with diversity: the politics of ethnicity in Southeast Asia."* Leiden University. Kantoren Stichthage, Koningin Julianaplein 10, Den Haag. 10 April Lecture.

Hitchcock, G., and Hughes, D. (1995). Research and the Teacher: A Qualitative Introduction to School-Based Research. London: Routldge

Hobsbawm, Eric J., (1990), *Nations and Nationalism since 1780*, Cambridge University Press

Holling, C. S. (1996), *Engineering resilience versus ecological resilience. In: Schulze, P. (ed.): Engineering within ecological con straints*. Washington D.C

HTUT, ZAW MIN, (2003), *Human RIGHTS ABUSES AND DISCRIMINATION ON ROHINGYA*, (BURMESE ROHINGYA ASSOCIATION IN JAPAN (BRAJ), Chittagong, September

Hugh Clifford, (1904), *Further India'. Being the Story of Exploration from the Earliest Times in Burma, Malaya, Siam and Indo-China,* London: Lawrence and Bullen

Huntington, Samuel P. (1996), *The Clash of Civilizations and Remarking of Word Order*, Simon and Schuster, New York, quoted in *Burma's Muslims: Terrorists or Terrorized?* by Andrew Selth (Australia: Strategic and Defence Studies Center, Natioanl University Australia, 2003)

Ibrahim, Azeem, (2016), *The Rohingyas: Inside Myanmar's Hidden Genocid,* London: Hurt Publication

Idrish, Muhammad Hossain Bin (2015), Socio-Political Impact of Rohingya refugee on Host Community in Cox's Bazar, Bangladesh, MA Thesis, Dept. of Geography & Environment, University of Dhaka

Imtiaz Ahmed (2010), *The Plight of Stateless Rohingyas: Responses of the State, Society and International Community*, UPL: Dhaka

Irwin, Anthony, (1946), *Burmese Outpost,* London; Roney, David, *Burma Victory*, Arams and Armour Press, London

Irwin, Anthony, (1992), *Burmese Outpost,* London, 1946; Roney, David, *Burma Victory,* Arams and Armour Press, London

Islam, Md. Nurul, (1999), *The Rohingya problem*, Arakan Rohingya National Organization (ARNO), Arakan (Burma)

J. S. Furnivall, (1956), *Colonial Policy and Practice,* New York University Press

Jaha, Ganganath, (1994), (Jawaharal Nehru University), *Rohingya Imbaolio: The Implication for Bangladesh in* S.R. Chakaravaty (Edited) *Foreign policy of Bangladesh*, New Delhi, p. 293; *The Manifesto of Arakan Rohingya National Organization (ARNO), Arakan* (Burma), 1999; *The Genocide of the Rohingya Muslims of Arakan in Barma, Rohingya Reader 1, Burma Centrum Nederland*, Amsterdam, October 1995

Jahan, Rounaq, (1972), *Pakistan: Failure in national integration*. Columbia University Press

Jilani, (2005), AFK. THE MUSLIMS OF SOUTHEAST ASIA, (THE TAJ LIBRARY, Chittagong: May

Jilani, AFK, (1975) "*A Brief Account of Regional Geography of Arakan*" (Physical Features) TMs (Photocopy), *Spacial collection, Arakan Historical Library*, Chittagong, p.1; The High School Geography of Burma (in Burmaese), The Textbook Committee, Ministry of Education, The Socialist Republic of Burma, Rangoon

Kakweyei Wungyihtana, (1997), *Thathana Yaunwa Htunzebo* [*Golden Light of Religion*], Yangon

Karim, Abdul, (2000), *The Rohingyas: A Short Account of their History and Culture.* (Arakan Historycal Society, Chittagong

Keen, David, (2000), "War and Peace: What's the Difference?" *International Peacekeeping*

Keyes, C. L. M. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Research

Kuada, J. (2012), *Research Methodology, A Project Guide for University Students*. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Kvale, S. (1996), *Interview Views: An Introduction to Qualitative Research Interviewing*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

LeCompte, MD & Goetz, JP (1993), Ethnography and Qualitative Design in Educational Research, 2nd Edn., Emerald Publishing, UK.

Lee, SW (2005), When refugees stream: Environmental and political implications of population displacement, Harvard University, Cambridge. Lee, SW (2005), When refugees stream: Environmental and political implications of population displacement, Harvard University, Cambridge.

Leichenko, R. and O'Brien, K. (2008): *Environmental change and globalization: Double exposures*. Oxford.

Leider, Jacque p, (2015), *"Competing Identities and the Hybridized History of the Rohingyss"* In Renaud Egreteu and Francois Robinne, eds. *Metamorphosis: Studies in Social and Political Change in yanmar*, Singapure: NUS press

Leipold, B. & Greve, W. (2009), Resilience: A conceptual bridge between coping and development. *European Psychologist, 14*(1)

Lemkin, R, (1944), Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress, Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace

Lemkin, R, (1944), Axis *Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government*, Proposals for Redress, (Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace

Lester, F. (2005). On the Theoretical, Conceptual, and Philosophical Foundations for Research in Mathematics Education. ZDM, 37(6)

Lieberman, (2003), Victor, *Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, c. 800-1830*, Cambridge University Press

Loescher, G., Steiner, N., Gibney, M. (eds). (2003). Problems of protection: the UNHCR, refugees and human rights, London: Routledge

Loescher, Gil, (1992), "Refugee Movements and International Security". Brassey's for The International Institute for Strategic Study. Published by Brassey's for the IISS

Malik, K. (2013). *Buddhist Pogroms and Religious Conflicts*, Pandaemonium. [Online]

Marshall, C. & Rossman, G.B. (1999). *Designing Qualitative Research*. 3rd ed. Thousand Oaks, California: Sage Publications

Matthews, Bruce, (2001), *Ethnic and Religious Diversity: Myanmar's Unfolding Nemesis*,

Maung Lu, Shew, (1989), *Burma in the Family of Nations*, (The University Press Limited, Dhaka

Maung Tin and C. H. Luce, (1913), *The Glass Place Chronical of the Kings of Burma* (London: Humphery, Milfod

Maung, U Maung, (1980), *From Sangha to Laity: Nationalist Movements of Burma, 1920-1940*, South Asia Books

Micael Hutt, (2005). *Unbecoming Citizens: Culture, Nationhood, and the Plight of Refugees from Bhutan*, New Delhi, Oxford University Presss

Milner & Loescher, (2011), Forced Migration Policy Brie_ng 6: Responding to protracted refugee situations: Lessons from a decade of discussion. Refugee Studies Centre, Oxford

Mogire, Edward. 2011. *Victims as Security Threats*. Global Security in a Changing World. London: Routledge

Mohammed Ashraful Alam, (1075), *A Short Historical Background of Arakan*, Unknown Publisher, p.1; The High School Geography of Burma (in Burmaese), The Textbook Committee, Ministry of Education, *The Socialist Republic of Burma, Rangoon*,

Munhall, P., & Chenail, R. (2008). Qualitative Research Proposals and reports: A guide (3rd ed.). Sudbury, MA: Jones and Bartlett

Murray, K., & Zautra, A. (2012). Community Resilience: Fostering Recovery, Sustainability, and Growth. In M. Ungar (Ed.), *The Social Ecology of Resilience. A Handbook of Theory and Practice*, New York: Springer Science+Business Media

"U Ba U, (1959), (*Mandalay Centenary: llistory of Burmese Muslims*1 (Mandalay, Burmese)

Panday, VC ed. (2004), 'Environment, Security, and Tourism Development in South Asia: Tourism development in South Asia', Gyan Publishing House 3, New Delhi

Patton, M. Q. (1990), *Qualitative evaluation and research methods*. Newbury Park, CA: Sage.

Paul R. Brass, (1980), *"Ethnic Groups and Nationalities: The Formation, Persistence and Transformation of Ethnic identities over time",* Quoted in T. Maniruzzaman, The Bangladesh Revolution and its Aftermath, Dhaka, BBl

Penrose, Jan, and Richard C.M. Mole. (2008), "Nation-States and National Identity."*The SAGE Handbook of Political Geography*. Ed. Kevin R. Cox. By Murray Low and Jennifer Robinson. Los Angeles: SAGE Publications

Phayre, A. (1884), *History of Burma*, London

Phillips, B. S. (1971), Social Research: Strategies and Tactics (3rd ed,). New York: Macmillan Publishing Company

Prince-Embury, S. (2013). Resiliency scales for children and adolescents: Theory, research, and clinical application. In S. Prince-Embury & D. H. Saklofske (Eds.), Resilience in children, adolescents, and adults: Translating research into practice, New York: Springer

Puggioni, R. (2016). Rethinking International Protection, The Sovereign, the State, the Refugee, Palgrave Macmillan UK

Pye, Lucian W., (1966), *Aspects of political Development* Boston, little, Brown and Company (Inc.)

Ravitch, S.M., & Riggan, M. (2017). Reason & rigor: How conceptual frameworks guide research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Razzaq, Abdur & Haque, Mahfuzul, (1995), *A Tale of Refugees: Rohingyas In Bangladesh*, Center for Human Rights, Dhaka, p. 15. Quoted in Michael W. Charney, *Where Jambudipa and Islamdom Converged: Religious Change and the Emergence of Buddhist Communalism in Early Modem Arakan (Fifteenth to Nineteenth Centuries)*, Ph.D dissertation, University of Michigan, 1999

Refugee International, *Citizens of Nowhere*, (2006). *The Stateless Biharis of Bangladesh*, (Washington: Refugees International)

Resnick, B. (2011), The relationship between resilience and motivation. In B. Resnick, L. Gwyther & K. Roberto (Eds.) *Resilience in aging: Concepts, research and outcomes* New York, NY: Springer; Windle, G. (2010), What is resilience? A review and concept analysis. *Reviews in Clinical Gerontology, 21*(2)

Rex Brynen and Roula El–Rifai, (2007). *Palestinian Refugees*: *Challenge of Repatriation and Development* (London: I. B. Tauris and Co. Ltd. and the International Development Research Center)

Rohingya refugees in Bangladesh and Thailand, (2011), *Fact finding mission to Bangladesh and Thailand* 4 to 17 February *Copenhagen*

Röhring, A., & Gailing, L. (2010). Path Dependency and Resilience – The Example of Landscape Regions. In B. Müller (Ed.), Urban Regional Resilience: How Do Cities and Regions Deal with Change? New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Rounaq Jahan, (1972), *Pakistan: Failure in national integration*. New Yourk: Columbia University Press

Samuels, David, (2013), "Political Identity." *Comparative Politics*. New York: Pearson Education

Scotti, J. R., Beach, B. K., Northrop, L. M. E., Rode, C. A., & Forsyth, J. P. (1995). The psychological impact of accidental injury. In J. R. Freedy & S. E. Hobfoll (Eds.), Traumatic Stress: From Theory to Practice Boston: Springer

Sharif, A. (1996), "On Arakan the Arakanese", Nalinikanta Bhattasali Commomoration Volume, Dacca Mesumuem,

Siddiquee, Mohammad Mohibullah, Edi. (2014), *THE ROHINGYAS OF ARAKAN History and Heritage*, ALI PUBLISHING HOUSE, Chittagong

Silverman, D. (2001), *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text*

Silverstein, Josef, comp. (1980), *Burmese Politics: The Dilemma of National Unity*. New Brunswick: Rutgers UP

Smith, Anthony D. (2007), *State of Strife: The Dynamics of Ethnic Conflict in Burma*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

Smith, Donald E. (1965), *Religion and Politics in Burma*. Princeton, N. J.: Princeton UP

Smith, Martin, (1999), *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity*, Zed Books

Smith, Martin, (2007). *State of Strife: The Dynamics of Ethnic Conflict in Burma*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

Smith, Martin. (1999), *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity*. London: Zed

Sonia, Farhana Rahman, (2014), *BANGLADESH-MYANMAR BILATERAL RELATIONS AND REGIONAL IMPLICATIONS*, (Department of International Relations, University of Dhaka, Dhaka

Stake, R.K. (2010), *Qualitative research: Studying how things work.* New York: The Guilford Press.

Surjan, A., Sharma, A., & Shaw, R. (2011). Understanding urban resilience. In R. Shaw, A. Sharma (Eds.), *Climate and disaster resilience in cities*. UK: Emerald Group Publishing Limited.

Swanson, R. A. (2013). Theory building in applied disciplines. San Francisco, CA: Berrett-Koehler

The Regional Islamic Da'wah Council of Southeast Asia and the Pacific, (1996), *Muslim Almanac: Asia and Pacific,* Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd.

The Young Foundation (2012). Adapting to change: the role of community resilience. Britain: The Young Foundation

U, Thant Myint, (2001), *The Making of Modern Burma,* Cambridge University Press

Uddin, K. and Ahamed, A. (2008), "Bangladesh Myanmar Relations: Continuity and change". The Chi ttagong universi ty journal of social sciences vol26, Uddin,N.(Ed).(2012),"To Host to Hurt: Counter-narrative on Rohingya Refugee Issue in Bangladesh". ICDR, Yesmin, S. (2016),"Policy Towards Rohingya Refugees :A Comparative Analysis of Bangladesh, Malaysia and Thailand". Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.), vol.61(1)

Uddin, N ed. (2012), 'To Host or Hurt: Counter-narratives on Rohingya Refugee Issue in Bangladesh', Dhaka: International Centre for Dispute Resolution (ICDR).

Ungar, M. (2004). Nurturing hidden resilience in troubled youth. Toronto, ON: University of Toronto Press.

Ungar, M. (2011), The social ecology of resilience: Addressing contextual and cultural ambiguity of a nascent construct. *American Journal of Orthopsychiatry, 81*(1)

Wade, F. (2017), *Myanmar's Enemy Within: Buddhist Violence and the Making of a Muslime `Other'*. London: zed Books

Weiss, R.S. (1994), *Learning from Strangers: The Art and Methods of Qualitative Interview Studies*. The Free Press, New York.

Weiss, R.S. (1994), *Learning from Strangers: The Art and Methods of Qualitative Interview Studies*. The Free Press, New York.

Wellington, G M; Dunbar, Robert G**;** Merlen, G (2001): *Part of the Global Seawater Oxyge-18* database, Wellington 1996. *PANGAEA,* https://doi.org/10.1594/PANGAEA.57852

WFP General Regulations (2009 edition), pursuant to FAO Conference Resolution 1/61

Whitaker, B. E. (1999), Changing opportunities: refugees and host communities in western Tanzania. Journal of Humanitarian Assistance

Whitaker, B. E. (2002) "Refugees in Western Tanzania: The Distribution of Burden and Benefits Among Local Hosts" *Journal of Refugee Studies* 15 (4)

Whitaker, BE (2002), 'Refugees in Western Tanzania: The Distributions of Burdens and Benefits among Local Hosts', Journal of Refugee Studies, vol. 15, no. 4

Whitaker, Beth Elise. (2008). "Funding the International Refugee Regime: Implications for Protection." *Global Governance* 14 (2): 241-258. http://www.jstor.org/stable/27800704

Wiles, R., Heath, S., Crow. G. & Charles, V. (2005) Informed Consent in Social Research: A Literature Review. ESRC National Centre for Research Methods. NCRM Methods Paper Series.

Withanaarachchi, J. (2013). Infl uence of Strategic Decision Making on Transport Corridor Planning, Transport Infrastructure and Community Resilience.

[Electronic version]. In Proceedings of the International Conference on Building Resilience 2013: Individual, institutional and societal coping strategies to address the challenges associated with disaster risk. University of Salford, Ahungalla, Sri Lanka. Retrieved April, 03, 2014

Wolcott, H. F. (1994), *Transforming Qualitative Data: description, analysis, interpretation* (Thousand Oaks, Sage).

Yegar, Moshe, (1972), *The Muslim of Burma: A Study of Minority Groups:* Hebrew University, Jerusalem:

Yegar, Moshe, (1972), *The Muslims of Burma: A Study of a Minority Group,* Otto Harasowitz. WIESBADEN, Germany

--------, (2002), *Between Integration and Secession: The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar*, Lexington Books

Youle, Col. Henry and Burnell, (1903), A. C. *Hobson-fobson*, new ed. edited by William Crooke [London: John Murray, , p. 495; Bishop Bigandet, *An Outline of the History of the Catholic Burmese Mission: From the Years 1720 to 1887* Rangoon: Hanthawaddy Press, 1887

Young, P. V. (1993), Scientific Survys and Research, New delhi: Prentice Hall of IndiaPvt. Ltd

Younus, Dr. Mohammed, (1994), *A History of Arakan: Past & Present*, (Magenta Colour, Chittagong

Yule, Capt. Henry, (1858), *A Narrative of the Mission Sent by the Governor-General of India to the Court of Ava in 1855* ...London: Smith, Elder

Yunus, (1994), *A History of Arakan: Past & Present*, Magenta Colour, Chittagong

Zarni, M. (2013). *Buddhist Nationalism in Burma,* Tricycle. [Online] Available:

Zarni, M. (2013). Tricycle Buddhist Nationalism in Burma. Retrieved October 6, 2019, from https://tricycle.org/magazine/buddhist-nationalism-burma

Zaw Win, Khin. (2010), Unfinished Task of Nation-Building.” *Ruling Myanmar: From Cyclone Nargis to National Elections*. Ed. Nick Cheesman, Monique Skidmore, and Trevor Wilson. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

Journals

"Refugee Support for Insurgencies." In *Trends in Outside Support for Insurgent Movements*, 1st ed., 61-70: RAND Corporation. http://www.jstor.org/stable/10.7249/mr1405oti.12.

"Trapped in Statelessness: Rohingya Refugees in Bangladesh." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 14 (8)

(Accessed 1 April 2014)

A Critical Comparison of Identity Theory with Social Identity Theory." *Social Psychology Quarterly*

Adisah, Jinmi (1996). 'Rwandan Refugees and Environmental Strategy in the Great Lakes Region: A Report on the Habitat/UNEP Plan of Action', *Journal of Refugee Studies* 9(3)

Akhter S & Kusakabe K (2014), 'Gender-based violence among documented Rohingya refugees in Bangladesh', *Indian Journal of Gender Studies*, vol. 21, no. 2

Annie Gowen, (2017) 'Textbook Example of Ethnic Cleansing': 370,000 Rohingyas Flood Bangladesh as Crisis Worsens," *Washington Post*, September 12

Arai, T. (2013), *Toward a Buddhist Theory of Structural Peace: Lessons from Burma/Myanmar*,

Archival Papers, *Mass Eviction of Burmese Muslims and Their Influx in Bangladesh.* File no. 900 1 (4), vol.1, P. 14 NAB

Bangkok, Thailand. [Online] Available at: http://works.bepress.com/tatsushi_arai/54

Bangladesh, The London School of Economics and Political Science, viewed 13 May 2018

Bond, A., Morrison-Saunders, A., Gunn, J. A. E., Pope, J., &Retief, F. (2014). Managing uncertainty, ambiguity and ignorance in impact assessment by embedding evolutionary resilience, participatory modelling and adaptive management. Journal of Environmental Management, 151C, 97–104

Boote, D. N., & Beile, P. (2005). Scholars before researchers: On the centrality of the dissertation literature review in research preparation. Educational Researcher, 34(6), 3-15

Brooten, L (2015), 'Blind Spots in Human Rights Coverage: Framing Violence Against the Rohingya in Myanmar/ Burma', Popular communication, vol. 13, no. 2

Brown, D., & Kulig, J. (1996/97). The concept of resiliency: Theoretical lessons from community research. Health and Canadian Society, 4, 29–52

Buchanan, Francis, (1799), "*A comparative vocabulary of some of the languages spoken in the Burma empire,"Asiatic Researches 5* Available online here:

Buchanan, Francis, (1799), *"The Classical Journal of 1811,"* *Asiatic Society Journal, 5,* Available online here: https://www.soas.ac.uk/sbbr/editions/file64276.pdf

Bury, M. (1982), Chronic illness as biographical disruption. *Sociology of Health and Illness, 4*(2)

Byman, Daniel, Peter Chalk, Bruce Hoffman, William Rosenau, and David Brannan, 2001,

Chambers, R. (1986), 'Hidden Losers? The Impact of Rural Refugees and Refugee Programs on Poorer Hosts', in International Migration Review, Vol. 20, No. 2, Special Issue: Refugees: Issues and Directions

Charney, Micael, W. (2005), "Theories and Historiography of the Religious Basis of Ethnonyms in Rakhiaing (Arakan), Myanmar (Burma)" Paper presented at the Workshop on *The Forgotten Kingdom of Arakan: A Public Seminar on the People of Presented Day Arakan State of Myanmar*, November, 23, in Bankok, Thiland.

Charney, Micael, W. 2005. "Theories and Historiography of the Religious Basis of Ethnonyms in Rakhiaing (Arakan), Myanmar (Burma)" Paper presented at the Workshop on *The Forgotten Kingdom of Arakan: A Public Seminar on the People of Presented Day Arakan State of Myanmar*, November, 23, in Bankok, Thiland.

Chawdhury, Mohammed Ali, (1995-96) "*The Advent of Islam in Arakan and the Rohingyas"*, Anual Magazine, *Arakan Historical Sociaty*, Chittagong.

Cheesman, N. (2017). Introduction: Interpreting communal violence in Myanmar. Journal of Contemporary Asia, 47(3), 335-352

Coclanis, P. (2013). 'Terror in Burma: Buddhists vs. Muslims', *World Affairs*

Collins, C. S., & Stockton, C. M. (2018). The central role of theory in qualitative. International Journal of Qualitative Methods, 17, 1-10.

Collis, (1995), Maurice in collaboration with San Shwe Bu, *Arakan's Place in the Civilization of the Bay. In: Journal of Burma Research Society*, vol. XXIII, p. 493.

Cookson, F 2017b, 'Impact of the Rohingya Crisis on Bangladesh (Part II)', The Independent, 10 October, viewed 11 April 2018

Crabtree, K. (2010). Economic challenges and coping mechanisms in protracted displacement: A case study of the Rohingya refugees in Bangladesh. Journal of Muslim Mental Health, 5, 41-58. doi:10.1080/15564901003610073

Creswell, JW, Hanson, WE, Clark Plano, VL, & Morales, A 2007, 'Qualitative research designs: Selection and implementation', The Counseling Psychologist, vol. 35, no. 2

Cutter, S. L., Boruff, B. J., & Shirley, W. L. (2003). Social vulnerability to environmental hazards. Social Science Quarterly, 84

D. G. E. Hall, (1960) "Studies in Dutch Relations with Arakan, Part I, Dutch Relations with King Thirithudhamma of Arakan", *Burma Research Society Fiftieth Anniversary Publications no. 2* Rangoon

Davoudi, S., Shaw, K., Haider, L. J., Quinlan, A. E., Peterson, G. D., Wilkinson, C., etal. (2012). doi:10.1177/0974928418802072.https://doiorg.libproxy.tuni.fi/10.1177/0974928418802072

Dussich, John P. J. 2018, "The Ongoing Genocidal Crisis of the Rohingya Minority in Myanmar." *Journal of Victimology and Victim Justice* 1 (1): 4-24. doi:10.1177/2516606918764998.

Dussich, John PJ. 2018. "The Ongoing Genocidal Crisis of the Rohingya Minority in Myanmar." *Journal of Victimology and Victim Justice*: 2516606918764998.

Easy Targets, *The Persecution of Muslims in Burma*, Karen Human Rights Group, May (2002), http://www.ibiblio.org/freeburma/humanrights/khrg/archive/khrg2002/khrg0202.html

Epidemiology and Community Health, 62(11), 987-991; Windle, G. (2010), What is resilience? A review and concept analysis. *Reviews in Clinical Gerontology, 21*(2), 152-169

Feller, E. (2011). "The Evolution of the International Refugee Protection Regime", Washington University Journal of Law & Policy, Vol.5, Available at:https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol5/iss1/11 [Accessed 24 July 2020]

Fisk, Kerstin. (2018). "One-Sided Violence in Refugee-Hosting Areas." *Journal of Conflict Resolution* 62 (3): 529-556. doi:10.1177/0022002716656447.https://doi.org/10.1177/0022002716656447.

Friedland, R. (2001). 'Religious Nationalism and the Problem of Collective Representation', *Annual Review of Sociology*, Vol. 27

Fulton, S. & Krainovich-Miller, B. (2010). Gathering and Appraising the Literature. IN LoBiondo-Wood, G. & Haber, J. (Eds). Nursing Research: Methods and Critical Appraisal for Evidence-Based Prcatice (7th Edition). St. Louis MO: Mosby Elsevier

Gaffari, Maung Ko (1960) "The First Muslim Community of Rangoon", *Guardian Monthly* (Rangoon), VII (Oct., 45;

Gain, Philip (ed.) *SHETU REPORT-1* (Shetu an Alternative Media Apporach), Dhaka, 1992, p. 31 Galache CS (2017), 'Rohingya villagers bear witness to a Brutal Crackdown in Myanmar', Time, 6 April, viewed 5 May 2018

Garrie, A. (2017), The Myanmar conflict-explained, In MPN news. Available at:

Gibbens, S (2017), 'Myanmar's Rohingya are in crisis- what you need to know', The National Geographic, 29 September, viewed 28 April 2018

Gladden, J. (2012). The coping skills of East African refugees: A literature review. Refugee Survey Quarterly Journal, 31, 177-196. doi:10.1093/rsq/hds009

Gooding, P., Hurst, A., Johnson, J. & Tarrier, N. (2012), Psychological resilience in young and older adults. International *Journal of Geriatric Psychiatry, 27*, 262-270 ; Nygren, B., Alex,

Goodman, J. H. (2004). Coping with trauma and hardship among unaccompanied refugee youths from Sudan. Qualitative Health Research, 14, 1177-1196.

Grant, C. & Osanloo, A. (2014). Understanding, Selecting, and Integrating a Theoretical Framework in Dissertation Research: Creating the Blueprint for 'House'. Administrative Issues Journal: Connecting Education, Practice and Research, Pp. 12-22 DOI: 10.5929/2014.4.2.9

Grundy-Warr, Carl, and Elaine Wong. (1997), “Sanctuary Under a Plastic Sheet–The Unresolved Problem of Rohingya Refugees.” *IBRU Boundary and Security Bulletin* 5.3: 79-91

Guilloux, A. (2010). 'Myanmar: Analyzing Problems of Transition and Intervention', *Contemporary Politics,* Vol. 16 (4), pp. 383-401

Guoqing Yu, (1993). “Origin and Development of Palestinian Refugee Problem,” *West Asia and Africa*, No.6,

Hall, (1960), *A History of South East Asia*, pp.780-81; *Ibid*, p.54

Hall, D.G.E. (1960), *Studies in Dutch Relation with Arakan,* Fiftieth Anniversary Publiccation No.-2, Burma Research Society, Rangoon

Headquarters of (1978), Rohingya Refugee Control Room in Ukiya, Cox’s Bazar, Bangladesh; N.

Hein, Patrick. (2018), "The Re-Ethnicisation of Politics in Myanmar and the Making of the Rohingya Ethnicity Paradox." India Quarterly 74 (4): 361-382.

Hobfoll, S., Freedy, J., Lane, C. & Gellar, P. (1990), Conservation of social resources: Social support resource theory. *Journal of Social and Personal Relationships, 7*(4)

Hogg, Michael A., Deborah J. Terry, and Katherine M. White. (1995), “A Tale of Two Theories:

Holling, C. (1973). Resilience and the stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics

Homer-Dixon, Thomas F., (1991), ‘On the Threshold’: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict, in International Security, Vol. 16, No. 2

Hossain, Md. Shayeed, (2015), *Bangladesh-Myanmar Relations*, IBS, Institute Of Bangladesh Studies, Rajshahi

Hourani, G.F. (1963), *Arab Seafaring: in the Indian Occan in ancient and early medieval times,* Beirut, p. 31; See also, Aktaruzzaman, Muhammed, *Op.Cit,* p.120

Howe, Adam E. (2018), "Discourses of Exclusion: The Societal Securitization of Burma’s Rohingya (2012–2018)." *Journal of Asian Security and International Affairs* 5 (3): 245-266. doi:10.1177/2347797018799000. https://doi-org.libproxy.tuni.fi/10.1177/2347797018799000;

http://arakanindobhasa.wordpress.com/2010/08/09/arakan-kingdom-map-up-to-modern-age (Accessed on 15.8.2016)

http://www.ecologyandsociety.org/voll2/issl/artl/

http://www.jstor.org/stable/24638575.

http://www.mcrg.ac.in/rw%20files/RW39_40/12.pdf [Accessed 25 March 2018]

http://www.mintpressnews.com/understanding-the-myanmar-conflict-and-

https://www.bbc.com/: https://www.bbc.com/news/world-asia-49596113

https://www.soas.ac.uk/sbbr/editions/file64276.pdf

Huai Zhi, (1964). “Palestinian Arab Refugee Problem,” *World Affairs*, No.13

Immigration and Population, May 2015), 8, http://myanmar.unfpa.org/sites/default/files/pub-

Impact on the Human Security of Host Communities. (Online) *International Migration*, Volume 40 Issues 5, pages 95-123, Special Issue 2 2002. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468- 2435.00213/abstract (accessed 13.12.12)

Imran, HFA & Mian, MN (2014), 'The Rohingya refugee in Bangladesh: A vulnerable group in Law and policy', Journal of Studies in Social Sciences, vol. 8, no. 2

International Crisis Group (ICG) (2018), 'The long haul ahead for Myanmar's Rohingya refugee crisis', Asia report N 296, Belgium, viewed 19 May 2018

International Crisis Group, ISCG, (2017), 'Myanmar's Rohingya Crisis Enters a Dangerous New Phase', December available at: https:// www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/292-myanmars-rohingya-crisis-enters-dangerous-new-phase

International Crisis Group, ISCG, (2018), Support to Bangladesh Host Communities in the Rohingya Refugee Response, May pg. 2

Islam, M. Nazrul (1988), *Problems of Nation Building in Developing Countries: The Case of Malayasia,* University of Dhaka, p.26 and also see author's *Pakistan and Malayasia: A Comperative Study in National Integration,* Sterling Publishers Ltd. New Delhi 1989

Jacelon, C. (1997), The trait and process of resilience. *Journal of Advanced Nursing, 25,* 123-129; Wagnild, G. (2003), Resilience and successful aging: Comparison among low and high income older adults. *Journal of Gerontological Nursing, 29*(12)

Jacobsen Karen, (1996), "Factors Influencing the Policy Responses of Host Governments to Mass Refugee Influxes". International Migration Review: Vol. 30, No. 3

Jacobsen, Karen. (2002), "Can Refugees Benefit the State? Refugee Resources and African Statebuilding." *The Journal of Modern African Studies* 40 (4): 577-596. http://www.jstor.org.helios.uta.fi/stable/3876026; Mutongu, Zablon Bundi. 2017a. "The Plight of Refugees in Africa: A Perspective from Kenya." *Theology* 120 (5)

Jaji, Rose. (2014), "Religious and Ethnic Politics in Refugee Hosting: Somalis in Nairobi, Kenya." *Ethnicities* 14 (5): 634-649. doi:10.1177/1468796813518313. https://doi-org.libproxy.tuni.fi/10.1177/1468796813518313

Jazeera, August available at: https:// www.aljazeera.com/indepth/features/price-hikes-jobs-ngos-impact-economy-cox-bazar-180810090248437.html

Jilani, AFK. (1999), *The Rohingyas of Arakan*: *Their quest for Justice,* Chittagong

John. (2001), Environment and Sociology: The State of the debate. Oxford polity Press. Parnini, S. (2013)," The Crisis of the Rohigya as a Muslim Minority in Myanmar and bilateral relations with Bangladesh". Journal of Muslim minority affairs, vol.33

Jonathan. (2019, September 10). BBC. Retrieved November 14, 2019, from

Jr, C.W. Welch, (ed.) (1971), *Political Modernization, A Reader in the comparative change California,* Duxbury Press, p. 168

Juergensmeyer, J. (2010). The Global Rise of Religious Nationalism. Australian Journal of International Affairs, 262-273.

Kamal, Bangladesh Red Crooss Society 1978 as quoted in: Kamaluddin, 1983

Khan, Abdul Mabud, (1984), *The Liberation Struggle in Arakan* (1948-1982). In Bangladesh today, May 16 - June15

khan, M. Siddik, (1936), *"Muslim intercourse with Burma", Islamic Cultur Relations de voyages et de textes giographiques arabes, Present et, tures Relatives eperxtreme orient du VIII e au XVIIIe Siecles,*

King, K. P. (2000), The adult ESL experience: Facilitating perspective transformation in the classroom. Adult Basic Education, 10(2): 69-89. doi: 1052231X

Kinnvall, C. (2002). 'Nationalism, Religion and the Search for Chosen Traumas: Comparing Sikh and Hindu Indentity Constructions', *Ethnicities,* 2(1), pp.79-106

Kinnvall, C. (2004). 'Globalization and Religious Nationalism: Self, Identity and the Search for Ontological Security', *Political Psychology,* 25(5), pp. 741-767

Kipgen N. (2013). 'Conflict in Rakhine State in Myanmar: Rohingya Muslims' Conundrum', *Journal of Muslim Minority Affairs,* 33(2), pp. 298-310.

Kipgen, Nehginpao. (2014), "Addressing the Rohingya Problem." *Journal of Asian and African Studies* 49 (2): 234-247. doi:10.1177/0021909613505269. https://doi.org/10.1177/0021909613505269

Kirmayer, L., Dandeneau, S., Marshall, E., Phillips, M.K. & Williamson, K.J. (2011), Rethinking resilience from indigenous perspectives. *Canadian Journal of Psychiatry, 56*(2)

Kirmayer, L., Dandeneau, S., Marshall, E., Phillips, M.K. & Williamson, K.J. (2011), Rethinking resilience from indigenous perspectives. *Canadian Journal of Psychiatry, 56*(2), 84-91

Knowledge for the New Millennium. Advances in Nursing Science, 21(4)

Kobia, K & Cranfield, L (2009), Literature Review: Urban Refugees, Carleton University, Ontario, Canada.

L., Jonsen, E., Gustafson, Y. Norberd, A. & Lundman, B. (2005) Resilience, sense of coherence, purpose in life and self-transcendence in relation to perceived physical and mental health among the oldest old. *Aging & Mental Health, 9*(4), 354-362; Wells, M. (2010), Resilience in older adults in rural, suburban and urban areas. *Journal of Rural Nursing and Health Care, 10*(2), 45-54

Landau, L. (2003) "Beyond the Losers: Transforming Governmental Practice in Refugee-Affected Tanzania" *Journal or Refugee Studies*, 16 (1):19-43

Lecours, André. (2000), "Ethnic and Civic Nationalism: Towards a New Dimension." *Space and Polity* 4.2 153-66.

Lederman, NG & Lederman, JS 2015, 'What is a theoretical Framework? A practical answer', Journal of science Teacher Education, vol. 26, no. 7, pp. 593-597.

Levy, Y & Ellis, TJ 2006, 'A system approach to conduct an effective literature review in support of information system research', Information Science Journal, vol. 9

Lewa, Chris. (2009), “North Arakan: An Open Prison for the Rohingya in Burma.”*Forced Migration Review* 32

Lewis, D. (2018), The view from Cox’s Bazar: assessing the impact of the Rohingya crisis on

Liehr P. & Smith M. J. (1999). Middle Range Theory: Spinning Research and Practice to Create

Linah Alsaafin, (2018), ‘Price hikes and jobs: How NGOs affect the economy in Cox's Bazar’, Al

Long, M. (2013). 'Dynamics of State, Sangha and Society in Myanmar: A Closer Look at the

Lu Maung, Shwe, 1989, (*Burma Nationalism and Ideology): Analysis of Society, Culture, and Politics,* Dhaka: University Press Limited, 1st edition, p. 63-64

Luthar, S., Cicchetti, D. & Becker, B. (2000), The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future research. *Child Development, 71*(3), 543-562; Netuveli, G.,

Lwin, Maung Than, Rakhine Kala or Ro Wan Nya People. (in Burmese) In: Myawaddy

Lwin, N. S. (2012). Retrieved November 1, 2019, from http://www.newmandala.org/making-rohingya-statelessness/

Lydia, D. , Kulwant, S. and Denise, L. (2015), A visual guide to 75 years of major refugee crises around the world, The Washington post, 21 December 2015. Retrieved from https://www.washingtonpost.com /graphics/world/historical-migrant-crisis

Maanen, J. V. (1979). Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: A Preface. *Administrative Science Quarterly, 24*(4), 520-526. doi:10.2307/2392358

Macdonald, P. A. (2013). 'From Military Rule to Elective Authoritarianism: the Reconfiguration of Power in Myanmar and its Future', *Asian Affairs: An American Review,* Vol. 40 (1), pp. 20-36

Madanat, H (2013), Impacts of Refugees on Societies, Hopes for Women in Education, Ontario, Canada, viewed 17 May 2018

Magazine, July, (1960), See and compare with Ba Tha, Rowengyas in Arakan (in English). In: Guardian Magazine, May.

Mahmud, T. (2018) “Rohingya relief ending up in Cox’s Bazar local markets” in *DhakaTribune website* [online] Available at: https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2018/02/11/rohingya-relief-ending-coxs-bazar- local-markets/ [Accessed 14 May 2018].

Malhotra, A. (2018). “Rohingya refugees sell aid to fund basic diet” in *Aljazeera website* [online] Available at: https://www.aljazeera.com/news/2018/02/rohingya-refugees-sell-aid-fund-basic-diet-180206185922617.html [Accessed 15 May 2018]

Marshall, ARC (2013), ‘Special Report: Myanmar gives official blessing to anti-Muslim monks’,

Marshall, N. A. and Marshall, P. A. (2007): *Conceptualizing and operationalizing social resilience within commercial fisheries in northern Australia. In*: *Ecology and Society* 12 (1),

Martin, Adrian, (2005), Environmental Conflict between Refugees and Host Communities. Journal of Peace Research, 42; 329, Published by: SAGE Publications on behalf of International Peace Research Institute, Oslo

Martin, Adrian. (2005a), "Environmental Conflict between Refugee and Host Communities." Journal of Peace Research 42 (3): 329-346. doi:10.1177/0022343305052015.https://doi.org/10.1177/0022343305052015

Martin, MF, Margesson, R & Vaughn, B (2017), The Rohingya crisis in Bangladesh and Burma, Congressional Research Service, viewed 26 March 2018

Massey, Doreen. (2004), "Geographies of Responsibility." *Geografiska Annaler B Geografiska Annaler, Series B: Human Geography* 86.1: 5-18

Masten, A. (2001), *Ordinary magic: Resilience processes in development*. *American Psychologist, 56*(3), 227-238; Seligman, M. & Csikszentmihalyi, M. (2000), Positive psychology: An introduction. *American Psychologist, 55*(1), 5-14

Maystadt, JF & Verwimp P. (2009), 'Households in Conflict Network: Winners and Losers among a Refugee-Hosting Population', Working Paper 60, The Institute of Development Studies, The University of Sussex, Falmer, Brighton.

Mbakem, Evarist Anu. (2017a). "Population Displacement and Sustainable Development: The Significance of Environmental Sustainability in Refugee–Host Relationships in the Congo−Brazzaville Crises." *Journal of Asian and African Studies* 52 (3): 363-377. doi:10.1177/0021909615594306. https://doi-org.libproxy.tuni.fi/10.1177/0021909615594306

Mbakem, Evarist Anu. (2017a). "Population Displacement and Sustainable Development: The Significance of Environmental Sustainability in Refugee–Host Relationships in the Congo−Brazzaville Crises." *Journal of Asian and African Studies* 52 (3): 363-377. doi:10.1177/0021909615594306. https://doi-org.libproxy.tuni.fi/10.1177/0021909615594306; Mogire, Edward. 2011. *Victims as Security Threats*. Global Security in a Changing World. London: Routledge

McCracken, G. (1988), *The long interview. Qualitative Research Methods Series*, No. 13. Newbury Park, CA: Sage.

McDonald M (2012) As violence continues, Rohingya find few defenders in Myanmar. International Herald Tribune, 31 October.

Merriam, S.B. (2009), *Qualitative research: A guide to design and implementation*. San Francisco: John Wiley and Sons.

Michael Symes, (1802), *Journal of his Second Embassy to the Court of Ava in* ed. D. G. E. Hall (London: George Allen and Unwin, 1955), p. 403; Scott, *op. cit.*, pp. 152-243

Mikael Gravers and Flemming Ytzen, (2014), Copenhagen: NIAS, 313-320

Milton, Abul, (2017), Mijanur Rahman, Sumaira Hussain, Charulata Jindal, Sushmita Choudhury, Shahnaz Akter, Shahana Ferdousi, Tafzila Mouly, John Hall, and Jimmy Efird.

Ministry of Foreign affairs, SEA, M. Sec., File No. 119, Relief for Myanmar Refugees;

Mohammad Abu Sayed Arfin khan & Others, Nasir Uddin (Ed.,) 2012, *Rural Livelihood of Rohingya Refugees in Bangladesh and their Impact on Forest: The Case of Teknaf Wildlife Sanctuary*, Institute of Culture & Development Research

Mohammad Mehedy Hassan, (2018), Audrey Culver Smith, Katherine Walker, Munshi Khaledur Rahman and Jane Southworth, 'Rohingya Refugee Crisis and Forest Cover Change in Teknaf, Bangladesh', Remote Sensing, April pg. 1)

Muller, Jerry Z. (2008), "Us and Them The Enduring Power of Ethnic Nationalism."*Foreign Affairs*

Murshid, N (2017), 'Why is Burma driving out the Rohingya-and not its other despised minorities?', The Washington Post, 9 November, viewed 1 April 2018, . *Muslims in Burma,* a *Pamphlet Published by RPF,* Arakan, Burma, July, 1984, p. 15

Mutongu, Zablon Bundi. (2017a). "The Plight of Refugees in Africa: A Perspective from Kenya." *Theology* 120 (5): 326-333. doi:10.1177/0040571X17710192. https://doi-

Mya (1), Asoya Sheinei U, (1939), *Bama Mutsalin Thamain Akyinchouk* [The Old Biography

N. Mohammad, (2012), "Refugee Protection Under the Constitution of Bangladesh: A Brief Overview" in Refugee Watch, [online] Available at:

org.libproxy.tuni.fi/10.1177/0040571X17710192.

Paper presented at the Asia Pacific Peace Research Association (APPRA) Conference.

Paris, R., (2001), Human Security: Paradigm shift or hot air. *International Security,* Vol. 26, No. 2,

Parkins, NC (2011), Push and Pull Factors of Migration, The University of the West Indies, Mona, viewed 1 June 20018

Parnini, SN (2012), 'Non-traditional security and problems of Rohingya across the Bangladesh', British Journal of Arts and Social sciences, vol. 5, no. 2, pp. 283-292.

Parnini, Syeda Naushin, Mohammad Redzuan Othman, and Amer Saifude Ghazali. 2013. "The Rohingya Refugee Crisis and Bangladesh-Myanmar Relations." Asian and Pacific Migration Journal 22 (1): 133-146. doi:10.1177/011719681302200107. https://doiorg.libproxy.tuni.fi/10.1177/01171968130220010 pdf/Rakhine%20State%20Census%20 Report%20-%20ENGLISH.pdf.

Peter Kyei, Michael Adjaloo, George Rapoo, and Kate Kilpatrick. (2008a). "Linkages between Livelihood Opportunities and Refugee–host Relations: Learning from the Experiences of Liberian Camp-Based Refugees in Ghana." *Journal of Refugee Studies* 21 (2): 230-252.

Petracou, E. (2004). Dominant issues in asylum policy in EU and Greece, 7th Panhellenic Geographical Conference, Lesvos, 14-17 October 2004 (in Greek)

Porter, Gina, Kate Hampshire, Peter Kyei, Michael Adjaloo, George Rapoo, and Kate Kilpatrick. (2008a). "Linkages between Livelihood Opportunities and Refugee–host Relations: Learning from the Experiences of Liberian Camp-Based Refugees in Ghana." *Journal of Refugee Studies* 21 (2): 230-252

Pye, Lucian W., (1972), *"Identity and political culture" in Binder et. Al. Crisis and sequencrs in political development,* princeton N.J. princeton University press, pp.73-74

Radhakrishna, E, Yoder, P & Ewing, JC (2007), 'Strategies for Linking Theoretical Framework and Research Types', Proceedings of the 2007 AAAE Research Conference, Volume 34

Ratcliffe, Rebecca. 2017. "Who are the Rohingya and what is Happening in Myanmar?" *The Guardian*, "Sep 6, " https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/06/who-are-the-rohingya-and-what-is-happening-in-myanmar.

Rodgers, B. (1989), Concepts, *analysis and the development of nursing knowledge*: The evolutionary cycle. *Journal of Advanced Nursing, 14*

Rohingya Issue'. *Asian Journal of Public Affairs*, 6(1), pp.79-94

Ruist, Joakim. 2015. "The Fiscal Cost of Refugee Immigration: The Example of Sweden." *Population and Development Review* 41 (4): 567-581.

Stokols, D. (1992) Establishing and maintaining healthy environments: Toward a social ecology of health promotion. *American Psychologist, 47*(1)

The Reuters, 26 June, viewed 30 March 2018
therohingya/231806/ (accessed: 22.1.2019)

Thin Kay Daw, (1960), Arakanese Capital, Journal of the Burma Research Society, Vol. LIII, Part-I

Ullah, Akm Ahsan. (2011), "Rohingya Refugees to Bangladesh: Historical Exclusions and Contemporary Marginalization." Journal of Immigrant & Refugee Studies 9 (2)"The Rohingya Refugee Crisis and Bangladesh-Myanmar Relations." *Asian and Pacific Migration Journal* 22 (1): 133-146. doi:10.1177/011719681302200107. https://doi-org.libproxy.tuni.fi/10.1177/011719681302200107;

Wiggins, R., Montgomery, S., Hildon, Z. & Blane, D. (2008), Mental health and resilience at older ages: Bouncing back after adversity in the British Household Panel Survey. *Journal of*

Yusuf, Muhammad (1992), " *The Plight of Rohingyas: A living Human Tragedy in Arakan*," Arakan Official Mouthpiece of ARIF, vol. 5, ISSUE 7, 31 July

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রিপোর্টসমূহ

"Ethnicity without Meaning, (2014), Data without Context: The 2014 Census, Identity and Citizenship in Burma/Myanmar," *Burma Policy Briefing Nr.13*, Transnational Institute, February available online here: http://www.tni.org/briefing/ethnicity-without-meaning-data-without-context (Accessed on June 2015)

"Nine policemen killed, five injured, one missing in border attack," *Global New Light of Myanmar*, October 10, 2016, 1, 3; "Extremists Terrorists Attack on Police Outposts in N-Rakhine," *Global New Light of Myanmar*, August 26, 2017

"Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, Yanghee Lee, A/HRC/34/67, United Nations, March 1, 2017. As a result of the 1982 Citizenship Law, and until the August 2017 attacks, Myanmar hosted more stateless people within its borders than any country in the world.

"Response from the Government of Myanmar to U.N. Special Rapporteurs," no. 30/3-27/91, United Nations, January 23, 2017

2007) See US Assistant Secretary of State for Population Refugees and Migration Ellen Sauerbrey made the resettlement offer at UNHCR's Executive Committee meeting in October

Aid and International Development Forum, (2018), 1 year on: 700,000 Rohingyas live in Cox's

Akins, H. (2014), may 2015, aljazeera. Retrieved oct 2019, 5, from http://www.aljazeera.com: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/10/no-place-islam-buddhist nationalism-myanmar-2013101710411233906.htm

Albert, E. (2015), The Rohingya migrant crisis, Council on Foreign Relations. Retrieved from https://www.cfr.org/backgrounder/rohingya-crisis

Alexander, D. E. (2013). Resilience and disaster risk reduction: An etymological journey. Natural Hazards and Earth System Sciences, 13(11)

Ali, Sayeed Amir, 1994. *The Sprit of Islam*, A One Publisher, Lahore

Alix-Garcia, J & Saah, D 2009, 'The Effects of refugee Inflows on Host Communities: Evidences from Tanzania', World Bank Economic Review, vol. 24, no. 1

Alix-Garcia, Jennifer and David Saah. (2010a). "The Effect of Refugee Inflows on Host Communities: Evidence from Tanzania." *The World Bank Economic Review* 24 (1): 148-170. http://www.jstor.org/stable/40647424.

Amnesty International, 19 May (2004), Myanmar, *The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied*, AI index: ASA 16/005/2004; http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA160052

Amnesty International: (2004), *"The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denialed*", Mayp.

An overview of Policy and Practice in an Historical Context. Working Paper. (Online). *Refugee Law Project*. Uganda.

Anand Kumar, February (2006). 'Pak-Bangladesh Relations in the Aftermath of Khleda's visit', South Asia Analysis Group. Paper No. 1706,

Arakan's place in the vivilisation of the Bay, JBRS, Vol. II Fiftieth Anniversary Publications , No. 2, p. 488

Archival Papers, File no. 900 1(4), vol.1, PP. 15-16, N.A.B.

Art. 7(1) (1997), Prosecutor v. Dusko Tadic, ICTY, Case No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment (Trial Chamber), May 7, para. 646, http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf (accessed April 10, 2013) as well as other Countries. (2004), Standing Committee.UNHCR,.(EC/54/SC/CRP.5)

Asia Pacific Refugees Rights Network, (2013). *Urban Refugees in Asia Pacific: Resiliency and Coping Strategies*, Asia Pacific Refugees Rights Network. [Online] Available at: http://www.aprrn.info/1/index.php/resources/reports/185-urban-refugees-in-asia-pacific-resiliency-and-coping-strategies (Accessed 18 January 2014)

Association of Young Monks, 2012, "Announcement to All Arakanese Nationals," June 29, on file with Human Rights Watch. See also, Human Rights Watch, Burma–The Government Could Have Stopped This: Sectarian Violence and Ensuing Abuses in Burma's Arakan State, August 2012, http://www.hrw.org/reports/2012/08/01/government-could-have-stopped, pp. 40-41

Aukot, E. (2003) "It Is Better to Be a Refugee Than a Turkana in Kakuma": Revisiting the Relationship between Hosts and Refugees in Kenya. Refuge, Vol 21, No 3 (2003). (Online), Global Movement for Refugees and Migrant Rights. https://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/refuge/article/view/23482/21678 (accessed 24.10.11)

Aukot, E. (2003), "It Is Better to Be a Refugee Than a Turkana in Kakuma": Revisiting the Relationship between Hosts and Refugees in Kenya. Refuge, Vol 21, No 3 (2003). (Online), Global Movement for Refugees and Migrant Rights. https://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/refuge/article/view/23482/21678 (accessed 24.10.11)

Available at: http://kenanmalik.wordpress.com/2013/11/21/buddhist-pogromsand-religious-conflict/ (Accessed 21 January 2014)

Available at: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1241663/FULLTEXT02.pdf [Accessed 17 May 2020].

Available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/bg.html

Ayako, S 2014, 'The formation of the concept of Myanmar Muslims as indigenous citizens: Their history and current situation', The Journal of Sophia Asian Studies, no. 32, pp. 26-40.

Bangkok, Thailand, p. 12, [Online] Available at: http://works.bepress.com/tatsushi_arai/54 (Accessed 1 April 2014)

Bangladesh Bureau of Statistics, (2011), Dhaka bangladesh/index.html

Bangladesh: Interviews with Rohingyas Fleeing from Myanmar since 9 October 2016," February 3, 2017,

Bazar with a population density 1.5 times that of Manilla. http://www.aidforum.org

Berman, J (2013), 'Utility of a conceptual framework within doctoral study: A researcher's reflections', Issues in Educational Research, vol. 23, no. 1

Betsy Apple, (2003), Esq. and Veronika Martin Burma's Army and the Rape of Ethnic Women, Refugees International, March

Betts, A. and Milner, J. (2019). "Governance of the Global Refugee Regime", Available at:

Black, R (1994) Forced migration and environmental change: the Impact of refugees on host environment, Journal of Environmental Management

Black, R. and Sessay, M., (1998) 'Forced Migration, Natural Resource Use and Environmental

Bogardi, J. J. (2006). *Resilience building: from knowledge to action. Introduction to UNU-EHS*. June, Presented to the Summar Academy of UNU:EHS. URL:

Bookbinder, A. (2013). '969: "The Strange Numerological Basis for Burma's Religious Violence" ', *The Atlantic*. [Online] Available at:

Booth, J. (2007). 'Military Junta Threatens Monks in Burma', *Times (London)*, 24 September

Brenson-Lazan, G. (2003). Group and Social Resilience Building. URL: www.communityatwork.com/resilience/RESILIENCIAENG.pdf

Burma Centre for Ethnic Studies Analysis Paper NO.1

C R Abrar and Mohammad Jalal Uddin Sikder, (2007), *Situation Analyses of Migratory Patterns of Cox's Bazar District,* Commissioned by International Labour Organization, Dhaka

C. R. Abrar and M. J. U. Sikder, (2014), "*Cross-border movement of the Rohingyas from Burma: Exclusion, vulnerability and coping mechanism*", Dhaka: Refugee and Migratory Movements

Cacioppo, J., Reis, H., & Zautra, A. (2011). Social Resilience. The Value of Social Fitness With an Application to the Military. *American Psychologist,* 66(1)

Cannon, T. (2008). Vulnerability, innocent disasters and the imperative of cultural understanding. Disaster Prevention and Management, 17

Carlos Sardiña Galache, (2012), "Fear, loathing and lies in Rakhine state," *The Bangkok Post*, 2 September, Available online here:

http://www.scribd.com/doc/114418943/Fear-loathing-and-lies-in-Rakhine-state

Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, (2007), (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), *Judgment, I.C.J.* 43, paras. 165, 431 (Feb. 26) [Bosnia v. Serbia]

Centlivres, Pierre and Micheline Centlivres-Demont. (1988). "The Afghan Refugees in Pakistan: A Nation in Exile." *Current Sociology* 36 (2)

Central Intelligence Agency (CIA) (2018) "Bangladesh" in The World Factbook. [online]

Chan, Aye, (2005), "The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar)," *SOAS Bulletin of Burma Research,* 3:2, Autumn. Available online here:

Change: the Case of the Senegal River Valley', International Journal of Population Geography 4(1): 31–47.

Charney, Dr. Michael W. (2005), *"Buddhism in Araka: Theory and Historigraphy of the Religeous Basis Ethninym",* a paper submitted to the Forgotten kingdom of Arakan

Cinner, J.; Fuentes, M. M. P. B. and Randriamahazo, H. (2009): Exploring social resilience in Madagascar's ma rine protected areas. In: Ecology and Society 14 (1), 41. http://www.ecologyandsociety.org/voll4/issl/art41

Comment. [Online] Available at: http://www.juancole.com/2013/07/extremist-buddhists-attacking.html (Accessed 1 May. 2014).

Crisp, J. (2003). No Solution in Sight: the Problem of Protracted Refugee Situations in Africa.

Dadush, U. and Niebuhr, M. (2016). "The Ongoing Genocidal Crisis of the Rohingya Minority in Myanmar." Journal of Victimology and Victim Justice 1 (1): 4-24. doi:10.1177/2516606918764998. https://doiorg.helios.uta.fi/10.1177/2516606918764998

David Dapice & Nguyen Xuan Thanh, *Creating a Future: Using Natural Resources for New Federalism and Unity*, Harvard Kennedy School, July 2013; particularly "Appendix A:

Dayton-Johnson, J. (2004). Natural Disasters and Adaptive Capacity. OECD Development Centre, working paper No. 237

Department of Botany, Jahangirnagar University and Bangladesh Poush, Dhaka
Department of Botany, Jahangirnagar University and Bangladesh Poush, Dhaka
development challenge', World Development Report 2011, Background Note, viewed 05 May 2018

Dick, Shelly, (2002). 'Responding to protracted refugee situations: a case study of Liberian refugees in Ghana', Evaluation and Policy Analysis Unit, UNHCR, Geneva disgraces Myanmar images," June

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, (2001), Report of the International Law Commission on the Work of its Fifty-Third Session, U.N. Doc. A/56/10, art. IV [Articles on State Responsibility]

Economic and Social Impacts of Massive Refugee Populations on Host Developing Countries,

Eleven Media Group, 2012. “Biased reporting of foreign media of Rakhine-Rohingya issue

Enghoff, M. et. al (2010) “In search of protection and livelihoods: socio-economic and environmental impacts of Dadaab refugee camps on host communities” Nairobi: Royal Danish Embassy

Environmental Problems in Bangladesh Myanmar Border Area". Unpublished MSS dissertation, University of Chittagong.

Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress, (Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, , p. 79

Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress, (Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, , p. 79

European Commission Humantarian Operation, (2018), The map shows the heavily populated areas in Bangladesh placing Cox bazaar and Kutapalong camps with high density of people. Source:European Commission Humantarian Operation, p. 3

European Commission. (2016). Humanitarian Protection. Available at:

Evaluation and Policy Analysis Unit, UNHCR. (Online) *Working Papers, Center for Comparative Immigration Studies, UC San Diego*. http://escholarship.org/uc/item/89d8r34q (accessed 13.12.12)

FAO & IOM: (2017), ‘Assessment on fuel wood supply and demand in displacement settings and surrounding areas in Cox’s Bazar District’, conducted March- June

FAO, (2003) Forestry outlook study for Africa- opportunities and challenges towards 2020, Forestry Paper number 141, Rome.

Favilli, Ch. (2018). European Union. Legal & Policy Framework of Migration Governance. Available at: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1241663/FULLTEXT02.pdf [Accessed 17 May 2020].

Favilli, Ch. (2018). European Union. Legal & Policy Framework of Migration Governance.

Feierstein, D, (1944), Genocide as Social Practice, p. 14. 20 Lemkin, R, Axis Rule in Occupied

Feierstein, D, (1944), Genocide as Social Practice, p. 14. 20 Lemkin, R, Axis Rule in Occupied

Fortify Rights interview with “N. Islam,” no. 43-2, Cox’s Bazar District, Bangladesh, September 4, 2017.

Fortify Rights interview with “N. Islam,” no. 43-2, Cox’s Bazar District, Bangladesh, September 4, 2017.

Fortify Rights interview with member of ARSA, no. 24-2, September 1, 2017

Fortify Rights interview with member of ARSA, no. 24-2, September 1, 2017

Fortify Rights interview with UN official, no. 35, Cox’s Bazar District, Bangladesh, December 17, 2016

Fortify Rights interview with UN official, no. 35, Cox’s Bazar District, Bangladesh, December 17, 2016

Fortify Rights interviews with no. 24, (2017), Cox’s Bazar District, Bangladesh, September 1,; no. 31 Cox’s Bazar District, Bangladesh, September 2, 2017;

Fortify Rights interviews with no. 24, (2017), Cox’s Bazar District, Bangladesh, September 1,; no. 31 Cox’s Bazar District, Bangladesh, September 2, 2017;

Fortify Rights interviews with survivors and eyewitnesses, (2016), Cox’s Bazar District, Bangladesh, December

Fortify Rights interviews with survivors and eyewitnesses, (2016), Cox’s Bazar District, Bangladesh, December

Fortify Rights interviews, (2017), Cox’s Bazar District, Bangladesh, and Rakhine State, Myanmar, October 2016–September

Fortify Rights interviews, (2017), Cox’s Bazar District, Bangladesh, and Rakhine State, Myanmar, October 2016–September

Fortify Rights, “Myanmar: Protect Civilians in Rakhine State, Investigate Fatal Shootings,” news release, October 12, 2016, http://www.fortifyrights.org/publication-20161012.html

Fortify Rights, “Myanmar: Protect Civilians in Rakhine State, Investigate Fatal Shootings,” news

Fortify Rights, *Policies of Persecution: Ending Abusive State Policies against Rohingya Muslims in Myanmar* (Bangkok: Fortify Rights, 2014).

Fortify Rights, *Policies of Persecution: Ending Abusive State Policies against Rohingya Muslims in Myanmar* (Bangkok: Fortify Rights, 2014).

Genociede in Burma against the Muslim of Arakan, 1978, published by Rohingya patiototic Front, Arakan, Burma,

Genociede in Burma against the Muslim of Arakan, 1978, published by Rohingya patiototic Front, Arakan, Burma,

Gomez, PG & Christensen, A (2010), ‘The impact of refugees on neighboring countries: A development challenge’, World Development Report 2011, Background Note, viewed 05 May 2018

Gomez, PG & Christensen, A (2010), ‘The impact of refugees on neighboring countries: A

Hossain, A.B.M. Enayet and Rahman, Muhammad Mahfuzr, (1992), *Environmental Impact of*

Hossain, A.B.M. Enayet and Rahman, Muhammad Mahfuzr, (1992), *Environmental Impact of*

http://ec.europa.eu/echo/sites/echosite/files/policy_guidelines_humanitarian_protection_en.pdf. WWw[Access on 26 May 2020]

http://www.ash.harvard.edu/extension/ash/docs/creating.pdf http://www.ehs.unu.edu/file.php?id=184

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Rome_Statute_ICC/romestatute.html (accessed November 8, 2017). The Rome Statute entered into force on April 11, 2002 and the ICC has the authority to prosecute the most serious international crimes since July 1, 2002. Burma is not a party to the Rome Statute.

https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/WRC%20Research%20Paper%2 0No.13.pdf [Accessed 24 July 2020].

https://www.facebook.com/MyanmarSCOInfoCom/posts/786463714860070 https://www.soas.ac.uk/sbbr/editions/file64388.pdf

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/sep/05/rohingya-aung-san-suu-kyi-nobel-peace-prize-rohingya-myanmar

Human Rights Watch (2013). *All You Can Do Is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State*, USA: Human Rights Watch. Human Rights Watch (2013). *All You Can Do Is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State*, USA: Human Rights Watch.

Human Rights Watch (2013). *All You Can Do Is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State*, USA: Human Rights Watch

Human Rights Watch (2017), with Azara Younus (pseudonym), Kutapalong refugee camp, October.

Human Rights Watch (HRW) (2013a), 'All You Can Do is Pray'. Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State, Human Rights Watch, New York, USA, viewed 5 March 2018, .

Human Rights Watch (HRW) (2013b), Unpunished Crimes Against Humanity, Humanitarian Crisis in Arakan State, Human Rights Watch, New York, USA, viewed 7 March 2018,

Human Rights Watch interview C.F., Sittwe, Arakan State, June 2012

Human Rights Watch interview D.A., Sittwe, Arakan State, June 2012

Human Rights Watch interview with Fatama Begum (pseudonym), (2017), Balukali refugee camp, October 3

Human Rights Watch interview with Leila Nur, (2017), (pseudonym), Kutapalong refugee camp, October 11.

Human Rights Watch interview with S.M., (2012), displacement site, Sittwe, Arakan State, October

Human Rights Watch, (2012), interview with K.O., displacement site, Sittwe, Arakan State, November

Human Rights Watch, (2014). *Burma: Scrap Proposed Discriminatory Marriage Law*.

Human Rights Watch, (2017), Crimes against Humanity by Burmese Security Forces Against the Rohingya Muslim Population in Northern Rakhine State since August 25, September 26, 2017, https://www.hrw.org/news/2017/09/25/crimes-againsthumanity-burmese-security-forces-against-rohingya-muslim-population. Human Rights Watch has previously determined that the Burmese security forces were responsible for abuses that amounted to crimes against humanity against the Rohingya in 2012 and 2016. See "All You Can Do is Pray" Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State, April 2013, https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanityand-ethnic-cleansing-rohingya-muslims; "Burma: Rohingya Recount Killings, Rape, and Arson," December 21, 2016, https://www.hrw.org/news/2016/12/21/burma-rohingya- recount-killings-rape-and-arson.

Human Rights Watch, "Crack Down on Burmese Muslims", in *Human Rights Watch Briefing Paper July 2002*, p. 3, accessed from *http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/asia/burmese_muslims.pdf* on 05 February 2014.

Human Rights Watch, 2000. *Burmese Refugees in Bangladesh: Still no Durable Solution*. Bangladesh: Human Rights Watch.

ICC Statute, art. 7(2) (a), (2013), http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/99_corr/cstatute.htm (accessed April 10, 2013)

ILC, Articles on State Responsibility, *see* note 375, art. 8

Immigration and Manpower Department, (1986), *Burma 1983 Population Census*, Rangoon:The Socialist Republic of the Union of Burma, Ministry of Home and Religious Affairs, part two.

International Religious Freedom Report (2003), US Dept of State

International Religious Freedom Report (2003), US Dept of State;

International Religious Freedom Report 2003, US Dept of State

IRIN Humanitarain News and Analysis, (2006). 'NEPAL: Bhutanese Refugee Census Nears Completion', http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=71885> (Accessed 15 July

Irrawaddy and Associated Press (2012) Mandalay monks hold anti-Rohingya protests. 3 September. Available at: http://www.irrawaddy.org/archives/13085 (accessed 25 February 2013).

ISCG, (2018) Support to Bangladesh Host Communities in the Rohingya Refugee Response, May, pg. 2

Jilani, AFK. (2001), *A Cultural History of Rohingya:* Published by Ahmed Jilini, Place of Publication: Unknown: July

Jilani, AFK. (2002), *HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN ARAKAN*, THE TAJ LIBRARY, Chittagong: June

Karim, S. (2018) "I visited the Rohingya refugee camps and here is what Bangladesh is doing right" in *the Conversation website* [online] Available at: https://theconversation.com/i-visited-the-rohingya-refugee-camps-and-here-is-what-bangladesh-is-doing-right-90513 [Accessed 11 May 2018].

Khan, M. Siddik, (1936), The author mentions, too, the theory that the port Syriam got Its name from Muslim sailors who called it *Sir-i am*, meaning (the river's) *head*. The Burmese name for this port city was Than Hlyin. Siddiq Khan himself adds that this assumption has not yet been proven (p. 425)

Khan, M. Siddik, "*Muslim intercourse with Burma*", *Islamic Cultur Relations de voyages et de textes giographiques arabes, Present et, tures Relatives eperxtreme orient du VIII e au XVIIIe Siecles*

Khatun, Dr. Fahmida. (2017),"Implecation of the Rohigya Crisis for Bangladesh". CPD. Kader,

Khin Gyi Pyaw, (1959-60), Who are the Mujahids in Arakan. In: Rakhine Tazaung Magazine

Kofi A Annan, (2016), Advisory Commission

Kyaw, T. A. (2013, Jan 20). Tin Aung Kyaw Buddhist Monk Wirathu Leads Violent National ampaign against Myanmar's Muslims. Retrieved oct 1, 2019, from http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/ground truthburma/buddhist-monk-wirathu-969-muslims-myanmar

Lomo, Z., Naggaga, A. and Hovil, L. (2001). The Phenomenon of Forced Migration in Uganda.

Maung, (2005), Shwe Lu-The Price of Silence: Muslim-Buddhist War of Bangladesh and Myanmar– a Social Darwinist's Analysis- Published by DewDrop Arts & amp; Technology, ISBN 10: 1928840035/ISBN13:9781928840039

Maung, Shwe Lu, (1989), *Burma-Nationalism and Ideology-Analysis of Society, Culture, and Politics*, U.P.L1st edition, Dhaka

MM. July 2014." The Commission notes that the Government's fi gure for the poverty rate in Rakhine is 43.5 percent, as compared with 25.6 percent nationally (Integrated Household Living Condition Assessment Survey, 2010)

Muslim Population Growth and Migration from Bangladesh into Rakhine State: What Do We Know?" Available online here:

Myanmar Poverty and Living Conditions Survey, World Bank, January 2015; Unlike the source stated, the correct source is, "World Bank. Myanmar: Ending poverty and boosting shared prosperity in a time of transition. A Systematic Country Diagnostic, ReportNo. 93050-

Myanmar: Justice on trial, 29 July (2004), Amnesty International USA;

N. W (2000): Social and ecological resilience: are they related? In: Progress in Human Geography 24 (3), 347-364. DOI: 10.1191/030913200701540465

Nemoto, Kei, (2005), *The Rohingya Issue: A Thorny Obstacle between Burma (Myanmar)*
OAU, (1969). Convention Governing the Specific Aspects of Refugee
Ogata, M., (1996). Pattern of Displacement of Refugees in Africa: UNHCR on-edge/ (Accessed 10 Feb. 2014)
ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf.
Pakistan Warns Burma: (1951), Says Influx of Arakan Moslems May Cause Disturbances, *The New York Times*, 20 December
Palatino, M (2013), 'The Politics of Numerology: Burma's 969 vs. 786 and Malaysia's 505', The Diplomat, 16 May, viewed 1 April 2018
Palestinian refugees in Jourdan, Syria and Lebanon who fall under the Jurisdiction of UNRWA, P. 5 (2,881,482)
Paton, D., Smith, L., & Violanti, J. (2000). Disaster response: risk, vulnerability and resilience. Disaster Prevention and Management, 9(3)
Peshkin, A. (1993). The goodness of qualitative research. Educational Researcher, 22(2)
Philips, Melissa, (2003), "The role and impact of humanitarian assets in refugee-hosting countries". New Issues in Refugee Research, UNHCR Evaluation and Policy Analysis Unit. Working Paper No. 84
Planning Theory 11(2): 148–169. http:// dx.doi.org/10.1177/1473095211426274
Polivy, J., & Herman, C. P. (2000). The false hope syndrome: Unfulfilled expectations of self-change. Current Directions in Psychological Science, 9, 128–131
Problems in Africa (OAU Convention), 10 September (1969), 1001 U.N.T.S.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 100 (14), 8074-8079.
Prosecutor v. Akayesu, ICTR, Case No. ICTR-96-4-T, Judgement (1998) (Trial Chamber I), September 2, , para. 579. In Akayesu the Trial Chamber defined widespread as "massive, frequent, large scale action, carried out collectively with considerable seriousness and directed against a multiplicity of victims.";http://www1.umn.edu/humanrts/instree/ICTR/AKAYESU_ICTR-96-4/Judgment_ICTR-96-4-T.html (accessed April 10, 2013); Prosecutor v. Kordic and Cerkez, ICTY, Case No. IT-92-14/2
Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century the 2006 Johan Skytte prize lecture. Scandinavian Political Studies, 30(2) release, October 12, 2016, http://www.fortifyrights.org/publication-20161012.html
Republic of the Union of Myanmar, Anti-Terrorism Central Committee, Order no. 1/2017 1379 MY 4 Waxing Day of Tawthalin, August 25, 2017,
Research Unit (RMMRU) and Sussex: Migration out of poverty (RPC), University of Sissex

Resilience. (n.d.). (1989), In *Oxford English Dictionary*, Retrieved from http://www.oed.com/

Rockstrom, J. (2004): *Making the best of climatic variability: options for upgrading rainfed farming in water scarce re gions. In: Water Science and Technology*, 49 (7), 151-156; Adger,

Rohingya Refugee Rehabilitation in Teknaf Area, a Report Jointly published by GEBCOM,

Rohingya Refugee Rehabilitation in Teknaf Area, a Report Jointly published by GEBCOM,

Rohingya Salvation Army, "Press Statement from Arakan Rohingya Salvation Army," Ref. no. ARSA/PR/01/2017, March 29, 2017

Rome Statute of the International Criminal Court (ICC Statute), (2002), 2187 U.N.T.S. 3, entered into force July 1, art. 7,

Rome Statute of the International Criminal Court, (2002), 2187 U.N.T.S. 3, entered into force July 1, art. 7, http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Rome_Statute_ICC/romestatute.html

RRRC, 2016. (*Refugee Repatriation and Rehabilitation Commission*), Cox's Bazar

Sakhong, Lian H. (2012), "The Dynamics of Sixty Years of Ethnic Armed Conflict in Burma."

Sakhong, Lian H. (2012), "The Dynamics of Sixty Years of Ethnic Armed Conflict in Burma." *Burma Centre for Ethnic Studies* Analysis Paper NO.1

Salehyan, Idean and Kristian Skrede Gleditsch. (2006). "Refugees and the Spread of Civil War." *International Organization* 60 (2): 335-366. http://www.jstor.org/stable/3877896.

Salehyan, Idean and Kristian Skrede Gleditsch. (2006). "Refugees and the Spread of Civil War" *International Organization* 60 (2): 335-366. http://www.jstor.org/stable/3877896.

Silverstein, Josef, comp.(1980), *Burmese Politics: The Dilemma of National Unity*. New Brunswick: Rutgers UP, p. 186

Sinclair M. (2007) Editorial: A Guide to Understanding Theoretical and Conceptual Frameworks. Evidence Based Midwifery 5(2): 39

Sire, J. (2004). Naming the Elephant: Worldview as a Concept. Downers Grove, Illinois:

Slaughter & Crisp, _2009, A Surrogate State? The Role of UNHCR in protracted refugee situations_, UNHCR Research Paper No.168

Smith, *State of Strife: The Dynamics of Ethnic Conflict in Burma*, East-West Center Washington, 'Policy Studies' No. 36, 2007

Sood, A. and Seferis, L. (2014) "Syrians contributing to Kurdish economic growth" *Forced Migration Review*

SPDC, 2002, *Information Sheet, Yangon, Myanmar*. C-2103 (1), January 30. Quoted in Martin

Sri Lanka Department of Census and Statistics, (2001). *Census of population and housing by Ethnicity*, Colombo, The Sri Lanka goernment has not coducted a population census*State Peace and Development Council* (SPDC) is the new name for SLORC, (1989)

Take away Aung San Suu Kyi's Nobel peace prize. She no longer deserves it Take away Aung San Suu Kyi's Nobel peace prize. She no longer deserves it;

Tandon, Y., (1999), Root Causes of the Peacelessness and Approaches to Peace in Africa.UNPAN010409.pdf

Taylor, E. J. et. al (2016) "Economic impact of refugees" *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113 (27) 7449-7453

Temple, R.C. *J. B. R. S,* (1925), p.1-31

Tha, U Kyaw Zan, (1991), *Background Paper on the Rohingya Problem*. Rangoon.

The 1978 Rohingija refugee influx drew the attention of the world towards Arakan for the first time since the failure of mujahid insurrection of 50s

The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Rakhine State (Naypyidaw: Ministry of *The Bangladesh Observer*, 14 May, 1978; *The Bangladesh Times*, 21 May, 1978

The Constitution of the People Republic of Bangladesh, (1979) (As modified up to 28th February, Ministry of law and Parliamentary Affairs, Govt. of Bangladesh, p. 5)

The Daily Gurdian, Rangoon, 27th October (1960), "Supreme Court quashes Expultion orders against Arakanese Muslim

The Daily Star. (2017), Rohingya Repatriation: First list handed to Myanmar, 17 February 2018. Retrieved from: http://www.thedailystar.net/front page/rohingya-repatriation-first-list-handed-myanmar-1536046

The Guardian, Rangoon, 27 October 1960, quoted in Moshe Yegar, *The Muslims of Burma: A Study of a Minority Group*, Otto Harasowitz, 1972, p. 100n

The Situation in the Republic of Kenya, (2010), Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, March 31, Case No. ICC-01/09, para. 93, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc854287.pdf (accessed September 13, 2012)

The UNHCR became operational in North Rakhine State in 1993–1994 following the large-scale repatriations of approximately 200,000 Rohingya from Bangladesh. Although their mandate primarily related to monitoring the returns, advocating with the Myanmar government for the documentation of all Rohingya populations was central to their work. See: Human Rights

The Washington post. (February 12, 2018). Mayesh a Alam. "How the Rohingya crisis is affecting Bangladesh—and why it matters?" https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/02/12/how-therohingya-crisis-is-affecting-bangladesh-and-why-it-matters/?noredirect=on&utm_term=.c9860deb6a1c [Accessed-17-04-2018]

This formula is the one used by Krejcie & Morgan in their, (1970) article "Determining Sample Size for Research Activities" (*Educational and Psychological Measurement*, #30

Thompson, Nathan A. (2017), "Yaba Addiction: The Dark Side of Bangladesh's Increasing Affluence." *Cnn*, "Aug 6, .https://edition.cnn.com/2017/08/05/asia/methamphetamine-yaba-

Tomes, R. (1857). The Americans in Japan, an abridgment of the government narrative of the

Tonkin, Derek, (2014), "The R-word, and its ramifications," *Democratic Voice of Burma*, 17 August; Available online here: http://dvb.no/analysis/the-r-word-and-its-ramifications-burma-myanmar-rohingya/43271(Accessed on June 2015)

Tony, (1979), *Burma-a travel survival kit*, pp. 15-16; The Encyclopedia American, vol. 5. pp.2-3

tp://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2003/23823.htm

Turner, B. L.; Kasperson, R.; Matson, P; McCarthy, J.; Corell, R.; Christensen, L.; Eckley, N.; Kasperson, J.; Luers, A.; Martello, M.; Polsky, C.; Pulsipher, A. and Schiller, A. (2003), Turner, B. L.; Kasperson, R.; Matson, P; McCarthy, J.; Corell, R.; Christensen, L.; Eckley, N.; Kasperson, J.; Luers, A.; Martello, M.; Polsky, C.; Pulsipher, A. and Schiller, A. (2003): *A framework for vulnerability analysis in sustainability science.* In:

U.N. Office of the High Commission for Human Rights, (2013), *Myanmar:UN Expert Greets Abolition of Notorious Border Security Force in Rakhine State and Calls for Accountability,* June 16, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13542&

U.S. expedition to Japan under Commodore Perry. New York: D. Appleton.

UN (2018) "Least Developed Countries (LDCs)" in UN website [online] Available at: https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category.html [Accessed 23 March 2018]

UN ECOSOC, *Commission on human rights, 60th session*, agenda item

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2018) "Rohingya emergency" *in UNHCR website* [online] Available at: http://www.unhcr.org/rohingya-emergency.html [Accessed 20 March 2018]

UN Office of the High Commissioner for Human Rights, "Report of OHCHR Mission to

UN Office of the High Commissioner for Human Rights, "Report of OHCHR Mission to Bangladesh: Interviews with Rohingyas Fleeing from Myanmar since 9 October 2016," February 3, 2017, http://www.

UNHCR (2017), Rohingya Emergency, September 2017. Retrieved from: http://www.unhcr.org/Rohingya -emergency.htmI.

UNHCR defines a protracted refugee situtionas one where 25,000 or more refugees of the same nationality have been in exile for five years or more in a given asylam country, Global Trends

UNHCR Standing Committee (1997), “Economic and Social Impact of massive Refugee Populations on host Developing Countries, as well as other Countries”. 6th Meeting. http://www.unhcr.org/basics.html

UNHCR, (1996), Environmental Guidelines. Jeneva: United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR, (1996), Environmental Guidelines. Jeneva: United Nations High Commissioner for Refugees.

UNHCR, (1997), *The State of the World Refugees 1997-98: a humanitarian agenda.* New York: Oxford University Press

UNHCR, (2005), UNHCR 2004 Global Refugee Trends. Geneva, Switzerland.

UNHCR, (2006). *Global Trends: Refugees, Asylum-Seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons,* (Geneva: UNHCR, June 2007)

UNHCR, (2009), ‘Protracted Refugee Sisutions’, p. 1 Geneva

UNHCR, (2012) from http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f08a27.html

UNHCR, (2018b), *Global Trends: Forced Displacement in 2017*. Geneva

UNHCR, (Geneva: 2006), *Analysis of Gaps in Protection Capacity*

UNHCR, (Geneva: 2006), *Analysis of Gaps in Protection Capacity-Thiland*

UNHCR, ‘Protracted Refugee Sisutions’ (2009), p. 2; See Jeff Crisp, *Who Has Counted the Refugees?* UNHCR, and the Politcs of Numbers, (Geneva: UNHCR

UNHCR, Refugee Response in Bangladesh, available at:

UNHCR. "UNHCR Global Trends: Forced Displacement in 2017." UNHCR, (accessed 07 Nov, 2018) http://www.unhcr.org/globaltrends2017

UNHCR. (1996). *Environmental Guidelines*. Jeneva: United Nations High Commissioner for Refugees; Martin, Adrian; 2005a. "Environmental Conflict between Refugee and Host Communities." *Journal of Peace Research* 42 (3): 329-346. doi:10.1177/0022343305052015. https://doi.org/10.1177/0022343305052015

UNHCR. (2001). Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Available at: https://www.unhcr.org/3b66c39e1.pdf [Accessed 24 May 2020].

UNHCR. (2012b). *Global Operations.* (Online). http://www.unhcr.org/pages/49c3646ccb.html (accessed 13.12.12)

UNHCR. (2017), "UNHCR Global Trends: Forced Displacement in 2017." UNHCR, accessed 07 Nov, 2018, http://www.unhcr.org/globaltrends2017/.

United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) (2003a), A stateless person is someone who is “not considered as a national by any state under the operation of its law”, Geneva, viewed 16 May 2018, .

United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) (2012), The Buddhist core values and perspectives for protection challenges: Faith and Protection, High Commissioner's Dialogue on Protection Challenges Theme: Faith and Protection, Geneva, viewed 7 May 2018

United Nations Office For The Coordination of Humanitarian Affairs, Annual Reaport, 2018

UNO. (2013). Human Rights Watch All You Can Do Is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State. USA

UNRWA, *UNRWA in Figures as June 30,* (2006), (Gaza, Palestine: Public Information Office, UNRWA Head-Quarters, 2006)

USCRI, *World Refugee Survey* (2007), (Washington, 2007)

USCRI, *World Refugee Survey 2006,* (Washington, 2006), p. 14

Walton, M. (2013). *Are Extremist Buddhists in Burma attacking Helpless Muslims?* Informed

Walton, MJ & Hayward, S (2014), Contesting Buddhist Narratives democratization, nationalism, and communal violence in Myanmar, Policy Studies, East-West Center, viewed 30 May 2018

Washaly, N. (2019). Rohingya: The Identity Crisis. Academia.

Watch, 'Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?' (1 September 1996) accessed on 04 January 2019.

Wilkinson, C. 2012. Social-ecological resilience: insights and issues for planning theory.

Workshop, 23-24 November, First Hotel, Bankok, Thiland. P. 15 In Buchanan, "*A Comparative vocabulary*,"

World Bank Development Report (2011), *The Impoact of Refugees on Neighbouring Countries: A Development Challenge*, Page no. 3

World Food Programme (WFP) (2017) "WFP News Video: New WFP Footage from Rohingya Camp in Bangladesh" [online] Available at: https://www.wfp.org/sites/default/files/11-30-17%20SHOTLIST%

Yaqoob, S. (2017, September 19). The very least the UK owes the Rohingya is protection. Retrieved February 10, 2019, from https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/uk-owes-rohingya-protection-170919100556527.html.

Zingel, W-P.; Keck, M.; Etzold, B. and Bohle, H.-G. (2011): *Urban food security and health status of the poor in Dhaka, Bangladesh. In: Krämer,* A.; Khan, M. H. and Kraas, F. (eds.): *Health in megacities and urban areas. Contributions to statistics. Heidelberg,* 301—319. DOI:

বিভিন্ন গেজেট

Chittagong District Records, Vol. 484, National Archibes of Bangladesh, Dhaka, Agargaon.

Census of India 1931, XI (Burma, Rangoon, 1993)

R. B. Smart, (1917), *Akyab District Gazetteer*, Vol. A (Rangoon)

R. S. Wilkie, (1934), *Yamethin District Gazetteer*, Vol. A, Rangoon

Williamson, (Rangoon, 1929), *Shwebo District Gazetteer*, Vol. A

বাংলা গ্রন্থসমূহ

সলিম, গোলাম হোসেন, (১৯৭৪), [উদ্দিন, আকবর-(অনু.)], *রিয়াজুস সালাতিন*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি

করিম, আবদুল, (অনু.) মুস্তফা মাসুদ, (২০১৬), রোহিঙ্গাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা, ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

------, (১৯৮০), *চট্টগ্রামে ইসলাম*, চট্টগ্রামঃ ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র

জলিল, মুহাম্মদ আব্দুল, (১৯৯৩), *বঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গি ও বর্গীর অত্যাচার*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি

ইসলাম, মুহাম্মদ নূরুল, (২০১০), *উখিয়ার ইতিহাস*, কক্সবাজারঃ কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমি

অং, মং বা (মং বা), (২০১৩), *রাখাইন রাজাওয়ান*, প্রকাশকঃ উ খিং নু (নু শাং), কক্সবাজারঃ ময়নামতি আর্ট প্রেস

আখন্দ, মোঃ মাহফুজুর রহমান, (২০০৫), *রোহিঙ্গা সমস্যাঃ বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

------, (২০১৩) *আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস*, চট্টগ্রাম-ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

আসাদ, আসাদুজ্জামান, ফেব্রুয়ারী ২০০৯, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী শিবির*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী

ইসলাম, এম নজরুল, (২০০৭), খান মোঃ লুৎফর রহমান (অনুঃ) *উন্নয়নশীল দেশে জাতিগঠনের সমস্যাঃ মালয়েশিয়া প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মালয়েশিয়ার সরকার, কুয়ালালামপুরঃ গভার্ণমেন্ট প্রিন্টার্স

ইসলাম, মুহাম্মদ নূরুল, (২০১৮), *রক্তাক্ত আরাকান বিপন্ন রোয়াইঙ্গা*, ঢাকা, ঝিঙেফুল প্রকাশনী

ইসলাম, সিরাজুল, (১৯৯৮), *ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি

পারভেজ, আলতাফ, (২০১৯), *বার্মা-জাতিগত সংঘাতের সাত দশক*, ঢাকা, ঐতিহ্য

উদ্দিন, রাহমান নাসির, (২০১৮)*"রোহিঙ্গা নয় রোয়াইঙ্গা" অস্তিত্বে সংকটে রাষ্ট্রহীন মানুষ*, কলিকাতাঃ মূর্ধণ্য প্রকাশনী

এলাহী, খোঃ লুৎফুল, (২০০০), *রোহিঙ্গা সমস্যাঃ ঐতিহাসিক পটভূমি বাংলাদেশে এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব*, ঢাকাঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মাহমুদ, মুহাম্মদ আবুল হোসেন, (১৯৭৮), *'বার্মায় মুসলিম গণহত্যা'* ঢাকা: বর্মী মুসলিম কেন্দ্রীয় সাহায্য কমিটি *বার্মায় মুসলিম গণহত্যা*

মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ, সম্পা. (১৯৯৪), *মুহাম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রায়, সুধাংশু রঞ্জন, (২০০৩), *বাংলাদেশ বার্মা সম্পর্ক, ১৮৮৬-১৯৪৭*, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, এমফিল অভিসন্দর্ভ

শরীফ, আহম্মদ, (১৯৮৩), *বাঙলী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খন্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি,

আবরার, সি আর, *(*২০০৩), *সংসদ সদস্যদের জন্য প্রণীত আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইন সহায়িকা*, ডিসেম্বর, ঢাকা: রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্ট (রামরু)

মুহাম্মদ এনামুল এবং আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ- এর (১৯৯৩), '*আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য*', মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, ঢাকা: বাংলা একাডেমি

হাবিবউল্লাহ, এন.এম., (১৯৯৫), *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, চট্টগ্রাম-ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:

চক্রবর্তী, রতন লাল, (১৯৮৪), *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক ১৭৮৫-১৮২৪*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছিদ্দিকী, মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ, সম্পা. (২০০০), *আরাকানের মুসলমান: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, চট্টগ্রাম: আরাকান হিস্ট্রিক্যাল সোসাইটি

ইসলাম, মোঃ সিরাজুল, *'ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক' ১৬৪৭-১৮৮৫* (১৯৯৮), ঢাকা বাংলা একাডেমী

বালা, অমৃতলাল, (১৯৯১), *'আলাওলের কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি'* ঢাকা: বাংলা একাডেমী

চৌধুরী, আবদুল হক, (১৯৮৯), *চট্টগ্রাম ও আরাকান*, *চট্টগ্রাম*: কথামালা প্রকাশ

চৌধুরী, আবদুল হক, (১৯৯৪), *প্রাচীন আরাকান রোয়াইয়াঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী* ঢাকা: বাংলা একাডেমি

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, (১৯৯২), *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ২২ শ খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

খান, মো: মাইনুল আহসান, (১৯৯৮), *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরনণার্থী: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন

দাস, শরচ্চন্দ্র, (১৮৯৮), এন্টিকুইটি অফ চিটাগাং, জে. এ. এস. বি.

বাংলা রিপোর্টসমূহ

দক্ষিণ বনবিভাগ অফিস, কক্সবাজার সদর, জানুয়ারী ২০২৮

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কক্সবাজার জেলা, জানুয়ারী, ২০২০

বার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৯-২০ (coxsbazar.gov.bd)

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কক্সবাজার জেলা, মে ২০১৮

বার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৯-২০ (coxsbazar.gov.bd)

লেদা মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প সংলগ্ন বাজার, নভেম্বর, ২০১৬

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন কার্যালয়, কক্সবাজার, ২৭ মার্চ, ২০১৮
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কক্সবাজার জেলা, মে ২০১৮
বার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৯-২০, (coxsbazar.gov.bd)
বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী মায়ানমার শরণার্থী সম্পর্কিত প্রতিবেদনঃ শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, কক্সবাজার, বাংলাদেশ, ২০২০
ইউনুছ, *অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস*, ১৯৭৮, পৃ.২৬-২৭
শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনের কার্যালয়, কক্সবাজার, ২০১৬

বাংলা প্রবন্ধসমূহ

খান, আব্দুল মাবুদ, (১৯৮৭), *“চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস ও প্রসঙ্গ কথা”*, ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৫শ-২০শ বর্ষ, (সম্মিলিত সংখ্যা), ১৩৮৮-১৩৯৩, পৃ. ৮৫

খান, আব্দুল মাবুদ, *“আরাকানের মুক্তি সংগ্রাম ও তার উৎস”*, ঢাকাঃ ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৩ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৮৬, পৃ. ৯৭

মাহমুদ, মুহাম্মদ আবুল হোসেন, (১৯৭৮), *‘বার্মায় মুসলিম গণহত্যা’* ঢাকাঃ বর্মী মুসলিম কেন্দ্রীয় সাহায্য কমিটি *বার্মায় মুসলিম গণহত্যা*, পৃ.২৬-২৮

খান, আব্দুল মাবুদ, (১৯৮৭) *“চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস ও প্রসঙ্গ কথা”*, ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৫ শ-২০ শ বর্ষ (সম্মিলিত সংখ্যা), (১৩৮৮-৯৩), পৃ. ৯০

করিম, আবদুল, (১৯৯২), “রোহিঙ্গাদের হাজার বছরের ইতিহাস, ঢাকা, *পাক্ষিক পালাবদল*

খান, আব্দুল মাবুদ, (১৯৭৮), *বাংলাদেশে আরাকানী শরণার্থী আগমনের পটভূমি*, ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৩ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৮৬, চট্টগ্রাম, পৃ. ১০০

খান, সামিউল আহমদ, (১৯৮৩), *“রোহিঙ্গা মুসলিম”*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, তেইশ বর্ষ, অক্টোবর- ডিসেম্বর, পৃ.২২৬

চৌধুরী, সুরমা জাকারিয়া, (২০১১), *মিয়ানমারঃ গণতন্ত্রের পথে*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনবিংশ খণ্ড, হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, গ্রীষ্ম-শীত ১৪১৮/, পৃ.৩৫৫

আক্তারুজ্জামান, মোঃ, (১৯৯৯), *আরাকানী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উৎস ও ক্রমবিকাশঃ একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা* (১২০৪-১৭৮৫ খ্রী) ইতিহাস, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ

হক, মুহাম্মদ এনামুল ও করিম, (১৯৩৫), আবদুল সাহিত্য বিশারদ, *আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতা, পৃ: ১-২; ও ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, পঞ্চবিংশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৯৮, পৃ. ১১৭

চৌধুরী, রফিকুল আবরার, (২০০৩), *শরণার্থী রক্ষণাবেক্ষণ: আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইন সহায়িকা*, ঢাকা, ইউএনএইচসিআর, পৃ.২২

পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী

দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম, ২২ আগষ্ট, ১৯৭৮

দি ইকনমিস্ট; যুক্তরাজ্যের, ৩ নভেম্বর, ২০১২

দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৮ নভেম্বর, ২০১২

দৈনিক আমাদের সময়, ২৬ মার্চ, ২০১৩

দৈনিক আমাদের সময়, ২৯ আগষ্ট, ২০১৬

হিন্দুস্তান টাইমস, ২৮ নভেম্বর, ২০১৬

দৈনিক টেকনাফ নিউজ, ৬ মে, ২০১৪

দৈনিক আমাদের সময়, ০৮ অক্টোবর, ২০১৬

bdnews24.com, ২৮ ডিসেম্বর, ২০১২

দৈনিক আজাদ, ২৩ জুন

দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৮ নভেম্বর, ২০১৭

দৈনিক আমাদের সময়, ০১ ডিসেম্বর, ২০১৬

দৈনিক আমাদের সময়, ৩১ অক্টোবর, ২০১২

দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৩০ অক্টোবর, ২০১৬

দৈনিক আমার দেশ ২০ জানুয়ারী, ২০১৩

থাইল্যান্ডের 'ফুকেতওয়ান' পত্রিকায় ১৬ জানুয়ারি, ২০১৩

দৈনিক আজাদ, ৬ জানুয়ারী, ১৯৯১

দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৮ নভেম্বর, ২০১২,

দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৮ নভেম্বর, ২০১২

দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ অক্টোবর, ২০১৬

দৈনিক যুগান্তর, ০৮ জুন, ২০১৯

The New Light of Myanmar, 26, October, 2012

The Bangladesh Observer, Dacca, 8, 14 May, 1978

The Daily Australian, September 6, 1999

The Weekly Holiday, Dhaka, Bangladesh, 2 September, 2005

The Bangladesh Illustrated Weekly, 14-21 May, 1978

DeHart, J (2013), 'Ashin Wirathu: The Monk Behind Burma's 'Buddhist Terror',

The Diplomat, 25 June, viewed 4 March 2018
Far Eastern Economic Review, 29 June, 1989
Asia week, vol-14, 2 September, 1988
The Daily Star, 16 March, 1992
দৈনিক আমাদের সময় ২৮ নভেম্বর, ২০১৬
দৈনিক আমাদের সময়, ২২ নভেম্বর, ২০১৬
দৈনিক আমাদের সময়, ২২ জুন, ২০১৩
দৈনিক আমাদের সময়, ২২ জুন, ২০১৩
দৈনিক আমার দেশ, ২ নভেম্বর, ২০১২
দৈনিক আজাদ ও দৈনিক কিষাণ, সম্পাদকীয় ৩০ এপ্রিল, ১৯৮১
দৈনিক আজাদ, ৩০ এপ্রিল, ১৯৮১;
দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ নভেম্বর, ১৯৮৬
দৈনিক আজাদ, ৮ মে, ১৯৭৮
দৈনিক ইত্তেফাক, জুলাই, ১৯৭৮
দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ নভেম্বর, ১৯৯১
দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭
দৈনিক বাংলা, ১৪ মার্চ, ১৯৯২
www.coxsbazarnews.com ১৩ জুলাই, ২০১২
দৈনিক বাংলা, ৩০ জানুয়ারী, ১৯৯২
দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ এপ্রিল, ১৯৯২
দৈনিক মানবজমিন, ২৪ আগষ্ট, ২০১৭
দৈনিক যায়যায়দিন ও দৈনিক আমাদের সময়, ২৯ জুলাই, ২০১২
দৈনিক যুগান্তর, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫
দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৪ নভেম্বর, ২০১৬
দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৫ নভেম্বর, ২০১৬
দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৫ নভেম্বর, ২০১৬
দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭
দৈনিক সমকাল পত্রিকা, ১২ অক্টোবর ২০১৭
দৈনিক দিনকাল, ১৪ জুলাই, ২০১২
দৈনিক মিল্লাত, ২০ জুলাই, ১৯৯২
দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৩
দৈনিক আমার দেশ, ২ নভেম্বর, ২০১২
দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৮ নভেম্বর, ২০১২
দৈনিক নয়াদিগন্ত, ০৮ জুলাই, ২০১৮

ওয়েবসাইট লিংক সমূহ

http://en.banglapedia.org (Accessed: April 24, 2019)

http://eversion.newseleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=602:bias-reporting-of- foreignmedia-on-rakhine-rohingyas-disgraces-myanmar-images&catid=42:weekly-eleven-news&Itemid=109 (accessed July 16, 2012)

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2435.00213/abstract (accessed 13.12.12)

http://rrrc.gov.bd/site/monthly_report/ed54585a-826d-43bf-a988-60841c2f50bf, (Accessed on 27 March, 2018)

http://web.amnesty.org/library/index/engasa160192003

http://www. ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf.

http://www.economist.com/news/asia/21654124-myanmars-muslim-minority-have-been-attacked-impunity-stripped-vote-and-driven?zid=306&ah=1b164dbd43b0cb27ba0d4c3b12a5e227-(Accessed on, 25/7/15)

http://www.economist.com/news/asia/21654124-myanmars-muslim-minority-have-beenattacked-impunity-stripped-vote-and-driven?zid=306&ah=1b164dbd43b0cb27ba0d4c3b12a5e227

http://www.hrw.org/news/2013/04/22/burma-end-ethnic-cleansing-rohingya-muslims (Accessed on 13/6/15)

http://www.hrw.org/news/2014/03/24/burma-scrap-proposed-discriminatorymarriage-law (Accessed 1 May 2014)

http://www.irrawaddy.org/archives/7183, (Accessed on 19.06.2012)

http://www.mizzima.com/news/inside-burma/7472-muslim-states-ask-suu-kyi-to-help-end-muslim-violence.html; Accessed on 19.11.2012

http://www.ndphr.net/2012/09/ethnic-cleansing-nightmare-buddhist.html (Accessed on 12.12.2016)

http://www.ndphr.net/2012/09/ethnic-cleansing-nightmare-buddhist.html (Accessed on 12.12.2016)

http://www.ndphr.net/2012/09/ethnic-cleansing-nightmare-buddhist.html (Accessed on 12.12.2016)

http://www.projectgaia.com/files/EnvironmentalConflictRefugeesHostCommunities.pdf (accessed 13.12.12)

http://www.rohingyablogger.com/2013/05/the-official-evidence-of-rohingya.html

http://www.shodalap.org/snazrul/16869/- Accessed on 30/7/15

http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/04/969-the-strangenumerological-basis-for-burmas-religious-violence/274816/ (Accessed 11February 2014).
http://www.tricycle.com/feature/buddhist-nationalism-burma?page=0,0.(Accessed 10 January 2014)
http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/events/opendoc.pdf
https//www.washingtonpost.com/world/textbook-example-of-ethnic-cleansing--370000-rohingyas-floodbangladesh-as-crisis-worsens/2017/09/12/24bf290e-8792-41e9-a769-c79d7326bed0_story.html?utm_term=.ef5ea455aeca.
https//www.washingtonpost.com/world/textbook-example-of-ethnic-cleansing—370000 rohingyas-floodbangladesh-as-crisis-worsens/2017/09/12/24bf290e-8792-41e9-a769-c79d7326bed0_story.html?utm_term=.ef5ea455aeca.
https://data2.unhcr.org/en/situations/myanmar_refugees [accessed 23 August 2018])
https://doi-org.helios.uta.fi/10.1177/2516606918764998; Dussich, John P. J. 2018. "The Ongoing Genocidal Crisis of the Rohingya Minority in Myanmar." *Journal of Victimology and Victim Justice* 1 (1): 4-24.doi:10.1177/2516606918764998. https://doi-org.helios.uta.fi/10.1177/2516606918764998.
https://doi-org.libproxy.tuni.fi/10.1177/011719681302200107.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=en
https://hls.harvard.edu/dept/clinical/clinics/international-human-rights-clinic/, 2014
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/global-refugee-crisis-statistics-and-facts
https://www.bing.com/images/search?view
https://www.bing.com/images/search?view= Teknaf.jpg
https://www.bing.com/images/search?view=political+map+of+ukhia+cox%27s+bazar&simid=6080
https://www.echr.coe.int/Documents/COURTalks_Asyl_Talk_ENG.PDF
https://www.google.com.bd/search?q=People+Cross+Bay+of+Bengal+since+2012&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjg8oHrldXOAhVGM48KHeVMBak4ChCwBAgY&dpr=1(Accessed on 19/8/16)
https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims ((accessed July 7, 2015)

https://www.nytimes.com/2013/06/21/world/asia/extremism-rises-among-myanmar- buddhists-wary-of-muslim-minority.html (Accessed on- June 22, 2013)
https://www.nytimes.com/2013/06/21/world/asia/extremism-rises-among-myanmar-buddhists-wary-of-muslim-minority.html Accessed on- June 22, 2013
https://www.questia.com/newspaper/1P2-36303782/radical-monk-calls-for-anger-in-myanmar-extreme (Accessed on- June 22, 2013)
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/2020 (accessed 22 Dec, 2020)
https://www.unrefugees.org/emergencies/rohingya/ (Accessed 22 Dec, 2020)
Reach_bgd_map_teknaf_upozila_nhilla_khali_union_host_community_paras_16jan2019_a0_bg. (1)-page- 001.jpg
Reach_bgd_map_ukhia_upozila_palong_khali_union_host_community_paras_16jan2019_a0_bg.page_001.jpg
Reach_bgd_map_ukhia_upozila_raja_palong_union_host_community_paras_16jan2019_a0_bg.pdf
The Burma Project; http://www.burmaproject.org
www.dailytimes.com.pk/default.asp? Page =2012\07\06\story_6-7-2012_pg14_2.:
www.humanitarianresponse.info (Accessed: April 24, 2019)
www.iseas.edu.sg/vr32001.pdf, Institute of South East Asian Studies
www.Soas.Ac.Ukk/ sbbr/editions/file 64276. pdf
http://www.thejakartaglobe.com/international/malaysia-killings-put-myanmarbuddhists-

‘বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রভাব’ শীর্ষক গবেষণার জন্য স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ- রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, নয়াপাড়া ও কুতুপালং নিবন্ধিত= □1 হ্নেদা ও কুতুপালং অনিবন্ধিত=□2

১. পরিবার সদস্যদের তথ্য:

Sl.	নাম	পরিবারের ধরণ	পরিবারের প্রধানের সাথে সম্পর্ক	লিঙ্গ নারী(1) পুরুষ(2) অন্যান্য (99)	বয়স পূর্বে/ বর্তঃ		শিক্ষা	পেশা পূর্বে/বর্তঃ		আয় (মাসিক)	বৈবাহিক অবস্থা/ বৈবাহিক সম্পর্ক কোথায়?		জন্মস্থান (কার কোথায়)
	A2	**A3**	**A4**	**A5**	**A6**	**A7**	**A8**	**A9**	**A10**	**A11**	**A12**	**A13**	**A14**
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													

১. পরিবার সদস্যদের তথ্য কোডিং:

পরিবারের ধরণ (কোডিং) A3	পরিবারের প্রধানের সাথে সম্পর্ক (কোডিং) A4	শিক্ষা (কোডিং) A7	পেশা (কোডিং) A8	বৈবাহিক অবস্থা (কোডিং) A10	বৈবাহিক সম্পর্ক কোথায়?	জন্মস্থান (কোডিং) A10
একক পরিবার (1)	পিতা/মাতা (1)	নিরক্ষর (0)		অবিবাহিত (1)	আরাকান (1)	বাংলাদেশ (1)
যৌথ পরিবার (2)	স্বামী/স্ত্রী (2)	স্বাক্ষর জ্ঞান (98)		বিবাহিত (2)	চট্টগ্রাম (2)	মিয়ানমার (2)
অন্যান্য (99)	ভাই/বোন (3)	প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি(1..5)		স্বামী /স্ত্রী পরিত্যাক্তা (3)	বান্দরবান (3)	অন্যান্য (99)
	পুত্র/কন্যা (4)	ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি(6...8)		বিচ্ছেদরত (4)	কক্সবাজার (4)	
	শ্বশুড়/শাশুড়ী (5)	এসএসসি/ দাখিল, (10)		বিধবা (5)	অন্যান্য (99)	
	আত্মীয় (6)	এইচএসসি/ আলিম (12)		অন্যান্য (99)		
	বন্ধু/বান্ধবী (7)	মক্তব (91)				
	প্রধান উত্তরদাতা (8)	কওমি মাদ্রাসা (92)				

পেশা কোডিং(A8):

ভূমি চাষ (1)	দিনমজুর (8)	শিক্ষকতা (15)	শহর থেকে অর্থ আসে (22)
বর্গা চাষ (2)	কাঠুরিয়া (9)	মুদী দোকান/চায়ের দোকান (16)	ভিক্ষা সংগ্রহ করে (23)
মাছ ধরা (3)	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (10)	লবন চাষ (17)	ফেরী করা (24)
রিক্সা/ভ্যান চালক (4)	হস্তশিল্প (মাটি/কাঠের) (11)	গার্মেন্টসে কাজ (18)	টুরিষ্ট গাইড (25)
সিএনজি চালক (5)	পশু পালন (12)	দর্জির কাজ (19)	ক্যাম্প নেতা (26)
সাগরের নৌকা চালক (6)	বেকার (13)	দোকান ভাড়া (20)	ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি (27)
ইটভাটার (7)	মুরগীর খামার (14)	বিদেশী অর্থ আসে (21)	স্ত্রী/কন্যার ঝিঁয়ের কাজ থেকে (28)
			অন্যান্য (99)

২.পরিবারের সদস্যদের শরণার্থী হবার প্রেক্ষাপটঃ

Sl.	আপনি ও পরিবারের সদস্যরা কত সালে এসেছেন?	আরাকানের কোন অঞ্চল থেকে এসেছেন?	এখানে আসার তথ্য কার কাছে পেয়েছেন?	নিবন্ধিত হ্যাঁ-1 না-2	(উত্তর না হলে)কোথায় কি কি সাহায্য পেয়ে থাকেন?	স্বেচ্ছায় কখনও প্রত্যাবাসিত হয়েছেন? হ্যাঁ-1 না-2	না হলে, কেন প্রত্যাবা-সিত হন নি?	আসার পর কোথায় কোথায় থেকেছেন?	যেখানে যেখানে অবস্থান করেছেন তার জন্য অর্থ খরচ হয়েছে কি?	হ্যাঁ হলে কাকে কাকে অর্থ দিতে হয়েছে?
	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11
1									হ্যাঁ (1)	
2									না (2)	
3									অন্যান্য (99)	
4										
5										
6										
7										

২.পরিবারের সদস্যদের শরণার্থী হবার প্রেক্ষাপট কোডিংঃ

আরাকানের কোন অঞ্চল থেকে এসেছেন? (B3)	এখানে আসার তথ্য কার কাছে পেয়েছেন? (B4)	(উত্তর না হলে) কোথায় কি কি সাহায্য পেয়ে থাকেন (B6)	আসার পর কোথায় কোথায় থেকেছেন? (B9)	হ্যাঁ হলে কাকে কাকে দিতে হয়েছে? (B11)
বুচিদং (1)	মিডিয়ার মাধ্যমে (1)	আত্মীয়/স্বজন (1)	টালে (1)	হেডম্যান/মাঝি (1)
চেদুবা (2)	স্বামী (2)	পাড়া/পড়শি (2)	গ্রামে (2)	পাড়া/পড়শি (2)
আকিয়াব (3)	স্ত্রী (3)	এনজিও (3)	অন্য ক্যাম্পে (3)	জনপ্রতিনিধি (3)
সিত্তুই (4)	পিতা/মাতা (4)	স্থানীয় চেয়ারম্যান (4)	আত্মীয়ের বাড়িতে (4)	রাজনৈতিক কর্মী (4)
রাথিডং (5)	পুত্র/কন্যা (5)	স্থানীয় মেম্বর (5)	শরণার্থী ক্যাম্পে (5)	বিজিবি (5)
মংড়ু (6)	শ্বশুড়/শাশুড়ী (6)	ইউএনএইসসিআর (6)	সমুদ্রতীরে (6)	পুলিশ (5)
রাথ্রী (7)	আত্মীয় স্বজন (7)	ইউএনও (7)	নদী তীরে (7)	ক্যাম্প ম্যানেজঃ কমিটি (6)
রেঙ্গুন (8)	বন্ধু/বান্ধব (8)	জেলা প্রশাসক (8)	খাস জমিতে (8)	দালাল চক্র (91)
কাইউত্তু (9)	ভাই/বোন (9)	অন্যান্য (99)	রাস্তার পাশে (9)	অন্যান্য (99)
কায়ুকপিউ (10)	পরিবারের অন্য সদস্য (10)		অন্যান্য (99)	
অন্যান্য অঞ্চল (99)	অন্য কেউ (99)			

৩. বর্তমান পরিবারের ব্যয়ের চার্ট (মাসিক):

কোডিং	অন্যান্য ব্যয়ের ধরণ	পরিমাণ	উৎসঃ ১= নিজে ২= দাতাসংস্থা	(উত্তর ১ হলে) টাকায়	টাকা যেভাবে সংগ্রহ হয়েছে (পেশা কাড থেকে)	বিদেশে থেকে আসলে কত টাকা পাঠায়?	ঋণ নিতে পারেন কি?	নিলে কতটাকা নিয়েছেন?
কোডC1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	
1	পোশাক					হ্যাঁ (1)	হ্যাঁ (1)	
2	চিকিৎসা					না (2)	না (2)	
3	শিক্ষা					অন্যান্য (99)	অন্যান্য (99)	
4	খাদ্য দ্রব্য							
5	জ্বালানী							
6	অন্যান্য							

৪. সামাজিক ক্ষেত্রে শরণার্থীদের অবস্থাঃ

Sl.	আপনার বাসস্থানের ধরণ কেমন?	আপনি/আপনার পরিবার সামাজিক সমস্যার শিকার হয়েছেন কী?	হ্যাঁ হলে, কি কি ধরনের সমস্যার শিকার হয়েছেন?	সমস্যা/ ঘটনার মিমাংশা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ হলে, কিভাবে হয়েছে?	না হলে, কারণ কী?	মিমাংশা না হলে, বর্তমান অবস্থা কী?
	D2	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**	**D7**	**D8**
1		হ্যাঁ (1)		হ্যাঁ (1)			
2		না (2)		না (2)			
3		অন্যান্য (99)		অন্যান্য (99)			
4							
5							
6							
7							

৪. সামাজিক ক্ষেত্রে শরণার্থীদের অবস্থা কোডিং:

Sl.	আপনার বাসস্থানের ধরণ কেমন? (D2)	হ্যাঁ হলে, কী সমস্যার শিকার হয়েছেন? (D4)	হ্যাঁ হলে, কিভাবে হয়েছে? (D6)	না হলে, কারণ কী? (D7)	মিমাংশা না হলে বর্তমান অবস্থা কী? (D7)
	D2	**D3**	**D5**	**D6**	**D7**
1	কাচা (1)	ঝগড়া-ঝাটি (1)	পারিবারিক (1)	পারিবারিক (1)	জেলে আছে (1)
2	পাকা (2)	বাচ্চাদের মারামারি (2)	ক্যাম্প ম্যানেজঃ কমিটি (2)	ক্যাম্প ম্যানেজঃ কমিটি (2)	বিচারাধীন আছে (2)
3	সেমি পাকা (3)	ছিন্তাই (3)	ক্যাম্প ইনচার্জ (3)	ক্যাম্প ইনচার্জ (3)	খোঁজ রাখি না (3)
4	বাশের বেড়ার তৈরী (4)	বিবাহ বিচ্ছেদ (4)	ইউএনএইচসিআর (4)	ইউএনএইচসিআর (4)	পালিয়ে আছে (4)
5	পলিথিনের তৈরী ঘর (5)	চুরি/ডাকাতি (5)	এনজিও (5)	এনজিও (5)	অন্যান্য (99)
6	অন্যান্য (99)	ইভ টিজিং (6)	থানায় (6)	থানা (6)	
7		নারী নির্যাতন (7)	কোর্টে (7)	কোর্টে (7)	
8		নারী ও শিশু পাচার (8)	অন্যান্য (99)	আর্থিক সমস্যার কারণে(8)	
9		অন্যান্য (99)		অন্যান্য (99)	

৫.অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শরণার্থীদের অবস্থাঃ

Sl.	আপনি কি কম মজুরী পান? (E6)	কম মজুরী পাবার কারণ কী? (E6)	অন্য জেলায় কোন কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে কী?(E7)	করলে কী ধরনের কাজ করেছেন? (E8) (পেশা কোড থেকে)
	E1	**E2**	**E3**	
1	হ্যাঁ (১)	শরণার্থী (1)	চট্টগ্রাম (1)	
2	না (২)	অবৈধ আশ্রয় প্রার্থী (2)	বান্দরবান (2)	
3		রোহিঙ্গা (3)	ফেনী (3)	
4		কাজের অনুমতি নাই (4)	ঢাকা (4)	
5		বিদেশী নাগরিক (5)	কুমিল্লা (5)	
6		শারিরীকভাবে দুর্বল (6)	যশোর (6)	
7		সহজে শ্রমিক পাওয়া যায়? (7)	রংপুর (7)	
8		অন্যান্য (99)	সিলেট (8)	
9			অন্যান্য (99)	

৫.অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শরণার্থীদের অবস্থা কোডিং:

Sl.	কম মুজুরী পাবার কারণ কী? (E6)	অন্য জেলায় কোন কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে কী?(E7)	করলে কী ধরনের কাজ করেছেন? (E8) (পেশা কোড থেকে)
	E2	E3	E8
1	শরণার্থী (1)	চট্টগ্রাম (1)	
2	অবৈধ আশ্রয় প্রার্থী (2)	বান্দরবান (2)	
3	রোহিঙ্গা (3)	ফেনী (3)	
4	কাজের অনুমতি নাই (4)	ঢাকা (4)	
5	বিদেশী নাগরিক (5)	কুমিল্লা (5)	
6	শারিরীকভাবে দূর্বল (6)	যশোর (6)	
7	সহজে শ্রমিক পাওয়া যায়? (7)	রংপুর (7)	
8	অন্যান্য (99)	সিলেট (8)	
9		অন্যান্য (99)	

৭. বনজ বিষয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবস্থা:

Sl.	বনে কাঠ কাঠতে যান?	হ্যাঁ হলে সপ্তাহে কতবার যান?	না হলে, কারা যায়?	কাঠ কাটতে টোকেন ব্যবস্থা আছে কি?	পরিবারের অন্য সদস্যরা যায় কি?	হ্যাঁ হলে, সপ্তাহে কতবার যায়?	বনে কী ধরণের কাঠ সংগ্রহ করা যায়?
	F2	F3	F4	F6	F7	F8	F9
1	হ্যাঁ (1)			হ্যাঁ (1)	হ্যাঁ (1)		
2	না (2)			না (2)	না (2)		
3	অন্যান্য (99)			অন্যান্য (99)	অন্যান্য (99)		
4							
5							
6							
7							

৭. বনজ বিষয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবস্থা কোডিং:

Sl.	না হলে, কারা যায়? (F4)	সংগৃহিত কাঠ কি কি ? (F9)
	F2	F3
1	গ্রামবাসী (1)	ফুটকি গাছ (1)
2	বনবিভাগের কর্মী (2)	গেইস্যা গাছ (2)
3	রোহিঙ্গা শরণার্থী (3)	সাইন গাছ (3)
4	স্থানীয় কাঠুরিয়া (4)	ডুইরি গাছ (4)
5	ডাকাত (5)	উড়িয়া গাছ (5)
6	অন্যান্য (99)	তুলা গাছ (6)
7		আগরা গাছ (7)
8		রাবার গাছ (8)
9		অন্যান্য (99)
10		
11		

৮. পরিবেশগত বিষয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবস্থাঃ ৬.১স্যানিটেশন ৬.২পানি (খাবার/ব্যবহার) ৬.৩ জ্বালানী

	স্যানিটেশন		পানি = (খাবার/ব্যবহার)			জ্বালানী
Sl.	টয়লেট ব্যবস্থা কীরুপ?	যা আছে সেটি কি পর্যাপ্ত?	পানির উৎস কী কী?	পানির ব্যবস্থা কারা করেছে?	পানির অন্য ব্যবহার কীভাবে করেন?	প্রথমে রান্নায় কী ধরণের জ্বালানী ব্যবহার করেন?
	G2	**G3**	**G4**	**G6**	**G7**	**G8**
1		হ্যাঁ **(1)**			কাপড় কাচা **(1)**	
2		না **(2)**			গোসল করা **(2)**	
3		অন্যান্য **(99)**			রান্না করা **(3)**	
4					ধোয়া মোছা **(4)**	
5					অন্যান্য **(99)**	
6						
7						
8						
9						
10						

৮. পরিবেশগত বিষয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবস্থাঃ{৬.১স্যানিটেশন ৬.২পানি (খাবার/ব্যবহার) ৬.৩ জ্বালানী} কোডিংঃ

Sl.	স্যানিটেশন		পানি = (খাবার/ব্যবহার)			জ্বালানী
	টয়লেট ব্যবস্থা কিরুপ? (G2)	পানির উৎস কি কি? (G4)	পানির ব্যবস্থা কারা করেছে? (G6)	পানির অন্য ব্যবহার কিভাবে করেন? (G7)		প্রথমে রান্নায় কি ধরণের জ্বালানী ব্যবহার হয়? (G8)
1	**G2**	**G4**	**G6**	**G7**		**G8**
1		ছড়া (1)	ক্যাম্প ম্যানেজঃ কমিটি **(1)**	ছড়া (1)		কাঠ (1)
2	কাচা (1)	ঝরণা (2)	ক্যাম্প ইনচার্জ **(2)**	ঝরণা (2)		কেরসীন (2)
3	পাকা (2)	পুকুর (3)	ইউএনএইচসিআর (3)	পুকুর (3)		গাছের শুকনা পাতা (3)
4	সেমি পাকা (3)	টেপ(4)	এনজিও (4)	টেপ(4)		নলখাগড়া (4)
5	খোলা জায়গা(4)	নলকূপ (5)	সরকার **(1)**	নলকূপ (5)		শোন গাছ (5)
6	অন্যান্য (99)	গভীর নলকূপ (6)	অন্যান্য (99)	গভীর নলকূপ (6)		অন্যান্য**(99)**
7		অন্যান্য**(99)**		ধার করে**(7)**		
8				কষ্ট করে**(8)**		
9				অন্যান্য**(99)**		
10						

৯. আপনার ঘরে কথা বলেন কোন ভাষায়?

ক. রোহিঙ্গা ভাষা☐ খ. আরাকানী ভাষা ☐ গ. চট্টগ্রামের বাংলা ভাষা ☐ ঘ.মিশ্র ভাষা ☐

১০.আরাকান থেকে আপনাদের বিতাড়নের কী কী কারণ বলে মনে করেন?

ক.রোহিঙ্গা ☐ খ.চট্টগ্রামের নাগরিক ☐ গ.মুসলিম ☐ ঘ.সামরিক শাসন চালু থাকায়☐ ঙ.অন্যান্য ☐

১১.শিক্ষা বিষয়ক অবস্থা:

Sl.	আপনার সন্তানরা কোথায় পড়াশুনা করে?	হ্যাঁ হলে, কোন ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে?	কোন ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে?	এই শিক্ষা কি যথেষ্ঠ বলে মনে করেন?	নিয়মিত স্কুলে যায় কি?	না হলে, এর কারণ কী কী?	শিক্ষা উপকরণ পায় কি কি?
1	**H2**	**H3**	**H4**	**H5**	**H6**	**H7**	**H8**
1				হ্যাঁ (1)	হ্যাঁ (1)		
2				না (2)	না (2)		
3				অন্যান্য (99)	অন্যান্য (99)		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

১১.শিক্ষা বিষয়ক অবস্থা কোডিং:

Sl.	আপনার সন্তানরা কোথায় পড়াশুনা করে? (H2)	হ্যাঁ হলে, কোন ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ রয়েছে?(H3)	কোন ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে? (H4)	উত্তর না হলে, কারণ কি কি? (H7)	শিক্ষা উপকরণ পায় কী কী? (H8)
	H2	**H3**	**H4**	**H7**	**H8**
1	মক্তব (1)	প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি(1..5)	বাংলা ভাষা (1)	শরণার্থী (1)	চক শ্লেট (1)
2	এনজিও স্কুল (2)	ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি(6...8)	রোহিঙ্গা ভাষা (2)	দরিদ্রতা (2)	খাতা (2)
3	সরকারী স্কুল (3)	এসএসসি/ দাখিল, (10)	বর্মী ভাষা (3)	রোহিঙ্গা (3)	পেন্সিল/কলম(3)
4	বাড়িতে (4)	এইচএসসি/ আলিম (12)	ইংরেজী (4)	উৎসাহ নাই (4)	স্কুল ড্রেস (4)
5	গ্রামের স্কুলে (5)	মক্তব (91)		বিদেশী নাগরিক (5)	স্কুল ব্যাগ (5)
6		কওমি মাদ্রাসা (92)		দূর্বল মেধা (6)	শিশুখাদ্য (6)
7				বিদেশ যাবার আকর্ষণ (7)	স্কুল বই (7)
8					অন্যান্য (99)
9					

১২.সামাজিক ক্ষেত্রে শরণার্থীদের অবস্থাঃ

Sl.	আপনি কি ভোটার?	হ্যাঁ হলে, কিভাবে হয়েছেন?	কি পরিমাণ অর্থ লেগেছে?	আপনার পাসপোর্ট আছে কি?	হ্যাঁ হলে, কিভাবে করেছেন?	অর্থ লেগেছে কেমন?	মৃত ব্যক্তিকে কোথায় কবর দেন?
	I2	**I3**	**I4**	**I5**	**I6**	**I7**	**I8**
1	হ্যাঁ **(1)**			হ্যাঁ **(1)**			
2	না **(2)**			না **(2)**			
3	অন্যান্য **(99)**			অন্যান্য **(99)**			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

১২. সামাজিক ক্ষেত্রে শরণার্থীদের অবস্থা কোডিংঃ

Sl.	হ্যাঁ হলে, কিভাবে হয়েছেন? (I3)	হ্যাঁ হলে, কিভাবে করেছেন? **(I6)**	মৃত ব্যক্তিকে কোথায় কবর দেন? (I8)
	I3	**J6**	**J8**
1	চেষ্টা করে(1)	চেষ্টা করে(1)	জংঙ্গলে (1)
2	আত্মীয়তার সম্পর্কে (2)	আত্মীয়তার সম্পর্কে (2)	অনির্দিষ্ট স্থানে(2)
3	কাজের বিনিময়ে (3)	কাজের বিনিময়ে (3)	কবরস্থানে (3)
4	অর্থ দিয়ে (4)	অর্থ দিয়ে (4)	ভাগাড়ে (4)
5	স্কুলের সার্টিফিকেট দিয়ে (5)	স্কুলের সার্টিফিকেট দিয়ে (5)	অন্যান্য স্থানে (99)
6	অন্যান্য (99)	অন্যান্য (99)	
7			
8			

‘বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রভাব’ শীর্ষক গবেষণার জন্য স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ-উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠী, রাজাপালং ইউনিয়ন= ১ ☐ ও পালংখালি ইউনিয়ন= ২ ☐ হ্নীলা ইউনিয়ন= ৩ ☐

১. উত্তরদাতার তথ্যঃ

Sl.	নাম	আপনার ইউনিয়ন কোনটি?	গ্রামের নাম কি?	লিঙ্গ নারী/পুরুষ	শিক্ষা	পেশা	আয় (মাসিক)	সামাজিক অবস্থা	বৈবাহিক সম্পর্ক কোথায়?	আপনার জন্ম কোথায়?
	A1	A2	A3	A4	A6	A7	A8	A9	A10	A11
1				নারী (1)						
2	(A5) বয়স			পুরুষ(2)						

১. উত্তরদাতার তথ্য কোডিংঃ

বাড়ি কোন ইউনিয়নে? (কোডিং) A2	গ্রামের নাম কি? (কোডিং) A3	শিক্ষা (কোডিং) A6	সামাজিক অবস্থা (কোডিং) A9	বৈবাহিক সম্পর্ক কোথায়? (কোডিং) A10	আপনার জন্ম কোথায়? (কোডিং) A11
1. রাজাপালং (1)	কুতুপালং (1)	নিরক্ষর (0)	অবিবাহিত (1)	আরাকান (1)	1. আরাকান (1)
		স্বাক্ষর জ্ঞান (98)	বিবাহিত (2)	চট্টগ্রাম (2)	2. বাংলাদেশ (2)
2. পালংখালি (2)	পালংখালি (2)	প্রাথমিক (1)	বিধবা (3)	বান্দরবান (3)	
	থাইংখালি (3)	মাধ্যমিক শ্রেণি (2)	বিপত্নীক (4)	কক্সবাজার (4)	
	বালুখালি (4)	এসএসসি/ দাখিল (10)	অন্যান্য (99)	নিবন্ধিত শরণার্থী ক্যাম্প (90)	
		এইচএসসি/আলিম (12)		অ-নিবন্ধিত শরণার্থী ক্যাম্প (91)	
3. হ্নীলা (3)	নয়াপাড়া (1)	অনার্স/বিএ/বিএসএস (13)		অন্যান্য (99)	
	মুচুনী (2)	এমএ/এমএসএস (14)			
	জাদিমুরা (3)	এমফিল/পিএইচডি (15)			
	লেদা (4)	মক্তব (91)			
		কওমি মাদ্রাসা (92)			

পেশা কোডিং (A7):

ভূমি চাষ /বর্গা চাষ (1)	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী/ মুদী দোকান/চায়ের দোকান (9)	ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি /টেকনিশিয়ান (17)
কাঠুরিয়া (2)	ইটভাটার শ্রমিক/ দিনমুজুর (10)	এনজিও কর্মী (18)
সিএনজি চালক/অটো রিক্সা চালক(3)	ডাক্তার/নার্স (11)	স্ত্রী/কণ্যার ঝিঁয়ের কাজ (19)
হস্তশিল্প (মাটি/কাঠের) (4)	ইমাম/মুয়াজ্জিন (12)	মাছ ধরা (20)
বেকার (5)	হাঁস/মুরগীর খামারী (13)	গার্মেন্টসে কাজ (21)
রিক্সা/ভ্যান চালক (6)	শিক্ষকতা (14)	ফেরী করা (22)
সাগরের নৌকা/জাহাজ চালক (7)	দর্জির কাজ (15)	অন্যান্য (99)
লবন চাষ (8)	পশু পালন (16)	

২. পরিবার সদস্যদের তথ্যঃ

আপনার বাসস্থানের ধরণ কেমন?	আপনার পরিবারের ধরণ কি?	আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত?	আপনার পরিবারে কতজন আয় করে?	আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত?	শরণার্থী পরিবারের সাথে আপনার পরিচয় আছে কি?	থাকলে, শরণার্থীর সাথে পরিচয় হয়েছে কিভাবে?
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
					হ্যাঁ (1)	
					না (2)	

২. পরিবার সদস্যদের তথ্য কোডিংঃ

আপনার বাসস্থানের ধরণ? (কোডিং) B1	আপনার পরিবারের ধরণ কি? (কোডিং) B2	থাকলে, শরণার্থীর সাথে পরিচয় হয়েছে কিভাবে? (কোডিং) B7
কাঁচা (1)	একক পরিবার (1)	স্থানীয় বাজারে (1)
পাকা বিল্ডিং (2)	যৌথ পরিবার (2)	স্থানীয় মসজিদে (2)
সেমি পাকা (3)		স্থানীয় সালিশে (3)
বাঁশের তৈরী (4)		স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (4)
পলিথিনের তৈরী ঘর(5)		স্থানীয় কর্মস্থলে (5)
অন্যান্য (99)		স্থানীয় পানি সংগ্রহের স্থলে (6)
		অন্যান্য (7)

৩. রোহিঙ্গা শরণার্থী-স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সামাজিক সম্পর্ক:

রোহিঙ্গাদের সাথে কোনো সামাজিক সমস্যা আছে কি?	হ্যাঁ হলে, কি কি ধরনের সমস্যা হয়?	কিভাবে তা সমাধান হয়েছে?	না হলে, কারণ কী কী?	সমস্যাটি বর্তমান কি অবস্থায় আছে?	রোহিঙ্গাদের সামাজিকতা সম্পর্কে ধারণা কি?
C1	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	**C6**
হ্যাঁ (1)					
না (2)					

৩. রোহিঙ্গা শরণার্থী-স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সামাজিক সম্পর্ক কোডিং:

হ্যাঁ হলে, কি ধরনের সমস্যা হয়েছে? (কোডিং) C 2		কিভাবে তা সমাধান হয়েছে? (কোডিং) C3	না হলে, কারণ কী? (কোডিং) C 4	বর্তমান অবস্থা কী? (কোডিং) C 5	রোহিঙ্গাদের সামাজিকতা সম্পর্কে ধারণা কি?(কোডিং) C 5
ঝগড়া-ঝাটি (1)	ইয়াবা (8)	পারিবারিকভাবে (1)	থানার কারণে (1)	জেলে আছে (1)	সামাজিক প্রকৃতির (1)
বাচ্চাদের মারামারি(2)	মানব পাচার (9)	ইউপি মেম্বার /চেয়ারম্যান(2)	ইউপি মেম্বার /চেয়ারম্যান (2)	বিচারাধীন আছে (2)	অসামাজিক প্রকৃতির (2)
ছিন্‌তাই (3)	বেকারত্ব (10)	এনজিও দ্বারা (3)	এনজিও (3)	খোঁজ রাখি না (3)	বাঁধা প্রাপ্ত সামাজিকতা (3)
মাদক সমস্যা (4)	জমি-জমা (11)	থানায় (4)	কোর্টে (2)	পালিয়ে আছে (4)	সামাজিক শিক্ষা না থাকা (4)
চুরি/ডাকাতি (5)	অবৈধ অস্ত্র (12)	কোর্টে (5)	আর্থিক সমস্যা (3)	প্রভাবশালীদের প্রশ্রয়(5)	নতুন সমাজের ধারণা নেই (5)
ইভ টিজিং (6)	স্বাধীনভাবে চলাফেরা(13)	অন্যান্য (99)	অন্যান্য (99)	অন্যান্য (99)	অন্যান্য (99)
জ্বালানী সমস্যা (7)	পানির সমস্যা (14)				

৪. রোহিঙ্গা শরণার্থী-স্থানীয় সম্প্রদায়ের যোগাযোগ:

আপনি কতদিন ধরে এখানে বসবাস করছেন?	কোন শরণার্থী ক্যাম্পটি আপনার বাড়ির কাছে?	আপনার বাড়ি থেকে ক্যাম্পের দূরত্ব কত?	কোনো শরণার্থীর সাথে পরিচয় আছে কি?	থাকলে, কোন কোন ক্যাম্পে?	শরণার্থীদের সাথে যোগাযোগের হয় কিভাবে?
D 1	**D 2**	**D 3**	**D 4**	**D 5**	**D 6**
		কি:মি:	হ্যাঁ (1)		
			না (2)		

৪. রোহিঙ্গা শরণার্থী-স্থানীয় সম্প্রদায়ের যোগাযোগ কোডিং:

কতদিন ধরে এখানে বসবাস করছেন? (কোডিং) D 1	বাড়ির কাছে শরণার্থী ক্যাম্প কোনটি? (কোডিং) D 2	থাকলে, কোন কোন ক্যাম্পে? (কোডিং) D 5	শরণার্থীদের সাথে যোগাযোগের হয় কিভাবে? (কোডিং) D 6
05-10 বছর (1)	কুতুপালং নিবন্ধিত ক্যাম্প (1)	কুতুপালং নিবন্ধিত ক্যাম্প (1)	পূর্ব পরিচিত (1)
10-15 বছর (2)	নয়াপাড়া নিবন্ধিত ক্যাম্প (2)	নয়াপাড়া নিবন্ধিত ক্যাম্প (2)	পারিবারিক প্রয়োজন (2)
15-20 বছর (3)	কুতুপালং মেকশিফট ক্যাম্প (3)	কুতুপালং মেকশিফট ক্যাম্প (3)	ব্যবসায়িক কারণে (3)
20-25 বছর (4)	লেদা মেকশিফট ক্যাম্প (4)	লেদা মেকশিফট ক্যাম্প (4)	আর্থিক লেনদেন (4)
25-30 বছর (5)			শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে (5)
30-35 বছর (6)			অন্যান্য (6)
35- তদুর্ধ্বো বছর (7)			

৫. রোহিঙ্গা শরণার্থী-স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক:

আপনার বাড়িতে শরণার্থীদের যাতায়াত আছে কি?	আপনানিও তাদের বাড়িতে যাতায়াত করেন কি?	হ্যাঁ হলে, বেশি যাতায়াত করেন কে?	শরণার্থীর সাথে আপনার সম্পর্ক, প্রতিবেশিরা বিষয়টি কিভাবে দেখেন?	এ সম্পর্ক, আপনার প্রতিবেশিরা কোনো আপত্তি করে কি?	আপত্তির ধরণ কিরূপ?	শরণার্থীদের সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে কি?	তাদের সাথে এই আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়েছে কার কিভাবে?
E1	**E2**	**E3**	**E4**	**E5**	**E6**	**E7**	**E8**
হ্যাঁ (1)	হ্যাঁ (1)					হ্যাঁ (1)	
না (2)	না (2)					না (2)	

৫. রোহিঙ্গা শরণার্থী-স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক কোডিং:

হ্যাঁ হলে, বেশি যাতায়াত করেন কে?(কোডিং) E3	আপনার প্রতিবেশিরা বিষয়টি কিভাবে দেখেন?(কোডিং)E4	আপনার প্রতিবেশিরা কোনো আপত্তি করে কি?(কোডিং) E5	আপত্তির ধরণ কিরূপ? (কোডিং) E6	তাদের সাথে এই আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়েছে কার মাধ্যমে? (কোডিং)E8
নিজে (1)	স্বাভাবিক ভাবে (1)	হ্যাঁ (1)	আপত্তি কর কথা বলে (1)	নিজের মাধ্যমে (1)
স্ত্রী (2)	খারাপ দৃষ্টিতে (2)	না (2)	থানায় অভিযোগ করে (2)	সন্তান-সন্তুতি (2)
সন্তানরা (3)	ঘৃনার দৃষ্টিতে (3)	নিরপেক্ষ থাকে (3)	মামলার হুমকী দেয় (3)	নিজের ভাই বোন (3)
পরিবারের অন্যরা (4)	সন্দেহের দৃষ্টিতে (4)	মৃদুও করে না (4)	গ্রাম্য সালিশের মুখোমুখি (4)	পরিবারের অন্য কেউ (4)
রোহিঙ্গা মাঝি (5)	অন্যান্য (99)	শক্তভাবে আপত্তি করে (5)	সামাজিকভাবে বয়কট করে (5)	প্রতিবেশির মাধ্যমে (5)
রোহিঙ্গা পরিবারের সদস্য(6)			মৌখিকভাবে নিষেধ করে (6)	চেয়ারম্যান/মেম্বর এর মাধ্যমে (6)

৬. রোহিঙ্গা শরণার্থী-স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত:

আপনার সাথে কোন রোহিঙ্গার দ্বন্দ্ব-সংঘাত আছে কি?	হ্যাঁ হলে, দ্বন্দ্ব-সংঘাত কিভাবে হয়েছে?	হ্যাঁ হলে, কি কি ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়েছে?	দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মিমাংসা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ হলে, কিভাবে হয়েছে?	না হলে, কারণ কি কি?	মিমাংসা না হলে, বর্তমান অবস্থা কী?
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
হ্যাঁ (1)			হ্যাঁ (1)			
না (2)			না (2)			

৬. রোহিঙ্গা শরণার্থী-স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত কোডিং:

হ্যাঁ হলে, দ্বন্দ্ব-সংঘাত কিভাবে হয়েছে? (কোডিং) F2	হ্যাঁ হলে, কি দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শিকার হয়েছেন? (কোডিং) F3	হ্যাঁ হলে, কিভাবে হয়েছে? (কোডিং) F5	না হলে, কারণ কী? (কোডিং) F6	মিমাংশা না হলে, বর্তমান অবস্থা কী? (কোডিং) F7
ব্যক্তিগত ঝগড়া-ঝাটি (1)	পারিবারিক (1)	সালিশ এর মাধ্যমে(1)	হাজতে আছে (1)	থানায় আছে (1)
পারিবারিক (2)	সামাজিক (2)	গ্রাম আদালত (2)	পলাতক আছে (2)	বিচারাধীন (2)
সামাজিক (3)	অর্থনৈতিক (3)	থানা (3)	ঝুঁলে আছে (3)	জানি না (3)
মাদক সমস্যা (4)	রাজনৈতিক (4)	কোর্ট (4)	অন্যান্য (99)	অন্যান্য (99)
চুরি/ডাকাতি (5)	ব্যক্তিগত (5)	অন্যান্য (99)		
ইভ টিজিং (6)	অন্যান্য (99)			

৭. স্থানীয় শ্রমিক ও শ্রম বাজার:

আপনার সংসারে কতজন আয় করে?	আপনি কাজ করে দিনে কত টাকা মজুরী পান?	রোহিঙ্গা আসার কারণে কম মজুরী পান কী?	হ্যাঁ হলে, কম মজুরী দেবার কারণ কী কী?	একই কাজ রোহিঙ্গারা করলে কত টাকা পায়?	রোহিঙ্গারা কেনো কম টাকায় কাজ করে?
G1	G2	G3	G4	G5	G6
		হ্যাঁ (1)			
		না (2)			

৭. স্থানীয় শ্রমিক ও শ্রম বাজার কোডিং:

আপনার সংসারে কতজন আয় করে?(কোডিং) G1	হ্যাঁ হলে, কম মজুরী দেবার কারণ কী কী? (কোডিং) G4	একই কাজ রোহিঙ্গারা করলে কত টাকা পায়?(কোডিং) G5	রোহিঙ্গারা কেন কম টাকায় কাজ করে? (কোডিং) G6
এক জন (1)	শরণার্থী উপস্থিতি (1)	২০০/ (1)	শরণার্থী হওয়ায় (1)
দুই জন (2)	তাদের কাজের অনুমতি নাই(2)	২৫০/ (2)	শারিরিক দূর্বলতা (2)
তিন জন (3)	সস্তা শ্রম (3)	৩০০/ (3)	কাজের অনুমতি নাই (3)
চার জন (4)	শ্রমের যোগান বেশি (4)	৩৫০/ (4)	কাজে দক্ষ নয় (4)
পাঁচ জন বা তদুর্দ্ধ (5)	শ্রমের চাহিদা কম (5)	৪০০/ বা তদুর্ধ্বো (5)	জরুরী প্রয়োজনে (5)

৮. স্থানীয় বাজারে শ্রম মূল্যের অবস্থা:

শরণার্থী আসার ফলে শ্রমের মূল্যের প্রভাব পড়েছে কি?	হ্যাঁ হলে, শ্রমের মূল্য বৃদ্ধির কারণ কি কি?	না হলে, শ্রমের মূল্য কমার কারণ কি কি?	এতে আপনার জীবন-যাত্রায় কি ধরণের ক্ষতি হচ্ছে?	এই ক্ষতি কিভাবে মোকাবেলা করছেন ?
H 1	H 2	H 3	H 4	H 5
হ্যাঁ (1)				
না (2)				

৮. স্থানীয় বাজারে শ্রমের মূল্যের অবস্থা কোডিং:

হ্যাঁ হলে, শ্রমের মূল্য বৃদ্ধির কারণ কি কি?(কোডিং) H 2	না হলে, শ্রমের মূল্য কমার কারণ কি কি?(কোডিং) H 3	এতে, আপনার জীবন-যাত্রায় কি ধরণের ক্ষতি হচ্ছে? (কোডিং) H 4	এই ক্ষতি মোকাবেলা করেছেন কিভাবে? (কোডিং) H 5
স্থানীয় এলাকায় অতিরিক্ত জনসংখ্যা(1)	রোহিঙ্গা শরণার্থী (1)	সঞ্চয় কমে গেছে (1)	নিজের পারিবারিক ব্যয় কমিয়েছি(1)
সম্পদের সীমাবদ্ধতা (2)	দক্ষ শ্রমিকের অভাব	পরিবারের খাদ্য দ্রব্য কম ক্রয় (2)	সরকারী সহায়তায় (2)
উৎপাদনের স্বল্পতা (3)	খাদ্যদ্রব্যের পর্যাপ্ততা (2)	সন্তানের শিক্ষা ব্যয় সংঙ্কুচিত(3)	বিদেশী সহায়তায় (3)
দালাল শ্রেণি (4)	উৎপাদনের স্বল্পতা (3)	স্বাস্থ্য সেবায় ঘাটতি (4)	এনজিও সহায়তায় (4)
হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ব্যবসায়ী(5)	দালাল শ্রেণি (4)	পোশাকের ব্যয় কমে গেছে (5)	আত্মীয় স্বজনের সহায্যে (5)
রাজনৈতিক প্রভাবশালী (6)		অন্যান্য (99)	অন্যান্য (99)
অন্যান্য (99)			

৯. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রায় প্রভাব:

শরণার্থী আসায় জীবন যাত্রায় প্রভাব পড়েছে কি?	হ্যাঁ, হলে প্রভাব ইতিবাচক না নেতিবাচক?	ইতিবাচক হলে তা কিসে কিসে?	নেতিবাচক হলে তা কিসে কিসে?	কোন কোন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে?	এই প্রভাব বেশি হওয়ার কারণ কি কি?	এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় কি কি?
I-1	**I-2**	**I-3**	**I-4**	**I-5**	**I-6**	**I-7**
হ্যাঁ (1)	হ্যাঁ (1)					
না (2)	না (2)					

৯. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রায় প্রভাব কোডিং:

ইতিবাচক হলে তা কিসে কিসে?(কোডিং) I-3	নেতিবাচক হলে তা কিসে কিসে?(কোডিং) I-4	কোন কোন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে?(কোডিং) I-5	এই প্রভাব বেশি হওয়ার কারণ কি কি?(কোডিং) I-6	এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় কি কি?(কোডিং) I-7
বিদেশী রেমিটেন্স (1)	জমি-জমার বিষয়ে (1)	জমি-জমায় (1)	অধিক জনসংখ্যা (1)	জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (1)
দেশি এনজিও সহায়তা (2)	ব্যক্তিগত ঝগড়া-ঝাটি (2)	আর্থিক সমস্যায় (2)	অদক্ষ জনগোষ্ঠী (2)	দক্ষতা প্রশিক্ষণ (2)
বিদেশি এনজিও সহায়তা (3)	পারিবারিক বিষয়ে (3)	পারিবারিক সমস্যায় (3)	শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত (3)	শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি (3)
সরকারী সহায়তা (4)	সামাজিক বিষয়ে (4)	ফসলের ক্ষেত্রে (4)	রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠী (4)	নাগরিকত্বের স্বীকৃতি (4)
সস্তা শ্রম (5)	অপরাধমূলক বিষয়ে (5)	চলাচলের ক্ষেত্রে (5)	দরিদ্র জনগোষ্ঠী (5)	প্রত্যাবাসন (5)
মানবিক সহায়তায় (6)	যোগাযোগ ব্যবস্থায় (6)	সন্তানদের লেখা-পড়ায় (6)	হতাশাগ্রস্থ জনগোষ্ঠী (6)	দারিদ্রতা থেকে মুক্তি (6)

১০. স্থানীয় কৃষি ও কৃষি উৎপাদন:

আপনি বা আপনার পরিবার কৃষির সাথে জড়িত আছে?	হ্যাঁ হলে, কৃষির সাথে সম্পর্ক কত দিন থেকে?	শরণার্থী আগমণে কৃষি উৎপাদনে কোনো প্রভাব পড়েছে কি?	হ্যাঁ হলে, কি কি ধরণের প্রভাব পড়েছে?	এই প্রভাব কাটিয়ে উঠছেন কি?	হ্যাঁ হলে, কিভাবে প্রভাব কাটিয়ে উঠছেন?
J-1	**J-2**	**J-3**	**J-4**	**J-5**	**J-6**
হ্যাঁ (1)		হ্যাঁ (1)		হ্যাঁ (1)	
না (2)		না (2)		না (2)	

১০. স্থানীয় কৃষি ও কৃষি উৎপাদন কোডিং:

হ্যাঁ হলে, কৃষির সাথে সম্পর্ক কত দিন থেকে? (কোডিং) J-2	হ্যাঁ হলে, কি কি ধরণের প্রভাব পড়েছে? (কোডিং) J-4	হ্যাঁ হলে, প্রভাব কিভাবে কাটিয়ে উঠছেন? (কোডিং) J-6
05-10 বছর (1)	চাষের জমি কমে যাওয়া (1)	নিজের চেষ্টায় (1)
10-15 বছর (2)	দক্ষ কৃষি শ্রমিকের অভাব (2)	সরকারী সহায়তায় (2)
15-20 বছর (3)	চাষের জমি বেদখল (3)	বিদেশী সহায়তায় (3)
20-25 বছর (4)	সেচের পানির অভাব (4)	এনজিও সহায়তায় (4)
25- তদুর্ধ্ব বছর (5)	ফসল ঘরে তুলতে না পারার আশংঙ্কা(5)	দেশী মানুষের সহায্যে (5)
	অন্যান্য (99)	অন্যান্য (99)

১১. স্থানীয়দের জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রার ঝুঁকি:

শরণার্থী আগমণ কৃষিতে ঝুঁকির কারণ মনে করেন কি?	কৃষিতে এই ঝুঁকির প্রধান উৎস কি?	এই উৎসের কারণে কৃষির কোন কোন ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে?	এই ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় কি কি?	এই ঝুঁকি মোকাবেলায় কার কার সহযোগিতা প্রয়োজন হয়েছে?
K-1	**K-2**	**K-3**	**K-4**	**K-5**
হ্যাঁ (1)				
না (2)				

১১. স্থানীয়দের জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রার ঝুঁকি কোডিং

কৃষিতে এই ঝুঁকির প্রধান উৎস কি?(কোডিং) K-2	এই উৎসের কারণে কৃষির কোন কোন ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে?(কোডিং) K-3	এই ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় কি কি?(কোডিং) K-4	ঝুঁকি মোকাবেলায় সহযোগিতা প্রয়োজন হয়েছে কার?(কোডিং)K-5
বনবিভাগের লোকেরা (1)	আয় কমে যাওয়া (1)	কৃষি জমি ফিরিয়ে দেওয়া(1)	সরকারী সহায়তায় (1)
প্রতিবেশিরা (2)	স্থানীয় মজুরদের কাজ কমে যাওয়া(2)	শরণার্থীদের দ্রুত প্রত্যাবাসন ব্যবস্থা(2)	বিদেশী সহায়তায় (2)
স্থানীয়রা (3)	খাদ্য নিরাপত্তা অনিশ্চিত (3)	কৃষকদের ভর্তুকির ব্যবস্থা করা (3)	এনজিও সহায়তায় (3)
রোহিঙ্গা মাঝিরা (4)	সন্তানের শিক্ষার সুযোগ সংঙ্কুচিত(4)	কৃষির উপকরণ স্বল্পমূল্য বিতরণ (4)	অন্যান্য (99)
সাধারণ রোহিঙ্গারা (5)	স্বাস্থ্য সেবার ঝুঁকি বাড়ে (5)	অন্যান্য (99)	

১২. স্থানীয় বন ও প্রাকৃতিক পরিবেশঃ

বন কি কি উপকারে আসে?	এখন বনে আগের মতো সুবিধাগুলো পাওয়া যায় কি?	না হলে,কারণ কি কি?	কাদের কারণে বনের ক্ষতি হয়েছে?	বন ধ্বংসে কি কি সমস্যা হয়েছে?	এ ক্ষতি পোষানোর জন্য বিকল্প কি করা যেতে পারে?	বন উন্নয়নে আপনার মতামত কি?
L-1	**L-2**	**L-3**	**L-4**	**L-5**	**L-6**	**L-7**
	হ্যাঁ (1)					
	না (2)					

১২. স্থানীয় বন ও পরিবেশ কোডিংঃ

বন কি কি উপকারে আসে? (কোডিং) L-1	না হলে, কারণ কি কি?(কোডিং) L-3	কাদের কারণে বনের ক্ষতি হয়েছে? (কোডিং) L-4	বন ধ্বংসে কি কি সমস্যা হয়েছে?(কোডিং) L-5	এ ক্ষতি পোষানোর জন্য বিকল্প কি কি করা যেতে পারে? (কোডিং) L-6	বন উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যাতে পারে? (কোডিং) L-7
আর্থিক উপকার(1)	বন ধ্বংস হওয়া(1)	রোহিঙ্গা শরণার্থী (1)	পাখিদের আবাস নষ্ট(1)	চাষের জমি উদ্ধার (1)	বন ধ্বংস রোধ (1)
জ্বালানী চাহিদা মেটায়(2)	কাঠের সংকট (2)	স্থানীয়রা (2)	প্রাণিদের অভয়ারণ্য ধ্বংস(2)	মাটির ক্ষয় রোধ (2)	বনে মানুষের যাতায়াত সীমিত করা (2)
মাটির উর্বরতা বাড়ায় (3)	ঘরবাড়ি তৈরী (3)	বনবিভাগের কর্মী (3)	মাটির ক্ষয় (3)	পানি দূষণ রোধ (3)	সামাজিক বনায়ন বৃদ্ধি(3)
খাদ্য চাহিদা মেটায় (4)	রাস্তাঘাট নির্মাণ(4)	অন্যান্য (99)	বায়ু দূষণ (4)	বায়ু দূষণ রোধ(4)	পরিবেশ সংরক্ষণ (4)
পরিবেশ বাঁচায় (5)	অন্যান্য (99)		অন্যান্য (99)	অন্যান্য (5)	বনবিভাগের উদ্যোগ (5)

১৩.জ্বালানী ও পরিবেশ সংকটঃ

রান্নার কাজে কি ব্যবহার করেন ?	জ্বালানী সংগ্রহ করেন কোথা থেকে?	এখন জ্বালানী সংগ্রহে কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা?	এই সমস্যা কখন থেকে তৈরী হয়েছে?	এতে আপনার পরিবারের ওপর কি কি প্রভাব তৈরী করেছে?	এতে আপনার এলাকায় কি ধরণের প্রভাব পড়ছে?	এ সমস্যা উত্তরণে কি কি করণীয়?
M-1	**M-2**	**M -3**	**M-4**	**M-5**	**M-6**	**M-7**
		হ্যাঁ (1)				
		না (2)				

১৩.জ্বালানী ও পরিবেশ সংকট কোডিংঃ

রান্নার কাজে কি ব্যবহার করেন?(কোডিং) (M-1)	জ্বালানী সংগ্রহ করতেন কোথা থেকে? (কোডিং) (M-2)	এই সমস্যা কখন থেকে তৈরী হয়েছে?(কোডিং) (M-4)	এতে আপনার পরিবারের ওপর কি কি প্রভাব তৈরী হয়েছে? (কোডিং) (M-5)	এতে আপনার এলাকায় কি ধরণের প্রভাব পড়ছে? (কোডিং) (M-6)	এ সমস্যা উত্তরণে কি কি করণীয়? (কোডিং) (M-7)
এলপি গ্যাস (1)	বাড়ির পাশে জঙ্গল থেকে(1)	১৯৭৮ সালের পর থেকে(1)	জ্বালানী ব্যয় বৃদ্ধি (1)	এই এলাকায় বন কমেছে (1)	দ্রুত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন (1)
বনের লাকড়ি (2)	বন থেকে লাকড়ি সংগ্রহ (2)	১৯৯২ সালের পর থেকে (2)	পারিবারিক সঞ্চয়ে ঘাটতি (2)	মানুষের আর্থিক খরচ বেড়েছে (2)	বন ধ্বংস থেকে রক্ষা করা (2)
বাড়ির পাশের লতা পাতা (3)	সৃষ্ট বন থেকে (3)	২০১২ সালের পর থেকে (3)	সন্তানদের পড়া লেখার ব্যয় সংঙ্কোচিত (3)	এ এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিরা দুশ্চিন্তায় আছে (3)	কাঠের বিকল্প জ্বালানীর ব্যবস্থা(3)
ইলেকট্রিক ব্যবস্থায়(4)	বাজর থেকে ক্রয় করে (4)	২০১৬ সালের পর থেকে (4)	পরিবারের স্বাস্থ্য সেবা সংস্কুচিত (4)	মানুষের পেশার পরিবর্তন ঘটেছে (4)	সৃষ্ট বন বৃদ্ধি করা (4)
কেরোশিন তেল (5)	অন্যান্য (99)	২০১৭ সালের পর থেকে (5)	পোশাকের ব্যয় সংস্কুচিত (5)	পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটছে (5)	বন ধ্বংসে মানুষকে সচেতন(5)
হাস্ক বা তুষের লাকড়ি(6)		অন্যান্য (99)	অন্যান্য (99)	অন্যান্য (99)	পর্যাপ্ত বনকর্মী নিয়োগ করা (6)
অন্যান্য (99)					অন্যান্য (99)

১৪.শিক্ষা বিষয়ক অবস্থাঃ

আপনার সন্তানরা স্কুলে যায় কি?	আপনার সন্তানরা কোথায় পড়াশুনা করে?	শরণার্থী আগমণে সন্তানের শিক্ষা গ্রহণে সমস্যা হয়েছে কি?	হ্যাঁ হলে, কি ধরণের সমস্যা হচ্ছে?	এ সমস্যায় আপনার সন্তানের পড়া-লেখায় কিরূপ প্রভাব পড়ছে?	এ সমস্যা উত্তরণে কি কি করণীয়?
N-1	**N-2**	**N-3**	**N-4**	**N-5**	**N-6**
হ্যাঁ (1)		হ্যাঁ (1)			
না (2)		না (2)			

১৪.শিক্ষা বিষয়ক অবস্থা কোডিং:

আপনার সন্তানরা কোথায় পড়াশুনা করে? (কোডিং) N-2	হ্যাঁ হলে, কি ধরণের সমস্যা হচ্ছে? (কোডিং) N-4	এ সমস্যায় আপনাার সন্তানের পড়া লেখায় কিরূপ প্রভাব পড়ছে?(কোডিং) N-5	এ সমস্যা উত্তরণে কি কি করণীয়? (কোডিং) N-6
এনজিও স্কুলে (1)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল (1)	শিক্ষা গ্রহণে অনীহা তৈরী (1)	শরণার্থী প্রত্যাবাসন (1)
সরকারী স্কুলে (2)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দপ্তর/ ক্যাম্প স্থাপন (2)	শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া (2)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দপ্তর/ ক্যাম্প/আশ্রয় কেন্দ্র দখল মুক্ত করা (2)
বাড়িতে (3)	শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি (3)	স্কুল সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা (3)	ক্যাম্পের বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শরণার্থী ভর্তির সুযোগ না রাখা (3)
বেসরকারী স্কুলে (4)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সমস্যা/যানজট সমস্যা (4)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি কম (4)	শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ (4)
কে. জি. স্কুল (5)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় গ্রহণ (5)	শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত হওয়া (5)	শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ (5)
মক্তব (91)	শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা সমস্যা (6)	অন্যান্য (99)	অন্যান্য(6)
কওমি মাদ্রাসা (92)	অন্যান্য (99)		
আলীয়া মাদ্রাসা (93)			

১৫. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ধারণা-

নিম্নলিখিত বিবৃতি সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আপনার মতামত অনুসারে একটি টিক দিয়ে দয়া করে আপনার প্রতিক্রিয়া জানান।

(১) দৃঢ়ভাবে একমত নই; (২) একমত নই; (৩) নিরপেক্ষ; (৪) একমত; এবং (৫) দৃঢ়ভাবে একমত

ক্র.	বিষয়	দৃঢ়ভাবে একমত 5	একমত 4	নিরপেক্ষ 3	একমত নই 2	দৃঢ়ভাবে একমত নই 1
1.	রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যহত হয়েছে	5	4	3	2	1
2.	রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে	5	4	3	2	1
3.	রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় মাদক কারবার ও চোরাচালান বেড়েছে	5	4	3	2	1
4.	রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকার মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভূগছেন	5	4	3	2	1
5.	রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকার মানুষ অস্বস্তিতে আছেন	5	4	3	2	1
6.	রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় বেআইনী/অনানুষ্ঠানিক বিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে	5	4	3	2	1
7.	রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় জীবন-যাপন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে	5	4	3	2	1
8.	রোহিঙ্গা শরণার্থী আসায় এ এলাকায় সন্ত্রাস প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে	5	4	3	2	1

১৬. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ধারণা-

নিম্নলিখিত বিবৃতি সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আপনার মতামত অনুসারে একটি টিক দিয়ে দয়া করে আপনার প্রতিক্রিয়া জানান।

(১) দৃঢ়ভাবে একমত নই; (২) একমত নই; (৩) নিরপেক্ষ; (৪) একমত; এবং (৫) দৃঢ়ভাবে একমত

ক্র.	বিষয়	দৃঢ়ভাবে একমত 5	একমত 4	নিরপেক্ষ 3	একমত নই 2	দৃঢ়ভাবে একমত নই 1
1.	কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা গোপনে আপনার এলাকায় জমি ক্রয় করেছে	5	4	3	2	1
2.	কোনো কোনো রোহিঙ্গা শরণার্থীরা অবৈধভাবে আপনার এলাকার ভোটার হয়েছে	5	4	3	2	1
3.	কোনো কোনো রোহিঙ্গা শরণার্থীরা অবৈধভাবে আপনার এলাকায় পাসপোর্ট করেছে	5	4	3	2	1
4.	কোনো কোনো রোহিঙ্গা শরণার্থী আপনার এলাকায় অবৈধ পন্থায় বিয়ে করেছে	5	4	3	2	1
5.	কোনো কোনো রোহিঙ্গা শরণার্থী আপনার এলাকায় স্থায়ী বাসিন্দাদের সাথে পুরোপুরি মিশে গেছে	5	4	3	2	1
6.	কোনো কোনো রোহিঙ্গা শরণার্থী আপনার এলাকায় বিভিন্ন প্রকার অবৈধ লেনদেন করে থাকে	5	4	3	2	1
7	এ এলাকায় মাদক কারবারের সাথে স্থানীয় জনগোষ্ঠীও জড়িত	5	4	3	2	1

পরিশিষ্ট-১

বর্মী সরকার ও সামরিক জান্তা কর্তৃক (১৯৪৮-১৯৮২) আরাকানে পরিচালিত অভিযানসমূহ

ক্র. নং	অভিযানের নাম	অভিযান এলাকা	অভিযানের সময়কাল
১.	বার্মা টেরিটোরিয়াল ফোর্স (বি.টি.এফ.) অপারেশন	উত্তর আরাকান	১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ
২.	কম্বাইণ্ড ইমিগ্রেশন এণ্ড আর্মী অপারেশন	উত্তর আরাকান	১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ
৩.	ইউনিয়ন মিলিটারি পুলিশ (ইউএমপি) অপারেশন	উত্তর আরাকান	১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ
৪.	ক্যাপ্টেন বো তিন চিয়াউ অপারেশন	উত্তর আরাকান	১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দ
৫.	শিউ কাই অপারেশন	সমগ্র আরাকান	১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ
৬.	চিগান অপারেশন	সমগ্র আরাকান	১৯৬৬-৬৭ খ্রিষ্টাব্দ
৭.	নাগাজিনগা অপারেশন	সমগ্র আরাকান	১৯৬৭-৬৮ খ্রিষ্টাব্দ
৮.	মিয়াটমন অপারেশন	সমগ্র আরাকান	১৯৬৯-৭১ খ্রিষ্টাব্দ
৯.	মিলিটারী অপারেশন	সমগ্র আরাকান	১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ
১০.	সেব অপারেশন	সমগ্র আরাকান	১৯৭৪-৭৮ খ্রিষ্টাব্দ
১১.	নাগামিন (কিং ড্রাগন) অপারেশন	সমগ্র আরাকান	১৯৭৮-৭৯ খ্রিষ্টাব্দ
১২.	গেলন অপারেশন	সমগ্র আরাকান	১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ
১৩.	শিউ হিনথা অপারেশন	সমগ্র আরাকান	১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ
১৪.	সিটিজেনশিপ অপারেশন	সমগ্র বার্মা (বিশেষ করে আরাকানে)	১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

Muslims in Burma, a *Pamphlet Published by RPF*, Arakan, Burma, July, 1984, p. 15

পরিশিষ্ট-২

মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা ও অভিযানের তথ্য পাওয়া যায়

ক্রমিক নং	অভিযানের নাম	অভিযানের সময়কাল
১.	৫ম বর্মী রেজিমেন্ট সামরিক অভিযান	নভেম্বর ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ
২.	দ্বিতীয় জরুরি ছিন রেজিমেন্ট-এর সামরিক অভিযান	নভেম্বর ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ
৩.	মাউ অভিযান	অক্টোবর ১৯৫২ থেকে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ
৪.	মনে-থোন অভিযান	অক্টোবর ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ
৫.	সমন্বিত অভিবাসন ও সামরিক যৌথ অভিযান	জানুয়ারি ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ
৬.	মেজর অং থান অভিযানমেজর অং থান অভিযান	১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ
৭.	তাউঙ্গকের গণহত্যা	১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ
৮.	তাউঙ্গি (পশ্চিম বার্মা)-এর মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা	--
৯.	পি থিয়া অভিযান	জুলাই ১৯৯১-৯২ খ্রিষ্টাব্দ
১০.	নাসাকা অভিযান	১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অব্যাহত
১১.	মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা	মার্চ ১৯৯৭ (মান্দালয়)
১২.	সিটিওয়ে'তে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা	ফেব্রুয়ারি ২০০১
১৩.	মধ্য বার্মার মুসলিম বিরোধী সর্বাঙ্গীন দাঙ্গা	৯/১১ -এর পরবর্তী থেকে অক্টোবর ২০০১
১৪.	সেনা বাহিনী ও বৌদ্ধদের যৌথ মুসলিমনিধন অভিযান	জুন ২০১২ থেকে অব্যাহত
১৫.	সাম্প্রতিক সেনা বাহিনী, সরকারি মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীগোষ্ঠী ও বৌদ্ধভিক্ষুদের সম্মিলিত মুসলিম নির্মূল অভিযান	(বিশেষ করে ২০১৬ ইং)

(*দৈনিক আমাদের সময়*, ২২ নভেম্বর, ২০১৬)

পরিশিষ্ট-৩

গুণগত তথ্য প্রদানকারী

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে এফ.জি.ডি. উপস্থিতির তালিকাঃ (পুরুষ)

স্থানঃ লেদা, টেকনাফ **সময়ঃ ১:৩০ মি. তারিখঃ ১.১২.২০২০ ইংরেজি**

ক্র. নং	নাম	পেশা	মোবাইল নং
১.	রহমত	এনজিওকর্মী	০১৮৬৬৩৩৭৩৫৬
২.	সৈয়দ আকবর	ব্যবসায়ী	০১৮৯১৫৮৫২২০
৩.	ফরিদ	চাকরীজীবি	০১৮২০৯১০৪৩২
৪.	আব্দুস শুক্কুর	কৃষক	০১৮২৫৬৫২০৪০
৫.	সোনা মিয়া	চাকরীজীবি	------
৬.	কবির আহমদ	কৃষক	------
৭.	নূর হোসেন	কৃষক	-------
৮.	মাওঃ মুহাঃ নূরুল ইসলাম	(খতিব) ইমামতি	০১৮৩৯৫১৭৩০৭
৯.	জামাল হোসাইন	বেকার	০১৮৫২৬৭৭৫৮২

দলীয় আলোচনায় তথ্য প্রদানকারীগণ

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে এফ.জি.ডি. উপস্থিতির তালিকাঃ (নারী)

স্থানঃ দঃ লেদা টেকনাফ **সময়ঃ ২:৩০ মি. তারিখঃ ১.১২.২০২০ ইং**

ক্র. নং	নাম	পেশা	মোবাইল নং
১.	রোজিনা আকতার	দর্জি	০১৮৮২১১৪৬২১
২.	রেহেনা আকতার	দর্জি	০১৮৮১৩০৬১৭২
৩.	নূর বেগম	গৃহিনী	০১৮২০৯১০৪৩২
৪.	জাহানারা বেগম	গৃহিনী	০১৮৮৯৫৩১২৬৯
৫.	নূর নাহার	এনজিও, চাকরীজীবি	০১৮১৯০৫৫০৭৮
৬.	ফরিদা বেগম	গৃহিনী	০১৮৫৯২২৫৩৭৯
৭.	হুইসানা	ব্যবসায়	০১৯১০৯৫০৪৭৪
৮.	মাইবু	ব্যবসায়ী	--
৯.	আবুয়ান	মুদী দোকান	০১৩০৫৯৮৫১৭৫
১০.	নুর নাহার	গৃহিনী	০১৮৬৬২০৩৩০১

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে এফ.জি.ডি. উপস্থিতির তালিকাঃ (নারী-পুরুষ মিশ্র লিঙ্গ)

স্থানঃ স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, টেকনাফ সময়ঃ ১১:০০ তারিখঃ ২.১২.২০২০ ইংরেজি

ক্র. নং	নাম	পেশা	মোবাইল নং
১.	আ.ন.ম তৌহিদুল মাশেক, হ্নীলা, টেকনাফ	শিক্ষকতা	০১৫২১৪০০২৬৬
২.	কায়সার রশিদ, হ্নীলা, টেকনাফ	শিক্ষকতা	০১৪০৭৪০৫৭০১
৩.	আমিরুন, হ্নীলা, টেকনাফ	শিক্ষকতা	০১৮২২৩২৭৩৬৯
৪.	বাদশা, লেদা, টেকনাফ	শিক্ষকতা	০১৫৩৭০৭৬৮১১
৫.	মোহাম্মদ হোছাইন কুতুবী, কাঞ্জর পাড়া, টেকনাফ	শিক্ষকতা	০১৮৫৭১০৮০৮৫
৬.	মো: আবু তৈয়ব, নাটমোরা পাড়া, টেকনাফ	শিক্ষকতা	০১৮২২৩২৪০৬৫
৭.	ফয়সাল জহুর চৌধুরী, নয়াপাড়া, টেকনাফ	শিক্ষকতা	০১৫১৬১০০৮০৭

গুণগত তথ্য প্রদানকারীগণ

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে এফ.জি.ডি. উপস্থিতির তালিকাঃ (পুরুষ)

স্থানঃ মুচুনী নয়াপাড়া টেকনাফ সময়ঃ সকাল ১১:০০ টা তারিখঃ ১.১২.২০২০

ক্র. নং	নাম	পেশা	মোবাইল নং
১.	লোকমান হাকিম	বেকার	০১৮৬৬৫৮৩৪৩৯
২.	বদিউর রহমান	ব্যবসায়ী	০১৮৩০৫৬৯২৮২
৩.	সৈয়দ নূর মনু	দিনমজুর	০১৮২৮৪২২২৯৪
৪.	মোহা: হাসান	ব্যবসায়ী	০১৮৪৫২১৮৭১০
৫.	নজির আহমদ	বেকার	----
৬.	সফি উল্লাহ	দিনমজুর	০১৮৮০১৯৪৫৩২
৭.	মোহা: কবির	বেকার	০১৮৩৬১৬০৬৯৫
৮.	গফ্ফার মিয়া	কৃষি	------
৯.	মুক্কুর আহমদ	দিনমজুর	০১৮৮০১৯৪৫৫০
১০.	নূর আলম,	কৃষক	০১৮৬০৮৫৪৩৭০

গুণগত তথ্য প্রদানকারীগণ

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে এফ.জি.ডি. উপস্থিতির তালিকাঃ (পুরুষ)

স্থানঃ থাইংখালি, উখিয়া সময়ঃ ১১:০০ টায় তারিখঃ ২৯.১১.২০২০ ইংরেজি

ক্র. নং	নাম ও গ্রাম	পেশা	মোবাইল নং
১.	মোঃ ইসহাক, থাইংখালী	-----	০১৮১৪১২২৮০৯
২.	মোশারফ আলী, থাইংখালী	কৃষক	০১৮৮০৩২১৯৯১
৩.	জাফর আলম, থাইংখালী	প্রবাসী	০১৬০০১২৯৬৪৩
৪.	আবু ছিদ্দিক, থাইংখালী	রাজমিস্ত্রি	০১৮৪০৮৮০৬৯৯
৫.	শামসুল আলম, থাইংখালী	কাঠমিস্ত্রি	০১৮১৬৪৬৮৪২২
৬.	আবুল মনজুর, থাইংখালী	কৃষক	০১৮১১২৭৪৪৮৮
৭.	মীর কাশের, থাইংখালী	কৃষি ও ব্যবসা	০১৮৩৯৭২১৫৭১
৮.	আবুল বশর, থাইংখালী	মাছ ব্যবসায়ী	০১৮২৩৪৫২২৫৬
৯.	দিল মোহাম্মদ, থাইংখালী	ক্ষেত-খামার	০১৫১৮৩৮২০০৫
১০.	দেলোয়ার হোসেন, থাইংখালী	বাজার সভাপতি	০১৮৮২১৬৩৯৯৯
১১.	মোঃ ইউনুচ, থাইংখালী	ড্রাইভার	০১৮৮৪২৬৯৪৫১

গুণগত তথ্য প্রদানকারীগণ

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে এফ.জি.ডি. উপস্থিতি তালিকাঃ (পুরুষ)

স্থানঃ কুতুপালং টিভি টাওয়ার, উখিয়া সময়ঃ ১০:০০ টায় তারিখঃ ২৮.১১.২০২০ ইংরেজি

ক্র. নং	নাম ও গ্রাম	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১.	নূরুল আলম, কুতুপালং	০১৮৪৪২৬৫৫৩৬	
২.	নূল আলম, কুতুপালং	০১৮৩৩২৭৯৪৬১	
৩.	ছয়দ আহাম্মদ, কুতুপালং	০১৮৪৪২৬৫৫৩৬	
৪.	সাদ্দাম হোসেন, কুতুপালং	০১৮৯০৮৬৬৮১৯	
৫.	আমির হোসইন, কুতুপালং	০১৮৮০৬৯৪০০৩	
৬.	ফিরোজ আহাম্মদ, কুতুপালং	০১৮৪৮৫৮৪৮৬০	
৭.	আলাউদ্দিন, কুতুপালং	০১৮৪৪৫৭৬০০২	
৮.	আবু মুসা, কুতুপালং	০১৬৩২৭১৪৩১৩	
৯.	ওসামা বিন লাদেন, কুতুপালং	০১৮১৪৬৩৫০১৯	

গুণগত তথ্য প্রদানকারীগণ

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে এফ.জি.ডি. হাজিরা তালিকাঃ (নারী)

স্থানঃ কুতুপালং টিভি টাওয়ার, উখিয়া সময়ঃ ৯:০০ টায় তারিখঃ ২৮.১১.২০২০

ক্র. নং	নাম ও ব্লক নম্বর	মোবাইল নং
১.	গোলতাজ বেগম, কুতুপালং	০১৮৫৯৬২৬৩২২
২.	মমতাজ বেগম, কুতুপালং	০১৮৪৩০৩৮৯৩৬
৩.	সাবেকুন নাহার, কুতুপালং	০১৫৭৫১১২৭৯০
৪.	উম্মে হাবিবা, কুতুপালং	০১৮৫৫৪২৪১৪৬
৫.	রেহেনা আক্তার, কুতুপালং	০১৬৩২৭১৪৩১৩
৬.	জুবাইদা বেগম, কুতুপালং	০১৮৮৬৯৪০০৩
৭.	রেহেনা আক্তার, কুতুপালং	০১৮৩৩২৭৯৪৬১
৮.	সুইটি আক্তার, কুতুপালং	০১৮৭৪৩২৪৭৭৫
৯.	জাহানারা বেগম, কুতুপালং	০১৮৫২৯১১৬৪০
১০.	শাহিনা আক্তার, কুতুপালং	০১৮৯৩০২৪০৬০

গুণগত তথ্য প্রদানকারীগণ

শরণার্থী জনগোষ্ঠীর সাথে এফ.জি.ডি. হাজিরা তালিকাঃ (পুরুষ)

স্থানঃ লেদা মেকশিফ্‌ট ক্যাম্প, টেকনাফ সময়ঃ ১:৩০ মি. তারিখঃ ৩০. ১১.২০২০

ক্র. নং	নাম ও ব্লক নম্বর	মোবাইল নং
১.	মোঃ আলম-ব্লক L.M.S B	০১৮৩৯৯৪১২৯৩
২.	দিল মোহাম্মদ - Cam-25, D-10	০১৮৭২৭৪৮৪৬৮
৩.	আমিন উল্লাহ, ব্লক- C-1	০১৮৪৬৫৭০৫৫৪
৪.	মোস্তফা কামাল, ব্লক- B-1	০১৮৭২৬৪১৪০৩
৫.	মোঃ সেলিম, ব্লক- B-10	০১৮৭৫৪৪২২৮৭
৬.	আজিমুল্লাহ, ব্লক- A-18	০১৮৬১৫৭৪৩৩০
৭.	মোঃ ইলিয়াস, ব্লক- L.M.S.A	০১৮৬০৪৩৯৭৯১
৮.	মোঃ আইয়ুব, ব্লক- A-9	০১৯৭২৬৬০৬৭৭
৯.	রহিম উল্লাহ, ব্লক- D-11	০১৪৮৮২১১৫০৪৬
১০.	মোঃ ইব্রাহিম, ব্লক- D-24	০১৮৫৩২৯৮০৯২

গুণগত তথ্য প্রদানকারীগণ

শরণার্থী জনগোষ্ঠীর সাথে এফ.জি.ডি. হাজিরা তালিকাঃ (পুরুষ)

স্থানঃ নয়াপাড়া নিবন্ধিত শরণার্থী ক্যাম্প, টেকনাফ সময়ঃ ১০:০০ তারিখঃ ৩০.১১.২০২০

ক্র. নং	নাম ও ব্লক নম্বর	মোবাইল নং
১.	Abu Shama, H Block	01871269381
২.	Md. Selim, H Block	01882210860
৩.	Ma Kamal, C Block	01849841973
৪.	Md. Noor, C Block	01866355569
৫.	Ferdous, C Block	01871065042
৬.	Md. Ismail, C Block	01645949283
৭.	Akaram Ullah, C Block	01572268611
৮.	Arefa Begum- H Block	01890609478

গুণগত তথ্য প্রদানকারীগণ

শরণার্থী জনগোষ্ঠীর সাথে এফ.জি.ডি. উপস্থিতি তালিকাঃ (পুরুষ)

স্থানঃ কুতুপালং নিবন্ধিত ক্যাম্প, উখিয়া সময়ঃ ১২:০০ টায় তারিখঃ ১০.১১.২০২০

ক্র. নং	নাম ও ব্লক নম্বর	মোবাইল নং
১.	মোঃ সরওয়ার, A/74, Block Member	০১৮৬০৮৫৭২৭২
২.	মৌ. মোঃ হাফেজ, C/13, Block leader	০১৮১৮৪২২৭৪৩
৩.	হাজী কামাল, E Blaock Assistant	০১৮৩২৬১৫২৩৭
৪.	আব্দু শুক্কুর, E Blaock Member	০১৮৩৯৮৫৭৫২২
৫.	মাজেদ আব্দুল্লাহ, D Block Member	০১৮৭২০১৪৮৭৯
৬.	ফজল আহমদ, D Block leader	০১৮৮০০৯৭৬৫১
৭.	সফুরা খাতুন, D Block Member	০১৮১৭২৩৯৬১৩
৮.	আব্দুছ ছামাদ, A Block leader	০১৮৭৬৫৪৬৫৯০
৯.	হাফেজ জালাল, G Camp leader	০১৮১২০২০৯৩৭
১০.	শামশু আলম, C Block Member	০১৮৭৪৭৬১৫০৮
১১.	ইমাম হোসেন, C Block Assistant	০১৮৫৭৭২৪২৮৪

পরিশিষ্ট-৪

কে আই আই তথ্য প্রদানকারী (কর্মকর্তা ও অন্যান্য)

ক্র. নং	নাম	দায়িত্ব	স্থান
১.	মোঃ আবুল কালাম	কমিশনার	শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার
২.	মোঃ সামছুদ-দৌজা	সহকারী কমিশনার	শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার
৩.	কামাল হোসেন	জেলা প্রশাসক	কক্সবাজার জেলা
৪.	মো: সাইফুল ইসলাম	ইউএনও	টেকনাফ, কক্সবাজার
৫.	মো: সফিউল ইসলাম	ইউএনও	উখিয়া, কক্সবাজার
৬.	মোঃ রেজাউল করিম	ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি	কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প
৭.	মোঃ আব্দুল হান্নান	ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি	কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প
৮.	দেওয়ান মো: জিল্লুর রহমান	নারকটিক্স	টেকনাফ, কক্সবাজার
৯.	এমদাদ চৌধুরী	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	টেকনাফ, কক্সবাজার
১০.	রেজাউল করিম	ইন্সেপেক্টর	এপিবিএন, কক্সবাজার
১১.	মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম	পরিবেশ ফোরাম, সাংবাদিক	কক্সবাজার
১২.	মো: গিয়াস উদ্দিন	প্রথমআলো, সাংবাদিক	টেকনাফ, কক্সবাজার
১৩.	খাইরুল বাশার	এ্যাকশান এইড	কক্সবাজার
১৪.	মোহাম্মদ আলী	ব্র্যাক	উখিয়া

কে আই আই তথ্য প্রদানকারী (স্থানীয় জনপ্রতিনিধি)

ক্রমিক নং	নাম	দায়িত্ব	স্থান
১.	আশেক মাহমুদ	চেয়ারম্যান	হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদ
২.	আব্দুল গফুর	চেয়ারম্যান	পালংখালি ইউনিয়ন পরিষদ
৩.	জাহাঙ্গীর কবীর	চেয়ারম্যান	রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদ
৪.	নুরুল আলম	পৌরসভা চেয়ারম্যান	টেকনাফ উপজেলা
৫.	মোহাম্মদ আলী	মেম্বর, নয়াপাড়া	টেকনাফ উপজেলা
৬.	শাহীনা আক্তার	মহিলা মেম্বর, পালংখালি	উখিয়া উপজেলা
৭.	মর্জিনা বেগম	মহিলা মেম্বর, লেদা	টেকনাফ উপজেলা
৮.	হেলাল উদ্দিন	মেম্বর, কুতুপালং	উখিয়া উপজেলা
৯.	মো: কামরুন্নেছা	মহিলা মেম্বর, কুতুপালং	উখিয়া উপজেলা
১০.	নুরুল হুদা	মেম্বর, লেদা	টেকনাফ উপজেলা

পরিশিষ্ট-৫

নিবিড় সাক্ষৎকার

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে নিবিড় সাক্ষৎকার উপস্থিতির তালিকাঃ (পুরুষ-নারী)

স্থানঃ উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার

ক্র. নং	নাম ও গ্রাম	ইউনিয়ন	পেশা	মোবাইল
১.	বাহার উদ্দিন, পালংখালী	পালংখালী	ব্যবসা	০১৮২২৮৪৯০১৭
২.	আব্দুল মজিদ সিদ্দিকী, পালংখালী	পালংখালী	ডাক্তার	০১৮৬৮৫১৮৯৫১
৩.	নূর মুহাম্মদ, থাইংখালি	পালংখালী	ব্যবসা ও কৃষি	০১৬৪১৬৬৩৯৬৬
৪.	হাঃ আজিজুর রহমান, থাইংখালি	পালংখালী	শিক্ষকতা	০১৮১৫১৫৩৬৯৪
৫.	রকিউল ইসলাম, থাইংখালি	পালংখালী	এনজিও কর্মী	০১৫৭৫৩৭৮০৩০
৬.	আঃ গফুর নানু, বালুখালী	পালংখালী	এনজিও কর্মী	০১৫৭৫১৫৫৮১৯
৭.	কফিল উদ্দিন, বালুখালী	পালংখালী	এনজিও কর্মী	০১৮৭৭৯৩৪৫৫৪
৮.	আব্দুল গণি, বালুখালী	পালংখালী	ব্যবসা	০১৮১১৮২১৫৩৫
৯.	আঃ ছালাম, বালুখালী	পালংখালী	বাস ড্রাইভার	০১৮১৪৯২৫১৪৪
১০.	মোঃ সৈয়দ নূর, বালুখালী	পালংখালী	শিক্ষকতা	০১৮১৫১১৩৯৭০
১১.	এজাহার মিয়া, লেদা	হ্নীলা	ব্যবসা	০১৬৪২৯৮১২১০
১২.	আঃ গফুর, প. লেদা	হ্নীলা	ড্রাইভার	০১৮২২৪০৪৫৭
১৩.	মোঃ আমীন, প. লেদা	হ্নীলা	-	০১৮৪১৬০৩৪৩৪
১৪.	ফরিদ আলম, প. লেদা	হ্নীলা	ড্রাইভার	০১৮১১২২৭৮০১
১৫.	জানে আলম, প. লেদা	হ্নীলা	দিন মজুরী	০১৮২৫১৫৭৭৫৩
১৬.	মোহাম্মদ, জাদিমুরী ক্যালা	হ্নীলা	ব্যবসা	---
১৭.	শাকের আহমেদ, লেদা	হ্নীলা	শিক্ষকতা	০১৮৭৪৬২২৩৮০
১৮.	আব্দুর রহমান, জাদিমুরা	হ্নীলা	এনজিও কর্মী	০১৮৩৭১২৫৭২০
১৯.	মোঃ ইউনুস, জাদিমুরী	হ্নীলা	এনজিও কর্মী	০১৮২৪৬৩৮০০৫
২০.	জাফর আলম, নয়াপাড়া	হ্নীলা	বেকার	০১৮২৪৮৫৬৬৭০
২১.	নূর মোহাম্মদ, নয়াপাড়া	হ্নীলা	ক্ষুদ্র ব্যবসা	০১৮১১৯০০৯৩০
২২.	মোঃ শাহ আলম, নয়াপাড়া	হ্নীলা	গরুর খামার	০১৮১৮৭৫৬৮৭৯
২৩.	আবু তাহের, নয়াপাড়া	হ্নীলা	মাছ চাষ	০১৮৮৪৭৬১৫৯২
২৪.	আঃ মুনাফ, জাদিমুরা	হ্নীলা	ব্যবসা	
২৫.	মাও শামসুল আলম, নয়াপাড়া	হ্নীলা	শিক্ষকতা	০১৮৩৬২৩৬০১৪
২৬.	মা. বজলুর রহমান, জাদিমুরা	হ্নীলা	চাকরীজীবি	০১৮৩৩২৭৩৯৮২
২৭.	মোঃ ইসমাইল, জাদিমুরা	হ্নীলা	চাকরী	০১৯০৯৩৮৫০০৬
২৮.	মোঃ আতিকুর রহমান, থাইংখালি	পালংখালি	ব্যবসা	০১৮৭১১২৮৫১৪
২৯.	জয়নাল আবেদিন, থাইংখালি	পালংখালি	চাকরী	০১৮১৪৯৪১৪৮৫
৩০.	আলী ইসলাম, কুতুপালং	রাজাপালং	মাছ বিক্রেতা	০১৮২১৪৬৯৮৩২

৩১.	খালেদা বেগম, কুতুপালং	রাজাপালং	গৃহিনী	০১৮৫২২৮৩২৪১
৩২.	শাহাবউদ্দীন, কুতুপালং বাজার	রাজাপালং	বেকার	০১৮১৮০০৪৫৮৯
৩৩.	ছাব্বির আহম্মদ, কুতুপালং	রাজাপালং	এনজিও কর্মী	০১৮৫৬৩৩০০২০
৩৪.	তাছলিমা খাতুন, কুতুপালং	রাজাপালং	এনজিও কর্মী	-----
৩৫.	আক্তার উদ্দিন, কুতুপালং	রাজাপালং	শিক্ষকতা	০১৮৮২৯০৮৭৮৭
৩৬.	মোঃ রফিক, কুতুপালং	রাজাপালং	কৃষি কাজ	০১৮৪৪৮৯৬৯৮০
৩৭.	আনোয়ার হুসাইন, বালুখালী	পালংখালী	এনজিও কর্মী	০১৫১৬৩৯৫৬৬৩
৩৮.	মোঃ শহীদুল্লাহ, বালুখালী	পালংখালী	শিক্ষার্থী	০১৮৩২২৩২৩২৭
৩৯.	নূরুল কবীর, পালংখালী	পালংখালী	ব্যবসা	০১৮৫১৬৩৯৯৪৩
৪০.	রফিক উদ্দিন, পালংখালী	পালংখালী	ব্যবসা	০১৮২০২৯৮৮২৮
৪১.	সিরাজুল মোস্তফা, নয়াপাড়া	হ্নীলা	ব্যবসা	০১৯৭৬৩০৭৫২৭
৪২.	হামিদ হোসেন, নয়াপাড়া	হ্নীলা	দোকান ভাড়া	০১৮৬০৮৯৪৮৭৯
৪৩.	আবু বক্কর, পালংখালী	পালংখালী	দিন মুজুরী	০১৮৫৫২৩৩৩১৮
৪৪.	কামাল হোসেন, পালংখালী	পালংখালী	চাষাবাদ	০১৮১৫৬৭৪৮১৪

পরিশিষ্ট-৬

মুচুনী গ্রামে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বসত ঘরের নিকট মানব বর্জ্য পরিশোধনাগার

পরিশিষ্ট-৭

লেদা গ্রামে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে দলীয় আলোচনা

পরিশিষ্ট-৮

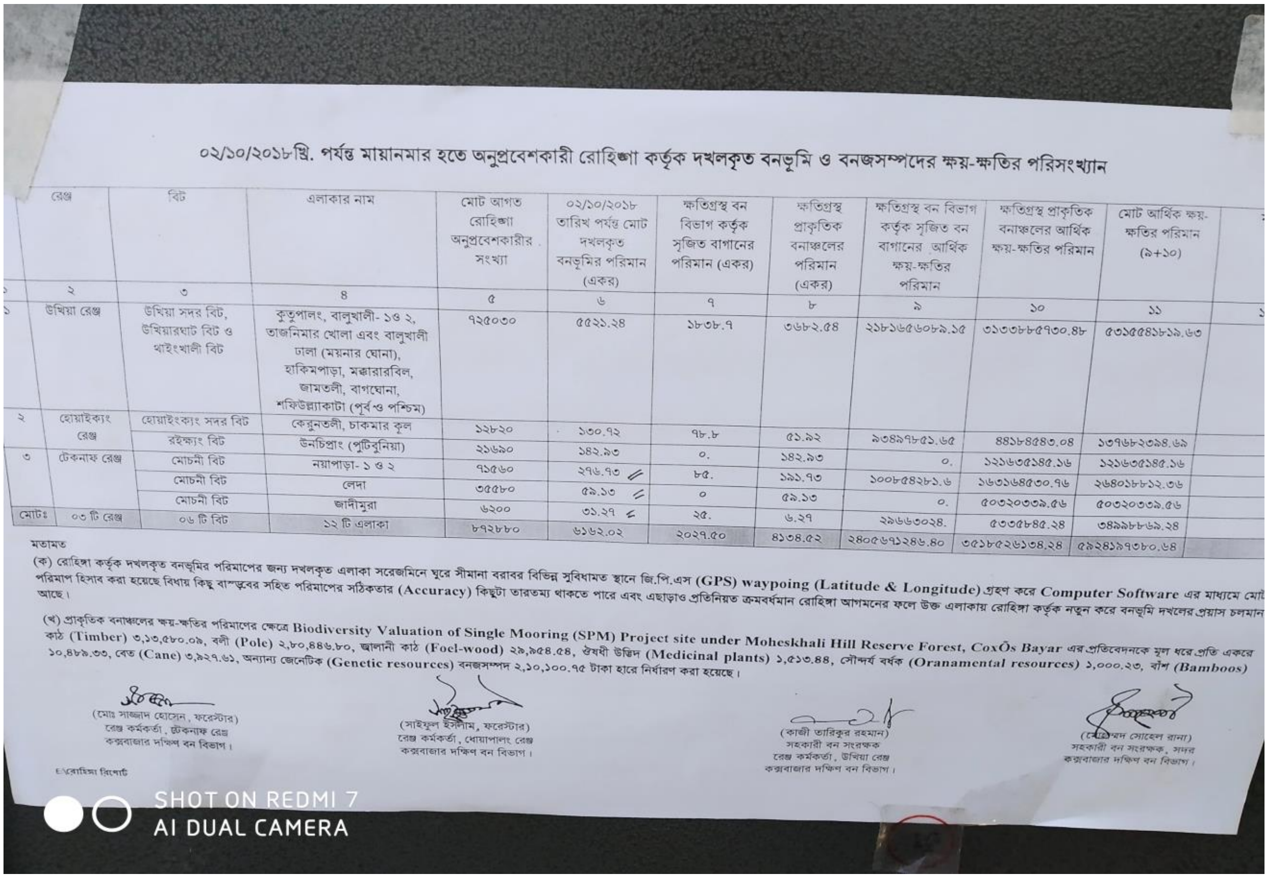

০২/১০/২০১৮খ্রি. পর্যন্ত মায়ানমার হতে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা কর্তৃক দখলকৃত বনভূমি ও বনজসম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিসংখ্যান

	রেঞ্জ	বিট	এলাকার নাম	মোট আগত রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা	০২/১০/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মোট দখলকৃত বনভূমির পরিমান (একর)	ক্ষতিগ্রস্থ বন বিভাগ কর্তৃক সৃজিত বাগানের পরিমান (একর)	ক্ষতিগ্রস্থ প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের পরিমান (একর)	ক্ষতিগ্রস্থ বন বিভাগ কর্তৃক সৃজিত বন বাগানের আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান	ক্ষতিগ্রস্থ প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান	মোট আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান (৯+১০)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	উখিয়া রেঞ্জ	উখিয়া সদর বিট, উখিয়ারঘাট বিট ও থাইংখালী বিট	কুতুপালং, বালুখালী- ১ও ২, তাজনিমার খোলা এবং বালুখালী ঢালা (ময়নার ঘোনা), হাকিমপাড়া, মক্কারারবিল, জামতলী, বাগঘোনা, শফিউল্ল্যাকাটা (পূর্ব ও পশ্চিম)	৭২৫০৩০	৫৫২১.২৪	১৮৩৮.৭	৩৬৮২.৫৪	২১৮১৬৫৬০৮৯.১৫	৩১৩৩৮৮৫৭৩০.৪৮	৫৩১৫৫৪১৮১৯.৬৩
২	হোয়াইক্যং রেঞ্জ	হোয়াইংক্যং সদর বিট	কেরুনতলী, চাকমার কূল	১২৮২০	১৩০.৭২	৭৮.৮	৫১.৯২	৯৩৪৯৭৮৫১.৬৫	৪৪১৮৪৫৪৩.০৪	১৩৭৬৮২৩৯৪.৬৯
		রইক্ষ্যং বিট	উনচিপ্রাং (পুটিবুনিয়া)	২১৬৯০	১৪২.৯৩	০.	১৪২.৯৩	০.	১২১৬৩৫১৪৫.১৬	১২১৬৩৫১৪৫.১৬
৩	টেকনাফ রেঞ্জ	মোচনী বিট	নয়াপাড়া- ১ ও ২	৭১৫৬০	২৭৬.৭৩	৮৫.	১৯১.৭৩	১০০৮৫৪২৮১.৬	১৬৩১৬৪৫৩০.৭৬	২৬৪০১৮৮১২.৩৬
		মোচনী বিট	লেদা	৩৫৫৮০	৫৯.১৩	০	৫৯.১৩	০.	৫০৩২০৩৩৯.৫৬	৫০৩২০৩৩৯.৫৬
		মোচনী বিট	জাদীমুরা	৬২০০	৩১.২৭	২৫.	৬.২৭	২৯৬৬৩০২৪.	৫৩৩৫৪৮৪৫.২৪	৮৩৯১৮৮৬৯.২৪
মোটঃ	০৩ টি রেঞ্জ	০৬ টি বিট	১২ টি এলাকা	৮৭২৮৮০	৬১৬২.০২	২০২৭.৫০	৪১৩৪.৫২	২৪০৫৬৭১২৪৬.৪০	৩৫১৮৫২৬১৩৪.২৪	৫৯২৪১৯৭৩৮০.৬৪

মতামত

(ক) রোহিঙ্গা কর্তৃক দখলকৃত বনভূমির পরিমাপের জন্য দখলকৃত এলাকা সরেজমিনে ঘুরে সীমানা বরাবর বিভিন্ন সুবিধামত স্থানে জি.পি.এস (GPS) waypoing (Latitude & Longitude) গ্রহণ করে Computer Software এর মাধ্যমে মোট পরিমাপ হিসাব করা হয়েছে বিধায় কিছু বাস্তবের সহিত পরিমাপের সঠিকতার (Accuracy) কিছুটা তারতম্য থাকতে পারে এবং এছাড়াও প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান রোহিঙ্গা আগমনের ফলে উক্ত এলাকায় রোহিঙ্গা কর্তৃক নতুন করে বনভূমি দখলের প্রয়াস চলমান আছে।

(খ) প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাপের ক্ষেত্রে Biodiversity Valuation of Single Mooring (SPM) Project site under Moheskhali Hill Reserve Forest, CoxÕs Bayar এর প্রতিবেদনকে মূল ধরে প্রতি একরে কাঠ (Timber) ৩,১৩,৫৮০.০৯, বলী (Pole) ২,৮০,৪৪৬.৮০, জ্বালানী কাঠ (Foel-wood) ২৯,৯৫৪.৫৪, ঔষধী উদ্ভিদ (Medicinal plants) ১,৫১৩.৪৪, সৌন্দর্য বর্ধক (Oranamental resources) ১,০০০.২৩, বাঁশ (Bamboos) ১০,৪৮৯.৩৩, বেত (Cane) ৩,৯২৭.৬১, অন্যান্য জেনেটিক (Genetic resources) বনজসম্পদ ২,১০,১০০.৭৫ টাকা হারে নির্ধারণ করা হয়েছে।

(মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, ফরেস্টার)
রেঞ্জ কর্মকর্তা, টেকনাফ রেঞ্জ
কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ।

(সাইফুল ইসলাম, ফরেস্টার)
রেঞ্জ কর্মকর্তা, ধোয়াপালং রেঞ্জ
কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ।

(কাজী তারিকুর রহমান)
সহকারী বন সংরক্ষক
রেঞ্জ কর্মকর্তা, উখিয়া রেঞ্জ
কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ।

(মোহাম্মদ সোহেল রানা)
সহকারী বন সংরক্ষক, সদর
কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ।

E:\রোহিঙ্গা রিপোর্ট

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কর্তৃক দখলকৃত বনভূমি ও বনজ সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৯

লেদা গ্রামে স্থানীয় নারী জনগোষ্ঠীর সাথে দলীয় আলোচনা

পরিশিষ্ট-১০

কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী জনগোষ্ঠীর সাথে দলীয় আলোচনা

পরিশিষ্ট-১১

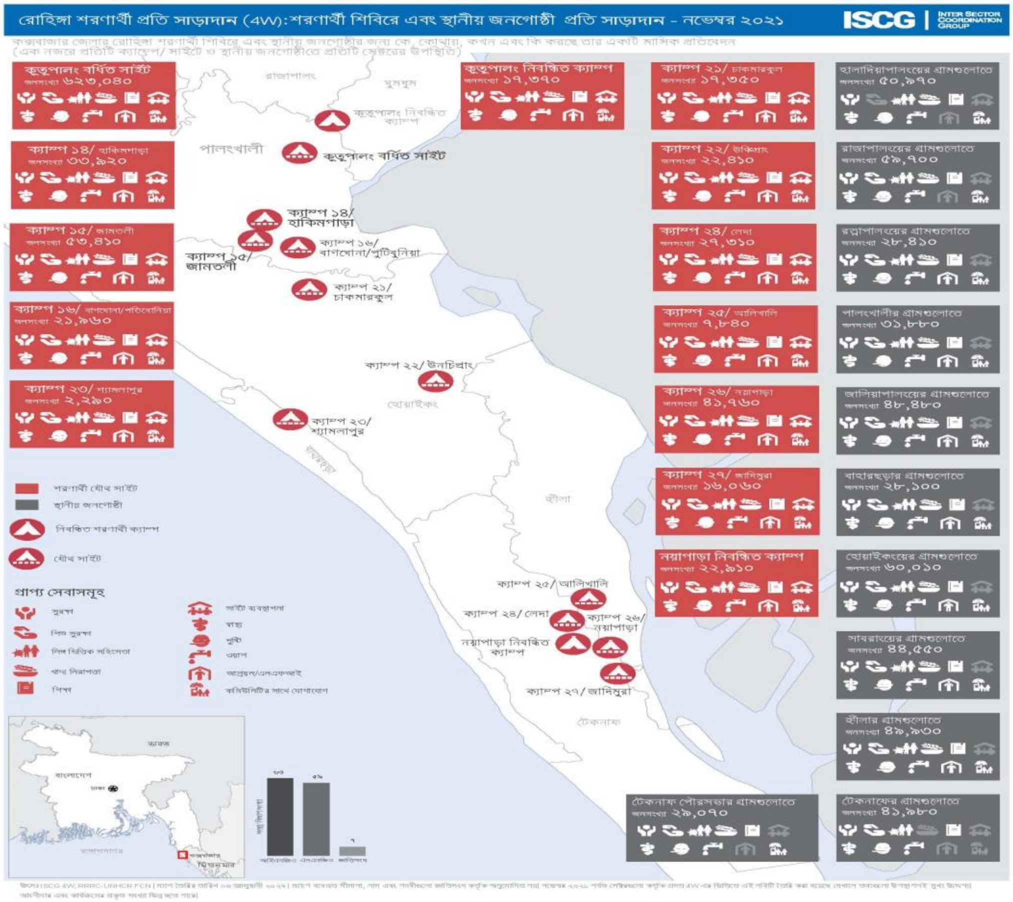

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বসবাসের স্থান ও সংখ্যা

পরিশিষ্ট-১২

গবেষণার কর্ম পরিকল্পনা চার্ট

গবেষণা কার্যক্রম		বছর				বছর				বছর				বছর		
		২০১৪-১৫ সাল				২০১৬-১৭ সাল				২০১৮-১৯ সাল				২০২০-২০২২ জুলাই		
		প্রথম ছয় মাস	দ্বিতীয় ছয় মাস	তৃতীয় ছয় মাস	চতুর্থ ছয় মাস	প্রথম ছয় মাস	দ্বিতীয় ছয় মাস	তৃতীয় ছয় মাস	চতুর্থ ছয় মাস	প্রথম ছয় মাস	দ্বিতীয় ছয় মাস	তৃতীয় ছয় মাস	চতুর্থ ছয় মাস	প্রথম বছর	দ্বিতীয় বছর	তৃতীয় বছর
১.	ক. বিষয় নির্ধারণ ও প্রস্তাবনা তৈরি খ. গবেষণা প্রস্তাবনা অনুমোদন	√														
২.	সাহিত্য পর্যালোচনা		√													
৩.	গবেষণা দলিল-পত্র সংগ্রহ			√												
৪.	তাত্ত্বিক পর্যালোচনা				√											
৫.	প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট তৈরি					√										
৬.	প্রশ্নমালা পরীক্ষা ও চেকলিষ্ট পরীক্ষা						√									
৭.	তথ্য সংগ্রহ							√	√							
৮.	তথ্য ব্যবস্থাপনা									√						
৯.	তথ্য বিশ্লেষণ										√	√				
১০.	ফলাফল আলোচনা												√			
১১.	ফলাফল আলোচনা													√		
১২.	উপসংহার-সুপারিশ														√	
১৩.	অভিসন্দর্ভ চূড়ান্তকরণ ও জমা প্রদান															√